গ্রন্থস্বত্ব : দেবেশচন্দ্র রায় ও শ্যামল সান্যাল

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৯

প্রকাশক : শ্রী রুদ্রপ্রকাশ ধর
বন্দে ভারতম্ প্রকাশনী
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড
পোঃ ঘোলা
উত্তর ২৪ পরগণা

সুভাষজননী প্রভাবতীদেবী

উৎসর্গ

অগ্নিযুগের বিপ্লবীনায়ক ৺মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত
ও
বিপ্লব বিধায়ক ৺সুপতি রায়কে
সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন পূর্বক
অর্ঘ্য

॥ এক ॥

নও তুমি নও শুধু ইতিহাস স্রষ্টা
সুভাষ কীর্তি গাঁথার রূপকার ধ্রুব,
তুমি যে অপার বিশ্ববাসীর মুক্তির
মুক্তকাণ্ডারীর আদি উপাখ্যানেরই
মহা উদ্‌গাতা অমর সংহিতাকার।
যে নামের স্বর্ণ রথে তুমি করেছিলে
যাত্রা লভিয়া সত্যের দিশা বীজমন্ত্র,
উড়ায়ে সুভাষ নামের ঐ বৈজয়ন্তী—
সে তো জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীরই
তীর্থ ত্রিবেণী সঙ্গম, সুভাষ প্রবাহ।
যে পুণ্য ধারায় আজ মুক্ত হচ্ছে গ্লানি,
ধন্য হচ্ছে নব কলেবরে বিশ্বভূমি,
সে বৈতরণীর কুলপ্লাবি ধারা তুমি
প্রবাহিলে সারা জীবজগত তরঙ্গে
শুনায়ে কল্কি ত্রাতার মহাবেদ বাণী,
এমনটি না হলে কি আরণ্যক মুনি?

ধন্য তুমি ধন্য তব মানব জনম
সেই মহানাম ব্রতে হয়ে ব্রতচারী।
তাই তব পুণ্যস্মৃতি স্মরে আজি মোর
কোটি প্রণতির ডালি এই অর্ঘ্যাঞ্জলি।
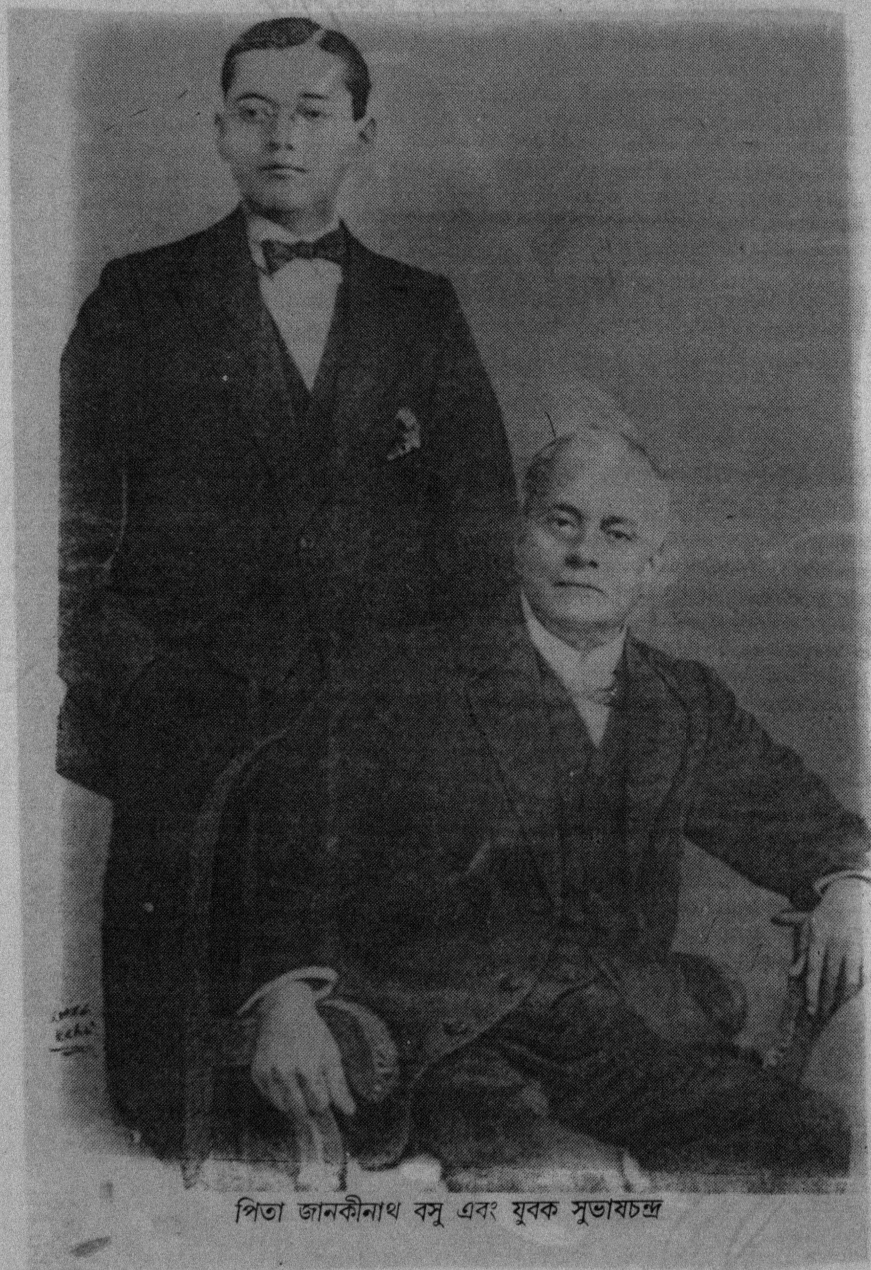
পিতা জানকীনাথ বসু এবং যুবক সুভাষচন্দ্র

॥ দুই ॥

বিপ্লবের অনন্ত সত্তায় উদ্ভাসিয়া সাথে
করে এনেছিলে যে মহাজীবন মহীয়ান,
মৃত্যুর মহানিষ্ক্রমণের মাঝে তাঁরে তুমি
করে গেলে কালোত্তীর্ণ অমরতায় অম্লান।
এমন যে সাগ্নিক বিধায়ক, স্বাধীনতার —
বেদীমূলে নিবেদিত প্রাণসত্তা ভাস্বর,
যাঁর ফল্গুস্রোতে আজো হচ্ছে সবে উজ্জীবিত
সেই যে স্বর্গীয় মহাপ্রাণ তাঁর স্মৃতিস্মরে
এই নেতাজী সুভাষ গাঁথার কীর্তিমালার
মালিকা গ্রন্থের অর্ঘ্য নিবেদন, পূতডালি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব : মানব ইতিহাসের শ্রেষ্টতম বিপ্লবী।

বেদান্ত কেশরী স্বামীবিবেকানন্দ : বিশ্ববিপ্লবের দীক্ষাগুরু।

প্রকাশকের নিবেদন

"সুভাষ দর্পণে বিশ্বরূপ" গ্রন্থটির লেখক শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র রায়, ব্যক্তিগত জীবনে একজন অন্তর্মুখীন অহমিকা শূন্য এবং প্রচার বিমুখ, অপরদিকে এমন বন্ধু বৎসল এবং দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি সমাজে সচরাচর অল্পই দেখা যায়। তিনি পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট জেলার এক বর্দ্ধিষ্ণু এবং বিশিষ্ট পরিবারে ১৯৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দেশভাগের ক্ষত বয়ে নিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পশ্চিম বাংলায় অনেক টানা পোড়েন এবং জীবন সংগ্রামের পর তিনি জি-এস-আই (জিওলজিকাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া) এর জরিপ বিভাগে কর্মে বহাল হন। কর্মসূত্রে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জরিপের কাজে ক্যাম্পে ক্যাম্পে চাকুরী জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান। উক্ত সময়ের মধ্যে তিনি অসংখ্য কবিতা—গান রচনা করেন, এবং কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বদলি হবার পর গানের সাধনা ও সুর রচনায় মনোনিবেশ করেন। এর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই "বন্দে ভারতম", "রুদ্রাণীমা" এবং "জয়তু নেতাজী" নামে তিনটি ক্যাসেট রেকর্ডিং করান। "বন্দে ভারতম" ক্যাসেটটি স্বদেশ বন্দনার এবং "রুদ্রাণীমা" ক্যাসেটটি ভক্তিমূলক। তৃতীয় "জয়তু নেতাজী" ক্যাসেটটি নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের স্বদেশ কর্মকাণ্ডের নাতিদীর্ঘ আলেখ্য যা কবিতার মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। ইদানীং কালের চতুর্থ ক্যাসেটটি নেতাজী বন্দনা ও মাতৃভূমির আরাধনার। গানগুলি শুনতে শুনতে স্বদেশ ভাবনায় সারা হৃদয় মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। অতুল প্রসাদ ও রজনীকান্তের গানের পর্যায়ের—গানগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিগত ৪/৫ বছরের মধ্যে পুরানো দিনের লেখাগুলি থেকে স্বদেশ বন্দনার কবিতা সংকলন "স্বদেশ দর্পণে" কবিতা গ্রন্থ। কাব্যগ্রন্থ "উর্ম্মিমালা"। এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা" ঐ মহামানব আসে" পুস্তক ত্রয় রচনা করেন। বর্তমান গ্রন্থটি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্ব নায়কদের এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে একটি অনন্য স্বাদের গ্রন্থ ; যেমন আকারে—তেমনি বিষয়ে। বাংলা ভাষায় এযাবৎ যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে তার মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থটি ভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে লেখা। বহু অজানা তথ্য যেমন সন্নিবেশিত হয়েছে তেমনি যুক্তিনিষ্ঠ বহু বিষয়ের অবতারণা করে পাঠককে অথবা গবেষকদের সঠিক সিদ্ধান্তে
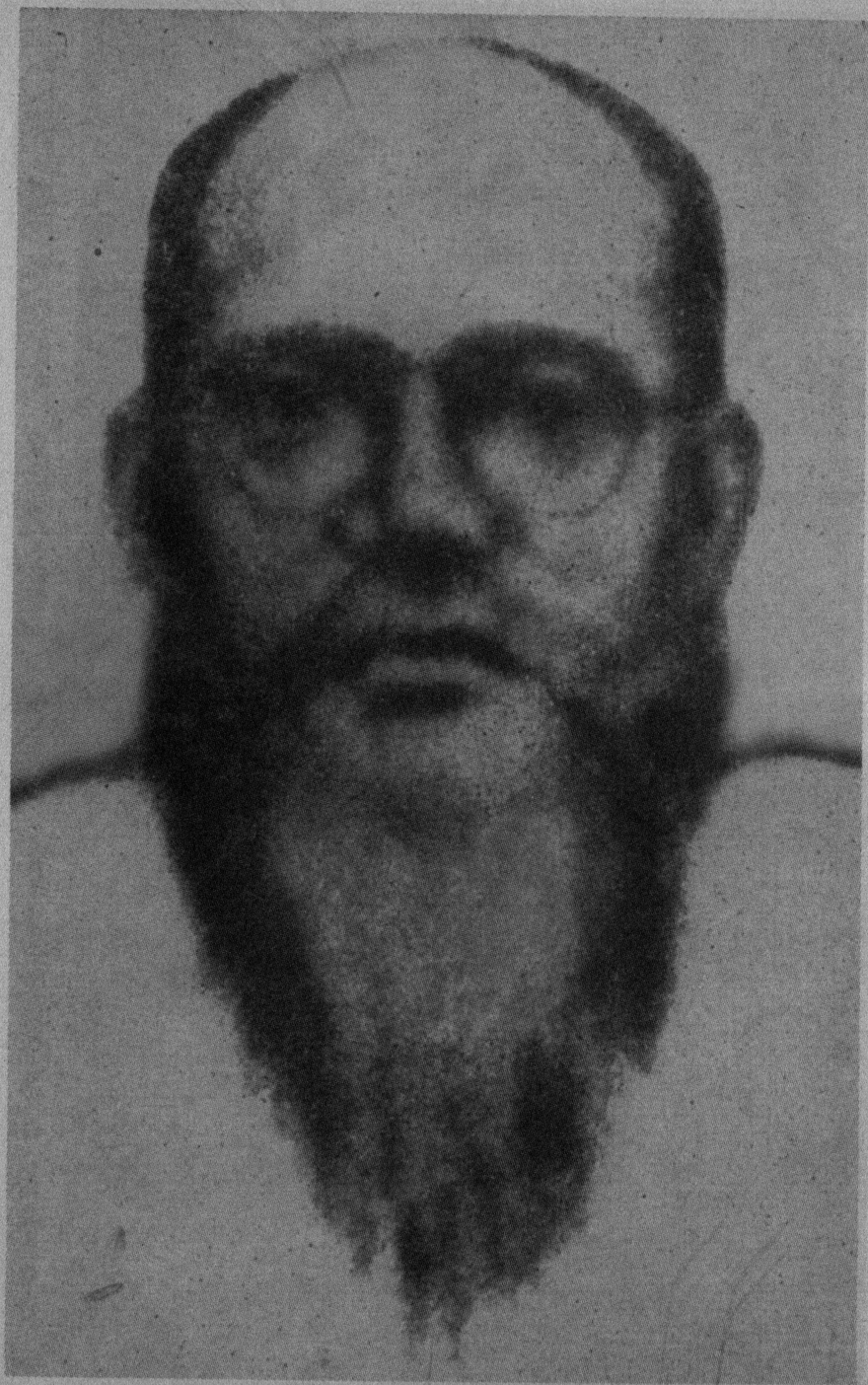
বিশ্বপিতা : শ্রীমদ্ সারদানন্দজী : বিশ্ববিপ্লবের মহাঋত্বিক ।

পৌঁছাতে সাহায্য করবে। এমন সব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে যা অসম্ভব বলে মনে হবে, তা আমরা ইতিপূর্বে কখনও পাইনি অথবা সে সকল তথ্য জানারও সৌভাগ্য হয়নি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়ে পরেছে যে, পুস্তকের সমস্ত ছবি, ডকুমেন্ট, হস্তলিপি বংশলতিকা ইত্যাদি বি-ভি'র (বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স)র বিপ্লবীদের সৌজন্যে প্রাপ্ত। লেখক কতিপয় বিপ্লবী এবং গবেষকদের স্নেহধন্য ছিলেন। তন্মধ্যে ক্যাপ্টেন রাধিকারঞ্জন দত্ত, ঁকমলা দাশগুপ্তা, আনন্দ ভারতী শিবপ্রসাদ নাগ এবং ঁমনোজ চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য।

লেখকের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো ভারতীয় পরাম্পরাগত ধারার উন্মোচন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ ধারার পরিপূর্ণতা হলো শ্রীমৎ সারদানন্দে। সুভাষ থেকে নেতাজী অবশেষে সারদানন্দে স্বয়ং সম্পূর্ণতা, এ এক অভিনব পরিক্রমা এবং স্বতন্ত্র আবিস্কার। গ্রন্থটি সুধী পাঠকবর্গের এবং যারা প্রকৃতি ইতিহাস জানতে চান তাদের ভাল লাগবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অজ্ঞাত দলিল হিসাবে এর মূল্য অপরিসীম। অপরদিকে সর্বতোমুখী স্বমহিমায় ভাস্বর সুভাষের চরিত্র চিত্রনে পুস্তকটি হয়ে উঠেছে এক অনন্য ভক্তির অর্ঘ্য।
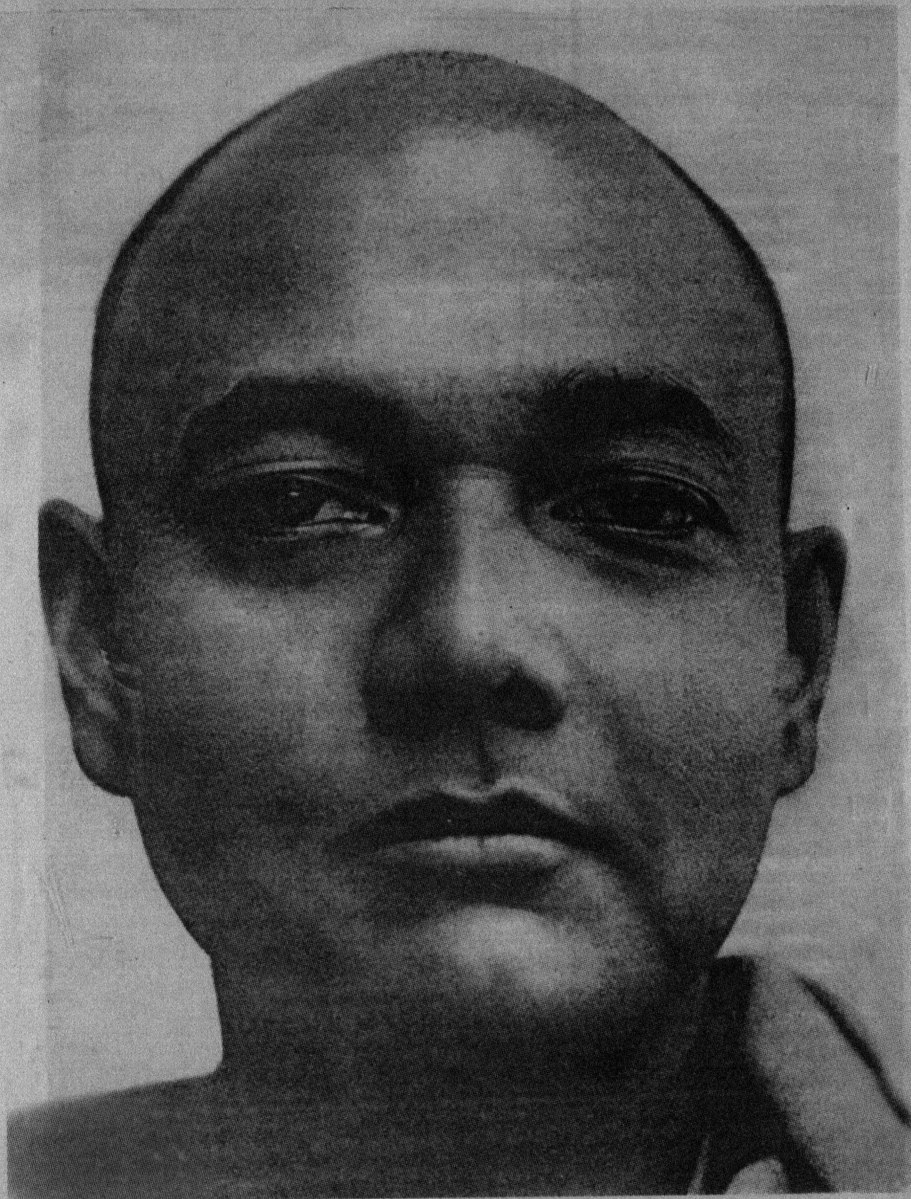
পিতৃ পারলৌকিককালে : সুভাষচন্দ্র ।

ভূমিকা

"অত্রাপি ভারতঃ শ্রেষ্ঠঃ জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতোহি কর্মভূরেষা ততোহন্যা ভোগভূময়ঃ॥
অত্র জন্ম সহস্রানাং ; সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্য পূণ্যসঞ্চয়াৎ॥
গায়ন্তি দেবাঃ কিলগীতকানি
ধন্যাস্তুতে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গা স্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয় পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥"

—*বিষ্ণুপুরাণ*

অর্থাৎ,

"হে মহামুনে! জম্বুদ্বীপ মধ্যে ভারতবর্ষই সর্বশ্রেষ্ঠ জানিবে। ইহা কর্মভূমি। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর সকল স্থান ভোগভূমি। হে সাধু শ্রেষ্ঠ! জীবগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর বহু পূণ্যের ফলে এই ভারতবর্ষে কদাচিৎ মনুষ্য জন্মলাভ করে। দেবগণ এইরূপ গীতকীর্তন করেন—'যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষস্পদের পথ স্বরূপ ভারতভূমিতে জন্মলাভ করেন তাঁহারা আমাদের দেবকুলের চেয়েও শ্রেয়ঃ এবং ধন্য।'—এই হেতু দেবগণও ভারতভূমিতে জন্মলাভের সাধনা ও আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন।"

পূণ্যভূমি ভারতবর্ষ শুধু কর্মভূমিই নয়। ভারতবর্ষ হচ্ছে পৃথিবীর সহস্রার। এই ভারতবর্ষ চিরকালই পৃথিবীর আলোক দিশারী। ভারতবর্ষ কখনও বিলোপ হতে পারেনা। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, 'ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান'। তাই শত বিপর্যয়ের ভিতর দিয়েও কালে কালে যুগে যুগে কর্মযোগী ধর্মবীর এবং মহান ত্যাগী যুগস্রষ্টাগণ আবির্ভূত হয়ে এই ভূমিকে পবিত্র হতে পবিত্রতর করেছেন। এবং তাঁরা সমগ্র মনুষ্য জগতের জন্য যুগোপযোগী আদর্শ অনুশাসন দিয়ে গেছেন। সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যার দ্বিতীয় উপমা দ্বিতীয় কোন স্থানে নেই, এবং আগামী যুগেও তাই ঘটবে অনিবার্য ভাবেই। এমন যে ভারতবর্ষ সে ভারতবর্ষে এ-পর্যন্ত যে সব কর্মযোগী ধর্মবীরগণ এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে বিরাজমান। এমন পুরুষের নাম করতে গেলে তাঁদের সীমা নেই। বলতে পারি সকল মহানপুরুষ বা যুগমানবদের সমন্বয় বা মথিত মন্থন রূপেই আজ আমরা পাচ্ছি শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীমদ্ সারদানন্দজীর (নেতাজী সুভাষ) প্রত্যক্ষ-রূপ পরিগ্রহণের মাঝে। তাই বলতেই হয় এ সবই হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই অমর অমোঘ বাণী অর্থাৎ,

মহানায়ক সুভাষচন্দ্র বসু বহির্ভারতে :
১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর : ঘোষিত অখন্ড স্বাধীনভারতবর্ষের
তথা আই. এন.এ. সরকারের রাষ্ট্রপ্রধানরূপে ।

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" ৪/৮

এই স্বতঃসিদ্ধ বাণীর প্রতিফলন বা সার্থক রূপায়ণ আজও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মাধ্যমে পৃথিবী তথা সমগ্র মানবজগত প্রত্যক্ষ করতে চলেছে অচিরেই এবং সুনিশ্চিত ভাবেই। এ ঘটনা আজ হোক কাল হোক ঘটবেই ঘটবে। তবে কারো কারো প্রশ্ন থাকতে পারে কেন এমন বিলম্ব? এর পক্ষে কিছু বলতে হলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এখানে এসে যায় পূর্ববর্তী যুগপুরুষ বা সাধকদের কথা ও উপমা। যথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বা এমন যাঁরাই অগ্রজ দিশারী তাঁরা যে সাধনমগ্নে ব্রতী ছিলেন, তাঁদের সাধনা কাল ছিল প্রত্যেকের দ্বাদশ বর্ষ বা অনুরূপ। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কাল দেখা যাচ্ছে খুবই দীর্ঘ। তাই আমরা সুভাষচন্দ্রের ব্যাপারটা কোন অঙ্কেই মিলাতে পারছিনা। শুধু এই দিকটাই নয়। সুভাষচন্দ্রের প্রতিটি পদক্ষেপই দেখা যাচ্ছে অঙ্কশাস্ত্র এখানে এসে তালগোল পাকিয়ে কক্ষচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। কোন অঙ্কেই তাঁর কোন একটা দিকও পৃথিবীর বিশারদরা মিলাতে পারছে না। পারবেন বা কেন বলুন? কেননা আগের আগের যত যুগস্রষ্টা এসেছেন তাঁরা সাধনা করেছেন, সিদ্ধিলাভ করেছেন, ফল বিতরণ করেছেন, চলে গিয়েছেন, কিন্তু এবারের ব্যাপারে ভেবে দেখুন—আমরাই কি সুভাষচন্দ্রের উপর সব চাপিয়ে দিই নি? কারণ, যে মাটিতে তিনি বীজ বুনবেন সেই মাটিটাই তো মাটি নয়। কাজেই সুভাষচন্দ্রের দায় যে অসীম। তাই স্বভাবতই সাধনার কালটাও হবে সেই অনুপাতে অর্থাৎ তথৈবচ।

লেখক শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র রায় ইতিপূর্বে কয়েকখানি কবিতার বই প্রকাশ করেছেন যা অতি মনোগ্রাহী এবং অনবদ্য। সকলেরই ভালো লাগার মতই বটে। তার মাঝে মুক্ত গদ্যছন্দে একটি বই আছে 'ওই মহামানব আসে'—এই নামে। এছাড়া স্বদেশ দর্পণে, ঊর্মিমালা ইত্যাদি বই প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তাঁর যে আদর্শ ও মূল্যবোধের দিকটি পাচ্ছি তা আজকের সার্বিক কোলাহলময় একটা শূন্যতার মাঝে অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। বলতে নেই পুরানো মূল্যবোধের ভিত্তিতে তাঁর লেখা আমার খুবই ভালো লেগেছে। তাঁর এই সুন্দর প্রচেষ্টাকে আমি বারংবার উৎসাহিত করেছি। এই প্রচেষ্টার ফল তাঁর, গুণীজনদেরও সমাদর লাভ করেছে বলে জানি। তাছাড়া তাঁর রচিত কিছু গান স্বদেশ বন্দনা ও ভক্তিগীতি অতি উচ্চমানের বলেই আমি মনে করি।

ইতিমধ্যে তিনি অপর একটি বই প্রকাশের প্রচেষ্টায় আছেন। এই বইটি হবে তাঁর সম্পূর্ণ অন্য স্বাদের। অন্য জগতের। এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আমাকে পাঠ করতে দিয়েছিলেন। আমি তা একাধিকবার শ্রবণ করেছি। লেখককে অতি সাধারণ স্তরের একজন তৃণমূলী বলাই সঠিক হবে। তিনি আমার প্রত্যক্ষ ছাত্র নন, কিন্তু ছাত্র বলেই তিনি দাবী করেন। তাঁকে খুব স্বল্পকালের মধ্যে যতটা দেখেছি, জেনেছি তাতে তিনি
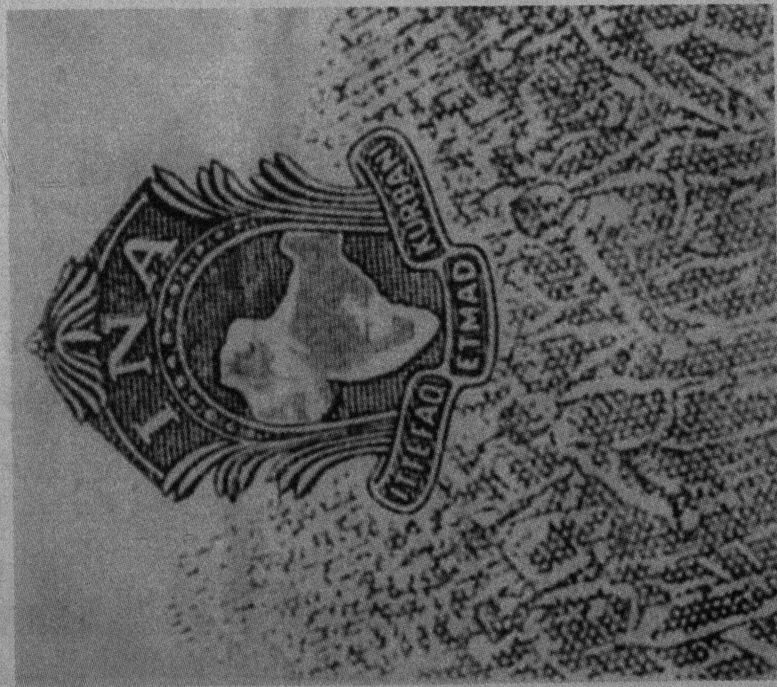
আই. এন. এ-র অখন্ড ভারতবর্ষের মনোগ্রামচিত্র,
যা ভারত সরকার ২৩/১/১৯৬৭ সালে প্রকাশ করেছিল।
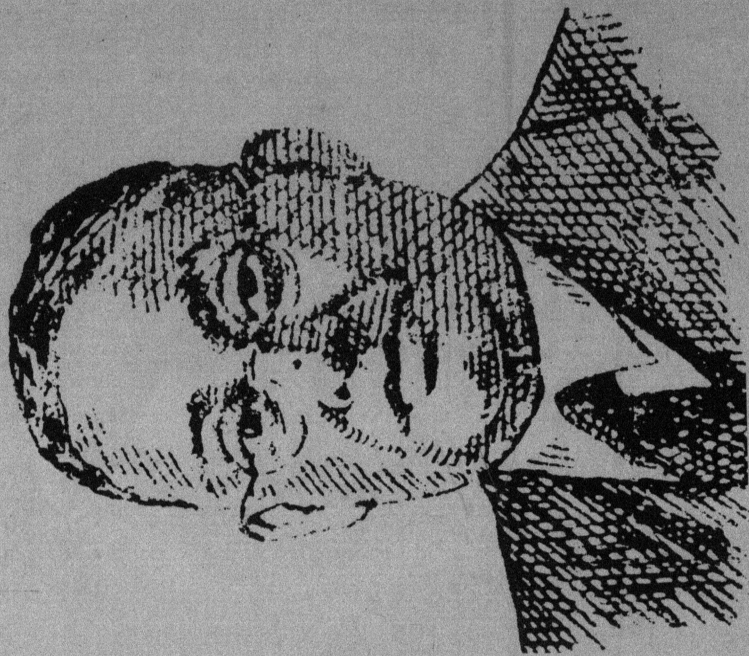
ভারত সরকার কর্তৃক মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর
জন্ম জয়ন্তীতে ২৬/১২/১৯৬৭ সালে প্রকাশিত ছবি।

যে এমন একটি দুরূহ, কঠিনতম, ঐতিহাসিক এবং বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডের বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু করতে পারবে তা আমার ধারণার অতীত ছিল। তিনি এই পাণ্ডুলিপি দিয়ে আমাকে বিনম্র আবেদন জানিয়েছিলেন গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখে দিতে। কিন্তু আমি আজ এক অশীতিপর অক্ষম ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও আমাকে এই কাজটি করতে হচ্ছে। অনিবার্য ভাবেই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলুম না। যদিও তাঁকে বলেছিলাম আমার যে বর্তমান শারীরিক অবস্থা তাতে সম্ভব হবেনা যদি করুণাময়ী 'মা' কৃপা না করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুরোধ রাখতেই হলো। হয়ত এটাই মায়ের ইচ্ছা।

বইটির নামকরণ করা হয়েছে 'সুভাষ দর্পণে বিশ্বরূপ'। নিঃসন্দেহে এক অনাবিল সুন্দর এবং অপূর্ব নাম। প্রচ্ছদের সঙ্গে নামের সার্থকতাও পরিষ্কার ভাবেই ফুটে উঠেছে কোন সন্দেহ নেই। বইটির নামকরণ ও প্রচ্ছদই বলে দিচ্ছে বইটির উদ্দেশ্য ও অন্তর্নিহিত বক্তব্য। এবং সাথে সাথে একথাও নামের মাধ্যমেই প্রকাশ পাচ্ছে বিষয়বস্তুর কাঠিন্য কী দুরূহ এবং কতখানি সাধনা ও শ্রমসাপেক্ষ। এমনকি এমনি একটি মহাবিতর্কিত ও দূরধিগম্য বিষয় নিয়ে কি কেউ কাজে নামে, না সাহস পায়? এতো এক দুঃস্বপ্ন। বিষয়বস্তু এমনি কঠিন তারে সপ্তসিন্ধু মন্থনতুল্য বললেও বোধ হয় কম বলা হবে। এমন একটি ব্যাপারে যখন তিনি কিছু লিখে আমার নিকট হাজির হয়েছেন তখন আমি অবশ্যই হতবাক হয়েছি। কারণ এই বিষয় সম্পর্কে আমিও মোটামুটি ওয়াকিবহাল বা সচেতন। আমি শতবর্ষের প্রায় সন্নিকটবর্তী এক অশীতিপর ব্যক্তি। শৈশবকাল থেকেই আমার ধ্যানের দেবতা হচ্ছেন এই আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত দৈবপুরুষ মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

এ ব্যাপারে পৃথিবী জুড়েই শত শত বই এবং নানা আকারের পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এবং চিরদিনই হবে। হয়ত আরও ব্যাপক ভাবেই। বিশেষ করে বিশ্বপিতা রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশের পর। কিন্তু আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে এই ব্যাপারে যত বই আজ পর্যন্ত হাতে এসেছে বা পড়েছি তার মধ্যে সর্বপ্রথম যে বইটির নাম করতে হয় তা যে অবশ্যই কবিবর মোহিতলাল মজুমদারের সুবিখ্যাত পুস্তক 'জয়তু নেতাজী' তা বলাই বাহুল্য। এই গ্রন্থ একসময়ে ভারতবর্ষের জনমানসে যে মহাআলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা তৎকালের ভারতবাসী কে না জানেন? কবিবর মোহিতলাল মজুমদার যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ছবি এঁকেছিলেন, তার সমকক্ষ পুস্তক বা নেতাজীর সার্বিক বর্ণনা আজ পর্যন্ত সে পর্যায়ের কেউ দিতে পেরেছেন বলে আশা করি কারো জানা নেই। অন্তত আমার তো নেই বটেই। তিনি সুভাষচন্দ্রের যে পরিধি ও তাঁর আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক চিত্রপটটা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিত্রায়িত করেছেন তা ছিল সুভাষচন্দ্রের তৎকালীন পরিব্যাপ্তি বা ব্যাপকতার পরিধি ও পরিমণ্ডল। তথাপি তিনি যা আমাদের দৃষ্টিগোচরীভূত করেছিলেন তা দ্বিতীয় কেউ তুলে ধরতে পারে নি। কবি মোহিতলাল মজুমদার হয়ে উঠেছিলেন এই প্রেক্ষিতে তিনি স্বয়ংই গবেষকদের গবেষণার বস্তু।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক রাজগুরু : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
২৯শে অক্টোবর ১৯২৪ সাল।

কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ মেয়ররূপে সুভাষচন্দ্র বসু।

কিন্তু আজকের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বা শ্রীমদ্ সারদানন্দজীর প্রেক্ষাপট সেদিনের তুলনায় সহস্র সহস্র গুণ ব্যাপক বললে অত্যুক্তি হবেনা। আজকের নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে কেউ চর্চা করে, অনুধ্যান করে তাঁর ত্রিসীমার ধারে কাছে যাবে একথা ভাবাও বাতুলতার নামান্তর।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র হচ্ছেন আমার জীবনের ধ্যান, জ্ঞান এবং স্বপ্ন। তিনিই আমার ইহ জনমের আরাধিত দেবতা। আমার মত অনেকেই যে আছেন এই ধ্যানজ্ঞানে নিবেদিত ও এই চর্চায় ব্যাপৃত তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু এতকাল যাবৎ সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে যত গবেষণামূলক বা এমনি পুস্তক পুস্তিকা ছিল বা পড়েছি (হয়ত সব হাতে আসেনি তবু) তাতে বর্তমান সুভাষচন্দ্রের অন্তহীন পরিধির কথা ভেবে কিছুতেই মন পরিতৃপ্ত হচ্ছিল না, আনন্দও পাচ্ছিলাম না। তাই আমার মনোগত ইচ্ছা ছিল বর্ত্তমান নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যে অন্তহীন বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডের পরিধি তা নিয়ে কেউ কিছু করুক যতটা সম্ভব অর্থাৎ কোন পুস্তক প্রকাশিত হোক। তাঁকে দেখে যেতে তো পারবোই না পরন্তু আমার স্বপ্নের ইচ্ছাও কিছুতেই পূর্ণ হচ্ছিল না। তাই হতাশই হতে হচ্ছিল নিজেকে। আমার দিন প্রায় সমাগত। আর কদিনই বা পৃথিবীর আলো বাতাস পাবো এই জীর্ণদেহ নিয়ে! তাই একটা ভীষণ আক্ষেপ মনে বহন করে যেতে হবে সন্দেহ নেই। তাঁকে নতুন করে দেখার ইচ্ছাও পূর্ণ হলো না। মনের দ্বিতীয় ইচ্ছাও পূরণ হবেনা ভেবেছিলাম। কিন্তু তাঁরই অসীম কৃপায় সেই ইচ্ছাটার কিছুটা পূরণ ঘটেছে বলতে পারি।

শ্রী দেবেশচন্দ্র রায়ের 'সুভাষ দর্পণে বিশ্বরূপ'—গ্রন্থের মাঝে যা বর্ণনা পাওয়া গেল তা এককথায় অতুলনীয় এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। সম্পূর্ণ রূপটি ধরা কার সাধ্য? তবু যতটুকু তাঁর কলমে ফুটে উঠেছে তাই বা কম কীসের? এমন একটি সুভাষ-চিত্র কেউ রূপ দিতে সক্ষম হবে তা কখনও ভাবতে পারিনি। অসীম সাধনা, অনুশীলন ও অনুধ্যানের দ্বারা যে বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে নেতাজীর অন্তহীন কর্মকাণ্ড তা বলতে গেলে কথঞ্চিৎ হলেও যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দ্বারাই লেখক সুভাষচিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন বলে আমি মনে করি। নেতাজী সুভাষের বর্তমান পরিধির নাগাল কেউ কোনদিন পাবে কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সেটা বোধহয় চিরকাল প্রশ্নবোধক চিহ্নেই বন্দী থাকবে। তথাপি এই পুস্তকের চিত্রকর যতটা সাধ্য সাধনা দ্বারা এই চিত্র অঙ্কন করেছেন তা বলা যেতে পারে অসাধ্য সাধনই করেছেন। বর্তমান নেতাজীর যে বিগ্রহ রূপটি তিনি এঁকেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে চুলচেরা বিশ্লেষণী ও ধ্বন্যাত্মক ঋণ্যাত্মক প্রশ্নের ও নানা তথ্যাতথ্য উপস্থাপনা করে ও তার বিচার করে এমন মনোমোহিনী, সুভাষ-চিত্র আজ পর্যন্ত কেউ করেছেন বলে আমি মনে করিনা। অনেক বিশেষজ্ঞের তুলিতে সুভাষ-চিত্রপট অঙ্কিত হয়েছে। অনেকের অনেক কিছু তথ্যও আছে দাবীও আছে। কিন্তু এমন তীব্র ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে জোর দিয়ে কেউই
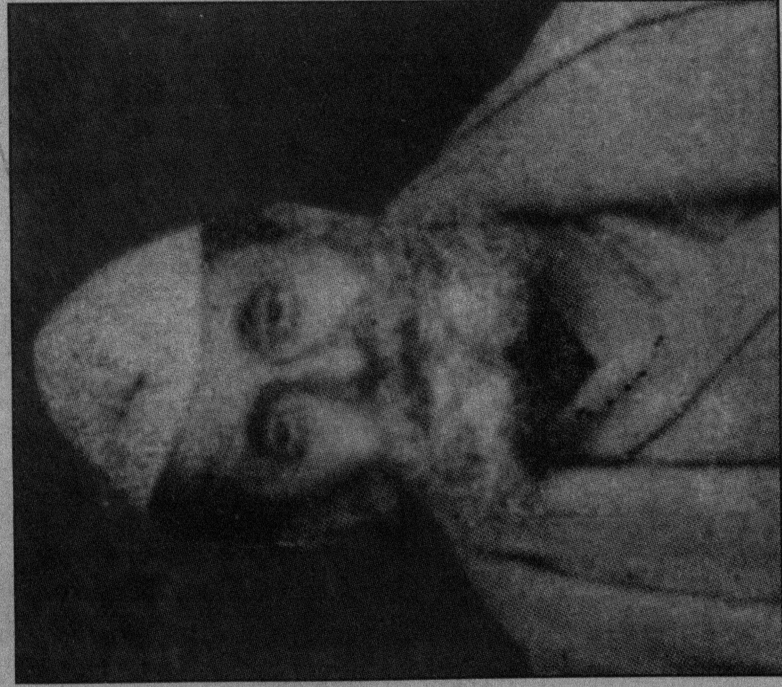
কলির ভগীরথ ও শৌলমারী মহাকান্ড ঘোষণার
বিপ্লবী নায়ক মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত।

ছদ্মবেশী নেতাজীর শতরূপের একরূপ :
বেরিলিতে ছদ্মবেশে অবস্থানরত বাবা হনুমানগীর রূপে।

বলতে পারেন নি। তাঁদের বক্তব্যের ভিতর বা চিত্রায়ণের মাঝে জড়তা ও দ্বিধা বর্তমান। যেহেতু চোখের আলোর পরিধির বাইরে তিনি বিরাজমান তাই অনেক লেখকেরই দ্বিধা প্রকাশিত তাঁদের লেখায়। বলতে চেয়েও যেন বলতে পারছেন না। কিন্তু দেবেশচন্দ্রের তা ঘটেনি। তাঁর আঁকা অতুলনীয় ছবি অতুলনীয়ই হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি আরও মনে করি এবং আমার গভীর বিশ্বাস দেবেশচন্দ্রের পক্ষে যতখানি নিখুঁত চিত্র আঁকা সম্ভব হয়েছে তা তাঁর কাজ নয়। সেই মহান দৈবপুরুষই তাঁর অসীম করুণা প্রদান করে এঁর মাধ্যমে এমন অকল্পনীয় দুরূহ ব্যাপারটা ঘটিয়েছেন। এছাড়া এমন ছবি আঁকা সম্ভব নয়। এই পুস্তকের মাধ্যমে দেবেশচন্দ্র যে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ এবং নেতাজী সুভাষ তথা শ্রীমদ্ সারদানন্দজীর এক অভিন্ন সুর ও একাত্মতার স্বরূপটি তুলে ধরতে সাধ্যসাধনা করেছেন এমনটি কোন বড় লেখক বা গবেষক আমাদের উপহার দিতে পারেননি। কিন্তু এই গ্রন্থকারের আঁকা বর্তমান নেতাজী তথা বিশ্ববিধায়ক শ্রীমদ্ সারদানন্দজীর রূপটি এবং আগামীদিনের নেতাজীর সম্ভাব্য রূপটি কী হতে যাচ্ছে তা যে সকলের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন তা যেমন অপূর্ব তেমনি এক কথায় অতুলনীয় এবং যথার্থ যা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

এতো গেল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পার্থিব ও পারমার্থিক দিক। এছাড়া সমগ্র পুস্তকে তিনি যে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করেছেন অত্যন্ত নির্মম সত্যাসত্য তথ্যাতথ্য উদ্ঘাটন করে কষ্টিপাথরের সুকঠিন বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে অতীব মুন্সিয়ানার সঙ্গে তুলনামূলক ব্যাখ্যা পরিবেশন করে বা ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিতর্ক উপস্থাপনা করে, তাও কঠিন দুঃসাহসের কাজ। সকলেই বিশ্লেষণ করেন কিন্তু পরিণতির নির্মমতার শেষপ্রান্তে কেউ কি যেতে সাহস করেন? সকলেই আত্মত্রাণের পথ পরিষ্কার রেখে তাদের লেখনীর দক্ষতা দেখাতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এই গ্রন্থের গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে এমন কথা খাটেনা। এইভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কেউ বিশ্লেষণ করেছেন বলে জানি না বা শুনিওনি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় পাতায় যে জাতির জাতীয় বেদনা লুকিয়ে আছে অথচ খলচক্রীদের চাতুরীর জন্য তা আজও প্রকাশিত হতে পারেনি এই পুস্তকের রচয়িতা সেটাই উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। বোধহয় সমগ্র জাতির পুঞ্জীভূত বেদনাকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন মাত্র। মানব ইতিহাসে যিনি শুধু শতাব্দীর নয়, সহস্রাব্দের নয় শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব, তাঁকে যে বা যারা অবমাননা ও অমর্যাদা করেছে, তাদের জাতি কি করে ভুলে যেতে পারে বলুন? এমন মহামানবকে যিনি বা যারাই বিষাদ সিন্ধুর অতল তলায় চক্রান্ত করে সমগ্রজাতির কাছে অন্ধকারে রেখেছে, সেই মহামানবের জন্য আমাদের কার না বেদনা হয় বলুন? এমন দৈবপুরুষের সঙ্গে যাঁরা চূড়ান্ত অসদাচরণ করেছেন তাঁদের কি আমরা ব্যক্তিগতভাবে বা জাতিগতভাবে ক্ষমা করতে পারছি? নেতাজী সুভাষচন্দ্র কোন পরিধির ব্যক্তিত্ব তা অনেক গবেষক
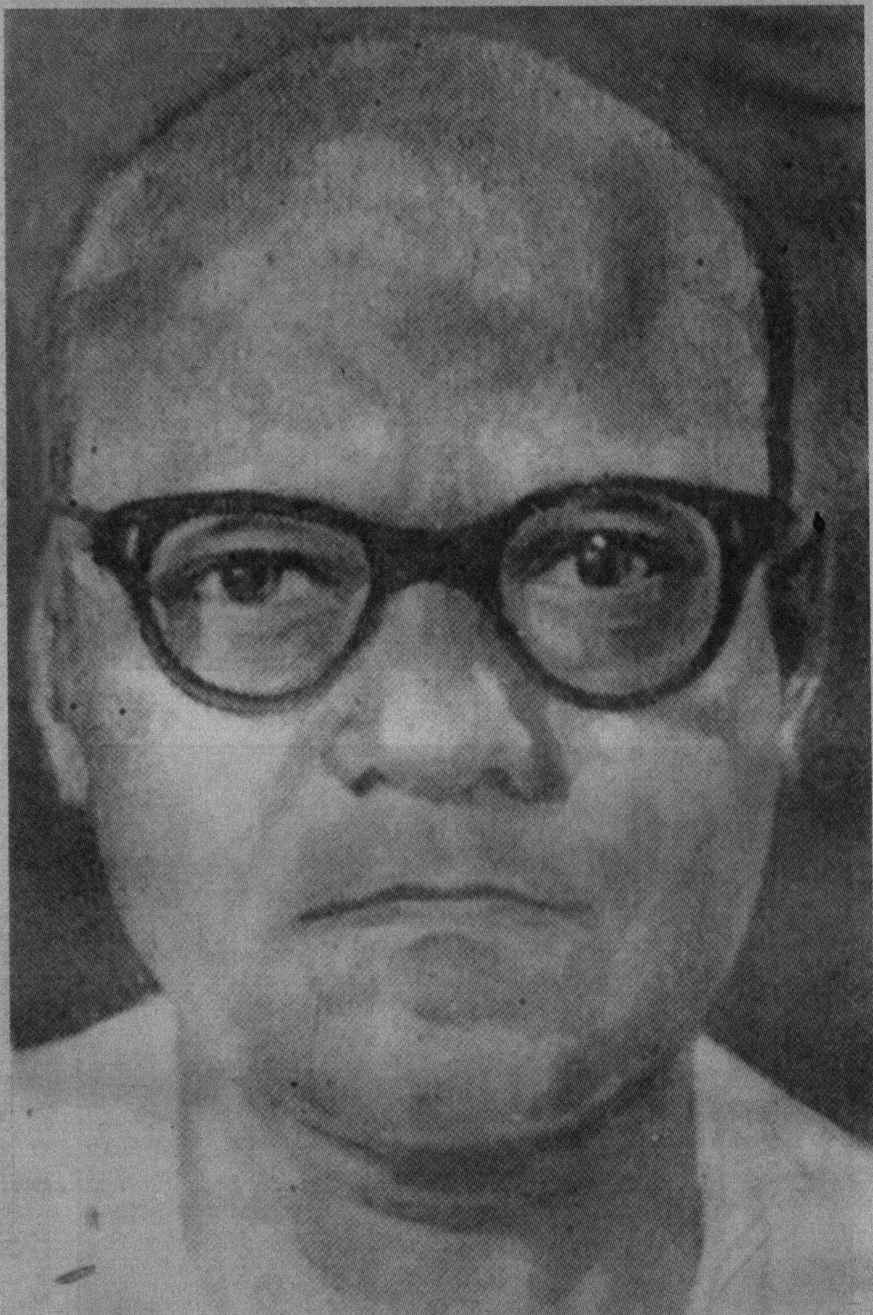
সুপতি রায় : এ্যাকশন্-স্কোয়ার্ড প্রধান : বেঙ্গল ভল্যান্টিয়ার্স।

গবেষণা দ্বারা দেখিয়েছেন যে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের এক সমন্বয়ের পরবর্তী পর্য্যায় বা রূপ। স্বামী বেদানন্দের যখন সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল তখন সেই আধ্যাত্মিক সাধক সুভাষকে বলেছিলেন, "তুমি রাজা, তুমি ঋষি। তুমি শিব, তুমি রুদ্র, তুমি সৃষ্টি, তুমি প্রলয়। তোমার ডম্বরুর তালে তালে অশিব ধ্বংস হবে, সুন্দরের নবজন্ম হবে" ইত্যাদি। (ইতিহাসের অন্তরালে : অমরেন্দ্রনাথ বসু ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় : পৃষ্ঠা : ৮)। আর সত্যগুপ্ত বলেছেন, লর্ড শ্রীকৃষ্ণের পর পৃথিবীর মানব ইতিহাসে এমন ব্যক্তিত্ব আর কখনও আসে নি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকান্দ, সুভাষচন্দ্রের যদি এক সমন্বয় রূপ হয় তবে সত্য গুপ্তের কথাও যথার্থ। কাজেই এমন ব্যক্তিকে যারা হেয় করেছে, তার জন্য জাতির জাতীয় বেদনা হবেনা তো কার জন্য হবে বলুন? এই গ্রন্থের গ্রন্থকার নেতাজী সুভাষের যে চিত্র চিত্রায়িত করেছেন তা যথার্থ বলেই আমি মনে করি। এছাড়া গ্রন্থকার যে ঐতিহাসিক প্রশ্নগুলো তুলেছেন বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন অধ্যায়ে নেতাজী সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সেইসব প্রশ্ন তো আমাদের সকলেরই অভিন্ন প্রশ্ন। গোটা ভারতীয় জাতির প্রশ্ন। সেই মর্মবেদনায় তো আমরাও জ্বলছি এবং ভুগছি, তা নয় কি?

দেবেশচন্দ্র যে 'সুভাষ দর্পণে বিশ্বরূপ' চিত্রের ছবিটি এই পুস্তকে এঁকেছেন সমকালীন বিশ্বের সকল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক কি তা সংশ্লিষ্ট করে তা যেকোন মহাজন স্বীকার করবেন এটি একটি যথার্থ রূপায়ণ। এ ব্যাপারে আমরা অনেকেই মৌখিক চর্চা করে থাকি ও নিষ্ক্রান্ত হই। কিন্তু এই গ্রন্থের রচয়িতা শুধু সমকালীন বিশ্বের ত্রি-রত্নের বাস্তব ছবি আঁকেননি। তার যথার্থ সমন্বয়ী রূপের আগুপিছুর ব্যাখ্যা ও গবেষকদের প্রদত্ত তথ্যাতথ্য সন্নিবেশ করেছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে। এবং আগামীদিনের নেতাজী সুভাষের বিশ্বরূপটিও তুলে ধরেছে যথাসম্ভব পরিষ্কার ভাবে। নেতাজীর এই বিশ্বরূপের কথা অনেক গবেষকই গবেষণায় ও তাঁদের ছবি এঁকেছেন। এমনি একটি গবেষণা লব্ধ বিষয়ের কথা এখানে সন্নিবেশিত করছি যা অত্যন্ত মনোগ্রাহী ও যথার্থ। ভারতের জাতিয়তাবাদ পুস্তিকায় এমনি একটি রূপ নেতাজীকে নিয়ে বিদ্যার্থীরঞ্জনের গবেষকরা কিছুদিন পূর্বে লিপিবদ্ধ করেছেন যা এখানে সংযোজন করা হলো এই পুস্তকের প্রেক্ষাপটের নিরিখে। যথা,

"শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভাবধারাটি স্বামীজীর ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করলো ফলিত বেদান্তরূপে। স্বামীজী বলেন, 'আমি কেবলমাত্র বিমূর্ত ধ্বনি'। সুভাষচন্দ্র হলেন সেই ভারতীয় সত্তার মূর্তপ্রতীক। সুতরাং নিয়তিরই নির্দেশে সুভাষচন্দ্রের মধ্যেই বিশ্বসত্তার উদ্বোধন অবশ্যম্ভাবী। এশিয়ার নেতার প্রস্তুতি চললো বিশ্বনেতা রূপে উত্তরণের। বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের কর্মকাণ্ড চললো বিনয়-বাদল-দীনেশের পদক্ষেপের যাত্রার সূচনা দিয়ে। যার পূর্ণাঙ্গতার পরিসমাপ্তি ঘটবে ভারতবর্ষ সত্তার বিশ্বসত্তাতে রূপ পরিগ্রহণের মাধ্যমে।"

এবার একটু আমার ব্যক্তিগত নিবেদন রেখে শেষ করবো। আমি এই গ্রন্থ শ্রবণে যা উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং এতকাল সুভাষচন্দ্র চর্চা করে যা বুঝেছি তাতে

আজাদহিন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণরত : সিঙ্গাপুরে নেতাজী সুভাষ।

বলতে পারি এ পুস্তক কোন গতানুগতিক পুস্তক নয় বা সাধারণ পুস্তক নয়। এ পুস্তক শুধু ভারতবাসীর জন্য নয়। এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য এবং মানবজাতির কল্যাণের জন্য। কারণ এই পুস্তকের মূল প্রতিপাদ্য হলো সুভাষচন্দ্রের বিশ্বসত্ত্বার রূপ কি তা উদ্‌ঘাটন। যিনি বিশ্বমানবকল্যাণ ব্রতে এক নিবেদিত প্রাণ। এক কথায় এটি হচ্ছে প্রকৃত অর্থে সুভাষ সংহিতা। আমার একান্ত ইচ্ছা এই পুস্তকখানি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত বা রূপান্তরিত হোক। আমি মনে করি গ্রন্থকার নিজে অবগত নয় তিনি কি এক দুরূহ ও মূল্যবান কাজ করলেন। এই পুস্তক ভাষান্তরিত হয়ে দেশান্তরিত হোক বা পরিব্যাপ্ত হোক এটাই আমার একান্ত ইচ্ছা। আরও বলতে চাই যে, লেখক এখানে যা বিশ্বরূপে নেতাজীর ছবি এঁকেছেন তা দ্বারা মনুষ্য জগতে সকলের মধ্যে নেতাজী চেতনার উদ্বোধন ঘটুক। নেতাজী কী জিনিষ তা মানুষের বোধগম্য হোক। বিশেষ করে এই পুস্তকের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের চেতনায় 'ঘা' পড়ুক। চেতনা ঘটুক। দেশ এটাও উপলব্ধি করুক নেতাজী কোন ইতিহাসের অতীত অধ্যায় নয়। কারণ ভারতীয় প্রত্যেক খলনায়করা এ ব্যাপারে ভারতবাসীকে একেবারে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে নেতাজী নামটি তাদের কাছে মুছে দিয়েছে। সেই আঁধার কেটে আলো আসুক তাদের কাছে। ভারতবর্ষ তথা বিশ্ববাসীর নিকট নেতাজীর বর্তমান রূপটি ফুটে উঠুক। এই আমার শেষ অভিলাষ। আমি আজ একজন নব্বুই বৎসরের বৃদ্ধ। আমার ব্রত শেষ। আমি একজন ভারতীয় নাগরিক ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী তথা সুভাষ অনুরাগী ব্যক্তি, সেই সঙ্গে একজন শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ হিসাবে এই আমার দেশবাসীর প্রতি আকুল নিবেদন। আমাদের মাতৃভূমি পূণ্যভূমি ভারতবর্ষে আবার হলাহল, হিংসা, নিবারিত হয়ে মূল্যবোধের আদর্শটি পরিব্যাপ্ত হোক। আমি বিশ্বাস করি গভীরভাবে যে, জাতি যদি নেতাজী ভাবনায় ও চেতনায় জেগে ওঠে তবে সমগ্রদেশ আবার মূল্যবোধের আদর্শকেই জীবনের মানদণ্ড করে এগিয়ে যাবে। আর তা সম্ভব 'নেতাজী সুভাষ' এই মহামন্ত্রে। ভগবানের শ্রীচরণে শেষ প্রার্থনা করি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিশ্বরূপটা বিশ্বের সকলের কাছে প্রকটিত হোক যথার্থভাবে। তবে তা যে হবেই হবে তাতে সন্দেহ নেই বিন্দুমাত্রও।

সর্বশেষে বলবো শ্রীদেবেশচন্দ্র রায়ের এই পুস্তকখানি সর্বজন সমাদৃত ও বহুল প্রচার লাভ করুক। তাঁর এই শ্রমসাধ্য, সাধনাসাধ্য প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হোক। তিনি আমার প্রত্যক্ষ ছাত্র না হলেও ছাত্রবৎ। তাঁকে আশীর্ব্বাদ করি তাঁর যথার্থ প্রতিষ্ঠা ঘটুক এবং উন্নতি বিধান হোক এবং যে আদর্শ এবং মূল্যবোধ চর্চা নিয়ে আছেন তিনি, তা তাঁর শেষদিন পর্যন্ত অটুট থাকুক। তাঁর আদর্শ, তাঁর দয়া ও করুণা দ্বারা তাঁর জীবন সুন্দর হোক ও উদ্ভাসিত হোক মঙ্গল হোক।

১৯৪৯ সালে চীনে : পিপল লিবারেশন আর্মির প্রধান রূপে মাও-সে-তুং এবং চৌ-এন-লাই এর মধ্যে নেতাজী (বাঁ দিক থেকে পঞ্চম ব্যক্তি।)
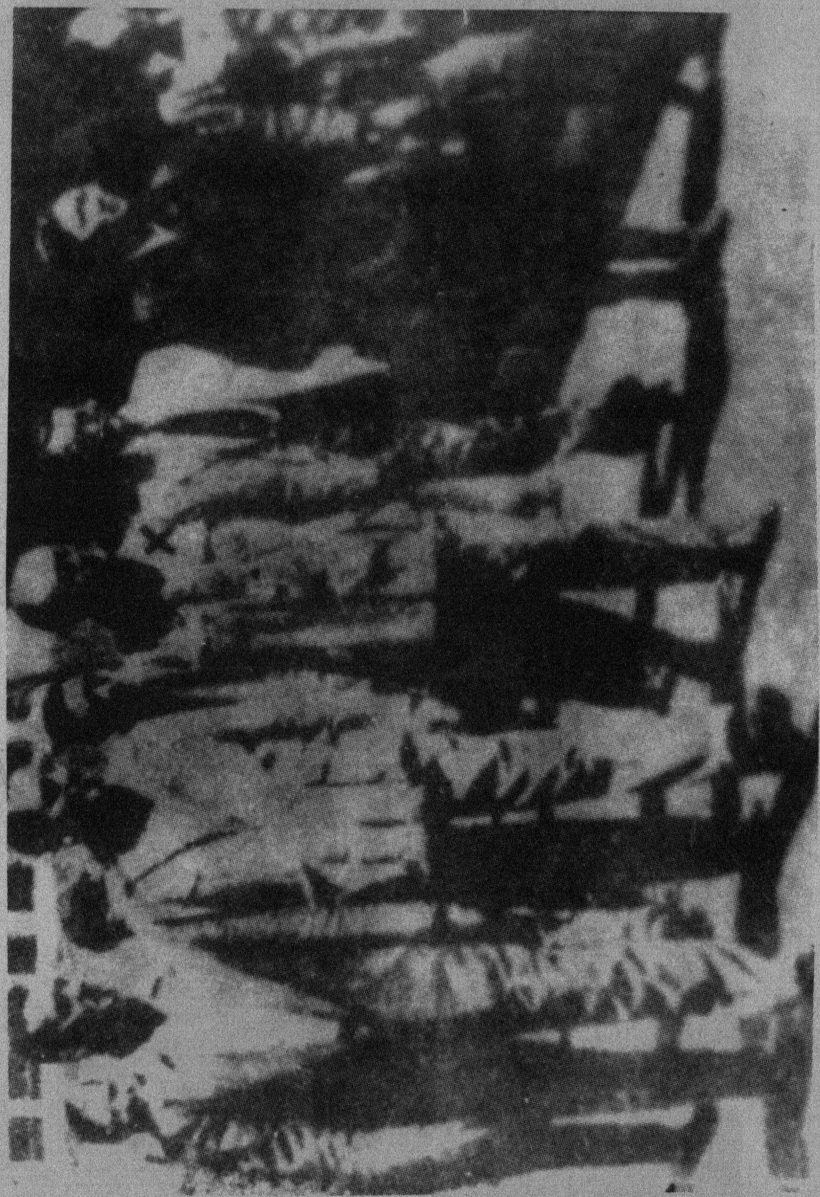
১৯৫২ সালে চীনে ঃ মঙ্গোলীয় ও অষ্ট্রেলীয় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে নেতাজী। মাঝের 'x' চিহ্নিত ব্যক্তি।

মঙ্গলাচরণ

॥ বন্দেমাতরম্ ॥

"জয় মহাক্ষত্রিয় জয় সারদানন্দ
নেতাজী সুভাষ যুগত্রাতা জগৎ দিশারী।
কই তুমি কোথা বীর ওগো মহাযোগী
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তপে তপশ্চারী॥

ওগো নব যুগ প্রণেতা নীলকণ্ঠ—
হিমাদ্রি ভেদিয়া দাঁড়াও হাসিয়া হে অনাদি।
নটরাজ বেশে এসো হে অগ্নিহোত্রী
দূরিতে ভারতক্লেশ মহালাজবারি॥

মানব মুক্তির ওগো রুদ্র তাপসবর
স্বাধীনতা দাতৃ ভারত ঋষি অরিন্দম।
কোথা আজ সেই দেশপ্রেম অনুপম!
শুধু লভ্য-লালস নিলাজ চরম।

তাইতো তব বিরহে আজো কাঁদে
জননী ভারত বিষাদে বিদারী।
ওগো কালজয়ী মহাভারতের মহাভাগ
কই তুমি কোথা ভীষ্ম যুগান্তরের কাণ্ডারী॥"

অনুজ প্রতীম বন্ধুবর শ্রীদেবেশচন্দ্র রায় এর লিখিত প্রকাশিতব্য পুস্তক 'সুভাষ দর্পণে বিশ্বরূপ'—এর পাণ্ডুলিপি পড়লাম—-আবার পড়লাম। তাঁর স্বমুখেও অংশবিশেষ শুনলাম। তিনি তাঁর পুস্তকে কিছু একটা (মঙ্গলাচরণ) লিখে দেবার জন্য আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমার লেখা দেবার কোনো প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করিনা। কারণ **পুস্তকটি স্বয়ং প্রকাশ**। তদোপরি পুস্তকটির ভূমিকা ও মুখবন্ধ লিখেছেন শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ নাগ।

ভূমিকা লেখক নাগ মহাশয়ের সাধারণ পরিচয় তিনি সোদপুর চন্দ্রচূড় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। অন্য বিশেষ পরিচয় যে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে রাজবন্দী ছিলেন। কারাগারে নির্য্যাতনের কথা প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। এটাতো অবশ্য পরিণতি। এ ছাড়া স্বাধীনতা
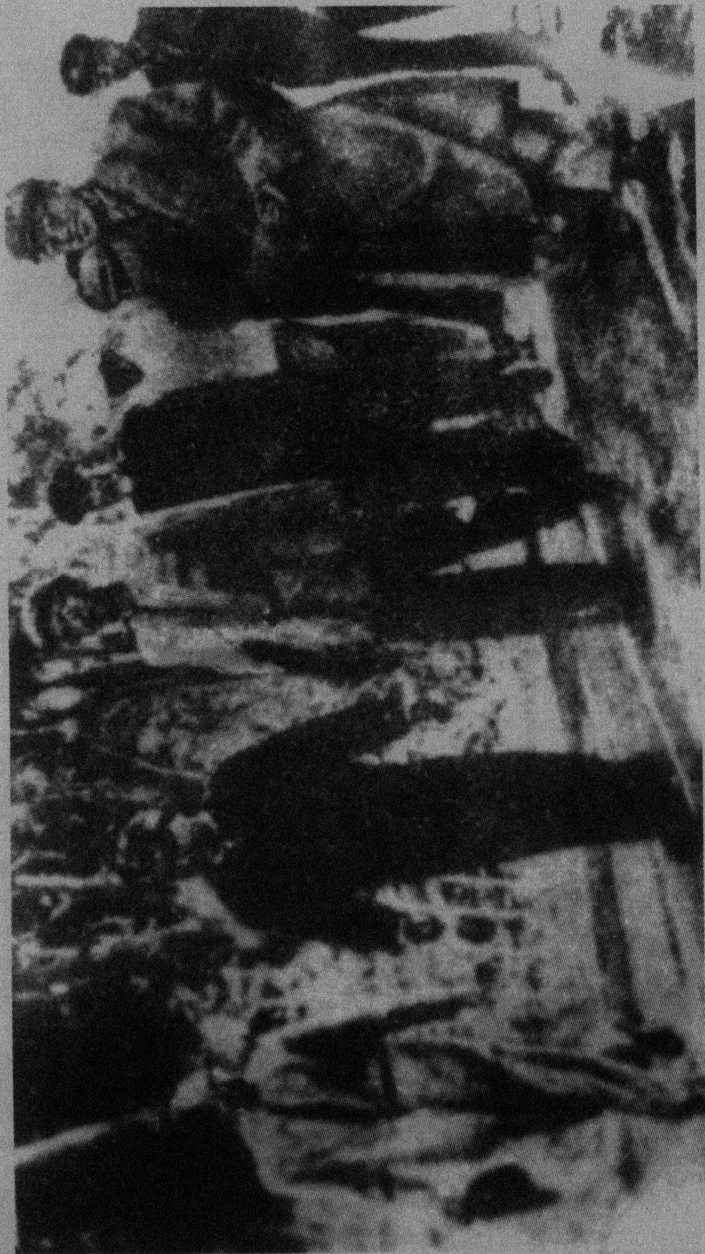
১৯৫৬ সালে বার্ম্মার (বর্তমান মায়ানমার) কোন শহরে প্রবেশকালে চৈনিক প্রতিনিধি দলের সাথে নেতাজী।
(বাঁ দিক থেকে সর্বপ্রথম টুপি হাতে রয়েছেন নেতাজী।)

সংগ্রামে নেতাজীর ভূমিকা কী, সে সম্বন্ধেও তিনি প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছেন। নেতাজী বিষয়ক চর্চায় তিনি একনিষ্ঠ গবেষক। যুদ্ধের সময় শ্রীনাগ মহাশয়ের এন. আই. প্রেস (শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সন্নিকট) থেকে নেতাজীর গোপন বার্তা ও অন্যান্য বৈপ্লবিক কার্যাবলী গোপনে মুদ্রিত হতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি বেশ কিছুদিন কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন—নির্য্যাতনও ভোগ করেছেন। তিনি এক বিদগ্ধ ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি ও সর্বজন শ্রদ্ধেয়।

এই বইয়ের মঙ্গালাচরণ লিখে দেবার কথা ছিল অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা কমলা দাশগুপ্তের। অধ্যাপিকা কমলা দাশগুপ্তা ছিলেন দক্ষিণ কলিকাতা শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের অধ্যক্ষা। তিনি বিপ্লবীদল বি. ভী-র সক্রিয় সদস্যা। এক্ষেত্রে কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের সতীর্থা কমলাদেবী অকস্মাৎ স্বর্গতাঃ হলেন। তিনি আমার বয়োঃকনিষ্ঠা ছিলেন। মৃত্যু তো অবধারিত। কনিষ্ঠার প্রয়াণে আমি শোকগ্রস্ত। লেখা মুশকিল। কিন্তু অনুজ প্রতীম স্নেহভাজন শ্রীমান দেবেশচন্দ্র রায়-এর আদেশ মানতে বাধ্য হলাম। আমার প্রধান গুণ যে আমি বয়োজ্যেষ্ঠ। যা নাকি কোন গুণের পর্য্যায়ে পাড়েনা। ব্যক্তিগতভাবে আমি নেতাজীর "নিজস্ব একান্ত দল" 'বি.ভী'র আজীবন কর্মীমাত্র।

পুস্তকটি স্বয়ং প্রকাশ। যে দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক পুস্তকটি লিখেছেন তার একটা স্বকীয়তা আছে। বহুবিধ ক্ষমতা ও গুণসম্পন্ন নেতাজীর (Multidimensional) পরিপূর্ণ চিত্রাঙ্কন কোন লেখকের পক্ষে সম্ভবপর---তা আমি মনে করি না। স্বভাবতই দেবেশবাবু একটি নির্দ্দিষ্ট দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আমাদের মতে তিনি সফলও হয়েছেন—তবে অন্যবিধ দিক অগ্রাহ্য করেছেন তা কিন্তু নয়। এখানেই তিনি মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন লেখক হিসাবে।

গ্রন্থকার প্রচলিত পন্থায় নেতাজীকে কোন গণ্ডীর চৌহদ্দিতে ভরে রেখে দেবার স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করেন নাই। দেশদেশনন্দিত স্বামী লোকেশ্বারানন্দ মহারাজ নেতাজী জন্মশতবার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন কালচার ইনস্টিটিউটে এক ভাষণে বলেছিলেন—"যাঁরা নেতাজীকে শুধুমাত্র রাজনীতির মধ্যে আবদ্ধ রাখেন তারা পাপ করেন—মহাপাপ করেন। এই পাপ থেকে তাঁরা রেহাই পাবেন না। সাধুরাও রেহাই পাবেন না।" টীকা নিস্প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থের লেখক কিন্তু এর থেকে মুক্ত। তাঁর অর্ঘ্য নিবেদন সংবেদনশীল, মনও মুক্তবুদ্ধির। পাঠকবৃন্দের ওপর তার বিচারের ভার। আমি আমার নিজস্ব বিচার ও উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করলাম। লেখকের কলম যেন থেমে না থাকে। ভবিষ্যতের জন্য আরো প্রত্যাশায় থাকলাম। বইটির যথার্থ সাফল্য কামনা করি।

ইতি

জয়হিন্দ

১৯৬৪ সালে ২৭শে মে দিল্লীতে জহরলালজীর শবদেহের পাশে দন্ডয়মান নেতাজী। Govt. of India কতৃক প্রচারিত documentary film No. 816B. তে নেতাজী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বেশে অবস্থান করছেন।

প্রস্তাবনা

বন্দেমাতরম্

নিবেদন

কেন এমন একটি প্রচ্ছদ?
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব
স্বামী বিবেকানন্দ
নেতাজী সুভাষচন্দ্র
(শ্রীমদ্‌সারদানন্দজী)

মেজর সত্যগুপ্ত
মহাত্মা গান্ধী
শ্রীমতী ইন্দিরা গা:
মাও-সে-তুং
চৌ-এন-লাই
স্তালিন
উইনস্টন চার্চিল
মাউন্টব্যাটেন
দালাই লামা
ভি. আই. লেনিন

বিপ্লবী সুপতিরায়
পণ্ডিত জওহরলাল
মুজিবর রহমান
হিটলার
মুসৌলীনি
জে: তোজো
রুজভেল্ট
জে: ম্যাক আর্থার
নেলসন ম্যাণ্ডেলা
জন. এফ. কেনেডি

এমন একটি প্রচ্ছদ কেন? এরূপ প্রচ্ছদের কারণ কি? এ সম্পর্কে কিছু বলার দাবিদার স্বয়ং প্রচ্ছদ নিজেই। তাই এ সম্পর্কে কিছু বলা এড়িয়ে যাওয়াটা লেম এক্সকিউজ। (বাজে অজুহাত) সুতরাং কিছু অবশ্যই বলতে হয়।

পৃথিবীর মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর পূর্ণাঙ্গকালকে যদি আমরা মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ বা ক্রমবিবর্তনের নিরিখে প্রতিফলন করে দেখার চেষ্টা করি তবে এ-পর্যন্ত সময়-কালকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রাক্‌সভ্যতার যুগ, মধ্য যুগ, এবং আধুনিক যুগ। এই তিনটি যুগেই পৃথিবীর দেশে দেশে বিভিন্নভাবে সভ্যতা এগিয়ে এসেছে এবং তা আত্মপ্রকাশ করেছে। তারে উৎকর্ষ-সাধন করতে বা তার কৃষ্টির ব্যাপ্তি ঘটাবার জন্য যুগে যুগে যুগপুরুষ বা যুগস্রষ্টারা জন্মগ্রহণ করেছেন। যেহেতু পৃথিবীর মানব সভ্যতা আপাতঃ স্থিতিশীল একটি বহতানদীর মতন চিরপ্রবাহমান তাই তার সভ্যতার উৎকর্ষ অপকর্ষও সে ভাবেই চলেছে। এবং সেকাল থেকে আজ পর্যন্ত তারে যুগে যুগে যুগোপযোগী করার জন্য সতত প্রচেষ্টা চলে এসেছে আবহমানকাল ব্যাপী। তার কোন ছেদ নেই। সেই শ্রীরামচন্দ্র. শ্রীকৃষ্ণ, যিশু, বুদ্ধ, মোহাম্মদ বা পরবর্তী যুগপুরুষদের কাল পর্যন্ত প্রত্যেকের সময়ে

১৯৬৪ সালে ২৯শে নভেম্বর মঙ্গোলীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কলিকাতা প্রবেশের পথে হাওড়া স্টেশনে নেতাজীকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত প্রাক্তন মেয়র কেশব বসু এবং সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (ছবিটি স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত)। বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি, টুপি মস্তকে ছদ্মবেশ নিয়েছেন।

তাঁদের প্রত্যেকের দ্বারা যতখানি সম্ভব তার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ঘটবার ঘটেছে।

বিশেষ করে ইশাহি, ইসলাম এবং বৌদ্ধ এই তিনটি মহান ধর্মই বিস্তৃতি বা ব্যাপকতার নিরিখে যথেষ্টই কলেবর বৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রসারলাভ করেছিল। কিন্তু এইসব ধর্মে; মানব প্রেমের ঐক্যতানের মূল সুরটি নিহিত থাকলেও তাকে সম্পূর্ণ এক অভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করার প্রচেষ্টা তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। ধর্মগুলোর মূল বাণী বা সুর যাই থাকনা কেন প্রত্যেকটি ধর্মই তার আপন আপন আত্মকথাতেই সচেষ্ট ছিল। প্রত্যেক ধর্মেই ধর্মবীরগণ আত্মশক্তি প্রচারে ও প্রসারেই ব্যস্ত। তাদের মাঝে কোন সমন্বয় হোক, এই প্রচেষ্টা কখনও দেখা যায়নি। ধর্মীয় গণ্ডী নিশ্চিহ্ন করে সমন্বয় হোক বা সব একাকার হোক তা কিন্তু বলা হচ্ছে না। পরস্পরের মাঝে যে হৃদ্যতার সেতুবন্ধন, সেই কথাই বলা হচ্ছে। অপরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন কিন্তু কোন অবস্থাতেই আত্মবিসর্জন নয়। অর্থাৎ সহমর্মিতা ও সহ-অবস্থানের যে সম্প্রীতির পরিবেশ তার কথাই বলা হচ্ছে। এসব তত্ত্ব ঐ কালজয়ী ধর্মের মূলীভূত হলেও তাকে সমগ্র মানব সমাজে প্রলম্বিত করে একটা নতুন শান্তির পরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রচেষ্টা কখনও হয়নি। ১৮৯৩ সালের শিকাগোর মহাধর্ম সম্মেলনও একই ধারায় প্রবাহিত হতো আত্মপ্রচারের নামান্তরে। কিন্তু ভাগ্যচক্রে ঘটনা ঘটে গেল সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়ায়। বলা যায় সবই বিধাতার ইচ্ছা। তাঁরই পরোক্ষ হস্ত প্রলেপে ঘটনা ঘটে গেল বিপরীত ধর্মী।

সেখানে নিয়তি নির্বন্ধের ফলে অবতার বরিষ্ঠায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিভূ হিসাবে বিশ্ব পেয়ে গেল যুগাবতারের যুগশ্রেষ্ঠদূত স্বামী বিবেকানন্দকে। যদিও তিনি সেখানে রবাহুত ভাবেই উপস্থিত হয়েছিলেন ভারতীয় হিন্দুসন্ন্যাসী হিসাবে। তবু দেখা গেল তাঁর উপস্থিতিতে সম্মেলনের উদ্দেশ্যটাই আমূল পাল্টে গিয়ে হয়ে গেল তা বিশ্ব মানব কল্যাণের এক আশ্রয়স্থল বা বোধিবৃক্ষ তথা বিশ্বমানব মিলনকেন্দ্র। স্বামীজীর উপস্থিতি অনিবার্য কারণে না ঘটলে চিরাচরিত রীতি অনুসারেই উপস্থিত ধর্মবীরগণেরও নিজ নিজ আত্মগরিমাই ঘোষিত হতো। এবং এভাবেই সেই মহাসম্মেলনের পরিসমাপ্তিও ঘটত। কিন্তু স্বামীজী যেন সেখানে একজন হিন্দু মঙ্ক বা সন্ন্যাসী নন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন যেন বিশ্ববিবেক রূপে। বিবেকের উপস্থিতি অনাহুত ভাবেই ঘটে। এখানেও মনে হয় অনিবার্য কারণেই যেন তা ঘটেছিল। ফলে প্রবহমান বিশ্বস্রোতটাকে তিনি যেন হাতে ধরে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করেছিলেন, যা উপস্থিত মহান ব্যক্তিরা কেউই ভাবতেই পারেননি। উপস্থিত সকলেই ভেবেছিলেন গতানুগতিক ভাবেই সবাই আত্মপ্রচার বা নিজ নিজ ধর্মমাহাত্ম্য ঘোষণা করেই ফিরবেন। এই ভাবনাটা যে সত্য নয় তা প্রমাণিত হয়েছিল যখন স্বামীজী প্রচলিত ধারার বাহিরে গিয়ে প্রথমেই, "ভ্রাতা ও ভগ্নী" এই বাণী দ্বারা সকল আমেরিকাবাসীকে সম্বোধন করে সুধীবৃন্দকে বিস্মিত করলেন। বিবেক যেমন আমন্ত্রিত হয়ে দেহকলেবরে উপস্থিত হয়না তেমনি বিশ্ব কলেবরের বিবেকও আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে উপস্থিত হননি। দেহস্থিত বিবেক যেমন স্বাভাবিক ভাবেই দেহে উপস্থিত থাকে এও যেন ঠিক অনুরূপই এক ঘটনা। অর্থাৎ

চীনা সৈন্যদলের নেতৃবৃন্দের মাঝে জেনারেল চু এবং মাও-সে-তুং এ র মাঝে নেতাজীকে দেখা যাচ্ছে।

অবচেতনেই যেন বিশ্ববিবেক সেখানে উপস্থিত। এবং অনাগত বিশ্বপ্রবাহের তিনি দিক দিশারী। এটাই প্রকৃতির ধারা। কোন অবিধেয় কাজ করলে দেহস্থিত বিবেকই মানুষকে সচেতন করে দেয়। এক্ষেত্রেও যেন ঠিক তাই। বিশ্ব-বিবেক রূপেই স্বামীজীর যেন এখানে অবস্থান। এ কথার সত্যতা তখনই প্রমাণিত হলো যখন তাঁকে উপস্থিত সমগ্র সুধীমণ্ডলিরা রাজকীয় সহৃদয় সম্বর্ধনা দ্বারা বরণ করে তাঁর জয়ধ্বনিতে সভাকক্ষ উদ্বেলিত করল, যা এর পূর্বে সেখানে কেউ পাননি, এমন কি পরেও কেউ পাননি। এবং ক্রমে স্বামীজীই হলেন উক্ত সম্মেলনের শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ। অতএব তিনি যে এখানে বিশ্ব-বিবেক রূপেই উপস্থিত ও সমাদৃত তা বলাই বাহুল্য।

এই বিশ্ব-বিবেকের প্রদর্শিত পথেই আজ বিশ্বের বাঁচার বীজ সুপ্ত আছে। এছাড়া পথ কোথায়? নান্য পন্থা। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবই বিবেকানন্দকে বীজমন্ত্র প্রদান করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিই যে আজ স্বামী বিবেকানন্দের শক্তি তা বললে ভুল হবেনা। অর্থাৎ ছদ্মবেশে বা নিরাকারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবই যেন ঐ মহাবিশ্বধর্ম সম্মেলনের আদি ও নিয়ন্তা। প্রকারান্তরে বলা যায়, স্বামীজীর প্রাপ্ত বীজমন্ত্রই স্বরূপে প্রকটিত হলেন বিবেকানন্দ এই অবয়বে। সেই স্বামীজীই দিলেন বিশ্বকে মহাসমন্বয়ের মহামন্ত্র বা বাণী। এ যেন বিশ্বের জন্য সেই মহা 'ওঁকার' ধ্বনি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন সর্বধর্মের স্থপতিকার হয়েছিলেন তাঁর মহাসাধনাদ্বারা, ঠিক তেমনি তাকে আজ বাস্তবায়িত করার জন্যই যেন স্বামীজীর শিকাগো মহাধর্ম সম্মেলনে সমাগম। তাই তিনি বিশ্ববাসীকে পথ দেখাতে ঘোষনা করলেন তাঁর অমোঘ সমন্বয়ের বাণী।

এই মহাসমন্বয়ের কক্ষপথ ধরেই স্বামীজীর মানসপুত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজ গতায়াত। কাজেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যদি এখানে বীজ বা মন্ত্রগুরু তবে স্বামীজী হচ্ছেন শিষ্য বা সেই বীজমন্ত্রের প্রচারসাধক আর নেতাজী হচ্ছেন রূপকার। এই ত্রিস্তরের মাধ্যমেই আজ পৃথিবী পাচ্ছে সমন্বয়বাদ। যার মূল কথা হচ্ছে বিশ্ব থেকে বিদ্বেষ হলাহল সংহার সাধন। এই তিনের অবস্থান এখানে যেন বীজ, বৃক্ষ, এবং পরিণতি ফল। এই তিনটি মহাসত্তাই আজ পৃথিবীকে উজ্জীবিত বা উদ্বুদ্ধ করার সার্থক কারিগর। এমনটি আর কোন যুগপুরুষরাই কি করতে পেরেছেন? গোষ্ঠীগতভাবে কোন কোন মহান পুরুষ বা ধর্মবীরের সাফল্য হলেও সমগ্র মানবসত্তাকে উজ্জীবিত করতে পারেননি। অন্তত আজকের বিশ্বের এই চরম সঙ্কটে স্বামীজী প্রদত্ত পথ ধরেই নেতাজী সুভাষ আজ বিশ্বত্রাতা, বিশ্বপিতা বা মহাঋত্বিক। বিশ্বপিতা যখনই হলেন তিনি তখনই তাঁর কর্মপরিধি বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। তিনি যে আর কোন গোষ্ঠী বা গণ্ডীর মাঝে অবস্থান করছেন না, তা তাঁর স্বীয়কৃত বয়ানেই আসুন শুনি। তিনি কি বলেছেন? তিনি বলেছেন—

".....My religion is no more Hinduism, Buddhism or Jainism or any other 'ism', but that is my religion that links me up with all religions in one common fellowship of spirit, recognising the central facts and truth in all the great religions; but not in idle harmony of beliefs and practices, but a unity within the multiplicity, a harmony among the
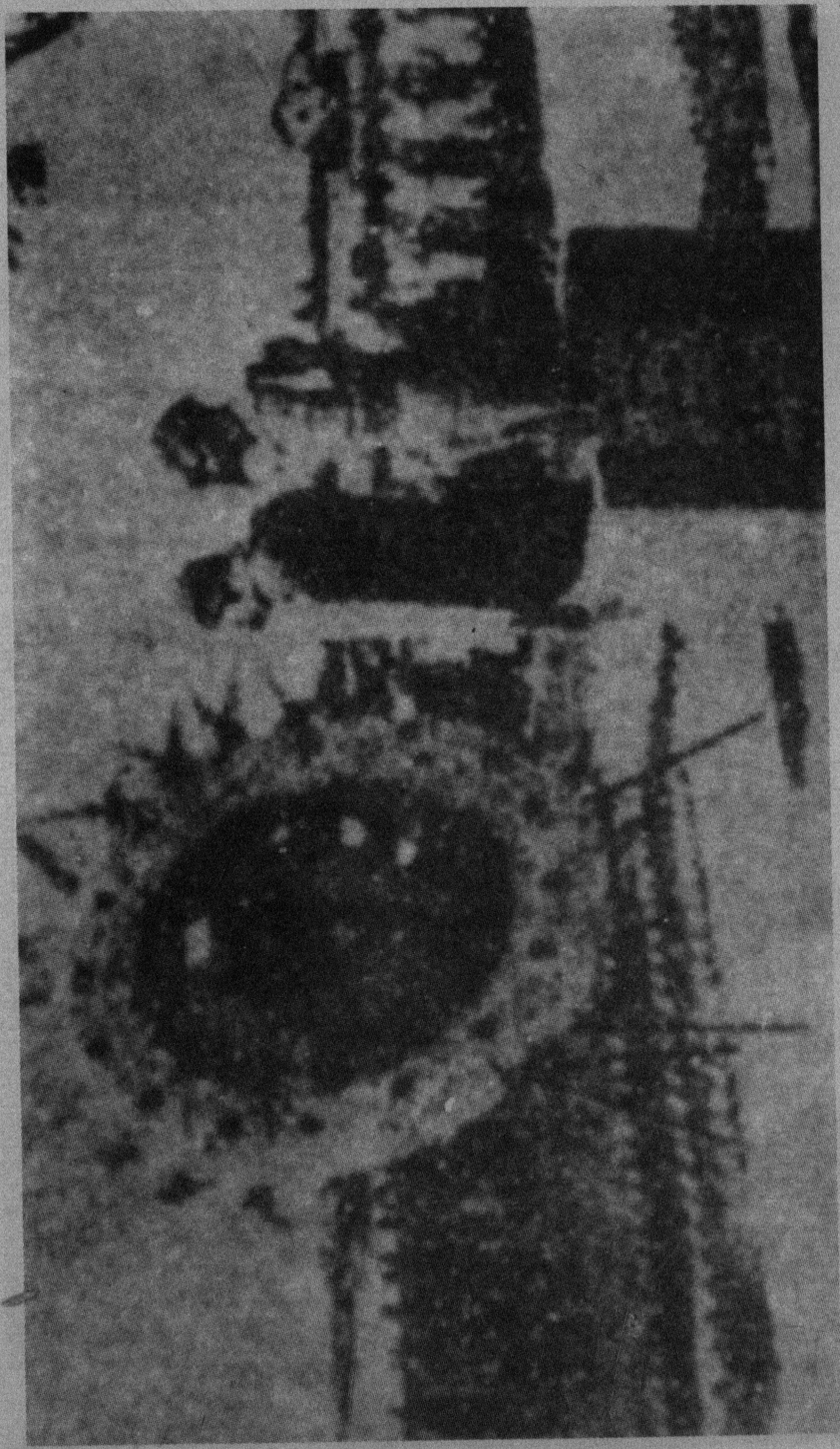
সিঙ্গাপুরে আজাদী সেনানীদের বেদীমূলে শ্রদ্ধানিবেদনরত নেতাজীকে দন্ডায়মান অবস্থায় দেখা যাচ্ছে ।

religions that are as many as there are individuals, as many as there are races, as many as there are differences and vision among men and women." অর্থাৎ হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ও জৈনধর্ম বা অন্য কোন ধর্মই আর আমার ধর্ম নহে। আমার ধর্ম হইল সেই ধর্ম যে ধর্ম, অন্য সকল মহান ধর্মের মূল তথ্য ও সত্যকে উপলব্ধি করিয়া আমাকে সকল ধর্মের সহিত সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের একাত্মবোধে সংযুক্ত করে। কিন্তু তাহা বিশ্বাস ও অমূলক সমন্বয় সাধনকারী রূপে নহে; পরন্তু সংখ্যাধিক্যের মধ্যে একত্ব, যত অনুশীলনের মধ্যে এক ব্যক্তিবিশেষ রয়েছেন, যত জাতি রয়েছে, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে যত বৈসাদৃশ্য দর্শন রয়েছে তত ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।"

(তাইহোকু থেকে ভারতে : পৃষ্ঠা : ৩৮৩-৩৮৪, দ্বিতীয় খণ্ড—অভিজিৎ সরকার)

কাজেই অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে বিশ্বঋত্বিক বা বিশ্বপিতা কে হতে পারেন? বলাবাহুল্য তাঁর অবস্থান হতেই হবে তখন সমস্ত কিছুর ঊর্দ্ধে। এমনকি তাঁরে কোন দেশ, কাল, গোষ্ঠী বা ধর্মের প্রতিও দুর্বলতা থাকা চলবে না। আরও শর্ত আছে। সবার ঊর্দ্ধে যিনি থাকবেন তাঁকে অবশ্যই হতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন এক সত্তায় সত্তাময় সার্বভৌম অদ্বিতীয় পুরুষ। সেই শর্ত অনুসারেই সুভাষচন্দ্র সর্বপ্রথমেই হয়েছেন নিজে সার্বভৌম স্বাধীন। তাঁর কাজের মাধ্যমেই তা তিনি যথার্থ প্রমাণ করেছেন। তিনি যে তাঁর এইসব শর্তগুলি যথার্থভাবে পালন করছেন তা তাঁর ঐ উক্তিতে আরও সুষ্ঠুভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। পর্যায়ক্রমে তারপর যা হওয়া উচিত বা তাঁর যা করণীয় তাও তিনি কঠোরভাবে পালন করেছেন। তিনি তাঁর পরবর্তী কার্যক্রমের দ্বারা তাঁর মাতৃভূমিকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। একথা বলেছেন তিনি বা স্বীকার করেছেন তিনি, যিনি তৎকালীন বৃটিশ শক্তির আধার অর্থাৎ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ক্লিম্যান্ট এ্যাটলি। তারপরের কার্যক্রম অনুসারে তিনি ভিয়েৎনাম, চীন এইসব দেশের মুক্তির দ্বার খুলে দিয়েছেন। এ-সবই আমাদের সকলের জানা। এছাড়া তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষের জন্য আর যা যা করণীয়, বা যা করতে পারেননি তার জন্য তিনি যে আদৌ দায়ী নন তাও নির্মম সত্য। যদি সমালোচকের মুখ দিয়ে বলা যায় তিনি তো তাঁর ইপ্সিত অভীপ্সা পূরণ করতে পারেননি। এরও যে উত্তর ঐ একটাই অর্থাৎ তাঁকে করতে দেওয়া হচ্ছে না। তবু এই নিরিখে বলা যায় যা তাঁর স্বপ্ন ছিল যা করতে পারেননি, আজ তিনি তাঁর সেই স্বপ্নকেই রূপ দেবার ব্রতে ব্রতচারী। তাছাড়া তিনি যে বিশ্বপিতা বা বিশ্বঋত্বিক রূপে তাঁর যা করণীয় তা একে একে ধাপে ধাপে করে চলেছেন। এসব তত্ত্ব ওয়াকিবহাল জগতের সবাই জ্ঞাত আছেন। এর পরিণতিতেই বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদীরা আজ পরিত্রাহি করছে। তাঁর এই সাধনা পূর্ণতা লাভ হলে বা সিদ্ধিলাভ করলেই পৃথিবীর সেরা জাতি হিসাবে ভারতবর্ষ আত্মপ্রকাশ করবে এবং সেই সাথে সাথে সূর্যও মেঘের আড়াল

২রা এপ্রিল ১৯৬৯ সালে রেঙ্গুঁনের অদূরে তৎকালীন ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী
ইন্দিরা গান্ধীর সহিত নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের গোপন মিটিং । বার্মিজ পোষাকের ছদ্মবেশে ।
এই ছবি ২রা এপ্রিল ১৯৬৯ সালে দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত ।

হতে উদ্ভাসিত হয়ে সমগ্র বিশ্ব-সত্তাকে আলোক মণ্ডিত করবে। সেই দিনই দেখবে বিশ্ব তাঁর পূর্ণজ্যোতির্ময় প্রকাশ। স্বামীজী বলেছেন "man is omnipotent power." তার যথার্থ সত্যতা তো স্বামীজী নিজেই প্রমাণ করেছেন। আর আজ তার সাক্ষ্যপ্রমাণ দিচ্ছেন স্বয়ং নেতাজী সুভাষ নিজে। তাঁর আত্মদর্শন ঘটেছে বলেই তিনি বলতে পারেন—

"I must be prophet of the future. I must discover the laws of progress The tendency both the civilisation and there form to settle the future goal and progress of mankind. The philosophy of life will alone help me in this ideal must be realised through a nation begin with India."

—Subhas Chandra

31st August 1915

এই হচ্ছেন নেতাজী সুভাষ। বলাবাহুল্য তিনি যে জন্মসিদ্ধ এক মহাজ্যোতিষ্ক তা কারো বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ তাঁর যে এই prediction তিনি করেছিলেন মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে বালসুভাষ। এই উক্তিই কি তাঁর জন্মসিদ্ধ সম্পর্কে যথেষ্ট নয়? কাজেই তিনি জন্ম থেকেই এক পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ।

তাঁর সাধনার পরিব্যাপ্তির অঙ্গ হিসাবেই তিনি সমকালীন পৃথিবীর সকল বিশ্বখ্যাত নেতাদেরও হয়ে উঠেছেন, শিক্ষক, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক। বিশ্বনায়কদের সঙ্গে তিনি যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট তার যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ আমরা এই বইয়ের স্থানে স্থানে সর্বত্র কমবেশি লক্ষ্য করেছি। এই সব নেতাদের মধ্যে সমকালীন বিশ্বের শতবর্ষ ব্যাপ্তিকালের মাঝে বোধহয় কেউ তাঁর পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ যোগসূত্রের বাইরে ছিলেন না বা নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মহাচীনের মহান নেতা, মাও-সে-তুং, চৌ-এন-লাই, সোভিয়েত রাশিয়ার যোশেফ স্টালিন, ভিয়েতনামী নেতা হো-চি-মিন প্রভৃতি ব্যক্তির নাম। তাঁরা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সঙ্গে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এবং তাঁরা প্রত্যেকে নেতাজীর সাহায্যে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন। আর পরোক্ষভাবে যাঁরা তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বৈরিতাসূত্রে তাঁরা হচ্ছেন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল, ক্লিম্যান্ট এ্যাটলি, মাউন্টব্যাটেন, জেনারেল ম্যাক আর্থার, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ট্রুম্যান প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত নায়কবর্গ। এছাড়া ছিলেন, বিশ্বত্রাসি হিটলার, মুসোলীনি, জে: তোজো এঁরা সকলেই। তাঁরা সকলেই ছিলেন তাঁর একান্ত সহায়ক। জন. এফ. কেনেডি সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ডের পরোক্ষ স্বীকৃতিও দিয়েছেন। তাছাড়া সুভাষচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন ফরাসী দার্শনিক ও ঋষি রোঁমা রোঁলার মত ব্যক্তিরা। আজকের দক্ষিণ আফ্রিকার নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলা সুভাষচন্দ্রকেই তাঁর নেতা বলে স্বীকার করেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে সমগ্র বিশ্বের যাঁরা নায়ক বলে পরিচিত ও খ্যাত তাঁরা সকলেই কোন না কোন ভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত। কেউ শত্রু-কেউ বা মিত্র। এইরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পৃথিবীর আর কোন্ নেতা কোন্ কালে বা কোন্
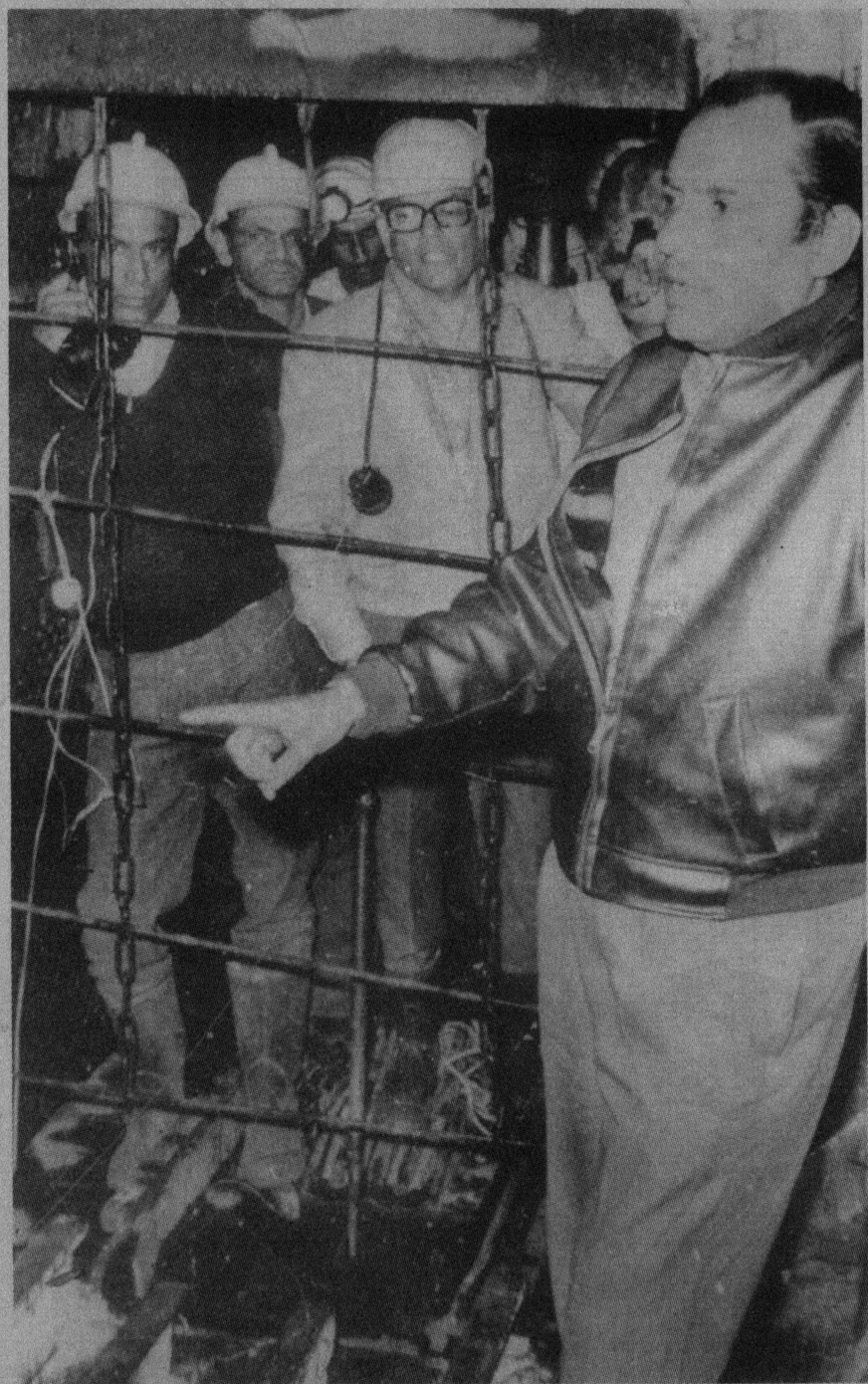
১৯৭৫ সালে বিহারের চাসনালায় যে কলিয়ারি দুর্ঘটনা হয় তখন উদ্ধার কার্য্যে নিযুক্ত অবস্থায় নেতাজীকে দেখা যাচ্ছে। (বি. ভী-র বিপ্লবী কমলা দাশগুপ্তার সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

যুগে পৃথিবীর সকলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন? এর নজির পৃথিবীর সভ্যতার উষালগ্ন থেকে আজও কেউ দেখাতে পারবেন না। আগামী পৃথিবীতে এমন ঘটবে কিনা রীতিমত সন্দেহ আছে।

এমন যে একজন বিশ্বপুরুষ বিশ্বমানব বেদীমূলে নিবেদিত প্রাণ তিনিই স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতাব বিশ্ব সমন্বয়বাদের হচ্ছেন রূপকার। একথা বললে বিন্দুমাত্রও বেশি বলা হয় না। তার তো সাক্ষ্য ঐসব বিশ্বখ্যাত নেতৃবর্গই। সবচেয়ে বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার হচ্ছে যে, একজন রক্তমাংসের দেহধারী মানুষকে এ্যাটমবোম্ব দিয়েও হত্যা বা বিনাশ করা সম্ভব হলো না। সুভাষচন্দ্রই যে ছিলেন এ্যাটমবোমা নিক্ষেপের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য, তা জেনারেল ম্যাক আরথারের কথাতেই পরিষ্কার। উইনষ্টন চার্চিল ও চেম্বারলীনরা ব্যর্থ বলেই তাঁদের পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল চন্দ্রবসু একবার প্রকটিত হলেই সাম্রাজ্যবাদীর সাধ চিরদিনের মত ঘুচে যাবে। তাঁরা আরও বলেছিলেন যে, বৃটিশ, আমেরিকা, স্তালিন, তেজো বা হিটলারকে ভয় পায় না। তারা ভয় পায় 'চন্দ্রবোস'কে—কিসের ভিত্তির উপর এই ভাষ্য? অবশ্যই এ্যাটমিক ব্যর্থতার উপর। রক্তমাংসের শরীর যখন এ্যাটমের দ্বারা বিনাশ করা গেলনা তখন সে তো যা ইচ্ছা তাই ঘটাতে পারেন তাতে কি সন্দেহের অবকাশ আছে? কাজেই তাদের ভাষ্য একমাত্র ঐ তথ্যের উপর ভিত্তি করেই। একথাই স্বতঃসিদ্ধ। বলতে নেই এর নাম "চন্দ্রবোস"। প্রকারান্তরে বলা যায় এর নামই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাবাদ বা ভারতীয় বেদান্তবাদ। বলাবাহুল্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রই যুগপৎ আজ ভারতীয় বেদান্তবাদ ও আধ্যাত্মবাদ। স্বভাবতই বিশ্বনায়করা কোন না কোন কারণে তাঁর কাছে নত বা ঋণী।

হতে পারে তা সখ্যভাবে, দাস্যভাবে বা শত্রুভাবে। যার কোন দ্বিতীয় উপমা বিশ্বমানব ইতিহাসে নেই। এমন যে অপ্রতিহত এক কালজয়ী ব্যক্তিত্ব তাঁকে ভারতবর্ষের নেতৃকুল তথা বিজাতির চাটুকাররা তুচ্ছজ্ঞানে উপেক্ষা করতে চাইছে। কিন্তু তাদের গুরুদত্ত সব ছলচাতুরীর মসলা ও কৃতকৌশল আজ শেষ। তাদের গুরুরাই তো পথভ্রষ্ট। অতএব শিষ্যবর্গ এই ভারতবর্ষের পদলেহি চাটুকারদের গতি কি? যদি তিনি স্বয়ং ক্ষমা ঘেন্না না করেন? কাজেই বলা যেতে পারে তিনি ক্ষমা ঘেন্না করলেও প্রকৃতি কিন্তু ছেড়ে দেবেনা। তাই বিশ্বকবির ভাষায় বলতেই হয়—

"দিন আগত ঐ।"

এই লেখা সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন যদি করেন তবে বলতে হয় এর উৎস যে কি এবং কোথা থেকে প্রাপ্ত তা আমি নিজেই জানিনা। তবে অগত্যা বলতে পারি এই লেখার জন্য ও তার মধ্যে এতটুকু যদি কিছু সারবস্তু থাকে বা ভাল কিছু থেকে থাকে তবে তা ঐ পরমপুরুষ সুভাষচন্দ্রের অনন্ত করুণার প্রভায় ঘটেছে। তাই তাঁর এই অশেষ কৃপার জন্য সেই আগামীদিনের (লেখকের নিকটআজকেরও বটে) প্রফেটের চরণে এ অভাজনের সহস্রকোটি প্রণাম। আর সহস্রকোটি প্রণাম সেই অনন্তের অধীশ্বর ঈশ্বরের চরণে। যিনি আমার অবচেতন মনে এই প্রবৃত্তি দান করে এই দুরূহ কাজে ব্রতী করেছেন।

name of the Viceroy and Gov-
nor-General of India, all those
hom it may concern to allow

Subhas Chandra Bose

pass freely, without let or hind-
nce, and to afford every assist-
nce and protection of which he
ay stand in need.

Given at Calcutta the
y of Sept 1919

By order of the Viceroy and
Governor-General.

Secretary to the Government of Bengal.

This Passport is valid for 2 years
from the date of its issue. It
y be renewed for 4 further periods
two years each after which a new
ssport will be required.

RENEWALS.

Place & date of birth Cuttack,
Bihar and Orissa India
Maiden name if widow or married woman travelling singly. 23rd Jan. 189

Height 5 feet 9 inches

Forehead broad Eyes

Nose straight Mouth

Chin Colour of Hair

Complexion light Face

Any special peculiarities

National Status British

PHOTOGRAPH OF BEARER

প্রথম বিদেশ যাত্রার পাশপোর্ট সহ সুভাষ চন্দ্র বসুর ছবি।

এছাড়া এ ব্যাপারে আমাকে যাঁরা প্রেরণা ও উপকরণ ইত্যাদি দিয়ে ভীষণভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে উৎসাহিত করেছেন তাদের প্রত্যেকের নিকট আমি নানাভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। এ ব্যাপারে কিছু অবশ্যই বলার আছে। তা বলা না হলে আমি তাঁদের সকলের নিকট অপরাধী থেকে যাবো। এই নিবন্ধের বা এই পুস্তকের মাঝে সত্যাসত্য বা তথ্যাতথ্য যাই থাক না কেন তবু বলতে হয় এ লেখার প্রয়োজনীয়তা কি বা কতখানি এবং কেনই বা এমন একটি দুরূহ ব্যাপারে লিখতে প্রবৃত্ত হওয়া? এ প্রশ্ন কেউ কেউ করতেই পারেন। এর উত্তরে বলতে পারি লেখার ব্যাপরটাই স্বপ্রণোদিত আত্মতাগিদে ঘটে। তবে সর্বোপরি এ তাগিদ যিনি আড়াল থেকে ঘটান তিনি যে অবশ্য পরমপিতা তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তিনি যাকে যেমন প্রবৃত্তি দিয়েছেন সে সেই পথেই হাঁটে বা বলার ও চলার চেষ্টা করে। এর বেশি আর তার কৈফিয়ৎ কি কিছু আছে? যাই হোক যা বলতে চাইছি তা হচ্ছে আজকের বিশ্বপ্রেক্ষাপটে যখন সার্বিক মূল্যবোধ হারিয়ে আমরা বাঁচার তাগিদে হাতড়ে মরছি এবং বিভ্রান্তির শেষ অধ্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি তখন শুধু এই অভাজন একা নয়, আপনারাও ভাবছেন এর শেষ কোথায়? আমাদের মুক্তি কোথায়? পৃথিবীব্যাপী তো আজ এক অবস্থা। এই অবস্থাই কি চলতে থাকবে? পরিত্রাণের পথ কি? কোথায় গেলে আলো পাবো? বলুনতো আপনিও কি ভাবছেন না? এই প্রশ্নগুলো যখন ঘুণের মত আমাদের সকলকে স্লো-পয়েজনের মত তিলতিল করে শেষ করছে তখন কিন্তু অন্যদিকে কিছু লোকের মাঝে আসল সত্য ও মানসপটে মানসলোকে আলোর সন্ধান দিচ্ছে। এমন যাঁরা আলোয় আলোকিত তাঁদের কারো কারো সাহচর্যলাভ করে এই প্রতিবেদকও ধন্য এবং বিমোহিত। তখনই এই নতুন দিশার অনুধ্যানে আজ উৎসাহিত হয়ে এই প্রায় অসম্ভব ও দুরূহ কাজে প্রবৃত্ত। এটাই প্রত্যক্ষ কারণ। এবং সেই অনুধ্যানে প্রায় অবচেতনেই এই দুর্গমপথে পদ বিক্ষেপন।

এই কাজে যাঁরা এই অন্তঃসারশূন্য এক অভাগাকে অন্তরের আদেশ দিয়ে এই দুরূহ অসাধ্য সাধনে মনোনিবেশ করিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক মহান ব্যক্তি আছেন। তাঁরা হচ্ছেন সোদপুরের চন্দ্রচূড় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং নেতাজী কর্মকাণ্ডে জড়িত আজন্ম নেতাজী গবেষক ও সাধক নেতাজী নিবেদিতপ্রাণ পরম শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ নাগ মহাশয়। দ্বিতীয়জন হচ্ছেন বিপ্লবপথের পথিক আজন্ম নেতাজী নিবেদিতপ্রাণ এবং মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত ও বিপ্লবী সুপতি রায়ের একনিষ্ঠ অনুরাগী, অনুগামী ও শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষা পরম শ্রদ্ধেয়া ঃ কমলা দাশগুপ্তা। তাঁর আরও পরিচিতি হচ্ছে তিনি আজন্ম বি. ভী.'র কর্মী এবং সাথে সাথে একজন আদর্শ শিক্ষাবিদও বটে। এছাড়া সুভাষবাদী তথা শৌলমারী আন্দোলন পর্বের ও কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধানদের একজন এবং কৈশোরকাল থেকেই বি. ভী.-র সঙ্গে যুক্ত মেজর সত্যগুপ্তের একনিষ্ঠ সেবক তথা সুভাষ নিবেদিত প্রাণ শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ দত্ত। তাঁরা প্রত্যেকেই অতীব মহান এবং আজ অশীতিপর। বিশ্বজিৎ দত্ত যিনি আজ একজন নিষ্ঠাবান আশ্রমিক। এ ব্যাপারে আরও অনেকে আছেন যাঁরা আমাকে শুধু উৎসাহিতই করেননি, তাঁরা তথ্যও সরবরাহ করে আমার এই কাজকে

১৯৭১ সালে প্যারিসে ভিয়েতনাম মুক্তি যুদ্ধের শান্তি আলোচনায় ভিয়েতনামী প্রতিনিধি দলে নেতাজীকে দেখা যাচ্ছে ডানদিক থেকে সর্বপ্রথম। ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি অবস্থায় অবস্থান করছেন। এই পোষাকেই জার্মানীর কিয়েল বন্দর থেকে তিনি সাবমেরিনে দূর প্রাচ্যের জন্য যাত্রা করেছিলেন ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ সালে।

যতপরনাস্তি পরিপুষ্টও করেছেন। এবং প্রেরণাদান করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম বলতে হয় তিনি হচ্ছেন আমার গুরুপ্রতিম পরম শ্রদ্ধেয় ঁমনোজকুমার চক্রবর্তী। যিনি একজন জাতীয় শিল্পীও বটে। এবং আত্মবিলোপন মন্ত্রে দীক্ষিত এবং সুভাষ নিবেদিত প্রাণ। আরও আছেন শ্রদ্ধেয় সুনীল ভট্টাচার্য, শ্রদ্ধেয় অনিল দত্ত (মান্টুদা), শ্রদ্ধেয় সত্যেন চৌধুরী, শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী, শ্রদ্ধেয় ঁপ্রফুল্ল বিশ্বাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ও সুধীজনরা। এছাড়া আছেন যাঁরা আমাকে অত্যন্ত নিকট থেকে প্রেরণা যুগিয়েছেন এমন বন্ধুজন। তাঁদের মধ্যে চন্দনা গোস্বামী, রুদ্রপ্রকাশ ধর, শুভম চৌধুরী, অপূর্ব গুহ, দীপক বসু। এঁদের ছাড়াও অনেকে আছেন যেসব সুধীবৃন্দের নাম এখানে স্বল্পপরিসরে উল্লেখ করতে পারলাম না। তাঁদের কাছে অবশ্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আর একজনের নাম সবিশেষ উল্লেখ্য, যাঁর কথা না বললে আমি অপরাধী হবো। তিনি হচ্ছেন শ্রীযুক্তা গৌরী রায়। এঁদের ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করতে পারবো না। তাঁদের স্নেহ ও ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণার ঋণ অপরিশোধ্য অপরিমেয়।

যাঁদের অশেষ কৃপায় এই প্রচেষ্টা সার্থক হতে চলেছে তাঁদের মধ্যে পরম শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই শিবপ্রসাদ নাগ মহাশয়ের নিকট আমি তাঁর পুত্রবৎ স্নেহের ও বাৎসল্যের পাত্র। তাঁর আশীর্বাদ ও প্রেরণাই এই গ্রন্থের গ্রন্থনার মূল উৎস ও প্রথম সোপান। তিনি না হলে এই রচনা এক কথায় হতোই না। তিনি দিনের পর দিন আমাকে শুধু বাৎসল্য স্নেহই প্রদান করেননি, তিনিই এই দুরূহ এবং পৃথিবীর কঠিনতম বিতর্কিত ব্যাপারে কাজে নামিয়েছেন। এবং অফুরন্ত প্রেরণা ও উপকরণ পেয়ে তাঁর দ্বারা আমি দিনদিন প্রতিদিন পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হতে বলিষ্ঠতর হয়েছি। ওনার নিকট থেকে আমি যা যা পেয়েছি তা ব্যক্ত করার ভাষা অন্ততঃ আমার মত দীনজনের নেই। আমার স্বল্পপরিসর জীবনে নেতাজী সুভাষপ্রেমিক অনেককে দেখেছি। এই নিবন্ধে আমি যাঁদের নাম করলাম তাঁদের সবাই সুভাষপ্রেমিক। যাঁরা সুভাষপ্রেমের মূর্তপ্রতীক এবং সমগ্র দেশে তাঁদের কর্মকাণ্ডের জন্য সমাদৃত সেই মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত ও বিপ্লবী নায়ক বি. ভী.'র এ্যাকশন স্কয়ার্ড প্রধান এবং পরবর্তীকালে শৌলমারী কাণ্ডের নীরব কাণ্ডারী পরমশ্রদ্ধেয় সুপতিদা (ঁসুপতি রায়)-কে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কারণ এ ব্যাপারে তখন ততটা সচেতন ছিলাম না। কিন্তু মাস্টারমশাই, পরমশ্রদ্ধেয় শিবপ্রসাদ নাগ মহাশয়ের চরণ রজ ও বাৎসল্য স্নেহে আমি সিক্ত হতে পেরেছি দেরীতে হলেও। তাঁর মত অশীতিপর বৃদ্ধের জীবনের একদিন একটি মুহূর্তও বোধ হয় 'সুভাষ'— এই নামমন্ত্র উচ্চারণ ছাড়া অতিবাহিত হয়নি। তিনি সুভাষ কর্মকাণ্ডের কোন ব্যাপারে ১৯৪৪ সালে হোমফ্রন্টে গ্রেফতার বরণ করে নিজেকে সার্থক করেছিলেন। তিনি সুভাষ নাম অনুধ্যানের এক মহান প্রাণ। তাঁর কাছে আমি শুধু ঋণী নই। যদিও খুব স্বল্পকালের পরিচয়ে পরিচিত, তবু বলতে পারি এমন আদর্শবাদীর চরণে ঋণী থাকাটাও বোধ হয় সৌভাগ্য ছাড়া হয় না। এমন আরও একজন পুরুষকে পেয়েছিলাম, তিনি হচ্ছেন ঁমনোজ কুমার চক্রবর্তী, যিনি একজন আদর্শ জাতীয় শিল্পীও বটে। কিন্তু যেহেতু

> REALITY is SPIRIT, the essence of which is LOVE, gradually unfolding itself through an ETERNAL PLAY of Conflicting Forces and their Solutions."
>
> —NETAJI

THE CALL

> "আমি আবার বলিতেছি, সেই মহালগ্ন সমাগত হইলেই আমি তোমাদের পাশে গিয়া দাঁড়াইব, সেই অন্তিম সংগ্রামে তোমাদের সঙ্গে যোগ দিব।"
>
> —নেতাজী

সুভাষবাদী জনতার মুখপত্র | ★ বিশেষ সংখ্যা (দ্বিতীয় সংস্করণ), ৬ই জুলাই, ১৯৬৪ ★ | সাহায্য—১০ নঃ পঃ

নেহেরুর শব-পার্শ্বে

কে এই সন্ন্যাসী ?

পিতৃশ্রাদ্ধের পর নেতাজী।

"There was a Yogi, too, among the early callers, and he looked upon the late Prime Minister as one of the biggest props of Yoga."

— STATESMAN, 28. 5. 64. Late city edition, Page 7, Col. 8.

"................................"

—DAILY MAIL, London, 28. 5. 64.

পন্ডিত জওহরলালের মরদেহের সম্মুখে ২৭শে মে ১৯৬৪ সালে দিল্লীর তিনমূর্তি ভবনে নেতাজী, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে। এই ছবি সুভাষবাদীজনতার 'ডাক' পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। কে এই সন্ন্যাসী ? এই প্রশ্ন করার সাথে সাথেই ভারত সরকার তাদের প্রচারিত ফিল্ম থেকে তা কেটে বাদ দেয়।

তিনি স্বামীজীর আত্মবিলোপন মন্ত্রের পথের পথিক তাই তাঁর নাম সকলের গোচরে নেই। কিন্তু তাঁর শিল্পকর্ম কাণ্ড বিবেকানন্দ শিলা, মিণাক্ষী মন্দির, থেকে বেলুড় মঠ ইত্যাদি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে নামগোত্রবিহীন ভাবে। বলতে নেই এমন পুরুষদের চরণে ঋণী থেকে জন্মজন্ম তাঁদের পাওয়াটাও চরম সৌভাগ্যের বলে আমি মনে করি। এই দুই মহান ব্যক্তিই আমার এই লেখার উৎস বা ফল্গুধারা। এই দুইজন ব্যতীত শ্রদ্ধেয়া কমলা দাশগুপ্তা ও শ্রদ্ধেয় বিশ্বজিৎ দত্ত মহাশয়কে বাদ দিলে এই গ্রন্থের গ্রন্থনাটাও আমার কাছ থেকে বিয়োজন হয়ে যায়। কাজেই এঁদের কথা বলে কখনও শেষ করতে পারবো না। তাই তাঁদের চরণে আমার স্বতঃস্ফূর্ত শতপ্রণাম রেখে আজ শেষ করছি। এ প্রসঙ্গে পরমশ্রদ্ধেয় আনন্দভারতী মহারাজের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তাও আমাকে আলোচ্য ব্যাপারে ভীষণভাবে সাহায্য ও পরিপুষ্ট করেছে। তাঁর চরণেও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন রইল। এই সব মহান সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ ছাড়া যাঁদের সহযোগিতা না হলে এই বই বই হয়ে উঠতো না তাঁরা হলেন শ্রদ্ধেয় নাট্যকার ও লেখক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পলাশ হালদার এবং প্রচ্ছদ রচয়িতা ও এই পুস্তকের সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্যের রূপদাতা শ্রীযুক্ত তাপসরঞ্জন ঘোষ। তাঁর সহযোগিতা ও সাহায্য অসীম। সমস্ত ছবির ব্যাপারে তাঁর শ্রীহাতের প্রলেপ না পড়লে গ্রন্থখানি কিছুতেই পূর্ণতালাভ করত না। তাঁর ঋণও অপরিশোধ্য। এই দুই বন্ধুকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর কৃতজ্ঞতা রইল প্রকাশক শ্রীযুক্ত রুদ্র প্রকাশ ধর মহাশয়ের প্রতি। তাঁর সহযোগিতার ঋণ পরিশোধনীয় নয়। সেই সঙ্গে রেজ ডট কম-এর সুমিত ও সুমন বাবুর শ্রম ও সহযোগিতার জন্য আমি অশেষ কৃতজ্ঞ।

বলাবাহুল্য এটি আমার চতুর্থ প্রয়াস। যদি কোন সহৃদয় পাঠক এই গ্রন্থ দ্বারা সামান্যতম পরিতৃপ্তি লাভ করেন তবেই জানবো আমার এই শ্রম সার্থক হয়েছে। যেসব অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তি রয়ে গেছে তার জন্য সকল সুধীবৃন্দের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

ইতি

বিনয়াবনত নিবেদক

জয়তু নেতাজী সুভাষ

জয়তু শ্রীমদ্ সারদানন্দজী

পোপার যুদ্ধ ক্ষেত্রে ১৯৪৪ সালে যুদ্ধস্থল পরিদর্শনরত নেতাজী।

"সাংবাদিকের চোখে—সুভাষ দর্পণে বিশ্বরূপ"

বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার নেতাজী অনুসন্ধানে ব্রতী শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র রায়-এর নেতাজী সাধনার আরও একটি পারিজাত অর্ঘ্য 'সুভাষ দর্পণে বিশ্বরূপ'—গ্রন্থখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে। এই গ্রন্থখানি কোন সৌখিনতার শুষ্ক মোড়কে চর্চিত 'পণ্য' নয়। হৃদয়ের আবেগ উৎসারিত পবিত্র দীপশিখার মতই এ অর্ঘ্য দেবগৃহের মহাযোগী কালচক্রের নিয়ন্ত্রা, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্দেশে নিবেদিত পুষ্পাঞ্জলির একটি পবিত্র পুষ্প।

ইতিপূর্বে সঙ্গীতের একাধিক ক্যাসেটের মাধ্যমে এই লেখকের সঙ্গীত রচনা ও সুর সাধনার ও সুভাষচর্চার প্রকৃষ্ট পরিচয় তথা প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি। যদিও এই সব চর্চা বা সাধনাই তাঁর অতি নীরবে নিভৃতে ও নির্লিপ্তে ঘটে চলেছে। তাঁর স্বদেশ বন্দনা ও ভক্তিগীতির ক্যাসেট-এর মাধ্যমে যা পেয়েছি তা আজকের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই অত্যন্ত রুচীশীলতার সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর গানের রচনা শৈলীতে যে চিরন্তণীর প্রকাশ ঘটেছে তাতে অতীত ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের কথাই স্মরণ করে দিচ্ছে।

'সুভাষ দর্পণে বিশ্বরূপ'—বইটিতে নির্বিচারে বিশ্বাসের একটা প্রবণতা থাকলেও নেতাজী অনুরাগী জাতীয়তাবাদী মানুষের হৃদয়ে প্রকৃত সত্যের হয়ত বা নিশ্চিতরূপে আপন গুণেই জায়গা করে নেবে। নেতাজী সম্পর্কে কঠোর সত্যের নানা দিক উন্মোচিত হচ্ছে দ্রুতলয়ে। সেই গতি ত্বরান্বিত করতে এই বই-এর ভূমিকা হবে অনস্বীকার্য্য। অপেশাদার এই লেখকের ব্যক্তিগত সততা ও নিষ্ঠা এক্ষেত্রে অনন্য সম্পদ। নেতাজীর সামগ্রিক জীবনের ক্রটিহীন বা বিতর্কহীন বিশ্লেষণ কোন গবেষকের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। পক্ষপাতিত্বহীন নির্ভুল মূল্যায়নে কোথাও কোথাও তথ্য ও তত্ত্বের মেলবন্ধন না ঘটলেও লেখকের সৎ প্রচেষ্টা পাঠকবর্গ সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন।

আর্থিক লাভ বা যশের কাঙ্গাল নন এমন যে সামান্য কিছু সত্যসন্ধানী নেতাজী গবেষক আছেন সেই বিরল প্রজাতিভুক্ত লেখক শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র রায়ের ব্রত সার্থক হোক, করুণাময় ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা রইল। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ও সাফল্য কামনা করি।
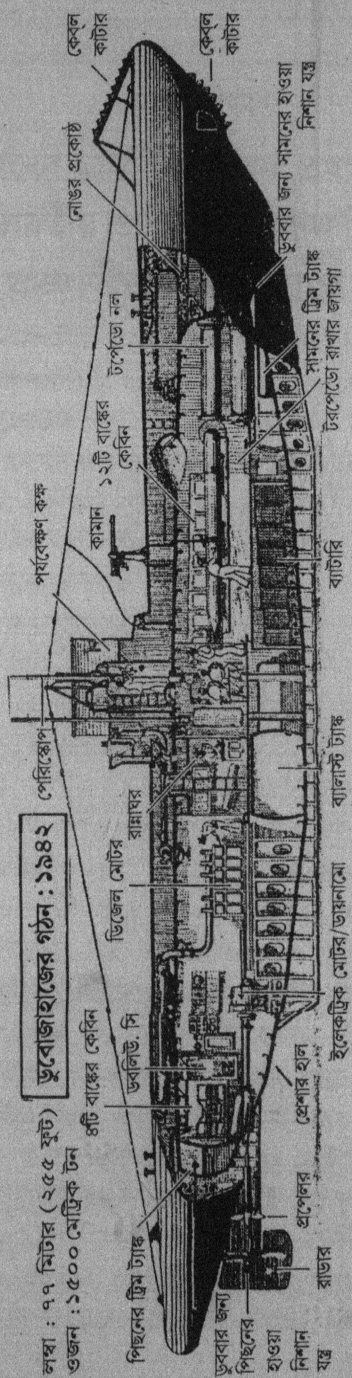
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র জার্মান থেকে যে সাবমেরিনে যাত্রা করেছিলেন সেই সাবমেরিনের হুবহু ডায়গ্রাম। সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত। নং ইউ-১৮০, এবং জাপানী সাবমেরিনের নং ছিল – আই ঃ ২৯।

নেতাজীর জীবন ও কর্মের চেয়ে তাঁর অন্তর্ধান রহস্য যেন অধিক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠছে। দীর্ঘকাল ধরে একটি প্রয়াস চলেছে - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম-পর্বে তিনি কোথায় গেলেন। বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। সরকারী তরফের এই সিদ্ধান্ত আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবার প্রগাঢ় প্রচেষ্টা হলেও, দেশবিদেশের বহু গবেষক আজও তৎপর। কারণ বহু ক্ষেত্রেই সূত্র ছিন্ন হয়ে আছে। নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের অভাব। জোর করে ঢাকনা বন্ধের চেষ্টা।

নেতাজীর কর্মকাণ্ডকে যতই মুছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, ততই তিনি আরও জাগ্রত হচ্ছেন। সর্বদিক থেকে আরো বিকশিত, প্রকাশিত হচ্ছেন তিনি। ইতিহাসের যে-আবর্ত থেকে তিনি উঠেছিলেন দেশ-মাতৃকার বন্ধন মোচনে, আবার যে-আবর্তের অন্ধকারে তিনি মিলিয়ে গেলেন, সেই আবর্তের অন্তরাল থেকে চমকপ্রদ যে-সব তথ্য ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে তাতে নেতাজী আমাদের জাতীয় জীবনে হয়ে উঠছেন এভারেস্টের মতো এক চরিত্র। তাঁর অন্তর্ধান তাঁর আবির্ভাবকে আরও ভাস্বর করে তুলছে। তাঁর মহিমা আরও প্রকট হচ্ছে। মুহূর্তে, মুহূর্তে তাঁর নব জন্ম হচ্ছে। তিনি না থেকেও যেন আরো বেশি করে থাকছেন। ক্রমশই তাঁর ভাবমূর্তি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

নেতাজীর জীবন ও জীবনী যেন দুই কক্ষবিশিষ্ট বিশাল এক প্রাসাদ। একটি কক্ষে জমা আছে তাঁর প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ড। দ্বিতীয়টিতে সঞ্চিত হচ্ছে ক্রমশ জানা যাচ্ছে এমন সব বিচিত্র ঘটনা, যা হয়ত জানা সম্ভব হত না যদি না তিনি অদৃশ্য হতেন। নেতাজী-চর্চার দ্বার তিনি খুলে দিয়ে গেছেন। ধীরে ধীরে আমরা তাঁর ভাবমূর্তিকে গঠন আবার পুনর্গঠন করতেই থাকব।

এই গ্রন্থ আকারে বিপুল, তথ্য সন্নিবেশনে মূল্যবান। প্রতিটি ছত্র শ্রমের ফসল। প্রশ্ন হতে পারে, তর্ক আসতে পারে। প্রমাণ, অপ্রমাণের দ্বন্দ্ব ঘটতে পারে। আর পারে বলেই এটি জীবন্ত। এই গ্রন্থটিকে ঘিরে আরো এগনো যেতে পারে। এটি একটি প্রবাহ। বহু মূল্যবান বিষয়ের সংযোজনে আদরণীয়।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
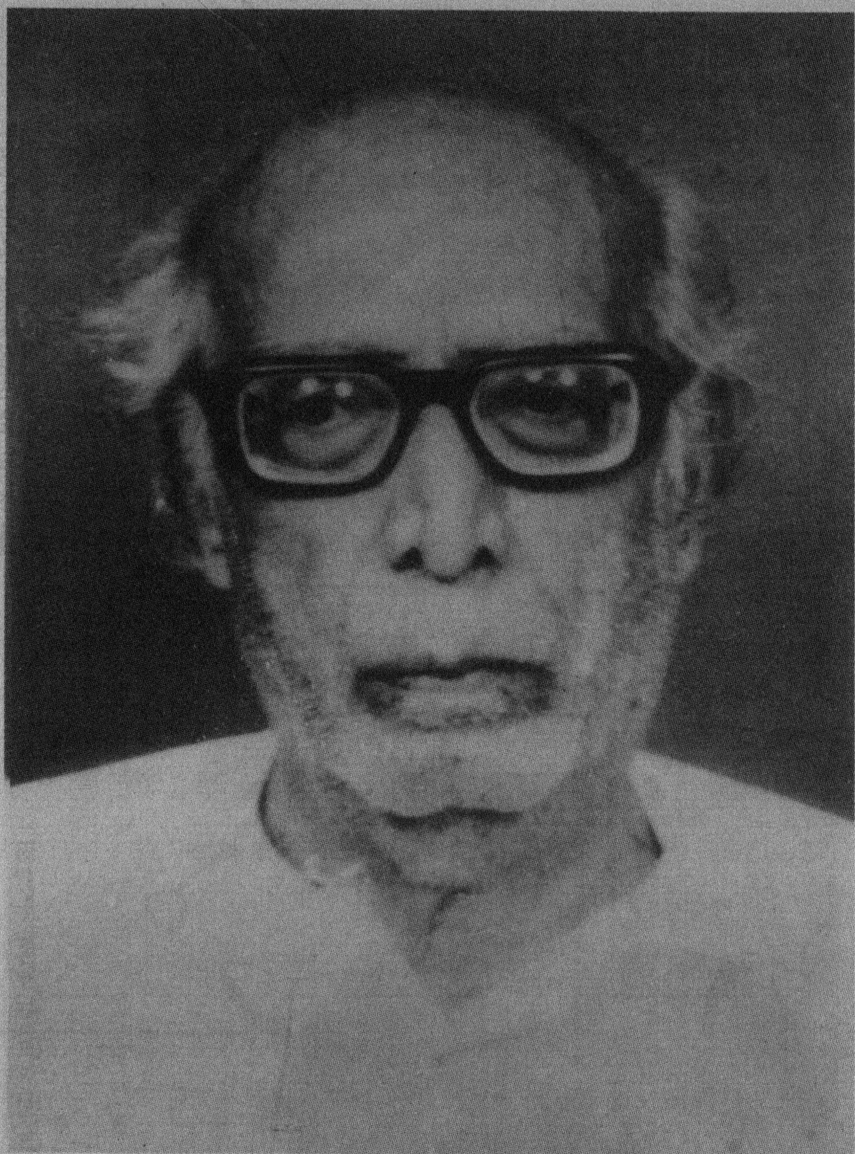
নেতাজীর হোমফ্রন্টে বৈপ্লবিক কর্মে যুক্ত এবং শিক্ষাবিদ তথা দৈনিক বসুমতীর
এক সময়ের সহঃ সম্পাদক ঁশিবপ্রসাদ নাগ। (পুস্তক যন্ত্রস্থ কালে দেহ রাখেন।)

কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য এবং প্রাক্তন কলেজ সার্ভিস কমিশন সদস্য (পঃ বঃ)-এর দৃষ্টিতে 'স্বদেশ দর্পণে বিশ্বরূপ'।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে ভারতবাসীর জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। চার বছর আগে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হলেও দেশবাসীর কাছে সুভাষচন্দ্র চিরসবুজ, চিরনবীন। তাঁর যৌবন আছে। জরা নেই। বার্দ্ধক্য নেই। বৃদ্ধি আছে। বিকাশ আছে। বিনাশ নেই। সুভাষচন্দ্র অমর, মৃত্যুহীন।

এমন পরম সৌভাগ্য সুভাষচন্দ্র ছাড়া আর কোন ভারতবর্ষীয় দেশনেতার কপালে জোটেনি। অথচ **আমরা কেবলমাত্র তাঁর জীবনের মাত্র আটচল্লিশটি বৎসরের সংবাদ জানি।** কটকের প্রবাসী বাঙালি সুভাষচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান দখল করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স পড়ছিলেন। কপালে সহ্য হ'ল না। দাম্ভিক, ভারতবিদ্বেষী ইংরেজ অধ্যাপক ওটেন লাঞ্ছিত হলেন। সুভাষচন্দ্র কলেজ থেকে বহিস্কৃত হলেন। পরে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পাশ করেন। (কাকতালীয় মনে হলেও স্মরণ করা যেতে পারে যে স্বামী বিবেকানন্দও প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেও গ্রাজুয়েট হন জেনারেল এ্যাসেম্বলিজ কলেজ অর্থাৎ স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে।) তারপর লন্ডনে আই. সি. এস. পরীক্ষা। মাত্র আটমাসের প্রস্তুতিতে আই. সি. এস. পরীক্ষা চতুর্থ স্থান লাভ করেন। এবং মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুকে নিজের আদর্শ ও স্বপ্নের কথা জানিয়ে এবং বাংলার স্বদেশযজ্ঞের পুরোহিত বৈরাগী কবি দার্শনিক চিত্তরঞ্জন দাশকে তাঁর দেশসেবক ও মাতৃসাধক হবার সংকল্প ব্যক্ত করে রাজকীয় নিশ্ছিদ্র নিরাপদ আরামদায়ক আড়ম্বরের জীবনের মোহ ত্যাগ করে আই. সি. এস. থেকে পদত্যাগ করেন। অবশ্য খালি হাতে স্বদেশে ফেরেননি। কেম্ব্রিজ থেকে ট্রাইপস লাভ করে নিজ মেধা ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন।

১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে রাজনৈতিক গুরু হিসাবে বরণ করে নেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং কারাবরণ। কলকাতায় প্রিন্স অব ওয়েলস্ বয়কট আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। 'ফরওয়ার্ড' ও 'বাংলার কথা' পত্রিকা পরিচালনা করেন। গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে দক্ষতার সঙ্গে অধ্যক্ষতার দায়িত্ব পালন করেন। উত্তরবঙ্গ বন্যায় পীড়িতদের সেবাকার্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কলকাতা করপোরেশনে মুখ্য কর্মসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিনা বিচারে মান্দালয়ে আড়াই বছর নির্বাসনে কাটান। বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। নিখিল ভারত কংগ্রেসের সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। সাইমন বিরোধী আন্দোলনেও নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯২৮ সালের ঐতিহাসিক কংগ্রেস অধিবেশনে সামরিক কায়দায় স্বেচ্ছা সেবকবাহিনী গঠন ও অধিনায়কের দায়িত্ব পালনে নজির স্থাপন করেন। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তারপর কোলকাতার মেয়র পদে বৃত হন। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য য়ুরোপ যাত্রা এবং অসুস্থ শরীরে "India Struggle" গ্রন্থ প্রণয়ন। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে

সভাপতির পদে বৃত হন। National Planning Committee গঠন। গান্ধীর বিরোধীতা সত্বেও ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হন। আদর্শগত কারণে সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। এবং ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। আবার কারাজীবন। অনশন এবং গৃহবন্দী। পুলিশের প্রহরা ভেদ করে দেশত্যাগ। দুঃসাহসী অভিযাত্রা। জার্মানী হয়ে অবশেষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গমন। ঐতিহাসিক আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন, যুদ্ধ ঘোষণা, ভারতের মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন এবং অসহায় অবস্থায় পশ্চাৎ অপসরণ এবং **বৃহত্তর পরিকল্পনা রূপদানের জন্য অজ্ঞাত স্থানে প্রস্থান। সময় আগস্ট, ১৯৪৫।**

সংক্ষেপে, সুভাষচন্দ্রের কর্মময় জীবন ১৯২১-১৯৪৫ স্বদেশে ও বিদেশে। কারাবাস ও অসুস্থতার সময় বাদ দিলে দেখা যাবে যে **তিনি দেশের অভ্যন্তরে দেশমাতার পূজা ও দেশবাসীর সেবার সুযোগ পেয়েছেন মাত্র দশ এগারো বছর।**

তবু সুভাষচন্দ্র এত ভালোবাসা লাভ করলেন ভারতবাসীর। আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করলেন জাতি, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর। কীসের জন্য এত ভালোবাসা, এত বিশ্বাস, এত নির্ভরশীলতা? **একবিংশ শতকের সূচনায়ও দুর্ভাগ্যপীড়িত, ভাগ্যলাঞ্ছিত, রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক নিষ্পেষিত, রাজনৈতিক অভিনেতা মন্ডলী অথবা রাজনীতিজীবিদের দ্বারা শোষিত ও উৎপীড়িত ভারতবাসী কেন মনে করেন যে সুভাষচন্দ্র উপস্থিতির সুযোগ লাভ করতে পারলে দেশজননীর রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ ও শুষ্ক নয়ন দেখতে হ'ত না? ভারতবাসীকে স্বাধীন ভারতে আর্থিক দাসত্ব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে হ'ত না?**

এর উত্তর অতি সহজ। সুভাষচন্দ্র সহজ সরল সাদামাটা ছিলেন। কোন জটিলতা ছিল না। কোন দ্বিচারিতায় ছিলেন না। তিনি ছিলেন খাঁটি। বাক্য ও মন এক ছিল। বুদ্ধি ও হৃদয় এক ছিল। তিনি কাঁদতেন। কাঁদতে পারতেন। দেশমাতার দৈন্যের জন্য কাঁদতেন। দেশবাসীর দুর্দশার জন্য কাঁদতেন। দেশজননীর উদ্ধারের জন্য, দেশবাসীর দুর্গতি মোচনের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর জীবনদর্শনের ভিত্তিই হ'ল প্রেম—অসীমপ্রেম, অনন্তপ্রেম, দেশপ্রেম, ঈশ্বরপ্রেম—সব সুভাষজীবনে মিলেমিশে একাকার।

এই অফুরন্ত অনন্ত অখন্ড দেশপ্রেমই প্রেমিক সুভাষচন্দ্রকে মাতৃমুক্তির জন্য সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করেছে। সর্বত্যাগী বৈরাগী সন্ন্যাসী সুভাষচন্দ্র আসলে রামকৃষ্ণ-সারদামণি-স্বামী বিবেকানন্দ-ভগিনী নিবেদিতা এবং দেশবন্ধুর পতাকাবাহী সৈনিক। তাঁর সংগ্রাম কেবলমাত্র ভারতবাসীর মুক্তির জন্য নয়। **তাঁর সংগ্রাম বিশ্বমানবের মুক্তির সংগ্রাম।**

স্বামীজীর Mission হ'ল Man-making। Man-making সম্পূর্ণ না হলে Nation-making হবে কেমন করে? স্বামীজীর স্বপ্ন সুভাষচন্দ্রের ধ্যান। জাগ্রত, উন্নত, আধ্যাত্মিক ভারতের পুনর্গঠনই তাঁর তপস্যা।

আর কোন দেশনায়কের মধ্যে ভারতবাসী এত ভালোবাসা, এত বিশুদ্ধতা, এত দুর্জয় সাহস, এত ক্ষাত্র তেজ, এত ব্রাহ্মণসুলভ মনীষা প্রত্যক্ষ করেনি। তাই গ্রন্থের শুষ্ক পৃষ্ঠায় নয়, ভারতবাসী নিজনিজ অন্তরে সুভাষচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশ্বের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র অনন্য। কোন দেশের, কোন কালের কোন নেতা জীবদ্দশায়,

সমসাময়িককালে, সমকালে, তৎকালে, কিংবদন্তী নায়কে পরিণত হননি। 'দেশগৌরব, 'দেশনায়ক' সুভাষচন্দ্র সমকালীন ভারতে Legend-এ পরিণত হয়েছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে Myth গড়ে ওঠে। Mythology গড়ে ওঠে। পুরাণ কথা রচিত হয়। সুভাষচন্দ্র তাঁর কালেই Myth-এ পরিণত হয়েছেন।

একটি জাতির কয়েক শতাব্দীর জীবনচর্চা ও জীবনচর্য্যা নিয়ে মহাকাব্য রচিত হয়। বীরত্ব, ত্যাগ, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, সার্বজনীনতা, বিশ্বজনীনতা—সব কিছু নিয়ে মহাকাব্য। মহাকাব্যের নায়ক কালের ক্ষুদ্র গন্ডী অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েন। নিজেকে পরিব্যাপ্ত করেন। বিস্তারিত করেন। Material এবং Spiritual দুটি দিকই মহাকাব্যে বিধৃত হয়। দুইয়ের সমন্বয়ে জীবনের সব উপকরণ দিয়ে নায়ককে অর্জিত করা হয়। প্রজানুরঞ্জন এবং সেবাই ভোগ ও ঐশ্বর্যকে অতিক্রম করে। মহাকাব্য সব যুগে রচনা করা যায় না। মহাকাব্যের কবি হামেশাই জন্মগ্রহণ করেন না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কিংবা বাল্মীকির আবির্ভাব প্রতি শতাব্দীতে তো দূরের কথা, প্রতি সহস্রাব্দে ঘটে না। তাই হোমার য়ুরোপে একজনই আবির্ভূত। 'সাবিত্রী' রচনা ক'জন করতে পারেন? শ্রী অরবিন্দকে অবশ্য একই সারিতে বসানো যাবে।

আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম অপেক্ষা করতে হবে। তারপর আবার একজন বেদব্যাস বা বাল্মিকীর শুভ পদধ্বনি শোনা যাবে। ইতিহাসের জীর্ণপাতা থেকে, পাষাণের বুক থেকে, নদনদীর কলকতান থেকে, পাহাড় পর্বতের চূড়া থেকে, বৃক্ষরাজি থেকে, পক্ষীর কাকলি থেকে তিনি সঙ্গীতের সন্ধান করবেন। ভারতবর্ষের পল্লীতে পল্লীতে, শহরে নগরে, বন্দরে, কৃষিক্ষেত্রে, চারণের কণ্ঠে শোনা যাবে জীবন দিয়ে জীবনগড়ার সঙ্গীত। সঙ্গীতময় সেই জীবনই সুভাষচন্দ্রের জীবনগাথা। জীবনকাব্য। শাশ্বত ভারতের নতুন মহাকাব্য। আমরা ভাবীকালের অনাগত মহাকবির প্রতীক্ষায় থাকব।

আমার একান্তপ্রিয় প্রীতিধন্য ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রী দেবেশ চন্দ্র রায় "সুভাষ দর্পণে বিশ্বরূপ" দর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। সুভাষচন্দ্রের বর্ণাঢ্য জীবনের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সংগৃহীত তথ্যকে তত্ত্বে পরিণত করেছেন। সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে তাত্ত্বিক শূন্যগর্ভ আস্ফালন একদা আমাদের দেশেরই কতিপয় বিভ্রান্ত নেতারা করে নিজেদের নীচতা, ক্ষুদ্র ও অজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, শ্রী রায় তার উল্লেখ করেছেন।

আমাদের জাতীয় তথাকথিত নেতৃবর্গের বালসুলভ চপলতার উল্লেখ করতেও তিনি ভোলেননি। তাঁদের নীচতা ও দীনতা জাতির কলংক। এই কলঙ্কের পরিণতিতেই অখণ্ড স্বাধীনতা খণ্ডিত হয়েছে। এ ব্যাপারে লেখকের লেখনী এখানে খুব জোরালো ও যুক্তিনিষ্ঠ।

সুভাষচন্দ্র অখন্ডের উপাসক। অখন্ড ভারত অখন্ড বিশ্বেরই প্রতিবিম্ব। ভারত-আত্মার সন্ধানে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি। কতশত সাধকের লীলাভূমি ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের মন্ত্র ত্যাগ। পথ সেবা। পাশ্চাত্যমগ্ন অর্থ ও কামচরিতার্থে; ভারতবর্ষ মগ্ন কামিনী ও কাঞ্চনকে সংযমের দ্বারা প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পূর্ণত্বলাভে অভিযাত্রায়। দেহসর্বস্ব পাশ্চাত্যের কাছে ভারতের বাণী হ'ল—বিদেহী আত্মা শক্তিতে সম্পদে বলীয়ান। ভোগ নয়, ত্যাগেই সুখ। ক্ষমতায় নয়, নিঃস্বতায় শান্তি। ভারতবর্ষের

আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য বিশ্বে বিলিয়ে দিতে চান সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র নীলকণ্ঠের ন্যায় রক্ষক। বিশ্বত্রাতা।

শ্রী রায় সুভাষচন্দ্রের রোমান্টিক বিপ্লবের কথা, অসমাপ্ত বিপ্লবের কথা, অসমাপ্ত বিপ্লবের প্রস্তুতির কথা এবং সুভাষচন্দ্রের অখন্ড বিপ্লবের প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের প্রতি সুভাষ-অনুরাগী দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মহাক্ষত্রিয় সুভাষচন্দ্রের ব্রাহ্মণদৃষ্টি কীভাবে অঘটন ঘটিয়েছে এবং ঘটাবে, তিনি সেদিকে নজর দিয়েছেন এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করেছেন। সুভাষজীবনের সবদিকেই তাঁর নজর।

আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নিপুরুষ সুভাষচন্দ্র। আজীবন যোদ্ধা সুভাষচন্দ্রকে Robert Browning-এর একটি কবিতা দিয়ে প্রণাম নিবেদন করা যেতে পারে ঃ

"I was ever a fighter, so one fight more
The best and the last!
I would hate the death bandaged my eyes,
and forebore.
And bade me creep past,
No! Let me taste the whole of it, fare like my peers.
The heroes of old,
Bear the brunt, in a minute pay glad life's arrears.
of pain, darkness and cold.
For sudden the worse turns the best to the brave,
The black minutes at end,
And the elements rage, the fiend voices
that rave.
Shall dwindle, shall blend
Shall change, shall become first a peace out of pain,
Then a light, then thy breast
O thou soul of my soul! I shall clasp thee again,
And with God be thee rest."

সুভাষচর্চার ক্ষেত্রে, স্বদেশচর্চার ক্ষেত্রে গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম। দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রম করেছেন লেখক। ডিগ্রীলাভ নয়, ডিগ্রীলাভ করে পদোন্নতি নয়, সমাজ ও দেশের উন্নতির কথা, দেশ নির্মাণের কথা বিবেচনা করেই এ গ্রন্থ প্রণয়ন। তথাকথিত এ্যাকাডেমিক ঝলসানি এখানে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে লেখকের ভক্তি ও নিষ্ঠা। এবং সর্বোপরি বিশ্বাস। বিশ্বাস ছাড়া কিছুই লাভ করা যায় না। ভ্রাতা দেবেশের বিশ্বাসের সঙ্গে আমার বিশ্বাসও যুক্ত করলাম। জয়হিন্দ।

নাট্যকারের চোখে সুভাষ দর্পণে বিশ্বরূপ

লেখক—দেবেশবাবু বীরশ্রেষ্ঠ সুভাষচন্দ্রের কীর্তিগাঁথা লিখতে গিয়ে সূচনা করে গেলেন এক নতুন দিগন্ত—তা হল **'সুভাষায়ন মহাকাব্য'** বিশ্বইতিহাসের প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর নানা প্রান্তরে তিনি ছুটেছেন ইতিহাস ও মিথের সওয়ার হয়ে। কবিত্বময় অর্থের যুক্তিনির্ভর এ রচনা একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে থামা যায় না।

যদিও দেবেশবাবু কবি ও গীতিকার তবু এ রচনা লিখতে গিয়ে তার গদ্য যে যথেষ্ট সাবলীল সে প্রমাণ তিনি রেখেছেন। যুগপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ থেকে বিশ্বের তাবড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে তিনি ছুঁয়ে গেছেন। উন্মোচন করেছেন ইতিহাসের নানা অধ্যায়। যদিও সর্বত্র তিনি প্রচলিত ইতিহাসকে সার্বিক ভাবে অনুসরণ করেন নি। কোথাও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। আবার নিজেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। বিশেষতঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্টদের ঐতিহাসিক ভুলগুলির দিকে। নেতাজীর বিবাহ ও মৃত্যু প্রসঙ্গে।

তবে সনাতন ভাবধারার মহিমা গাইতে গিয়ে মন্দির মসজিদ বিতর্ক এখানে না আসাই বাঞ্ছনীয় ছিল যদিও তা অযৌক্তিক নয়। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন 'বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ঐসলামিক শরীরযুক্ত' এক মিলিত নতুন শক্তিশালি ভারতীয় জাতি। নেতাজীও তাই।

দেশ ভাগ, দাঙ্গা এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটত না তিনি উপস্থিত থাকলে। ভাগাভাগির সেই স্মৃতি আজো দগদগে ক্ষত। সীমান্তে অব্যাহত রণদামামা বারুদের গন্ধ। হয়ত তিনি মেলাবেন 'ঝড়ো হাওয়া পোড়ো বাড়ি'—যুগের পর যুগ কেটে গেলেও তাঁর অদৃশ্য অলৌকিক উপস্থিতি জাগ্রত বিবেকের মত চাবুক মারে আমাদের লোভ-পাপ-ভয়, নতজানু ইন্দ্রিয়ের পিঠে।

হয়ত সব বাধা কাটিয়ে আমরাও একদিন সাহসী হয়ে উঠব। 'আমিই সে' সেই অনাগত ভোর কত দূর কে জানে? গ্লোবালাইজেশান ভোগবাদী আত্মস্বর্বস্য সময়ের এ যুগসন্ধিক্ষণে আদর্শবাদ ত্যাগের এ এক অবিস্মরণীয় দলিল জানিনা এর মূল্যায়ন হবে কতদূর? এবং কবে? এক মলাটের ভিতর এত অধিক সুভাষতথ্য যথেষ্ট বিস্ময়ের। পরিশেষে আজাদ হিন্দের দিনপঞ্জী—মহাজীবনের জীবনীপঞ্জী—বংশাবলী অতি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন সাবমেরিনের ডায়াগ্রাম তাতে সন্দেহ নেই। দেবেশবাবুর এ ভাষ্যের সব তথ্যের হয়ত প্রামাণ্য দলিল নেই, তবে যুক্তি-বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ দিয়ে নেতাজীর জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন সুচারুভাবে এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে। পরিশেষে দেবতাকে উৎসর্গ করা তার শ্রেষ্ঠ ভক্তের উপচারে কোন খাদ নেই। তাই এ রচনা লিখতে গিয়ে বেদ-বেদান্ত-ইতিহাস-দর্শন, অতীত-ভবিষ্যত-বর্তমান সব মিলেমিশে একাকার হয়ে বর্ষিত হয়েছে অমৃত। আর আগামী দিনে সেই অমৃতসুধা পান করে আমরাও আবার পুনর্জীবিত হব। পুস্তকের সাফল্য ও বহুল প্রচার কামনা করি।

নেতাজী সুভাষের জীবনবাদের বেদবাণী—

"ইত্তেফাক ইত্তেমদ্ কোরবাণি"

**"তুম হামকো খুন দেও
ম্যায় তুমকো আজাদী দুঙ্গা"**

(৫ই জুন ১৯৪৩, সন্ধ্যা ৫ ঘটিকা)

"GIVE ME BLOOD
I SHALL GIVE YOU FREEDOM"

Netaji
Singapur
5th June, 1943.

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য মহামানবদের শাশ্বত বাণী :

"ভারতের নবজাগ্রত জাতীয় আত্মা আজ
মুক্তির জন্য হাহাকার করছে।"

"বঙ্গ-জননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছ, এসো। মায়ের হাতে তোমরা পাবে দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র্য ও কারাযন্ত্রণা। যদি এইসব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার—তবে তোমরা এগিয়ে এসো। হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই তো দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করে । ওগো বাংলার যুবক-সম্প্রদায়, স্বদেশ সেবার পুণ্যযজ্ঞে আমি তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, ছুটে এসো। ভারতের নবজাগ্রত জাতীয় আত্মা আজ মুক্তির জন্য হাহাকার করছে।"

—সুভাষচন্দ্র বসু

"সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি
ইহা বিস্মৃত হইও না।" —ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

"পৃথিবীর সহস্রার হচ্ছে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের
সহস্রার হিমালয়।"

"আত্মা যখন ধুলোয় লুটায়, ধর্ম যখন ভিক্ষায় নামে
তখন ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন।"

"আমাদের সমগ্র জাতির কৃতপাপের জন্য
আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি।" —নেতাজী সুভাষচন্দ্র

"হিন্দু শব্দ কোন সম্প্রদায়ের প্রতীক নয়
বরং উদার ব্যাপক এর অর্থ।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

"আধুনিক যুগান্তরের সঙ্কট মোচনের
সব থেকে উপযুক্ত ধর্মই হলো হিন্দুধর্ম।"—ভগ্নী নিবেদিতা

মানুষ হইতে গেলে তিনটি জিনিষ চাই--

1) Embodimemt of the past.
2) Product of the present.
3) Prophet of the future.

"I must assimilate the past history infact all the past civilisations of the world."

"I must study myself—Study the world around me—both India and abroad and for this foreign travels are necessary."

"I must be the prophet of the future. I must discover the laws of progress—the tendency of both the civilisation and there form to settle the future goal and progress of mankind. The philosophy of life will alone help me in this. This ideal must be released through a nation—begin with India."

—Subhas Chandar, 1915, 31st August

"ঐতিহ্যকে যারা ভুলে গেছে, প্রবল কপটতার মধ্যেও যাঁরা ঐতিহ্যকে ধরবে না তারা CRUSHED হয়ে যাবে। সেখানে দয়া থাকবে না, মায়া থাকবে না; ঝড় উঠেছে , ঝড় উঠবে। যে নিজেকে সেরে নেবে সে থাকবে। যে মনে করবে আমরা ভূতের ওঝা তারা শেষ হয়ে যাবে। তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বললেও রেহাই পাবে না।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

"India shall arise again in her full glory. Corrupt people of my country (motherland) soil will be completely eliminated, and gradually after a specified period dishonest person will not have to right on my motherland soil. And on your statement shall lead the whole world to the forth stage."

—Netaji Subhas

"She is walking with her own majestic steps—my motherland to fulfil her glorious destiny. which no power on earth or in heaven can check. And in my mind's eye I see the future giant slowly maturing the future India the youngest and the most glorious of the nations of the earth as well as the oldest....."

—Swami Vivekananda

"I have given you best of jewels. I have given you Subhas. wait and see you will find everything in him."

- -Deshabandhu Chittaranjan

"আগামী ইতিহাসে ভারতবর্ষ নুতন ভূমিকা নেবে। সপ্তদশ শতাব্দীতে নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড, অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে ফ্রান্স, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সর্বহারা বিপ্লবের ব্যাপারে রাশিয়া পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসকে এইসব দেশের ভূমিকা সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তী সম্পদ আসছে ভারতের ভূখণ্ড থেকে।"

—(সুভাষচন্দ্র বসু, ১০-০৬-১৯৩৩, ফ্রায়ার হল লণ্ডন)

"If love of country is a crime, I am a criminal, not only the chief executive officer of this (Calcutta) Corporation, but the Mayor of this Corporation equally guilty. I plead guilty to the charge. If that is a crime, I am ready to be hanged for it rather than shrink the duty which I feel to be the duty of every Indian to-day."

—Deshbandhu C. R. Das, 09-10-1924

"আগামী সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে একজন " বেঙ্গলী হিরো"; কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম 'পলায়নম্'; ঢাকা হবে 'রেড সিটি'; কালক্রমে বাঙ্গালী হবে পৃথিবীর নমস্য।" —শ্রীশ্রী মহাপ্রভু জগবন্ধু

... ."I believe and know and have faith in divine grace. I know that honest endeavours pursued with dedication are surely blessed with divine grace..... And even if the pioneer dies, his sadhana not dies. It is taken up by other sadhakas of the same line and thoughts are pursued to its final glorious consummation.....my sadhana cannot—shall not fail! Matri sadhana can never fail." —Mahakal

".....শুধু একটি হিসেব মনে রেখে চলেছি। সেটা আমায় দেখতে হবে, এ জীবনে একটা জিনিষের ওপরই আমার নজর রাখতে হবে, যে কি আমি দিতে পারিনি। কি আমি পাইনি এর হিসাব রাখা এ-জীবনের কাজ নয়। আমার এ জীবনের কাজ হলো কি আমি দিতে পারিনি এখনও, ব্যস ছুটি।" —মহাকাল

"আমি বিবাহ করিব না, সুতরাং যখন যাহা সত্য বুঝিব তাহাকে পালন করার পথে সাংসারিক বিবেচনার অধীন হইয়া থাকিতে হইবে না।

—সুভাষচন্দ্র, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২০

....."জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের দিন হইবে—যেদিন independent হইব—এবং তারপর সবচেয়ে আনন্দ হইবে যেদিন দার্জিলিঙ যাইব। আমার জীবন enjoyment-এর জন্য নহে। অবশ্যই আমার জীবন নিরানন্দও নহে, কিন্তু আমার জীবন enjoyment-এর জন্যও নহে।—My life is a mission—a duty"

—সুভাষচন্দ্র, ২০শে নভেম্বর ১৯২০

'ভারতে "শূদ্র" রাজত্বের' প্রেরণা আসিবে ভারতের উত্তর পূর্বসীমান্ত দ্বারা, তাহা হইবে ভয়াবহ। আর সান্‌পোর অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের তীর হইতে একটা 'সভ্যতা'র—ঢল ভারতে নামিয়া আসিবে।"
—স্বামী বিবেকানন্দ

"প্রথমে স্বাধীনতার ন্যায় একটা পরিবর্তন ভারতে আসিবে। পরে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার যাহা কিছু হইবার হিমালয় হইতেই হইবে। ভারতের স্বাধীনতা ভারতের স্বাধীনতা বলিতে বলিতে হিমালয়ে প্রায় দুইশত বৎসরের এক বাঙ্গালী সাধুর ক্রন্দন।"
—শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুর

"উপলব্ধি—renunciation and realisation এক বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ। এখনই ষোল আনা পাওয়া ও ষোল আনা দেওয়ার জন্য আমার মন প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।"
—সুভাষচন্দ্র বসু

যিনি এত দুর্বলতার মধ্য দিয়া আমাকে শক্তির উচ্চশিখরে লইয়া আসিয়াছেন—তিনি কি দয়া করিবেন না? উপনিষদে বলে,

"যমেবৈষবৃণতে তেন লভ্য" : —"এখন দেখা যাক।"

—সুভাষচন্দ্র, এপ্রিল ১৯২৭

"ষোল আনা দিতে হইলে অপরদিকে আদর্শকে ষোল আনা পাওয়া চাই। অথবা আদর্শকে ষোল আনা পাইতে হইলে নিজের ষোল আনা দেওয়া চাই।"
—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

"জীবন না দিলে যেমন জীবন পাওয়া যায়না—ভালবাসা না দিলে যেমন ভালবাসা পাওয়া যায়না—তেমনি নিজে মানুষ না হইলে মানুষ তৈয়ারী করা যায়না।"
—ভারতপথিক। (নেতাজী)

"দেয়ার আর থাউজেন্ড অব গেটস টু গেট ইন বেঙ্গল, বাট দেয়ার ইজ নান টু একজিট।"
—জনৈক ইউরোপীয়ান

"ঐহিক এবং জড়দেহের সুখদুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া যে এইভাবে আত্ম নিবেদন করিতে পারে জীবনে তাহার সফলতা অবশ্যম্ভাবী। আমার আদর্শ যে একদিন জয়ী হইবে সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সুতরাং আমার স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি কোন চিন্তাই করি না।" —সুভাষচন্দ্র, ৬ই মে ১৯২৭

"নেতাজী সুভাষচন্দ্র নারীস্পর্শ করেনি, বিবাহ তো বহু দূরের কথা।.....বর্তমানে আধ্যাত্ম সাধনায় রয়েছেন। বার্ধক্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর দেহ সম্পূর্ণ যোগসিদ্ধ। ভারতবর্ষের বহু মহাপুরুষ সিদ্ধ সাধকের আধ্যাত্মশক্তি সুভাষের মধ্যে সঞ্চারিত ও সঞ্জীবিত। যথাসময়ে সুভাষ দেশ ও জগত কল্যাণে আত্মপ্রকাশ করবে। নেপালে ও কলিকাতায় তাঁর সঙ্গে ৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মাঝে বহুবার সাক্ষাৎকার ঘটেছে।"

—রামনাথ অঘোরিবাবা

"তিব্বত হইতে সাম্যবাদের বন্যা ভারতে নামিয়া আসিবে; তারপর এশিয়ার সহিত ইউরোপ, আমেরিকার যুদ্ধ।" —ঋষি অরবিন্দ

"সুভাষচন্দ্র নামাধিকারী নেতাজীর গগনবিহারী ব্যক্তিসত্তাকে আমাদের মতো ক্ষুদ্রমতি ব্যক্তিদের বুঝে ওঠা অসাধ্যই নয়—তা দুঃসাধ্যও বটে। তিনি ভগবত সত্ত্রা।"....."**ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য, যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্বব ষন্নাংভগ ইতিকা না।**
অর্থাৎ : সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টি অচিন্ত্যশক্তি যাঁর মধ্যে বিরাজমান তিনিই ভগবান।"

"অসীম মহাকাশে মহাতপস্বী
মহাকাল আছে জাগি।
আজিও যাঁহারে কেহ নাহি জানে,
দেয়নি যে দেখা আজো কোনখানে,
সেই অভাবিত কল্পনাতীত
আবির্ভাবের লাগি মহাকাল আছে জাগি"
"নমো নমো হে মহাকালতপস্বী।" —বিপ্লবী বিশ্বজিৎ দত্ত

"আমি আবার বলিতেছি, সেই মহালগ্ন সমাগত হইলেই
আমি তোমাদের পাশে গিয়া দাঁড়াইব, সেই অন্তিম সংগ্রামে
তোমাদের সঙ্গে যোগ দিব।"

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

"Reality is spirit, the essence of which is love, gradually unfolding itself through an external play of conflicting forces and their solution."

—Subhas Chandra Bose

"টিকেনা যা, কথা দিয়ে কে পারিবে টিকাতে
ছাই হয়ে গিয়ে তবু বাকী যাহা রহিবে,
আপনার কথা সে আপনি কহিবে।" —বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

সূচীপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট অধ্যায়

তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় যাঁরা বিভ্রান্ত তাঁদের কৌতুহল নিবৃতার্থে কিছু সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য। কত যে জানার! মানব ইতিহাসের এক অবিস্মরনীয় ব্যক্তিত্ব। আমেরিকার C.I.A.-এর একটি গোপন রিপোর্টের De-classified কপির অংশবিশেষ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত Bibliography এর অংশ বিশেষ। সুভাষবাদী জনতার প্রচারিত 'ডাক'-বুলেটিন থেকে একটি সংবাদ সমীক্ষা। ভারত সম্পর্কে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ভবিষ্যদ্বানী। কিছু অবশ্য জ্ঞাতব্য জরুরী তথ্য ঃ (সুপ্রিম কোর্টের প্রকাশিত রায়ের অংশের নকল) রেনকোজি মন্দির ভস্মীভূত। চিতাভস্মের ডি.এন.এ. পরীক্ষা কি আদৌ সম্ভব? নেহেরুর অন্ত্যোষ্টিতে নেতাজী। বিশ্বনেতা নেতাজীর অন্তর্দ্ধান রহস্য উন্মোচনে দেশবাসীর নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য। কৃতজ্ঞতা স্বীকার, গ্রন্থপঞ্জী এবং পত্রপত্রিকাও তাদের গোষ্ঠীর প্রতি। ৩৫৫-৪৩২

মহানায়কের বিভিন্ন অবস্থানের কিছু ছবির পরিচিতি এবং তৎসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মহানদের ছবির সূচী ঃ

এক নজরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিশ্ব পথ পরিক্রমা মহা অভিযানের পথনির্দেশিকার সংক্ষিপ্ত সূচী

ক) ১৯৪১ সালের ১৬/১৭ই জানুয়ারী আফগান মুসলিম জিয়াউদ্দিন নামের ছদ্মবেশে কলিকাতা ত্যাগ। কলিকাতা থেকে বিহারের 'গুমো' হয়ে সেখান থেকে পাঠানকোট এবং সেখান থেকে কাবুল। কাবুল থেকে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তাসখন্দ ও মস্কো হয়ে 'ওর্ল্যান্ডো মাজেট্টো' ইটালীয় নামের ছদ্মবেশে বার্লিনে আগমন। এটা ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়।

খ) তৃতীয় পর্য্যায়ে সুভাষচন্দ্রের সাবমেরিনে যাত্রা। সুভাষচন্দ্র সাবমেরিনে পথ পরিক্রমা করেছিলেন ২৫,৫০০ কিলোমিটার, যা বিশ্বের বিগত মানব ইতিহাসে অদ্বিতীয়। বলা যেতে পারে মানব সভ্যতার আগামী ইতিহাসেও এমনটি আর কখনও ঘটবে না।

গ) সাবমেরিনে বিশ্ব পথ পরিক্রমার যতটুকু ইতিহাস সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত জানা সম্ভব হয়েছে তা হচ্ছে—জার্মানের কিয়েল বন্দর থেকে তাঁর সাবমেরিনে যাত্রা শুরু হয় ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ সালে। (সাবমেরিন নং ইউ-১৮০)

ঘ) কিয়েল থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশ দিয়ে তিনি আসেন আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরিপ। সেখানে এসে ২০শে এপ্রিল ১৯৪৩ সালে সাবমেরিন পরিবর্তন করেন।

ঙ) সেখান থেকে তিনি জাপানী ভি. আই. পি. 'মাৎসুদা'-নামের আড়ালে সুমাত্রা দ্বীপের সাবাং বন্দরে উপস্থিত হন। সেখানে জাপানী সাবমেরিনে তিনি সুমাত্রা আসেন। (সাবমেরিন নং আই-২৯)

চ) সাবাং থেকে আকাশ মার্গে তিনি এরোপ্লেনে জাপানের টোকিওতে পৌছান ১৯৪৩ সালের ১৬ই মে।

এই ছিল সুভাষচন্দ্রের বিশ্ববিপ্লব সাধনপথে বিশ্ব পরিক্রমার প্রথম প্রয়াস বা প্রথম পর্য্যায়। তারপর আরও যে তিনি বিশ্ব পরিক্রমা করেছেন তাঁর বিশ্ববিপ্লব সাধনা কল্পে তা আজও পৃথিবীবাসীর কাছে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়নি। এবং তা পাবে কি না সেটাও একমাত্র মহানায়কই বলতে পারেন।

মহানায়কের মহানিষ্ক্রমণের বিশ্বপথ পরিক্রমার মানচিত্র।
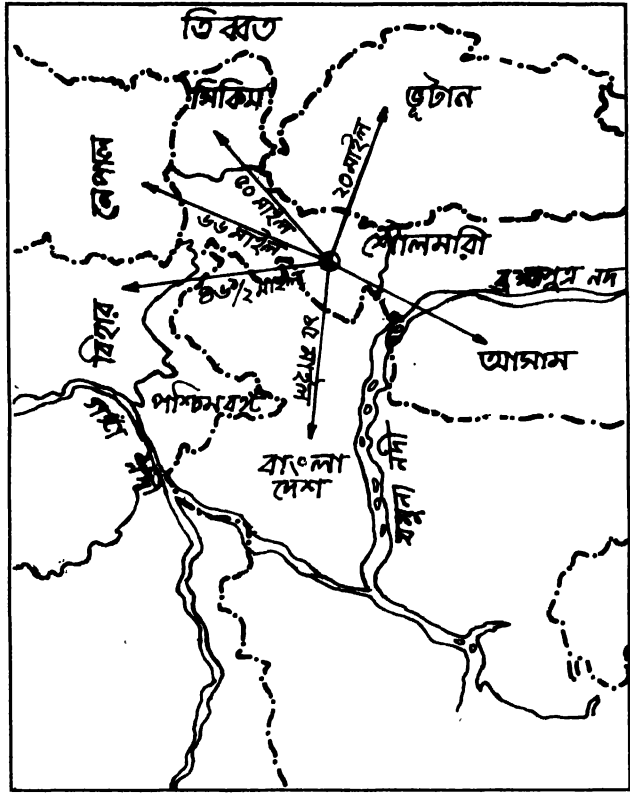
শৌলমারী আশ্রমের ভৌগলিক অবস্থান সহ মানচিত্র।

কলির ভগীরথ মেজর সত্য ভূষণ গুপ্তের
৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ সালের শৌলমারী পর্বের
ঐতিহাসিক ঘোষণা কালে একটি অনন্য সাধারণ
মূহুর্ত। যে মূহুর্তে তিনি ঘোষণা করেছিলেন —
"I am convinced, I met Netaji in the guise of Shrimat Saradanandaji at Shaulmari Ashram"
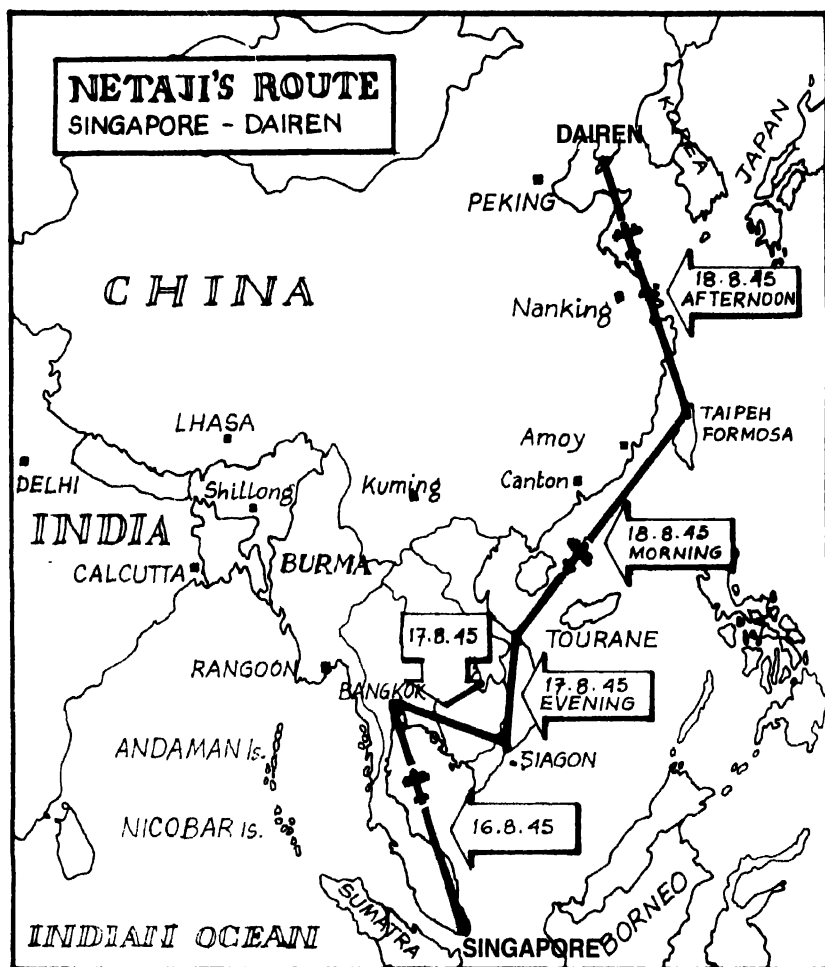
Netaji's Route map SINGAPORE to DAIREN.
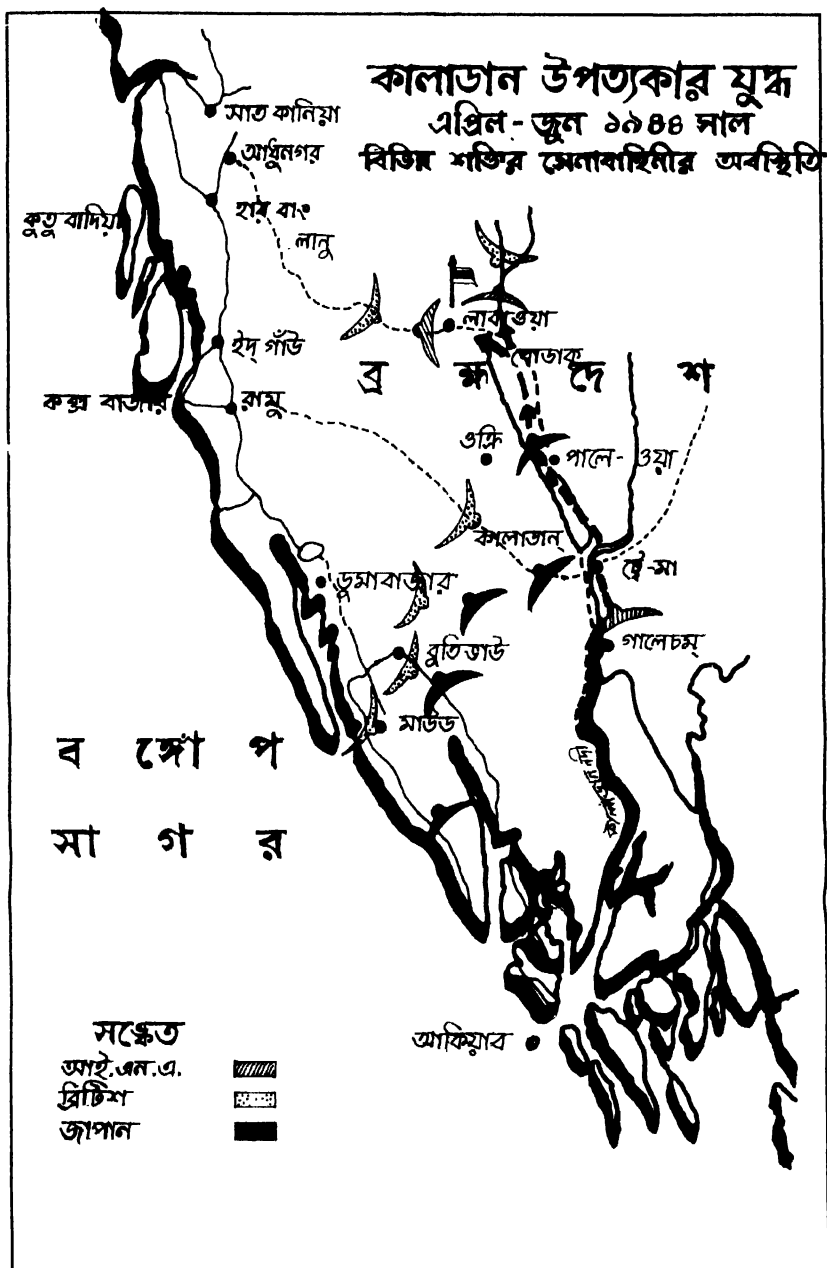
কালাডান উপত্যকায় যুদ্ধের অবস্থান মানচিত্রে প্রদর্শিত। .
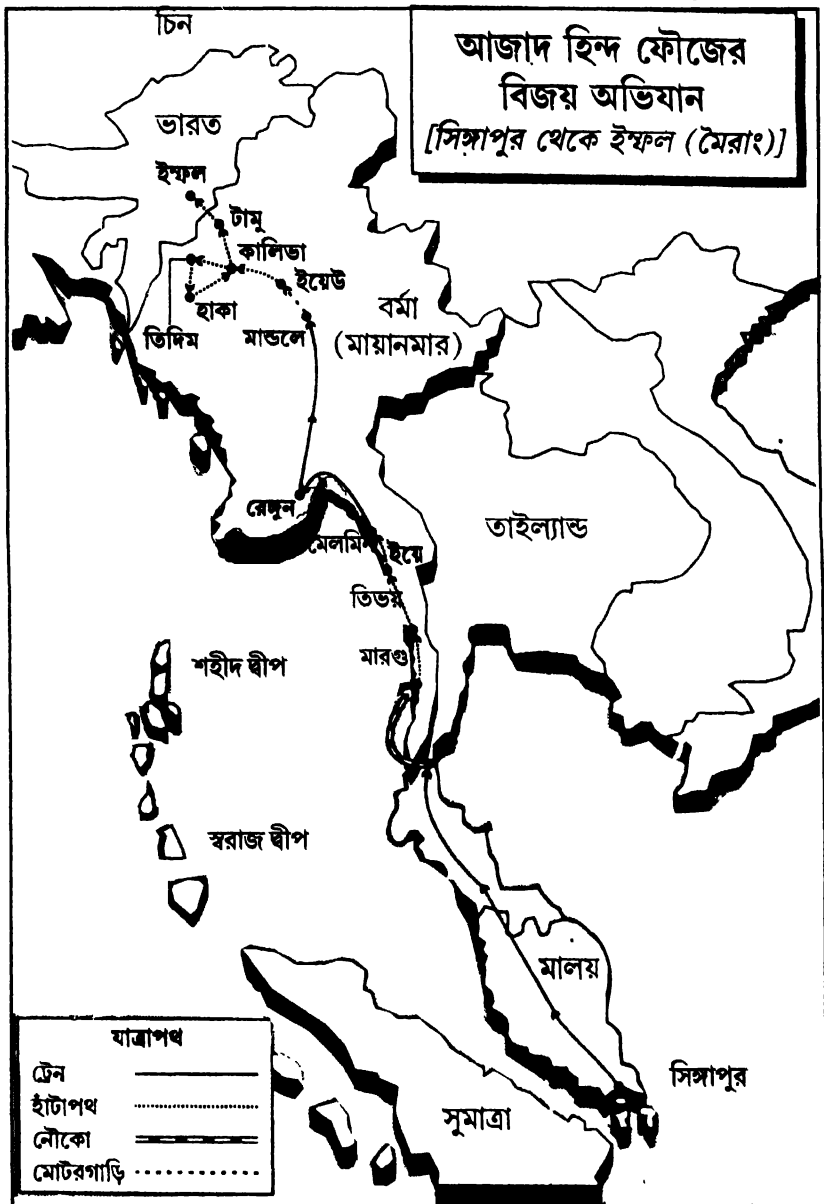
আজাদহিন্দ ফৌজের ইম্ফল অভিযানের মানচিত্র।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র জার্মান থেকে যে সাবমেরিনে যাত্রা করেছিলেন সেই সাবমেরিনের হুবহু ডায়গ্রাম। সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত। নং ইউ-১৮০, এবং জাপানী সাবমেরিনের নং ছিল – আই ঃ ২৯।

প্রথম অধ্যায়

ভারত পাকিস্তানের মানসিক মিলন প্রয়াসে ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বাস-ডিপ্লোমেসি ও তার পরিণতি এবং সমকালীন বিশ্বনায়কদের প্রতিক্রিয়া।

সম্প্রতি পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে গেল। গত ১২ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে। পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে পাক সেনাপ্রধান মোশারফ পারভেজ প্রথমে গৃহবন্দী ও পরে সামরিক কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। সেইমত তাঁর বিচার চলছে এখন। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই তাদের রাজনৈতিক দর্শন বলে যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে ভারত বৈরিতা। ভারত বৈরিতাই পাকিস্তানের রাজনৈতিক উত্থান পতনের মাপকাঠি। ভারত বৈরিতায় যে দল যত কট্টর হবে পাকিস্তানে তাঁরা সেইমত সাফল্যের মুখ দেখবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় থেকে আজ পর্যন্ত কোন পাক শাসকই ভারত বৈরিতাকে কিছুদিনের মত ছুটি দেননি। প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফও সেই ভূমিকা থেকে খুব দূরে ছিলেন না। কিন্তু বোধহয় অপেক্ষাকৃত কম ভারত বিদ্বেষী ছিলেন। তার একটি প্রমাণ, তিনি যখন গত যাত্রায় পাক-প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী তখনই তিনি পাক আমজনতার দরবারে ভারত পাকিস্তানের সৌভ্রাতৃত্বের আবেদন বা স্লোগান দিয়েছিলেন। যদিও তা রাজনৈতিক দৃষ্টিসঞ্জাত। তবুও বলতে হবে তার হাত ধরেই তো তিনি বিগত নির্বাচনে জয়মাল্যে ভূষিত হন। শুধু জয়ী নয়। পাকিস্তানের জন্মের পর এবারই প্রথম পাকিস্তানের কোন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে তিন-চতুর্থাংশ লোকের ভোটে জনগণের জনাদেশ পান। আর দ্বিতীয়ত তা না হলে অর্থাৎ তিনি যদি অপেক্ষাকৃত নরম না হতেন তবে লাহোর-দিল্লী আন্তর্জাতিক বাস ডিপ্লোমেসি সম্ভব হতো কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু শুধু যে দুই প্রধানমন্ত্রীরাই এই অসম্ভব ঘটনার একমাত্র কৃতিত্বের দাবীদার তা বোধহয় সত্য নয়। তবু ঐতিহাসিক এই মানসিক মিলন প্রচেষ্টাকে পাকিস্তানের কট্টর পন্থীরা কোনভাবেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। আর পাকসেনা বিভাগ তো এই সহমর্মিতা মানতে একবিন্দুও তৈরী ছিল না। তার সাক্ষ্য তারা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পাক সফরকালেই রেখেছিল। প্রোটকল অনুসারে এক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী অন্য রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সফরকালে সেই দেশের সেনাপ্রধানরা সাধারণতঃ গার্ড অব অনার দিয়ে রাষ্ট্রীয় সম্মান দিয়ে থাকেন। এটাই আন্তর্জাতিক প্রথা। এই ঘটনার সময় ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে যখন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপায়িজী লাহোরে বাসে করে গেলেন তখন পাকসেনা প্রধানরা এই

প্রোটকল ভঙ্গ করে তাদের কট্টর ভারত বৈরিতা অগ্রিম ঘোষণা করেই রেখেছিল। এবং তারপরই ক্রমে ভারত-পাক যুদ্ধ বা সীমান্ত সংঘর্ষের সূত্রপাত। এটা ছিল পাকনেতাদের ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর থেকে চতুর্থ পাক-ভারত যুদ্ধ।

এবার নওয়াজ শরিফের কিছুটা নরম মনোভাবের ফলেই হয়ত তাঁকে পাকিস্তানের গদি থেকে বিদায় নিতে হলো অতি নাটকীয় ভাবে। এই নাটক হয়ত বা সেখানেই শেষ হয়ে যেতো। এবং নওয়াজ শরিফের মৃত্যুপরোয়ানাও ঘোষিত হয়ে যেতো তাতে কিন্তু অবাকের কিছু নেই। এটাই পাকিস্তানের প্রচলিত ধারা। সেনা-প্রধান মোশারফ পারভেজ হয়ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে কোতল করে নিজেকে স্বঘোষিত সম্রাট বলে ঘোষণা করতেন। এবং সেই মোতাবেক যাবতীয় কর্মতৎপরতাও শুরু হয়ে যেতো। কিন্তু এই অভ্যুত্থানের কয়েকদিনের মধ্যেই আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো বিশেষ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন পাক-কর্তাদের জানিয়েছেন নওয়াজ শরিফ যেন ন্যায়বিচার পায়। এমন অবস্থায় পাক-বর্তমান কর্তৃপক্ষ যে বেশ ভালোরকম বেকায়দায় পড়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এরপর মোশারফ পারভেজ কি করেন তা ভবিতব্যই বলবে। ইতিমধ্যে অবশ্য নওয়াজ শরিফের যাবৎজীবন কারাদণ্ড এবং মুক্তিলাভ করে বিদেশে নির্বাসনও ঘটে গেছে।

এদিকে পৃথিবীর মানচিত্রের রং এবার যেন ক্রমেই কেমন কেমন ঠেকছে। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা যাক। বিগত পঞ্চাশ বছরে অর্থাৎ পাকিস্তান জন্মলাভ করার পর সিন্ধু, গঙ্গা, মিসিসিপি বা হোয়াংহো দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। এই পঞ্চাশ বছরে বিশ্বের যে নিয়ন্তা বলে পরিচিতি লাভ করেছে সেই মহাবলী আমেরিকা কদাচিৎ ভুলেও পাক-পরিপন্থী কোন কাজ করেছে বলে পরম শত্রুও নজির দেখাতে পারবে না। তাঁরা সর্বদাই ভারতকে কি করে বেকায়দায় ফেলা যায় বা কোন ঠাসা করা যায় এই পথ ধরেই হাঁটবার প্রচেষ্টা করেছে। এবং পাকিস্তানকে আশাতীতভাবে সাহায্য করে এসেছে। এমনকি ১৯৭১ সালে তৃতীয় পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আমেরিকার সপ্তম নৌবহর ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হয়েছে। ভারতকে ঘায়েল করার জন্য। কিন্তু তাদের ফিরে যেতে হয়েছিল শুধু হাতে। যদিও ভারতবাসী বা অধিকাংশ পৃথিবীই জ্ঞাত নয় এখনও যে এই মানবতার শত্রু তথা সপ্তম নৌ-বহর ভারত মহাসাগর থেকে শুধু শুধু ফিরে যায়নি। তাদের ফিরতে হয়েছিল ভারতের কোন মহান গুপ্তবিপ্লবী সংস্থার হাতে রীতিমত পঙ্গু বা ঘায়েল হয়ে। এই অঘটনের পর পৃথিবীবাসী কি আর কখনও শুনেছেন আমেরিকার সপ্তম নৌ-বহর নিয়ে আর কোন দেশকে এমন করে হুমকি দিতে? এছাড়া অতি সম্প্রতি ভারতবর্ষের পোখরান দুই এর ঘটনার প্রেক্ষাপটেও মহাশক্তিধর মার্কিন প্রশাসন ভারতকে যত প্রকার ধমক দেবার তা দিতে কসুর করেনি। শুধু তাই নয়, জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ সদস্যদেরও প্রভাবিত করে ভারতকে শায়েস্তা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। বর্তমান পৃথিবী যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের পর আজ সম্পূর্ণ এককেন্দ্রীক একথা আমরা সবাই জানি।

এই এককেন্দ্রীক সময়ে তো বটেই এমনকি ইতিপূর্বেও যখন সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্বের অপর বৃহৎ শক্তিরূপে অবস্থান করছিল তখনও পৃথিবীটা চলতো মার্কিন প্রশাসনের অঙ্গুলী হেলনে।

সেই ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পাক-ভারত সকল কর্মকাণ্ডে আমেরিকার ভূমিকা ছিল নরমে গরমে ভারত বিরোধিতা। কখনও পূর্ণাঙ্গভাবে, তো কখনও আংশিকভাবে। কাশ্মীর ইস্যুতে আমেরিকাকে ভারতের বিরুদ্ধে একবার নয় তিন-তিনবার রুশভেটোর সম্মুখীন হতে হয়েছে। কাজেই ইতিহাস বলছে ভারতবৈরিতা হচ্ছে আমেরিকার একটি স্বাভাবিক রীতি বা ধর্ম। শুধু তাই নয়, অতিসম্প্রতি এই বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে কার্গিল যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বেও এই আমেরিকার পররাষ্ট্র বিভাগ বলেছে কাশ্মীর সমস্যা হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। কাশ্মীর একটি স্বাধীন সার্বভৌম ভূ-ভাগ। এখানে ভারতের কোন অধিকার নেই। যদিও কাশ্মীরের তৎকালীন মহারাজা হরি সিংয়ের সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক চুক্তি মোতাবেক পাকিস্তান তথা পৃথিবীর কারো কিছু বলার এক্তিয়ার নেই। আমেরিকা কার্যত এতকাল বিপরীত মেরুপথেই হেঁটে এসেছে। এবং সেই সাথে পাকিস্তানকে তাদের সেরা বন্ধু ও অকৃত্রিম দোসর করেছে। এই সকল কর্মই কিন্তু আমেরিকার ভূমিকাটা কি বিশ্ববাসীকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছে।

এখানে অবশ্যই স্মরণীয় যে বৃটিশরা যখন তাদের ভারত সাম্রাজ্য ছেড়ে যায় তখন ঐ বৃটিশ কর্তাদের সাথে ভারতবর্ষের তৎকালীন কর্তৃপক্ষের যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যেকার বিধিব্যবস্থা অনুসারে ভারতীয় করদ রাজ্যগুলোর যে অধিকার স্থিরীকৃত হয়েছিল সেই অনুসারে সেই সেই রাজ্যের অধিপতিরা তাদের ইচ্ছানুসারে ভারতীয় ভূ-খণ্ডে বা পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রে যোগদান করতে পারতেন। এইরূপ একটা পরিস্থিতিতে কাশ্মীর রাজ্য পাক-অনুপ্রবেশকারী দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সঙ্কটময় আপতকালীন অবস্থায় সেখানকার মহারাজা হরি সিং ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের দ্বারস্থ হন। জওহরলাল ভারতীয় সেনা প্রেরণ করে যখন কাশ্মীর প্রায় সম্পূর্ণ বিজয়ের দ্বারদেশে তখন, তখনকার ভারতের গভর্ণর লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ঘৃণ্যচালে জওহরলাল কাশ্মীরে অস্ত্র সংবরণ করেন। এবং মাউন্টব্যাটেনের ঘৃণ্য কুমন্ত্রণায় তিনি জাতিপুঞ্জের দরবারে কাশ্মীর সমস্যার জন্য বিচারপ্রার্থী হন। এটাই ছিল ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধকে সামনে রেখে বৃটেন যে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চালটি জওহরলালের মাধ্যমে মাউন্টব্যাটেনের উপস্থিতিতে চালিয়েছিলেন তারই যে পরিণতি আজ কাশ্মীরের এই জটিল অবস্থা সেকথা সকলেরই জানা। বলাবাহুল্য আজকের বিশ্বে আমেরিকার যে ভূমিকা এটা বৃটেনের উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত। একথা বললে ভুল হবে না। এই আলোকেই আমেরিকার বর্তমান অবস্থান। নয়তো আজকের আমেরিকার স্থানাধিকারী ছিল গ্রেট-বৃটেন বা ইংরাজরাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমন্বয়বাদের মাধ্যমে বিশ্বে মানবিক যুগের স্বপ্ন ও তার রূপকার।

কিন্তু এবার লক্ষ্য করলে আমরা কি দেখছি, দেখছি কাশ্মীর রাজ্যের কার্গিল যুদ্ধের সমসাময়িক সময় থেকেই ঐ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একটু একটু করে বেসুরো গাইছিল। এখন শুধু বেসুরেই নয় একেবারে উল্টো সুরে কীর্তন শুরু করেছে। এটা কি খুব স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে? শুধু কি যুক্তরাষ্ট্রের উল্টো রথে যাত্রা? ওদিকে গোটা পশ্চিমী জগৎটাই তো আজ উল্টো পুরাণের পালা শুরু করেছে। বর্তমান বৃটেনও উল্টো সুরে সুর ধরেছে। শুধু উল্টো সুরই নয়। বৃটেন ও আমেরিকা পাক কর্তাদের জানিয়েছে যে কোন প্রকার ভারতবৈরিতাকেই তারা সহজে মেনে নেবে না। যদিও তাঁদের এই হুঁশিয়ারীর মাঝে কিছুটা কিন্তু কিন্তু একটা ভাব পরিলক্ষিত হয়। তবু বলতেই হয় ব্যাপারটা আসলে কি? লিগ অব নেশন থেকে সূত্রপাত করে আজকের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পর্যন্ত সবাই একসুরে একলয়ে ভারতের বিরুদ্ধেই এতকাল যাবৎ দোহারা দিয়ে এসেছে। অথচ আজ হঠাৎ দেখা যাচ্ছে তারা সকলে অন্য সুরে গলা মিলিয়ে চলেছে। ব্যাপারটা যত সহজ অঙ্কের ইকুয়েশন ভাবা হচ্ছে বস্তুতপক্ষে ব্যাপারটা কি ততই সহজ? হয়ত কেউ কেউ বলবেন এখানে ঐ সৌদিআরবীয় ধনকুবের মৌলবাদী ওসামা-বিন-লাদেনের প্রশ্নই প্রধান উপজীব্য। (হয়ত আপনি এও প্রশ্ন করতে পারেন অবশ্য যারা তার সম্পর্কে অবহিত নন তাদের কথা বলছি। আসুন লাদেনের সঙ্গে আমরা একটু পরিচিত হই। সম্প্রতিকালে সে হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তার স্বপ্ন নাকি সারাবিশ্বে শরিয়তি রাজপ্রতিষ্ঠা করা ও সমগ্র বিশ্বকে পদানত করা। তার এমনি সন্ত্রাসমূলক দাপট যে তার জন্মভূমি খাস সৌদিআরবেই তার স্থান নেই। যদিও সৌদিআরব একটি মৌলবাদী রাষ্ট্র বলে বিশ্বে পরিচিত।) বলা নিস্প্রয়োজন হয়ত বা এটাও একটা ফ্যাক্টর। কিন্তু তথাপি সেটাই কি এত বড় একটা যুগান্তরকারী সিদ্ধান্তের পশ্চাৎভূমি? ওসামা-বিন-লাদেন বলতে গেলে সম্প্রতি ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রায় যুদ্ধঘোষণা করে রেখেছে। তবু বলা চলে লাদেনের কর্মকাণ্ডে তো এতদিন পশ্চিমীজগৎ উল্টো স্রোতে সাঁতার কাটেনি। না, ব্যাপারটা যত সহজ ভাবা হচ্ছে আদপেই যে তা নয় তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান এই প্রতিবেদকের একান্ত দৃঢ়বিশ্বাস এর পিছনে নিশ্চয়ই তার চেয়ে অনেক বড় কার্যকারণ কাজ করছে, যা আমাদের সকলের বোধগম্যের বাইরে।

যাই হোক আজ বিশ্বের দিকে দিকে দৃষ্টির স্বচ্ছতা নিয়ে তাকালে একটা জিনিস

খুব পরিষ্কার ভাবেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে, তা হচ্ছে পৃথিবীর রাজনৈতিক আমূল রূপ বদল। এই রূপ বদল খুব তড়িত গতিতেই ঘটছে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে পৃথিবীর জন্ম বা মানব সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই এই পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু এবারের পরিবর্তনের মধ্যে তাৎপর্য অনেক, এবং তা অনেক লক্ষণীয়ও বটে। অতি-সম্প্রতি যে পৃথিবীব্যাপী বিশ্বায়ন চলছে তার সঙ্গে ঐ পরিবর্তনের যেন কোথায় একটা গোপন যোগসূত্র রয়েছে। এটা বুঝতে হলে আমাদের একটু পিছন ফিরে ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে। চলে যেতে হবে আজ থেকে শতবর্ষ পিছনে সেই ১৮৯৩ সালের ঐতিহাসিক শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে। ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আজকের পৃথিবীর দিকদিশারী জগৎবরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন সেইদিন সেই মহাবিশ্ব ধর্মসম্মেলনের সেরাতম বক্তা তথা সেরাতম আকর্ষণ। সেইদিন থেকে তিনি জগতময় এক নবজাগরণ এনেছিলেন। ঐ নবজাগরণের নামই আজ "রামকৃষ্ণভাব আন্দোলন"। তিনি ঐ নবজাগরণের বাণী দিতে গিয়ে যে কয়টি কথা ঐ প্রসঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন তা আজও সমগ্রবিশ্বের কাছে অমূল্য সম্পদ। এবং আজও সেই সম্পদই পৃথিবীর নিকট অমরপাথেয়। তাই বলতেই হয় কাব্যের ভাষায়।

পুরুযোত্তম বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিল বিশ্বে বিশ্ববাণী
চরণ তাঁর আজিও তাই স্মরিছে বিশ্ব দূরিতে গ্লানি।
মুক্ত করিতে বিশ্বকালিমা ধায়িল সে ধরণীতে কতনা,
জয়ধ্বনি উঠিছে আজও তাইনা তাঁর দিগন্ত অনুরণি।
জাগাতে গিয়ে সবার বিবেক, বিবেক হলো বিশ্ববিবেক
বজ্রনির্ঘোষে প্রচারিল তাইতো তাঁর অমর অমোঘ বাণী।
ভেদ-গ্লানি-ক্লেদ-চূর্ণ করি সব অশনিসংকেত হানাহানি
দাওরে ভাই দাও পূরব-পশ্চিম মিলিত কণ্ঠে মানুষের জয়ধ্বনি।

তিনি সেদিন বিশ্বভ্রাতৃত্বের এবং ঐক্যবিশ্ব গড়ার জন্য তাঁর অমূল্য বাণী দিয়েছিলেন। এবং মানুষে মানুষে তথা পূর্বপশ্চিমের মিলনের ডাক দিয়েছিলেন। সেই বাণীর মাঝেই আজকের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর বাঁচার পথ লুকিয়ে আছে। স্বামীজীর ঐ মহান বাণীর জন্য আজও পৃথিবী স্বামী বিবেকানন্দের নামে উদ্বেলিত হয়। তাঁর সেই সুমহান বাণী দিতে গিয়ে যে কয়টি কথা উচ্চারণ করেছিলেন তার সূচনা করেছিলেন এই বলে, "হে আমার আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ....."। এই ছিল স্বামীজীর সম্বোধন। এই বাণী উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক অনাহুত অতিথি হয়েও ঐ সম্মেলনে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম তথা রাজকীয় সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। তার কারণ, সেদিনের উপস্থিত সব মহামান্য ব্যক্তিরা বুঝেছিলেন ও উপলব্ধি করেছিলেন এই হচ্ছে মহাসাম্য, বিশ্বসাম্যের কথা তথা বিশ্ব-আত্মার কথা। এই হচ্ছে মহাসমন্বয়ের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের বিশ্বের কথা। আত্মকলহ জর্জরিত বিশ্বের পরিত্রাণের মহা হুঁকার ধ্বনি। এই বাণী কোন তথাকথিত সাধারণ ব্যাপার নয়। এই হবে আগামীদিনের বিশ্বের

চলার পথের পাথেয় বীজমন্ত্র। এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সেই সুমহান বাণীটি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য ও তাৎপর্যময়।

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্যনিঠুর দ্বন্দ্ব;
ঘোর কুটিল পন্থ তার; লোভ জটিলবন্ধ॥
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী—
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃত বাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চির মধু নিষ্যন্দ।
শান্তহে, মুক্তহে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন, ধরনীতল কর কলঙ্কশূন্য".....॥

এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব বা 'বসুধৈব কুটুম্বকম'—মন্ত্রে যদি বিশ্ব চলার পথ খোঁজে তবে পৃথিবী যে বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে একদিন স্বামীজীর স্বপ্নের বিশ্বে পরিণত হবে তাতে সন্দেহ নেই। বলাবাহুল্য এই বাণী বা মন্ত্রের সার্থক রূপায়ণ বা এই সমন্বয়ের ফসল আমরা হাতে কলমে পেয়েছিলাম ব্রহ্মরণাঙ্গনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদী ফৌজের ভূমিকায়। যার কোন বিকল্প পৃথিবী ব্যাপী নজির আজও দ্বিতীয়টি নেই। স্বামীজীর এই মহাসাম্যের মহারূপকার তাই স্বাভাবিক ভাবেই হচ্ছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। যিনি আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রবাহেরই অপর নাম। তাই তিনি বলেছেন, "স্বামী বিবেকানন্দ বেঁচে থাকলে তিনিই হতেন আমার গুরুদেব। এবং স্বামীজীর চরণতীর্থ পদাম্বুজেই আমি আশ্রয় নিতুম।" এই মহান তিনজনের কর্মধারা অনুধাবন করলে বলতেই হয় যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যদি বীজ তবে স্বামীজী হলেন সেই বীজজাত বটবৃক্ষ আর নেতাজী সুভাষ হচ্ছেন সেই বৃক্ষের সুশীতল ছায়া অর্থাৎ পরিণতি ফসল। তাই সুভাষচন্দ্রই হচ্ছেন আগামী যুগের মানবিক তথা অধ্যাত্মবাদের সমন্বয়ের নতুন বিশ্বের রূপকার। কাজেই বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত স্বামীজীর বাণীই যে সুভাষচন্দ্র আত্মস্থ করবেন বা করেছেন এবং সেই কর্মের বিজয় বৈজয়ন্তীর ধারক ও বাহক তা বলাই বাহুল্য। এর জন্য কোন গবেষণার প্রয়োজন হয় না। এই আলোকে স্বামী চণ্ডীকানন্দের একটি গানের কথা মনে পড়ছে যা এখানে খুবই সার্থকভাবে সুপ্রযোজ্য। যথা,

বীর সেনাপতি বিবেকানন্দ
ঐযে ডাকিছে আয়রে আয়।
আহ্বানে তাঁর আপনা ভুলিয়া
কত মহারথী ছুটিয়া যায়॥
আত্মত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে
দীক্ষিত হয়ে নবীনতন্ত্রে
ভোগবাদ জাত দৈত্যদলিতে
আপনা সঁপিতে কে যাবি আয়॥

স্বার্থদ্বন্দ্ব ঘোর কোলাহল
এনেছে জগতে শুধু হলাহল,
নেভাতে আজিকে এই দাবানল
প্রেমবারি সে যে এনেছে হায়।
এসো দেব এসো করুণা নিধান
লহো আজি মম তনু-মন-প্রাণ।
কৃপা করি কর এ আশিস দান
তব কাজে যেন জীবন যায়।।

স্বামী চণ্ডীকানন্দের এই স্বামী বিবেকানন্দ বন্দনার মধ্যে আমরা যাঁকে আত্মবিলোপন হতে দেখি তিনি হচ্ছেন আজকের বিশ্বে আর এক বিশ্ববরেণ্য বিশ্বমানব বেদীমূলে আত্মনিবেদিত মহানপ্রাণ নেতাজী সুভাষ বা শ্রীমদ্ সারদানন্দজী। এই অনুধ্যানের জন্যই আমাদের পিছন ফিরে দেখা। পিছনে তাকাতে গিয়ে আমরা স্বামীজী প্রদত্ত মন্ত্র পেলাম। আর সাথে সাথে ঐ মন্ত্রের রূপদানের জন্য এক অনন্য রূপকার মন্ত্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রী পুরোহিতকেও পেলাম। আমরা এমনি একজন ঋত্বিককে খুঁজছিলাম, যিনি নাকি সমগ্র বিশ্বসত্তাকে আপন শৌর্যে উদ্বেলিত করে সঠিক দিশায় পরিচালনা করতে পারেন। এমন ব্যক্তিত্বের সন্ধান কল্প কথার ঝুলিতে পাওয়া গেলেও এই মাটির কঠিন বাস্তব ভূমিতে পাবার কথা নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটি এমনই উপাদানে সঞ্জাত যে এখানে পৃথিবীর সবতো বটেই এমনকি যা এই পৃথিবীতেই দুর্লভ তাও ভারতবর্ষের মাটিতে পাওয়া যায়। এবং একথা যথার্থ বলেই আমরা স্বামীজী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত দুর্লভ রত্নের গর্বে গর্বিত হতে পারছি। সুভাষচন্দ্রই যে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উত্তরসূরী এক অগ্নিহোত্রী, নীলকণ্ঠ তার ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। বিশ্ববিপ্লব যজ্ঞের পুরোহিত তাই স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয় যোগমার্গের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। শুধু তাই নয়। এমন যিনি হবেন তাঁকে সকল ক্ষেত্রেই হতে হবে যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী তেমনি হতে হবে সংঘটক ও জনসংযোজক রূপেও বিশ্বসেরা। পৃথিবীব্যাপী যাঁদের কর্মকাণ্ড পরিব্যাপ্ত আছে অসীম ও অসামান্য তেমন নামটি যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তা বোধহয় ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এই আলোর নিরিখে একটু আলোচনা করলেই সব ছবির মত স্বচ্ছ হয়ে আপনি প্রতিভাত হবে। পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র অসম্ভবের মহানায়ক বা স্বর্গীয় মহাপুরুষ। তিনি যে অসম্ভবের অদ্বিতীয় মহানায়ক তার তথ্যপ্রমাণ পৃথিবীর সর্বাঙ্গে আনাচে কানাচে ভূঁরি ভূঁরি বিরাজমান। যা আমরা নিজেরাই শুনলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। আমরা ক্রমে সেই পর্যায়ে যাবো এবং দেখতে পাবো তাঁর কী অবিস্মরণীয় সুবিশাল অবদান। যা নাকি মানব সভ্যতার ঊষা থেকে আজ পর্যন্ত অদ্বিতীয়।

তৃতীয় অধ্যায়

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের চোখে স্ট্যালিন, মাও-সে-তুং, তোজো, হিটলার'রা ভয়ের কারণ না নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু? সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের কেন গোপনে সন্ধিপ্রস্তাব নেতাজী সুভাষের কাছে? সুভাষচন্দ্র কি শুধু ভারতবর্ষের প্রবাদপুরুষ? গান্ধীজীর চোখে নেতাজীর রূপ কি? সুভাষচন্দ্রের উপর গান্ধীজী ভরসা না করে জওহরলালকে কেন বেছে নিলেন? এবং তার পরিণতিই বা কী?

ভুললে চলবে না যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নায়করাও তাঁর সঙ্গে গোপন আঁতাতে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। যখন নেতাজী সুভাষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অন্তে সোভিয়েত দেশে আত্মগোপন করে ছিলেন, তখন বিশ্বশক্তিগোষ্ঠী নেতাজী সুভাষের কাছে যে প্রস্তাব রেখেছিলেন তা আজ শুধু গবেষকদের গবেষণাগারেই শোভাবর্ধন করছে না! তা আজ দিবালোকের মত যেমন পরিষ্কার তেমনই সত্য। বিশ্বশক্তিজোটের প্রস্তাব ছিল যে,—"তুমি তোমার ভারতবর্ষকে নিয়ে চুপ থাকলে এবং অবশিষ্ট পৃথিবীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বা দৃষ্টি না দিলে, এই মুহূর্তেই আমরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যবো"।—বলুনতো এটা কি সন্ধি প্রস্তাব নয়? সন্ধি হয় সাধারণতঃ সমানে সমানে। কিন্তু এক্ষেত্রে কি দেখছি। দেখছি, একজন প্রায় বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশের অধীশ্বর, অন্যদিকে অপরজন হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যাঁর না আছে রাজ্য, রাজ্যপাট, এমনকি ঘরদোর পর্যন্ত নেই। কৈলাসপতি শিবের মত ভস্মাবৃত শ্মশানচারী আজীবন আকাশ তলায় বিচরণশীল এক ফকির। এমন ব্যক্তির কাছে বিশ্বশক্তিজোট কেন এমন উদ্ভট প্রস্তাব পাঠাবে? কাজেই এ থেকেই বুঝতে কি এতটুকু অসুবিধা আছে যে তিনি শুধু ভারতবর্ষের ভাবনায় ভাবিত ছিলেন না এবং আজও নয়। তাঁর এই বিশ্বভাবনা সেইদিন থেকেই। বিশ্বের সকল অবহেলিত মানব সম্প্রদায়কে নিয়েই তাঁর ভাবনা। তাছাড়া একটি অতি স্বাভাবিক প্রশ্ন এখানে মনে আসবে সবারই। তা হচ্ছে বিশ্বশক্তিজোট গোপনে কেন এই সন্ধির জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল? উত্তরটাও তাই স্বাভাবিক। এমন প্রতাপান্বিত শক্তি কি করে একটিমাত্র ব্যক্তির কাছে যিনি নাকি আবার রাজ্য রাজ্যপাট ছাড়াই বৃটিশ আমেরিকার ঘোষিত শত্রু তাঁর কাছে প্রকাশ্যে নতিস্বীকার করে, তাই না? তাতে তাঁদের মর্য্যাদা ধুলোয় লুটাবে এই ভয়ে নয় কি? এই ছিলেন সুভাষচন্দ্র

বসু, যাঁর ভয়ে বিশ্বপ্রতাপ ইংরেজ অধিশ্বরও জড়সড়। এই বৃটিশ আমেরিকা সুভাষ বোসের নামে কতখানি ভীত ছিল তা মিত্রশক্তির সেনাপ্রধান জেনারেল ম্যাক আর্থার উক্তিতেই শোনা যাক। ম্যাক আর্থার পরবর্তীকালে বলেছিলেন, ..."WE are not afraid of Stalin or any other leaders of the world but we are afraid of Netaji Bose the future emancipator of the coloured races of the world....." (—Mac. Aurther, C-in-c, U.S.A., Army Gen. H. Q. Tokyo, File No. 273 Govt. of India).

সুভাষচন্দ্র যে মানবজাতির মুক্তির দূত ছিলেন তার উদাহরণ স্বরূপ এখানে দুই-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যা নাকি খুবই প্রাসঙ্গিক ও খুব সুপ্রযোজ্যও বটে। যেমন মালয়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কুআবদুলরহমান তাঁর জীবনীতে একস্থানে বলেছিলেন যে, "নেতাজী সুভাষচন্দ্রই আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব দেশগুলোকে আজকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নতুবা আমাদের মত দেশগুলো চিরদিনই ছিল পৃথিবীতে অবহেলার শিকার।"—*(স্বামী আনন্দ ভারতী মহারাজ, বক্তৃতামালা)*

এই শৌর্য্যবীর সুভাষচন্দ্রের কাহিনী পৃথিবীর আনাচে কানাচে বহু ছড়িয়ে আছে। এই শৌর্য্যবীরের কাহিনী শুধু শতাব্দীর প্রবাদপুরুষ বা প্রবাদ কাহিনীকে ম্লান করেনি, ম্লান করেছে মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত প্রকার প্রবাদ কাহিনীকেও। সুতরাং তিনি শুধু প্রচলিত শতাব্দী বা সহস্রাব্দের প্রবাদপুরুষ নয়। তিনি বিগত, বর্তমান এবং আগত মহাকালেরও হবেন প্রবাদপুরুষ তথা রোমাঞ্চের অদ্বিতীয় মহানায়ক যা বিশ্বকোষের ভাষায়ও ব্যক্ত করার ভাষা পাওয়া অসম্ভব। যুক্তির খাতিরে এখানে বলতেই হয়, নইলে কি বিশ্বত্রাসি হিটলার হতে স্তালিন, মাও-সে-তুং সকলে তাঁকে অভূতপূর্ব শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনে আসীন করেন, না প্রায় সমগ্র বিশ্বের অধীশ্বর বৃটেন-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁর কাছে গোপনে সন্ধির প্রস্তাব দিতে পারেন? এর চেয়ে বড় যুক্তি আর কি হতে পারে? এসব তো বিশাল বিশাল ঘটনা। ছোট ছোট ঘটনারও অভাব নেই। এমন একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়। যথা, ১৯/০৯/৭০ সালে যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। খবরে প্রকাশ যে, ইরাকের মরুপ্রান্তরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দুই বৃটিশ সামরিক অফিসারের সঙ্গে অজিততারণ নামক এক বাঙ্গালী সমর অফিসার এক আরব বেদুইন গ্রামে বেড়াতে যায়। সেখানে তারা খুবই সমাদৃত হলো। কিন্তু আকস্মিক এক ঘটনায় তারা হলো প্রাণান্তকর। তাদের মধ্যে এক ইংরেজ সামরিক সাহেব পকেট থেকে ক্যামেরা বের করে ছবি ওঠায় বেদুইনদের। এই ঘটনায় বেদুইনরা ঐ তিনজনকে কোতল করার জোগাড় করল। তলোয়াল বের করে জবাই করার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ। এমন একটা অবস্থায় তারা প্রাণে বাঁচার জন্য মহাত্মাগান্ধী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ এমনি আরও কত নাম স্মরণ করল। কিন্তু বেদুইনরা নাছোড়। কিছুতেই কিছু হলোনা। শেষে নেতাজীর নাম করাতে তারা বেদুইনদের কবল থেকে পরিত্রাণ পায়। এবং প্রাণ

নিয়ে ফিরে। বেদুইনদের রাগের কারণ ওরা কখনও ছবি তুলতে দেয় না। এটা তাদের কাছে খুবই গর্হিত কাজ। তাই বলছিলাম যে সুভাষ বসু নামের এমনি মাহাত্ম্য বা যাদু, যে যাদুতে আরব দেশের মরুর বুকেও মরুদ্যান সৃষ্টি করতে পারে। অথচ ঐ আরবীয় গণ্ডগ্রামের লোকেরাও কেন মোহিত সেই নামে? শুধু কি তাই, যে বৃটিশ ও বাঙ্গালী অফিসাররা সুভাষচন্দ্রের শত্রু শিবিরের লোক তারা পর্যন্ত সেই নামের মহিমায় পরিত্রাণ পায় শত্রুর কবল থেকে। এ যেন সেই প্রহ্লাদের হরিনাম! এই সব ঘটনাতেই প্রমাণিত যে বিশ্বশক্তির ধারক ও বাহকের নায়করা আপনার আমার চোখের পর্দায় নেতাজী সুভাষকে দেখেননি। সেদিনও না এবং আজও নয়। তাঁদের বিচারে সুভাষচন্দ্র শুধু একজন নশ্বর ব্যক্তি নয়। তিনি হচ্ছেন একটি অখণ্ড মহাশক্তি। বলাবাহুল্য তিনি জন্মাবধিই এই শক্তির আধার। এই আলোকে সুভাষ জীবনের একটি ক্ষুদ্রচিত্র এখানে অবশ্যই বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি যখন মাত্র অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ তখন সদগুরুর সন্ধানে ভারতবর্ষের বহু তীর্থ ভ্রমণ করে বেনারসে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎকার ঘটে। স্বামী ব্রহ্মানন্দই তাঁকে গৃহে ফিরতে বলেন। আরও বলেন যে, তোমার জন্য এপথ নয়। তোমার জন্য অপেক্ষা করছে গোটাদেশ, গোটাবিশ্ব। আজ পরবর্তীকালে আমরা কি দেখছি? স্বামী ব্রহ্মানন্দের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত, যেন বেদবাক্যের প্রতিফলন! তারপরও কি আর ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে তিনি কত বড় শক্তির আধার?

আসুন এবার তাঁর অন্যান্য কিছু কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ করে দেখি, তা কিরূপ এবং কতখানি পরিব্যপ্ত আছে। অনেকেই অবগত আছেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মস্তিষ্কের দ্বারা পরিচালিত হয়েই এক সময়ের পরাধীন ভিয়েতনাম, ফ্রান্স ও আমেরিকার কবলমুক্ত হয়েছিল। এর সত্যাসত্য স্বীকার করেছেন ১৯৬৫ সালে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজার্স। এই সম্পর্কে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডিও পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন তার যথার্থতা সম্পর্কে। এস. এম. গোস্বামী একজন প্রাক্তন সরকারী আমলা ও সমরকর্মী, তিনি একসময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এন্টিকরাপ্শন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ছিলেন। তাঁর প্রদত্ত বয়ান থেকে আমরা প্রেসিডেন্ট কেনেডির স্বীকারোক্তিতে জানতে পারি যে, "Netaji was at Hanoi till 1953. His men fought Americans there. That was the significance of Robert Kennedy's statement that a superior force was fighting behind the Vietcong." এই উক্তিতে প্রমাণিত হচ্ছে যে সুভাষচন্দ্রের এইসব বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডের যথেষ্ট প্রমাণ ভুক্তভোগী ফ্রান্স ও আমেরিকার হাতে রয়েছে। এছাড়া গণচীনের মুক্তিযুদ্ধেও স্বয়ং মাও-সে-তুং নেতাজীর সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তৎকালীন চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর ঐ প্যারিস টি. ভি. সাক্ষাৎকারই তার সত্যতার প্রমাণ বহন করছে। নেতাজী যে সে সময় চীনে অবস্থান করে চীনা নেতাদের ব্যাপক সাহায্য করেছেন তা এ পুস্তকে প্রদত্ত ছবিগুলোই যথেষ্ট প্রমাণ। এখানে স্মরণীয় যে বেশ কয়েক বছর

পূর্বে বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান কলিকাতায় এসেছিলেন। তখন তিনি এক সাক্ষাৎকারে সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে নেতাজী সুভাষ বসু সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমাদের সব মূল্যায়নই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান প্রতিবেদক পাঠকদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। কারণ এই প্রতিবেদক উক্ত তথ্যের বিস্তারিত তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণের অভাবে যথাযথ দিতে না পারার জন্য। তবে ঘটনাটি কিন্তু সত্য। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এইসব সত্যাসত্যের গভীরতা বুঝতে হলে বৃটিশকর্তা লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ও জেনারেল ম্যাক আর্থারের স্বীকার উক্তিগুলো কি ছিল আসুন তা একটু দেখা যাক। সেই উক্তিতে লর্ড বলেছেন, "He has escaped again". (Statesman—1962). ১৯৬২ সালে এই ছিল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের প্রতিক্রিয়া। স্মরণীয় এই মাউন্ট ব্যাটেনই ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বশেষ ভাইসরয় বা ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজপ্রতিনিধি। এবং তিনিই হচ্ছেন ভারতবর্ষ বিভাজন যজ্ঞের ও হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গা তথা কাশ্মীর সমস্যার জনক। পরবর্তীকালে নিয়তি তাকে যথার্থই শাস্তি দিয়েছিলেন। আইরিশ বিপ্লবীদের হাতে তিনি ইংলিশ চ্যানেলে প্রমোদ ভ্রমণের সময় প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা নিহত হন। আর জেনারেল ম্যাক আর্থার বলেছিলেন, ".....If Chandra Bose comes again we will lose the whole of Asia. ....We are not afraid of Stalin or any other leaders of the world but we are afraid of Netaji Bose the future emancipator of the coloured races of the world."

এমন উক্তি যাঁর সম্পর্কে তিনি যে কোন সাধারণ ব্যক্তি নয় তা সহজেই অনুমেয়। এহেন ব্যক্তি নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে হাতের মুঠোয় পেয়েও কিন্তু হত্যা করতে পারেননি। এই ঘটনা বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে কোরিয়ার রণাঙ্গনে ১৯৫৩ সালে ঘটেছিল। আসুন তৎকালে পত্রপত্রিকায় কি তথ্য পাওয়া যায় একটু পরখ করে দেখা যাক। মিঃ এস. এম. গোস্বামীর কাছ থেকেই আসুন শুনি,

Mr. S. M. Goswami said that. "Lt. General Thimayya told witness in New Delhi soon after the Korean war that he had seen Netaji on the 38th parallel. The General further said that the General Mac Arthur had also spotted out Netaji and intended to shoot him. Having failed in his attempt. sought President Truman's permission to bomb the area. Truman immediately dismissed the five star General Mac.Arthur and re-called him. (Hindustan Standard.)

উপরের তথ্যাবলী পর্যালোচনা করলে কি পাই এবার সেটা একটু দেখা যাক। উল্লেখ্য জেনারেল ম্যাক আর্থার ছিলেন তৎকালীন বিশ্ব শক্তিজোটের সামরিক বিভাগের দক্ষিণ এশিয়ার সমরপ্রধান। ঘটনাচক্রে তিনিই আবার ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সৈন্যাধক্ষ্য। ভাবা যায় এমন সমরবিদ সমরবিশারদেরও চোখের সামনে নেতাজী উপস্থিত হয়ে তাঁর অভীপ্সিত কর্ম করে ঐ সমরনায়ককে ঘোল খাইয়ে চলে

যেতে পারেন। জেনারেল ম্যাক আর্থার কোন সাধারণ যুদ্ধের মামুলি সমরনায়ক নন। বিশ্বশক্তিজোটের একজন প্রধান সামরিক কর্তা। এমন একজন ব্যক্তি কিনা নেতাজীর কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। শুধু ব্যর্থ বললে ভুল হবে। কারণ এত বিশাল কর্মকাণ্ডের নায়ক হয়েও ম্যাক আর্থার চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রকে হত্যা করতে, ঐ সমগ্র অঞ্চলটিকে বোমা মেরে ধ্বংস করে দিয়ে। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে জাপানে যে দুটি এ্যাটম বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল তা সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্যবস্তু করেই। এর পেছনে যুক্তি একটাই ঐ বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল, না কোন শিল্প শহরে, না ঘন জনবসতি অঞ্চলে। টোকিও শহরে হলেও বোঝা যেতো যে শত্রু জাপানকে চিরতরে পঙ্গু করার জন্যই তা করা হয়েছে। কার্যত তাও নয়। তবে বোমা মারার উদ্দেশ্য কি? যার কোন সঠিক উত্তর আজও ঐতিহাসিকরা উদ্ধার করতে পারেননি। কিন্তু কথিত আছে ঐ দুইস্থানে সুভাষচন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কে মিত্রগোষ্ঠীর কর্তাদের কাছে খবর ছিল। স্মরণীয় যে সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্যবস্তু করেই যে এ্যাটম বোমা নিক্ষেপণ এ সম্পর্কে "ভগবৎ দর্শন" পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ১৯৮২ তে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তাতে ঐ তথ্যই সত্য প্রমাণিত। ভগবৎ দর্শন পত্রিকার ভাষায়ই আসুন ব্যাপারটা শোনা যাক—

যথা, "বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি ভারতবর্ষ করতল গত ক'রে রাখার জন্য ইংরেজরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল। শোনা যায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জাপানের হিরোশিমায় আছে ব'লে সংবাদ পেয়ে আধুনিক যুগের সব চাইতে বড় অসুর উইনস্টন চার্চিল তাঁকে হত্যা করে ভারতবর্ষের উপর বৃটিশ আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ফ্রাঙ্কলিন ডেলেনো রুজভেল্টকে হিরোশিমার উপর এ্যাটম বোমা ফেলতে রাজী করায়। হিরোশিমায় বোমা ফেলার পর চার্চিল জানতে পারেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আসলে তখন নাগাসাকিতে। তাই আবার আরেকটি বোমা ফেলা হয় নাগাসাকিতে।"

এই তথ্য যথার্থ কি না? এই প্রশ্নের উত্তর পাবার চেষ্টা করলে এবং আরও একটু অনুশীলন করলে আমরা কি পেতে পারি। আসুন তা একটু দেখা যাক। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বৃটিশ আমেরিকান নায়কদের উক্তি ছিল, "If Chandra Bose comes again we will lose the whole of Asia".....we are not afraid of Stalin or any other leaders of the world....." ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এমন একটি ভাষ্য তাঁরা দিলেন কি ভিত্তিতে। তাঁরা তো ত্রিকালদর্শী যোগমার্গীর নয়। তবে তাঁরা সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ চিত্রটা কোন যাদুবলে প্রত্যক্ষ করলেন? বলাবাহুল্য যখন তাঁরা এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করেও একটি রক্তমাংসের দেহ ভেদ করতে পারল না বা সুভাষচন্দ্রকে বিনাশ করতে ব্যর্থ হলো তখনই তাদের পক্ষে ঐ জাতিয় ভাষ্য বা prediction সম্ভব হয়েছিল। স্মরণীয় যে সুভাষচন্দ্র, যুদ্ধ চলাকালীন তাঁর সেনানীদের কোন এক পরিস্থিতিতে বলেছিলেন বৃটিশ এমন কোন অস্ত্র তৈরী বা সৃষ্টি করতে পারেনি যা দিয়ে তোমাদের নেতাজীর দেহ ভেদ করতে পারে। এছাড়া ১৯১৫ সালে বলেছিলেন যখন মাত্র তিনি ১৮ বছরের যুবক সুভাষ।

"I must be prophet of the future. I must discover the laws of progress. The tendency both the civilisation and there form to settle the future goal and progress of mankind. The philososphy of life will alone help me in this ideal must be realised through a nation begin with India." —Subhas Chandra 1915, 31st August

এবার ভেবে দেখুন সুভাষচন্দ্রের মুখের কথার বা তাঁর বাণীর মূল্য কতখানি বা কোন জগতের। এতো সুভাষচন্দ্রের বাণী নয়। যেন স্বয়ম্ভুর মুখ নিঃসৃত বাণী। এ্যাটম বোমা যাঁর দেহ ভেদ করতে অক্ষম সে কে? এরপরও কি বলার অপেক্ষা রাখে? তিনি যে মানব দেহধারী স্বয়ম্ভুর প্রেরিত প্রতিভূ? সুভাষচন্দ্র তাঁদের দৃষ্টিতে কত বড় শত্রু ছিল তা মিত্রগোষ্ঠীর কর্তাদের বয়ানেই আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। জাপানের জেনারেল তেজো বা স্তালিন ছিলেন সুভাষচন্দ্রের চেয়ে নগন্য তা তাঁরা নিজেরাই বলেছেন। এই হচ্ছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁকেই আমরা একঝলক একপলক না দেখে না বুঝে যেন মনে হয় তাঁর সমস্ত ব্যাপারগুলো, তাঁর সমস্ত দর্শন, অতি পণ্ডিতের দল হজম করে বসে আছি। যে তত্ত্ব বুঝতে পৃথিবীর তাবড় তাবড় কূটনৈতিক বিশারদরা প্রতি পদে পদে সেই ১৯৪১ সাল বা তারও পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত নাকানি চোবানি খাচ্ছে তেমন এক মহামহিম জিতেন্দ্রিয় সিংহ পুরুষকে আমরা এককথায় যেন উদরস্থ করে ফেলেছি। এমন একটা ভাব আমরা হাটে ঘাটে মাঠে সর্বক্ষণ দেখাচ্ছি। শুধু এখানেই শেষ নয়। ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে বা সুদূর হিমালয় অঞ্চলেও যেসব সাধুসন্ত বা জিতেন্দ্রিয় যোগীরা আজও আছেন তাঁদের দাবী তাঁরা সকলেই নেতাজীর অনুরাগী ও অনুগামী। তাঁরা ভুলে কখনও দাবী করেন না যে তাঁরা নেতাজীকে সম্পূর্ণভাবে হৃদঙ্গম করেছেন বা তাঁরা নেতাজী বিশারদ হয়ে বসেছেন। এমনকি পৃথিবীর দিকপাল মহামহানায়করাও এই জাতীয় বাক্য ভুলেও দাবীতো পরের কথা উচ্চারণ পর্যন্ত করেন না।

এবার আমরা ছেড়ে আসা পর্যায়ে আবার ফিরে যাবো। জেনারেল ম্যাকা আর্থার যিনি নেতাজী সুভাষ সম্পর্কে ঐ উক্তি করেছেন তিনি কোন যোগবলে অতীন্দ্রিয় জগতের লোক নন। এতদ্ সত্ত্বেও তিনি যে সুভাষ বসু সম্পর্কে এমন মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন তাতে তাঁর গভীর দূরদৃষ্টিরই পরিচয় বহন করছে। তাঁর এই কূটনৈতিক দূরদর্শিতার এবং কঠোর বাস্তব বোধের প্রশংসা না করে উপায় নেই। প্রশংসা অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য, অপরদিকে পণ্ডিত জওহরলালের কর্মধারায় আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একজন সহকর্মী ও বন্ধুস্থানীয়। জাতীয় আন্দোলনের সময় উভয়ে হাতে হাত রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছেন। নেহেরু ছিলেন সুভাষচন্দ্রের চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ। তিনি দিল্লীর তখতে আসীন হবার লোভে সিঙ্গাপুরে মাউন্ট ব্যাটেনের প্রস্তাবে এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। ১৯৪৫ সালে সিঙ্গাপুরে নেহেরুকে ডেকে তিনি প্রশ্ন রাখেন, সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরলে

কে হবেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী? অবশ্যই ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগের পর। ভারতবর্ষকে বাংলা না উত্তরপ্রদেশ নেতৃত্ব দেবে? স্মরণীয় যে তৎকালে অখণ্ড ভারতবর্ষে অখণ্ড বাংলাই ছিল সর্ববৃহৎ রাজ্য। লর্ডের এই প্রস্তাবে পণ্ডিত নেহেরুর তো মাথায় বিনামেঘে বজ্রাঘাত। কার্যত তখনই ভারতবর্ষের তথা ভারতবাসীর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। ঐ সিঙ্গাপুরেই। শুধু তৎকালীন ভারতবাসীর নয়। অন্তত ভারতবাসীর ভাগ্য সেই চলমান শতাব্দীরও বটে। কেননা তখনই ভারতবর্ষের বিভাজন রেখাটা অন্তত পণ্ডিত নেহেরুর মনের পর্দায় স্থিরীকৃত হয়ে গিয়েছিল।

বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে সে সময় যেসব তথ্য এবং গোপন গোয়েন্দা রিপোর্ট ছিল তাতে বৃটিশরা নিশ্চিত ছিল যে তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষের মৃত্যু একটা সুপরিকল্পিত অলীক ঘটনামাত্র। এই তথ্য বৃটিশের চেয়েও পণ্ডিত নেহেরু অনেক বেশী এবং নিশ্চিতভাবেই জানতেন। কারণ বৃটিশ শাসকরা ছিল নেতাজী সুভাষের জন্ম শত্রু। তাই শত্রুদের তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হতো তাঁদের গোয়েন্দা বিভাগের উপর। অনেক সময় গোয়েন্দাদের তথ্য বিশ্লেষণে ত্রুটিও থাকে বা থাকতে পারে। কাজেই তাদের অনেক ব্যাপারেই যে অনুমানের ভিত্তিতে বলতে হয় বা চলতে হয় সেইরূপ নেহেরুর ব্যাপারটা কিন্তু ছিলনা। কারণ সুভাষচন্দ্র ছিলেন নেহেরুর কাঁধে কাঁধ মেলানো এক সর্বক্ষণের সহকর্মী ও বন্ধু। অতএব সুভাষচন্দ্রের মানসিক পট-চিত্রটা নেহেরুর মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বুঝতে কোনই বিভ্রান্তি ঘটার কথা নয়। এটা আমরা ধরে নিতে পারি। তাছাড়া বৃটিশ আমেরিকান গোয়েন্দা রিপোর্টতো নেহেরুর বন্ধু লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের কল্যাণে তাঁর হাতের মুঠোয় ছিলই। সর্বোপরি নেতাজী সুভাষ যে জওহরলালকে একাধিক পত্রে জানিয়েছিলেন তিনি ভারতবর্ষে আসবেন সে তথ্য তো তাঁর নিকট মজুদ ছিলই। কাজেই নেহেরুর মাথায় বজ্রঘাত হবে লর্ডের কথায় তাতে আর গালে হাত দিয়ে ভেবে হতাশার কি আছে? এখানে আক্ষেপের স্থান নেই। আসুন আমরা এই প্রেক্ষাপটটা আরও তলিয়ে দেখার চেষ্টা করি। কেন আমরা ভারতবাসীরা মানব জগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্বকে পেয়েও তাঁকে ভারতবর্ষের কর্ণধার রূপে পেলাম না? "ভগবান মঙ্গলময়" বা "God is good to all".—এই আপ্তবাক্য আমরা মানি আর নাই মানি তা যে চন্দ্রসূর্যের মত নিত্যসত্য, universal truth তা বলাই বাহুল্য। এই দুই নায়কের নায়কত্বের যে বিচরণভূমি তাই বলে দিচ্ছে কেন সুভাষচন্দ্র না হয়ে জওহরলালই হলেন ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা। তার কারণ বিধাতাপুরুষ স্বয়ং এই দুই সংগ্রামী পুরুষের জীবনের কর্মসূচী স্থির করে রেখেছিলেন। নতুবা সর্বক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হয়েও কেন সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবাসীর কর্ণধার হলেন না? কারণ তাঁর জন্য যে সমগ্র বিশ্ব প্রতীক্ষারত ছিল। কাজেই আমরা যতই বেদনাহত বা আক্ষেপে বিমূঢ় হই না কেন, যাঁর যা স্থিরীকৃত তাঁর সেখানে পৌঁছাতেই হবে। তাই আমরা দেখছি নেহেরু অনেক কসরৎ করে তবেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর আসনে আসীন হতে পেরেছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের জন্ম তো ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর

মত সীমিত পরিসরের জন্য নয়। তাতো তাঁর সুবিশাল বিশ্বব্যাপী কর্মপরিধিই বলে দিচ্ছে। তিনি যদি ভারতবর্ষের কর্ণধারের আসনে আসীন হতে চাইতেন তবে তা কি কেউ প্রতিহত করতে সক্ষম হতেন? এই বিতর্কে আমরা অবশ্যই অবতীর্ণ হবো তবে তা কিছু পরে।

হ্যাঁ, তাইহোকু নাটক যে কত বড় একটি মিথ্যা তা কোন অবস্থাতেই বলার অপেক্ষা রাখেনা। অথচ এই মিথ্যা রটনাটি নিয়ে এ পর্যন্ত দেশবিদেশে কত নাট্যায়নই না ঘটে গেল, ঘটে চলেছে আজও। তৎকালে এই ঘটনার পর নেতাজী মাঞ্চুরিয়া থেকে জাতির উদ্দেশ্যে এবং জাতীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথকভাবে লিগনেতা জিন্না থেকে গান্ধী, নেহেরু, আজাদ প্রভৃতি প্রত্যেক শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে বেতারে বক্তৃতার মাধ্যমে ১৯৪৬ সালে কম করে দুইবার সনির্বন্ধ আবেদন করেছেন। এবং ১৯ ডিসেম্বর ১৯৪৫ একবার তিনি অনুরোধ করে জানিয়েছেন তাঁরা যেন বৃটিশের ফাঁদে পা দিয়ে দেশকে বিভাজনের মত এক ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে না ফেলেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা? অথচ দেশ বা জাতি জাহান্নামে যাক, শত বিভাজনে ছিন্ন হোক ক্ষতি নেই। তবু নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে যেকোন মূল্যেই হোক প্রতিহত করা চাই। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রকে বরণ করতে বা মেনে নিতে কোন ভারতীয় নেতৃবৃন্দই প্রস্তুত নয়। এমনকি আজ ১৯৯৯ সালের অন্তিম পর্বেও একই নাট্যায়ন। এই হচ্ছেন ভারতীয় নেতাদের সত্যকারের আত্মপরিচয়। তা হলে এই ছবি থেকে এটাই কি পরিষ্কার হচ্ছে না যে, সকল ভারতীয় নেতৃবৃন্দই কি ছোট, কি বড়, কি মাঝারি সবাই সুভাষ মাহাত্ম্যে ও তাঁর সুদূর প্রসারী ব্যক্তিত্বের প্রভাবের আতঙ্কেই আতঙ্কিত? গান্ধীজী যে সুভাষচন্দ্রকে বেটা বলতেন, তাহলে কি ধরে নিতে হবে ঐ মিষ্টি মধুর যে সম্বোধন সেটা একটা লৌকিক তকমা? তাছাড়া কিছুই নয়। গান্ধীজী যে একজন মহান ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বিশালত্বকে এই প্রতিবেদকের পক্ষে পরিমাপ করা, মূল্যায়ন করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু যাঁরা এই মহানতা মূল্যায়নের যথার্থ ব্যক্তিত্ব বা পরিমাপযোগ্য বলে মনে করেন তাঁরা কি আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর দেবেন? যিনি এমন মহান এবং যিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব বলে সমগ্র জাতির বিচারে স্বীকৃত তিনি কেন সুভাষ আতঙ্কে আতঙ্কিত? যিনি ঋষিতুল্য বলে দেশবাসীর বিচারে ধার্য তাঁর দৃষ্টি কেন এমন সঙ্কীর্ণ, এমন আচ্ছন্ন? যদি কেউ প্রশ্ন করেন তাঁর সঙ্কীর্ণতার পরিচয় কোথায়? ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয়বার সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতির বিজয়ে গান্ধীজী কি বলেননি— "শত হলেও সুভাষ তো আর দেশের শত্রু নয়"। শ্রদ্ধেয় পাঠকবর্গ আপনারাই বলুন, ঐ উক্তি দ্বারা গান্ধীজী কোন মাহাত্ম্যের সাক্ষ্য বহন করছেন? গান্ধীজীর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা সজীব রেখেই আমার এই জিজ্ঞাসা। শুধু এখানেই শেষ নয়। যদিও গান্ধীজীর দেশপ্রেমের ব্যাপারে কোন প্রশ্নেরই অবকাশ নেই। বিশেষ করে এই প্রতিবেদকের মত এক নগন্য তৃণমূলীর। তবু একটি ছোট প্রশ্ন রাখতে চাই। গান্ধীজী তাঁর সমগ্র সত্তা পণ করেই দেশ ও দশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও কল্যাণপ্রার্থী। এবং

আমরা এও জানি তিনি সার্বিক অর্থেই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মহামানবদের মধ্যে অন্যতম। যেমন জীবনচর্যায়, তেমনি চারিত্রিক বলিষ্ঠতায়, ন্যায়ধর্মে সমস্ত ব্যাপারেই। এমন যে ব্যক্তি তিনি নিশ্চয়ই এমন একজনকেই দেশের কর্ণধার বা কর্মকর্তা নির্বাচন করবেন যিনি হবেন অন্তত সকল বিচারে তাঁর কাছাকাছি সকল গুণে গুণান্বিত। এটা গান্ধীজীর নিকট অন্তত জাতির প্রত্যাশা। যদি তাই হয় তবে জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্রের মত দুই বিশাল ব্যক্তিত্বের মধ্যে তুলনামূলক হিসাবে কে শ্রেষ্ঠ বা কে দেশের নেতৃত্বের মানদণ্ডে অধিকতর গ্রহণযোগ্য, এই বিচার ক্ষমতা কি তাঁর ছিল না? এ কথা কি আমাদের বিনা বির্তকে চোখ বুঝে মেনে নিতে হবে? তবে কেন তিনি সুভাষচন্দ্রকে বর্জন করে জওহরলালকে অধিকতর গুরুত্ব দিলেন? এবং শ্রেয় মনে করলেন? এইসব প্রশ্নই আসতো না যদি তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষের অভিভাবকের আসনে না বসতেন। যেন তিনি ভারতবর্ষের জনক এই ছিল তাঁর অবস্থান, অন্তত ভারতবাসীর নিকট সেই সময়ে। বস্তুত পক্ষে তিনি ছিলেনও তাই। কাজেই তাঁর কাছ থেকে তো যথার্থ নিরপেক্ষ বিচারই কাম্য। এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে গান্ধীজীকে কি নিষ্কলঙ্ক বলা যায়? তাঁর এই ভুলের পরিণতি ফল যে দেশবিভাগ তা বলাই বাহুল্য। কারণ সুভাষচন্দ্র যদি তখন নেতৃপদে বৃত হতেন তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসটা হতো সম্পূর্ণ অন্য রূপ এবং সাথে সাথে বলা যায় পৃথিবীর মানচিত্র অন্য রং-এ হতো রঙিন, অতি অবশ্যই। কাজেই গান্ধীজীর এই ভুল হিমালয়ান ভুল। এই ভুলের ফল আজ জাতি হিসাবে আমাদের ভুগতে হচ্ছে। তাতে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় সুভাষ বোসের কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটেনি। তাই বলছিলাম সমালোচনার ঊর্দ্ধে উঠে শতাব্দীর সেরা সর্বোচ্চ আসনে কি গান্ধীজীকে আসীন করা যায়? তিনি যে শতাব্দীর সেরাতম ব্যক্তি বা সেরাতম দেশপ্রেমিক ও ভারতপ্রেমিক এই তত্ত্বে কি তিনি কালিমা মুক্ত হতে পারেন? গান্ধীজীর সম্পর্কে এই সত্য সমালোচনাকে যদি আমরা দূরে রেখে তাঁর ইমেজ নিয়ে চর্চা করি তবে তিনি অবশ্যই জাতীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে সমকালীন ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর ঐ সকল জাতীয় হিমালয়ান ভুলগুলো চর্চা করলে তাঁকে কোন্ আসনে আসীন করবেন বলুন? বরং বলা যেতে পারে দেশবিভাজনের সময় তাঁর ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গৌণ। অথচ আমরা দেশবিভাজনের জন্য তাঁকেই নির্মমভাবে দায়ী করে থাকি। পরন্তু সুভাষকে বরণ করলে ঐ প্রশ্নটাই আজ অবান্তর হতো।

যদিও তিনি জীবনের শেষপ্রান্তে এসে এইসব ভুলের প্রভূত প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করার আগেই আমরা দেখেছি তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। এতে অন্তত প্রমাণিত হলো তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দরাই তাঁর বিরুদ্ধবাদী। অন্যভাবে বলা যেতে পারে তিনি যাঁদের তাঁর অনুরাগী বা অনুগামী বলে ধার্য করেছিলেন তাঁরাই হলো তাঁর কাছে কাল। আপাতদৃষ্টিতে অন্য রং-এর পর্দা চোখে ভাসলেও আসল তথ্য যে এটাই তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে পরে আলোচনার অবকাশ রেখে আমরা অন্য দৃশ্যে যাবো এখন। চলুন আমাদের ফেলে

আসা অবস্থানে ফিরে যাই। গান্ধীজী যে তৎকালে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি এই রায় ছিল তখনকার তাঁর দেশবাসীর। গান্ধীজীর আদেশ তখন দেশবাসীর কাছে ছিল বেদবাক্যসম। কিন্তু তিনি যখন তাঁর নিজস্ব বিচারবুদ্ধি দিয়ে নিজেকে স্বচ্ছভাবে বিচার করতে শুরু করলেন তখন কিন্তু সর্বভারতীয় বিচারক কুলের সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই নস্যাৎ করে দিলেন। তিনি যে ভারতবর্ষের নায়ক বা কর্ণধার হিসাবে জওহরলালকে ধার্য করেছিলেন বা তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর ছিলেন তা তাঁর নিজের বিবেকের বিচারেই ভুল বলে প্রমাণিত হলো। কারণটা গান্ধীজীর প্রদত্ত বয়ানেই শোনা যাক। আসুন গান্ধীজী কি বলেন শুনি। তিনি বলেন,

In his last tribute to Subhas, in 1947 Gandhiji said. "I regard Subhas Bose as a patriot of patriots, he sacrificed a brilliant carrier for the sake of country's service. His bravery shines through all his actions. Netaji's name is one to conjure with. He abolished all distinctions of caste and class. He pride all under him with same zeal, so that they acted as one man. He was not a mere Hindu He was not a mere Bengali. He was Indian first and last. (Indian observer)

এখানেই শেষ নয়। ১৯৪২ সালে ৮ই আগষ্ট বোম্বাই সর্বভারতীয় কংগ্রেস সম্মেলনে গান্ধীজী বৃটিশের বিরুদ্ধে "ভারত ছাড়" আন্দোলনের ডাক দিয়ে প্রস্তাব পাশ করালেন এবং স্লোগান উপহার দিলেন জাতির জন্য 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর প্রতি প্রশ্ন রাখেন বাপুজী, ভারত ছাড় প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে জাতির জন্য আপনার কর্মসূচী কি? উত্তরে গান্ধীজী বললেন কর্মসূচী দেবে সুভাষ। অথচ সুভাষচন্দ্র তখন সুদূর বার্লিনে অবস্থান করছেন। তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? এই যে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়ানো এটা কি মহাত্মার মত ভারতবরেণ্য একজন মহান ব্যক্তির আদৌ করার প্রয়োজন ছিল? তিনি যখন জওহরলালকে নির্বাচন করেন তাঁর পরবর্তী ব্যক্তিত্ব হিসাবে বা ভারতবর্ষের কর্ণধার হিসাবে তখন কি সুভাষচন্দ্র ছিলেন না? কিন্তু তিনি তা করেননি। এখানে স্মরণ রাখতে হবে সুভাষচন্দ্রের চোখে গান্ধীজী ভারতবর্ষের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেও তাঁর চেয়ে ঊর্ধ্বে ছিল দেশ ও দেশের ৩৮ কোটী ভারতবাসী। ভারতজননীর মর্যাদার বিনিময়ে অন্য কারো স্থান ছিল সুভাষচন্দ্রের বিচারে অপেক্ষাকৃত কম। এছাড়া এই বিশ্লেষণে আর যা পাচ্ছি তা হচ্ছে গান্ধীজী যেমন একজন রাজনৈতিক পথপ্রদর্শক তেমন সুভাষচন্দ্রও একজন রাজনৈতিক পথদ্রষ্টা তথা রাজনৈতিক দর্শনের নীতিনির্ধারক। কাজেই গান্ধীজীকে জওহরলাল হুবহু অনুসরণ বা অনুগমন করলেও সুভাষ কোন অবস্থাতেই তা ছিলেন না। কিন্তু তা বলে গান্ধীজীকে একবিন্দুও অমর্যাদা করার পাত্র তিনি নন। তার সাক্ষ্য আমরা সুভাষ জীবনের প্রতি পদে পদে পাই। এই আলোচনায় আমরা পরে যাচ্ছি। তার আগে গান্ধীজীর আলোয় জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রকে একটু আমরা চিনে নিই। সুভাষচন্দ্র যে গান্ধীজীর অন্ধ অনুসরণকারী ছিলেন না তার এক আধটা ঘটনা পরখ করা যাক। ১৯৩১ সালে বিলেতে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজীর ভূমিকা নিয়ে সুভাষচন্দ্র বলেন,

'ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে একই দেহে দুটি ভূমিকায় তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা এবং জগৎ গুরুর ভূমিকা। কখনও কখনও তিনি নিজেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে যেন সরিয়ে দিতেন। ভুলে যেতেন যে নিজের দেশের জন্য আলোচনায় তিনি এসেছেন। তখন তিনি একটি নূতন আদর্শ। অহিংসা ও বিশ্বশান্তির প্রচার গুরুর আসন নিতেন। এই দ্বিতীয় ভূমিকার জন্য তাঁকে এমন অনেক লোকের সঙ্গে বহু সময় ব্যয় করতে হতো যাঁরা কোনমতেই তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সহায়ক নন।" (আমি সুভাষ বলছি)

"During his stay in England he had to play two roles in one person the role of political leader and that of world teacher" (Indian struggle)

বলাবাহুল্য গান্ধীজীকে এখানে সুভাষচন্দ্র অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠা করেও বলছেন যে এমন অনেকের সঙ্গে আলোচনা করতেন যা তাঁর রাজনৈতিক দিক থেকে সহায়ক নয়। এমন ব্যাপার সুভাষচন্দ্রের পক্ষে মেনে নেওয়া যে সম্ভব হতো না তা গবেষণার দরকার পড়ে না। কিম্বা ধরুন গান্ধীজী যখন বারবার ইংরাজের কাছে ডোমিনিয়ান স্টেটাস চাইছেন তখন কিন্তু সুভাষচন্দ্রের দাবি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ করানো। এই যে দুইজনের মধ্যে ব্যবধান এই ঘটনা জওহরলালের সঙ্গে ঘটলে গান্ধীজীর প্রাধান্যই শেষ পর্যন্ত জয়ী হতো। এটাই ছিল গান্ধীজীর সুভাষ বর্জন ও জওহরলালকে গ্রহণের প্রধান কারণ। কিন্তু গান্ধীজীর জীবন সন্ধ্যায় তাঁকে তাঁর ভুলের মাশুল গুণতে হলো কি না? শুধু গান্ধীজীর ভুলের খেসারত গান্ধীজীকে গুণেই সেই অধ্যায়ের পূর্ণচ্ছেদ ঘটেনি। তাঁর ঐ হিমালয়ান ভুলের মাশুল আজও প্রজন্ম হতে প্রজন্মান্তরকে গুণতে হচ্ছে। আরও কত যে প্রজন্ম গুণবে কে জানে? আর সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এত যে বিরূপ আচরণ গান্ধীজী করেছেন তা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র কখনও গান্ধীজীকে ভুলেও অমর্যাদা করেননি। সুভাষচন্দ্রের জীবনচর্চা করলে আমরা শুধু দেখতে পাই গান্ধীজীকে তিনি কেবল ঊর্দ্ধ থেকে ঊর্দ্ধতর আসনে বসিয়েছেন। এই ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্রকে একবার ওয়ার্ধা স্টেশনে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন যে, আপনাকে ।জী শত উপেক্ষা করেন, তা সত্ত্বেও আপনি কি কারণে তাঁকে এত গভীর মর্যাদা দিয়ে থাকেন? জবাবে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা প্রদর্শনই হচ্ছে মনুষ্যধর্ম। এই গান্ধীজীই অবস্থান্তরে জওহরলালকে দোষারোপ করতেও দ্বিধা করেননি। অবশ্যই তার যথার্থ কারণ ছিল। নতুবা গান্ধীজীর মত আদর্শ ব্যক্তি কখনও তা করতে পারেন না। সে প্রসঙ্গে আমরা পরে যাচ্ছি। এইসব চর্চায় যা ফুটে উঠেছে তা হলো মানুষের যা সহজাত স্বভাব, সেই স্বভাব থেকে তা হলে গান্ধীজীও মুক্ত নন। অর্থাৎ ডোমিনেটিং নামক প্রবৃত্তি থেকে গান্ধীজীও পরিত্রাণ পাননি। তিনি অত্যন্ত ভালভাবেই বুঝেছিলেন জওহরলালের উপর যে ডোমিনেটিং করার ক্ষমতা তাঁর থাকবে সুভাষচন্দ্রের উপর তা একেবারেই অচল। এটাই প্রধানতম কারণ সুভাষ বর্জন ও জওহরলালকে গ্রহণের। ক্ষেত্রেও কি প্রশ্ন করা চলেনা—মহাত্মা যিনি, তাঁর কেন এমন মানসিকতা থাকবে? তবে কিসের তিনি মহাত্মা, এ প্রশ্ন এড়ানো যায় কি?

চতুর্থ অধ্যায়

১৭৫৭ সালের পলাশীর প্রহসন নাটক আর ১৯৪৭ সালের বৃটিশের ক্ষমতা হস্তান্তর-এর মধ্যে ঐতিহাসিক বিচারে কোনটি বড় অপরাধযুক্ত? সুভাষচন্দ্র ব্যতিরেকেও অখণ্ড স্বাধীন ভারতবর্ষ হতে পারতো কিন্তু জওহরলাল, প্যাটেলরা তা কেন বানচাল করল? তা কি সত্য? গান্ধীজী কেন বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র যথাসময়েই ফিরবেন? সুভাষচন্দ্র মারা যায়নি। বৃটিশের ভারতবর্ষ ছাড়ার অন্যতম কারণ কি? ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল সিঙ্গাপুরে জওহরলাল কর্তৃক কেন? তা কি যথার্থ?

এবার আমরা একটু পিছন থেকে চলতে শুরু করবো। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯৪৫-১৯৪৬ সালে প্রত্যেক ভারতীয় নেতাদের কমপক্ষে তিনবার আবেগ এবং কান্না জড়িত কণ্ঠে ভারতবর্ষ বিভাজনের সম্পর্কে হুঁশিয়ারী দিয়ে তার পরিণতির বিষময় ফলের কথা জানিয়েছেন এবং কাতর আবেদন রেখেছেন। সেই সাথে জাতিকেও সাবধান ও অনুরোধ করেছেন একই সঙ্গে। অথচ কাকস্য পরিবেদনা? কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সেই হুঁশিয়ারীর ফল আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে কিনা? সুভাষচন্দ্রের কথা জাতি কিম্বা নেতৃবৃন্দ কেউ গ্রাহ্যই করল না। এককথায় সুভাষ বর্জন। সুভাষচন্দ্রকে বর্জন করেও কিন্তু ভারতবর্ষ অবিভাজ্য ভাবেই তার স্বাধীনতা পেতে পারতো। আসুন সেই আলোকে কি হতে পারতো তা একটু অনুধাবন করা যাক। ইতিমধ্যে নেতাজীর ব্রহ্মরণাঙ্গন যবনিকার অন্তরালে চলে গেছে। এই ব্রহ্মযুদ্ধের ফলাফলে প্রত্যক্ষভাবে নেতাজী পিছু হটলেও পরিণতিতে কি ঘটেছিল তা ইতিহাসই প্রমাণ।

ভুললে চলবে না যে, ব্রহ্মযুদ্ধের আজাদী ফৌজের ফৌজি প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতালাভ। কারণ আই. এন. এ.-এর আক্রমণে এবং পরবর্তীকালে লালকেল্লায় আই. এন. এ.-এর সেনানীদের ঐতিহাসিক বিচার পর্ব শুরুর ফলে ভারতীয় রয়েল নাভেল ফোর্সে প্রবল বিদ্রোহ দেখা দেয়। যা ঘটেছিল ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী। এই বিদ্রোহই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নৌ-বিদ্রোহ নামে

খ্যাত। এই নৌ-বিদ্রোহের অনুপ্রেরণায় ভারতীয় বায়ুসেনা ও স্থলসেনাতেও ক্রমে বিদ্রোহের বীজ বপন হয়ে তা দানা বাঁধতে শুরু করে। তখন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশেরা দেখল যে এদেশের মূল মেরুদণ্ড তথা শক্তির উৎস সামরিক বাহিনী তাদের আদেশ শুনতে আর রাজি নয়। চতুর বৃটিশের সে কথা অনুধাবন করতে এতটুকু সময় লাগেনি। তখনই শাসক বৃটিশ স্থির করল তারা ভারতবর্ষকে ভারতবাসীর হাতে অর্পণ করে চলে যাবে। এই তথ্যের সত্যতা আমরা তৎকালীন বৃটিশ কর্তার প্রদত্ত বয়ানেই পেয়ে থাকি। ১৯৫৫ সালে লর্ড ক্লীম্যান্ট এ্যাটলি কলিকাতা এসেছিলেন এবং তিনি দুইদিন ছিলেন কলিকাতা রাজভবনে, তখন কলিকাতা হাইকোর্টের মহামান্য প্রধান বিচারপতি ছিলেন ফনীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয়। স্মরণীয় যে লর্ড এ্যাটলি ছিলেন তৎকালে ইংল্যাণ্ডের লেবার পার্টির নেতা। ১৯৪৭ সালে যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার নামে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় তখন তিনিই ছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী। তাঁর হাত দিয়েই ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের পুনর্মুষিকভব তথা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। তাই স্বয়ং এ্যাটলিকে মহামান্য প্রধান বিচারপতি মহাশয় তখন প্রশ্ন রাখেন যে, আপনারা স্থির করেছিলেন ১৯৪৮ সালের জুন পর্যন্ত কমপক্ষে ভারতবর্ষের ক্ষমতায় থাকবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল কম করেও এক বৎসর আগেই আপনারা চলে গেলেন। এই সিদ্ধান্ত এত তড়িৎগতিতে কেন ঘটল? এই প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় লর্ড এ্যাটলি বলেছিলেন, আজাদ হিন্দের ইম্ফল ও দক্ষিণে স্বরাজদ্বীপ তথা আন্দামান দখলের পর ভারতীয় সমরবিভাগ আমাদের কব্জার বাইরে চলে গিয়েছিল। একটা দেশের শাসকদের মূল মেরুদণ্ডই হচ্ছে সামরিক বিভাগ। সামরিক বিভাগের উপর কর্তৃত্ব না থাকলে কারো প্রশাসনিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব না। এটাতো স্বতঃসিদ্ধ। তাই বৃটিশকে ভারত ছাড়তে হয়েছিল তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই শুধু নেতাজী সুভাষের জন্যই। এই ছিল প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নিজ মুখের বয়ান বা উক্তি, যিনি নাকি আবার ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তরের মূল কারিগরও বটে। মাননীয় ফনীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় আরও প্রশ্ন করেছিলেন যে গান্ধীজীর "Quit India" আন্দোলনের ফলে ইংরাজের ভারত ছাড়ার ব্যাপারে কতটা প্রভাব ছিল? এর উত্তরে এ্যাটলি অবজ্ঞাসূচক হেসে বলেছিলেন **'Mini-m-a-l'**. (রাখালবেণু—পৃঃ ১১০, ১৩৯০, সত্যরঞ্জন বক্সী সংখ্যা)।

এবার ভাবুন যাঁরা বলছেন ব্রহ্মরণাঙ্গন ব্যর্থ বা সুভাষচন্দ্র অকৃতকার্য, তাঁদের দাবি কতখানি অন্তঃসারশূন্য মিথ্যা বাগাড়ম্বর। এই দাবি শুধু একজন সাদামাঠা সাধারণ লোকের নয়। আমদের দেশের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক তত্ত্ববিদদের তথা পৃথিবীখ্যাত কোন কোন মহাজনদেরও দাবি। তাঁদের অনেক্রেই হয়ত আজও মনেপ্রাণে বৃটিশ তাঁবেদারীরই পৃষ্ঠপোষক। এবং সেই ভেবেই তারা গর্ববোধ করেন। বিশেষ করে আজ এমন বাঙ্গালীরও অভাব নেই। তাঁরা সাথে সাথে আরও অনেকের সমর্থন লাভ করে যেন লজিস্টিক সমর্থন পেতে চান। নতুবা কথায় কথায় গল্পে সাহিত্যে কেন সেই দাবির সোচ্চার ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় আজও বলুন? এইরূপ একটি বিশ্বযুদ্ধের বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক পরিণতি সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে কি তাদের এতটুকু বিবেকে

বা জিহ্বায় বাঁধে না? তারা আজও এমনই দাসবৃত্তির ক্রীড়নক! এমন মহাজনদের কিন্তু আমাদের দেশে অভাব নেই।

এসব ছেড়ে এবার আসুন ১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঘোষিত নৌসেনাদের নৌবিদ্রোহে কি কি ঘটেছিল তা একটু ডাইরির পাতায় দেখা যাক। এবং সেই স্মরণী ধরে কতদূর যাওয়া যায় তাও দেখা যাক। ব্যাপারটা ছিল এইরূপ যথা, আজাদি ফৌজের আক্রমণের সাথে সাথে নেতাজী সুভাষচন্দ্রেরও আহ্বান ছিল ভারতীয় সকল সেনাবিভাগের সকল সেনানীদের প্রতি তারা যে যেখানেই থাকুন তারাও যেন স্বদেশ যজ্ঞের এই মহান বিদ্রোহে যোগদান করেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেন। নেতাজীর এই আহ্বানের ফল ফলেছিল তখন অকল্পনীয় ও সুদূর প্রসারী। ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই সেই তথ্য অবগত আছেন। এই আহ্বানে নেতাজী ব্যাপক সাড়া পেয়েছিলেন। এই সাড়া দেখে শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ঘাবড়ে যাননি। কংগ্রেসী নেতারাও প্রচণ্ড বিব্রত হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের এই আহ্বানের ফলে বিশেষ করে ভারতীয় নৌ-সেনারা কার্যত নাভেল বিভাগটিকে অচল করে দিয়েছিল। ফলশ্রুতি সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশরা প্রমাদ গুণতে শুরু করে। সেই প্রমাদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে বৃটিশের ত্রাতা হিসাবে তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বড় কর্তারা একেবারে যাকে বলে ডাবল মার্চ করে এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ড: প্রফুল্ল ঘোষ, জে. বি. কৃপালনি প্রভৃতি ব্যক্তিরা ছিলেন অগ্রগণ্য। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা অগ্রগণ্য হবেন। কারণ ওঁরাই ছিলেন তখন জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বা হাইকম্যাণ্ড। ওদিকে নৌসেনারা ভারতীয় নৌ-বন্দরগুলোতে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এমত অবস্থায় পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল প্রভৃতি ব্যক্তিরা সেনাদের ক্যাম্পে বা বন্দরে উপস্থিত হয়ে প্রতিশ্রুতি দেন বিদ্রোহীদের প্রতি যে, বিদ্রোহীরা অস্ত্র সংবরণ করলে তাঁদের কোনপ্রকার শাস্তি হবে না। শুধু তাই নয়, পরন্তু যে কারণে তাদের এই বিদ্রোহ, অর্থাৎ স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতাও বৃটিশরা অচিরেই ভারতবাসীর হাতে অর্পণ করবে।

তারপরের ঘটনা যা ঘটেছিল তা ১৭৫৭ সালের মুর্শিদাবাদের পলাশীর প্রহসন নাটককেও লজ্জা দেয়। তা এমনি নির্ম্মম মর্ম্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক ছিল। কেননা বিদ্রোহীদের অস্ত্র সংবরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের উপর বৃটিশ নেকড়ে ও হায়নার দল ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং ভারতীয় সেনাদের বিশেষ করে বিপুল সংখ্যক নৌ-সেনাদের বোম্বে ও করাচি বন্দর প্রভৃতি স্থানে আরব সাগরের জলে সলিল সমাধিস্থ করে। অর্থাৎ বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা গুলি করে কাতারে কাতারে সমুদ্রের উত্তাল বক্ষে হাঙ্গরের মুখে ফেলে দেওয়া হয়। গুলি খেয়ে মরেও রেহাই পায়নি তারা। দ্বিতীয় মৃত্যু হাঙ্গরের মুখে। জাতীয় কংগ্রেসের কর্তারা যে তাদের আশ্বাস প্রদান করেছিলেন, তা

দেখা গেল ১৭৫৭ সালের মিরজাফরীয় প্রহসনও ঐ নাটকের কাছে শিশু। এই ছিল জওহরলাল সর্দার প্যাটেল ও তখনকার জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা। এই ভূমিকায় জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয় নেতাদের বৃটিশের প্রতি মহৎ কর্তব্যের কৃতজ্ঞতা স্বরূপই আমরা এই নাটকের পরবর্তী দৃশ্যের প্রথম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে পর্দা উঠালেই দেখতে পাই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের মধ্যরাতে বৃটিশের ক্ষমতা হস্তান্তর। যার নক্সা বা ছক তৈরী হয়েছিল বৃটিশ পার্লামেন্টের মন্ত্রণাশালার গর্ভগৃহে। তারপরের ইতিহাস তো আমাদের সকলেরই জানা।

এখানে উপরের বর্ণিত চিত্র দ্বারা আমরা যে সিদ্ধান্তে আসতে পারি তা যেমন এক ঘৃণিত ন্যক্কারজনক ঘটনা তেমন ন্যক্কারজনক ঘটনা হয়ে আজও ইতিহাসে জ্বলজ্বল সাক্ষ্য বহন করছে ১৭৫৭ সালের পলাশীর প্রান্তরের ভারতের দিবাকর, ভাগ্যরবিকে আপন হাতে বিসর্জন দেবার ঘটনা। দুটি ঘটনার বিচারে কোনটি অধিকতর ঘৃণ্য, তা বলতে হলে বলতেই হয় ১৯৪৭ সালের ঘটনাই অধিকতর ঘৃণ্য। কারণ পলাশীর ঘটনাকে বলতে গেলে বলতে হয় আংশিক থেকে পূর্ণাঙ্গে যাবার সোপান। আর ১৯৪৭ সালের ঘটনা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ থেকে আংশিকের পথে পদচারণা। অর্থাৎ একটি যদি part to the whole তবে অন্যটি অবশ্যই whole to the part. সেই সুবাদে বলা চলে একবাক্যে, ভারতমাতাকে বৃটিশের দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দিনী করার কৃতিত্বে এ যুগের কৃতকর্মই অধিকতর ন্যক্কারজনক। কেননা এ যুগের কৃতকর্মকে আজ অর্ধশতক বৎসর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ নাটকে খেলার ফলফল আমাদের নিকট অর্থাৎ দেশের আমজনতার নিকট আজও প্রহেলিকাময়। আমরা এখনও বুঝতে পারছি না কি যে ঘটনা ঘটল। আজও আমরা কেউ কেউ বলছি আমরা স্বাধীন, কেউবা বলছি এই কথা সত্য নয়। তার মানে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে যে আমাদের দাবি তা আজও সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন কোন নাটকের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিনয়রত গিরিশ ঘোষের তারিফ করেছিলেন তেমন আজ ১৯৪৭ সালের দিল্লীর নাটকের দর্শকরাও অর্থাৎ ভারতবাসীরা তার কলাকুশলীদের তারিফ না করে উপায় নেই। তাদের অভূতপূর্ব ভেক-বাজির জন্য। এখানে ১৯৪৭ সালে কি ঘটল কি ঘটল না তা দেশবাসীর কাছে যেমন আজও গবেষণার বিষয় তেমন ১৭৫৭ সালের ঘটনায় কিন্তু তা ছিল না। কারণ দর্শকরা সেদিন সেখানে প্রেক্ষাগৃহে বসেই বলে দিয়েছিল নাটকের পরিণতি। ভুললে চলবে না, উভয় নাটকের উভয় মঞ্চের কুশীলবদের চালকরা ছিল সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা অববাহিকার ও ইউরোপের টেম্‌স নদী অববাহিকার কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ নায়ক নায়িকারা। ১৭৫৭ সালের পলাশীর প্রহসনের ফল যদি আমরা দুই শত বৎসর ভুগে থাকি তবে ১৯৪৭ সালের দিল্লীর যমুনা তীরের প্রহসনে যে কত প্রজন্ম ভুগতে হবে তা হয়ত স্বয়ং নিয়তির কাছেও অজ্ঞাত। আমজনতা তো কোন ছার। দিল্লীর নাটকের জট খুলতে এক মহানায়ক ত্রিকালদর্শী ঋত্বিকেরই পার

হয়ে গেল জীবনের শত বৎসর। আর কতকাল এভাবে যে চলে যাবে কে জানে? এবার পাঠক বন্ধুরাই বিচার করুন অধিকতর উৎকর্ষ বা অপকর্ষের দাবিদার কোন নাটকের কৃতকৌশলীরা।

একটু পেছনে তাকালে এবার আমরা দেখতে পাই এই প্রতিবেদক একস্থানে দাবি করেছে যে ভারতবাসী অবিভাজ্য ভারতবর্ষকেই স্বাধীনভাবে লাভ করতে পারতো সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ডের ফলে, অথচ সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতেও। আসুন এই বক্তব্যের সারবত্তা একটু পর্যালোচনা করে দেখি তা কতখানি যুক্তিগ্রাহ্য ও যথার্থ। যখন ১৯৪৬ সালে নৌ-বিদ্রোহ প্রায় অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে চলছিল, তখন তাকে জাতীয় কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, বা আরও যেসব দল তখন ভারতবর্ষে ছিল তারা যদি বিদ্রোহীদের পিছনে এসে দাঁড়াতো এবং পূর্ণসহযোগিতার হাত প্রসারিত করতো এবং একই সাথে বৃটিশের আত্মত্রাণে বিশ্বাসঘাতকতা স্বরূপ ইংরাজদের সঙ্গে যদি সহযোগিতা না করতো, তবে ভারতবাসী যে অবশ্যই অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করতো সেকথা তো বলাই বাহুল্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কর্মকর্তা অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র ব্যতিরেকেও জওহরলালরা বা তৎকালীন নেতৃবর্গ ও জাতীয় কংগ্রেস অনায়াসেই ভারতবর্ষকে নিজেদের আয়ত্বে পেয়ে যেতো। অর্থাৎ অখণ্ড ভারতবর্ষই স্বাধীন হচ্ছিল। সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক ব্রহ্মযুদ্ধেরই পরিণতিফল যে এই স্বাধীনতা তা ইতিপূর্বেই আমরা প্রমাণ পেয়েছি। অথচ সেই পূর্ণাঙ্গ ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে আমাদের ক্ষমতালোভী নেতৃবর্গই পায়ে ঠেলে দিলেন। ক্ষমতালোভী নেতৃবর্গ তো ক্ষমতা করায়ত্বে পেতেই যাচ্ছিল। এমনকি তাতে ভাগ বসাবারও কেউ ছিল না। সুভাষচন্দ্রের জন্যই তো তাদের ছিল ভয়। অথচ সুভাষচন্দ্রই অনুপস্থিত। তা সত্ত্বেও কেন এমন অঘটন? তবে কি বলতে হবে ভারতবর্ষের বিধিও বাম? কিন্তু তাই বা বলা যায় কোন যুক্তিতে? কারণ জওহরলাল বা জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা যে তখন অন্য স্বপ্নে মশগুল। বিশেষ করে জওহরলাল তো বটেই। কেননা জওহরলালের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী তখন কেউ ছিল না, অন্তত সুভাষচন্দ্রের বহু বিস্তৃত বিশালত্বের তুলনায়। সুভাষচন্দ্রের পরিধির ব্যাপকতা সম্পর্কে জওহরলাল যথেষ্ট সচেতন ও ওয়াকিবহাল ছিলেন। এবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আর তা না হলেও জওহরলালের শ্বেতপ্রভুরা অভিভাবক হিসাবে যা কর্তব্য তা করতে এতটুকু কসুর করেনি। গুরু বা প্রভুর কাজ হচ্ছে, গুরুমন্ত্র শিষ্যের মর্মে মর্মে যাতে যথাযথভাবে পৌঁছে যায় তার বিধি বিধান বাত্‌লে দেওয়া। বৃটিশরা যে তা জওহরলাল তথা জাতীয় কংগ্রেসের মর্মস্থলে গোচরী-ভূত করে দিয়েছিলেন তার পর্যাপ্ত প্রমাণ ইতিহাসে আছে। এমনকি আজও ভারতীয় নেতৃবর্গের চরিত্র এবং কর্মকাণ্ড সেই কথাই বলছে। আর জওহরলাল যে ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম, তাতো আমরা হাতে কলমেই পাই।

যথা, বৃটিশ প্রতিনিধি লর্ড মাউন্টব্যাটেন, সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত ভারতের জাতীয়

শহীদস্তম্ভ, যা নেতাজী সুভাষচন্দ্র আই. এন. এ.-এর শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক উৎসর্গ করেছিলেন এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেন তা ধ্বংস করিয়েছিলেন ও তাতে নেহেরুকে মাল্যদানে বিরত রাখেন। আসুন ব্যাপারটি কি তা একটু সংক্ষেপে দেখা যাক। ১৯৪৬ সালে নেহেরু সিঙ্গাপুর আসার পর থেকেই তাঁর জীবনের চূড়ান্ত Turning point বলা যেতে পারে। ভারতের ভাগ্যাকাশেও তখন থেকেই নতুন করে কালোমেঘের উদয় এবং জওহরলাল জীবনের মূল্যবোধ পতনের যাত্রাশুরু। সিঙ্গাপুরই তাঁর উত্থান ও পতনেরও কারণ। বলা যেতে পারে তার পূর্ব পর্যন্ত সত্যই তিনি এক স্বাধীনতা যোদ্ধা ও ভারত প্রেমিক। ১৯৪৬ সালের জুলাই থেকেই তাঁর জীবনের নব অধ্যায় শুরু। ১৯৪৫ সালেও তিনি নেতাজীর মৃত্যুকে মানেন নি। ১৯৪৬ সালে I.N.A.-এর ঐতিহাসিক সেনানী বিচারের ফলে ভারতে যে গণজাগরণ দেখা দেয় সেই প্রেক্ষাপটেই তার সিঙ্গাপুর আগমন, I N.A. শহীদবেদীতে মাল্যদানার্থে। তখন যে তাঁর আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল সেই আবেগকেই সাম্রাজ্যবাদী মাউন্টব্যাটেন করল তাঁদের সাম্রাজ্যের স্বার্থে স্বার্থ রক্ষার রক্ষা কবচ বা পুঁজি। এই পুঁজিকে কেন্দ্র করেই চক্রান্তকারী বৃটিশ পরবর্তী পর্যায়ে নেতাজী বর্জন, গান্ধী হনন ও দেশভাগের পথ সুগম করে রাখে। I.N.A.-এর শহীদ বেদীতে মাল্যদান করতে এসেই নেহেরু তাঁর প্রকৃত অস্তিত্বকে চিরতরে নাশ করলেন। তিনি যখন সিঙ্গাপুর এলেন তখন লর্ড ওয়াভেল তাঁকে তেমন মর্যাদা দিতে চাননি। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন শুধু মর্যাদাই দিলেন না তাঁকে, লর্ড ও লেডি মাউন্টব্যাটেনের ভোজ পর্বেও আপ্যায়িত করে গোপন বৈঠকের আয়োজন করলেন। এখানই নিহিত আছে ব্যক্তি নেহেরুর সার্বিক পতনের উৎস। বলাবাহুল্য ঐ গোপন বৈঠকেই হয়েছিল তাঁর কাল, ভারতবর্ষেরও কাল। এর সোপান ধরেই আজ ভারতের এই ত্রিশঙ্কু পরিণতি। শুধু তাই নয়, ঐ তিন মহাকাণ্ডের হাত ধরেই নেহেরু এবং শাস্ত্রীজীরও পৃথিবী থেকে বিদায়, বিশ্বস্ত সূত্র অন্তত তাই বলে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই গোপন বৈঠকেই মাউন্টব্যাটেন প্রশ্ন রাখেন পণ্ডিত নেহেরুর নিকট যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ফিরলে কে হবেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, জওহরলল না সুভাষচন্দ্র? ভাবুন, বৃটিশের এক ঢিলে দুই পাখি বধ হয়ে গেল। বৃটিশের এতটুকু কসরৎ করতে হলোনা। এই ছিল ধূর্তশ্রেষ্ঠ খলরাজ বৃটিশ। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের এই প্রশ্নই পরিষ্কার করে দিচ্ছে সুভাষচন্দ্রের তথাকথিত মৃত্যুরহস্য একটা প্রশ্নাতীত অলীক নাটকমাত্র। তারা খুব ভালোভাবেই ওয়াকিবহাল ছিলেন যে সুভাষচন্দ্র তখন ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করতে উদ্‌গ্রীব। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র ১৯৪৫ সালে ভারতবর্ষে এসে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেছেন। যে কারণে গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রম বৃটিশের বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড দ্বারা তল্লাসিত হয়েছিল। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৫। এছাড়াও সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর সঙ্গে সংগোপনে যে যোগাযোগ রাখছিলেন তা নেহেরু ভালোভাবেই জানতেন। এমন একটি নথি বা সংবাদ এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। যথা,

In 1945 Gandhiji said that he believed that Netaji was not dead. This was the dictation of his "inner conscience". By that time Netaji

had written a letter to Gandhiji stating that he wanted to escape to India. That was the significance of the 'inner voice' of Gandhiji. Nehru also saw this letter. That was why he wanted to greet Netaji with bayonet." (Hindusthan Standard : 1956)

উপরের সংবাদ উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে যে জওহরলাল শুধু নেতাজীর অবস্থানই জানতেন না। তাঁকে বেয়নেটের দ্বারা কোথায় কিভাবে প্রতিহত করবেন তার জন্যও যথাকর্তব্য পরিকল্পনা করে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। আঁতকে উঠবেন না বন্ধু। এই হচ্ছেন খাঁটি দেশপ্রেমিক। খাঁটি বৃটিশ বন্ধু জওহরলালের চেহারা বা আত্মপরিচয়। শুধু মিরজাফরকে নিয়ে টানাটানি আর তিরস্কার কেন? ভুলে গেলে হবেনা তিনিই হচ্ছেন তখন জাতীয় কংগ্রেসের কর্ণধার এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তারপরও কি বলার অপেক্ষা রাখে বৃটিশের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্কের নিগূঢ়তা কোথায় এবং কতখানি। ইতিপূর্বের কোন অধ্যায়ে এই প্রতিবেদক বলেছে ১৯৪৬ সালে সিঙ্গাপুরে বসেই ভারত তথা ভারতবাসীর ভাগ্য স্থির করেছিলেন জওহরলাল। এবার ভাবুন এ অভাজনের দাবি সত্য কিনা? অবশ্যই এই বলাটা এই প্রতিবেদকের নয়। এটা ইতিহাসের অমোঘ বিধানের বাণী। এই প্রতিবেদক শুধু ইতিহাসের রত্নাগার থেকে তুলে এখানে পরিবেশন করেছে। শুধু ঐটুকুই শেষ নয়। ভারতবাসীর ভাগ্য ও ভারতবর্ষের মানচিত্রের রং ও চেহারাও জাতীয় কংগ্রেস দ্বারা নির্ধারিত হয়নি। নির্ধারিত হয়েছিল শুধু পণ্ডিত মতিলালনন্দন জওহরলালের খামখেয়ালী স্বার্থ ও তাঁর বন্ধু বৃটিশের স্বার্থের নিরিখে।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আমরা কি কারণে হারিয়েছি। অথচ জওহরলাল যদি বৃটিশ তাঁবেদারের চক্রান্তে হাত না মিলাতেন তবে আজকের ভারত-মানচিত্রই শুধু অন্য রং-এ রঙিন হতো তা নয়, বিশ্বমানচিত্রের রংটাই অন্যরূপ হতো। এখনও আক্ষেপ করে আমরা বলে থাকি নেতাজী সুভাষচন্দ্র থাকলে বা উপস্থিত থাকলে দেশটা এভাবে টুকরো টুকরো হতোনা। শুধু সাধারণ লোকেরই এরূপ আক্ষেপ বলছি কেন? স্বয়ং মহাত্মাগান্ধীও প্রকারান্তরে এই একই আক্ষেপ করেছেন। শুধু আক্ষেপই নয় বলতে গেলে অশ্রু বিসর্জন করেছেন সুভাষের অনুপস্থিতিতে দেশের এই করুণ অবস্থার জন্য। তাঁর এই আক্ষেপ নোয়াখালির দাঙ্গা কবলিত প্রান্তরে বসে। যে বৃটিশ ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত তাদের ভারত সাম্রাজ্য ভোগদখলে রাখার পরিকল্পনা করেছিল তারা প্রায় অবস্থার চাপে বা সুভাষচন্দ্রের আন্দোলন ও যুদ্ধের ফলে এক বৎসর সময় এগিয়ে নিয়ে এলো। ১৯৪৭ সালের আগষ্টেই বৃটিশ ভারত সাম্রাজ্য খাতায় কলমে ত্যাগ করল। ভুললে চলবে না যে আই. এন. এ. সেনানীর বিচার ও নৌ-বিদ্রোহের চাপের ফলে যা ঘটেছিল তখন কিন্তু ঐ উত্তাল ভারত ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে কোন বিকারগ্রস্ত রাজনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস তেমন কিছু ঘটেনি। এটা যে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর মহান ঐতিহাসিক কৃতিত্বের প্রতিফলন ও সুভাষচন্দ্রের একটি মৌলিক অবদান আজ তা বিশ্বজনবিদিত। কাজেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রই যে অখণ্ড ভারতবর্ষের সার্থক প্রতিষ্ঠাতা হতেন তা উপরের সকল তথ্যই পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

পঞ্চম অধ্যায়

১৯৯৭ সালের ৪ঠা আগষ্টে ভারতের সুপ্রিম ন্যায়ালয় নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু সংক্রান্ত যে ফরমান জারি করেছিল তার পশ্চাৎভূমি কি? ভারতবাসী কি সুভাষচন্দ্র বা নেতাজীকে যথার্থই চিনেছিলেন?

অতঃপর নিশ্চয়ই ভারতবাসীরা তাদের রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর যথাপর্যায়ে নিয়ে গিয়ে তার রূপ দিতে যা করণীয় তা ক্রমে ক্রমেই সেই পদক্ষেপে এগিয়ে যেতো অবশ্যই। যা এই খণ্ডিত ও হস্তান্তরিত ভারতবর্ষেও ১৯৪৭ সালের পর ভারতবাসী করেছিল। পৃথিবীর যেকোন রাষ্ট্রই যখন প্রথম নব জন্মলাভ করে, তখন তার প্রথম কাজই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো গঠন করা। সে রাষ্ট্র যতই ছোট বা বড় হোক না কেন। এমন একটা পরিস্থিতি বা কার্যক্রম যখন ক্রমে শুরু হতো তখন নিশ্চয়ই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু অনিবার্যভাবেই ভারতবর্ষে এসে পৌছে যেতেন। হয়ত বা কেউ কেউ এই প্রতিবেদকের এই সব কল্পনাকে উন্নাসিক বলে উচ্চস্বরে হাসবেন ও ব্যঙ্গ-কৌতুক করবেন। কিন্তু ভুলে যাবেন না ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রস্তাব জাতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে ৮ই আগষ্ট পাশ হবার পর মহাত্মাজীর যে মানসিক অবস্থান ছিল সেই অবস্থানে যদি জওহরলালরা থাকতেন অর্থাৎ যদি নেহেরু জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে দেশ স্বাধীন করার যে একনিষ্ঠ ব্রতে ব্রতী ছিলেন সেই অবস্থানে কঠোরভাবে থাকতেন তবে উপরে বর্ণিত ঘটনাই তো ঘটবার কথা। এবং তখন সুভাষচন্দ্র এসে যোগ দিতেন ও হাত মেলাতেন গান্ধী ও নেহেরুর সহিত। এরপর যে ফল সেটাই হতো প্রকৃত ভারতবর্ষ। এবং তখনই প্রকৃত স্বাধীনতা উপলব্ধি হতো সকল দেশবাসীর। কিন্তু তা ঘটবার আগেই ঘটে গেল মিরজাফরীয় খেলা সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে। বলা যেতে পারে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মিরজাফরীয় খেলা আর দেশের সঙ্গে মিরজাফরীয় খেলা দুই-ই সমার্থক ও সত্য। এই মিরজাফরীয় খেলা অন্তবর্তী সময়ে না ঘটলে আই. এন. এ. যুদ্ধের পর খুব স্বাভাবিকভাবেই নেতাজী মহাবীরের বেশে দেশে উপস্থিত হতেন। তখন গান্ধী-সুভাষ-নেহেরুর সমন্বয়ে ভারতবর্ষে যা ঘটত তাই হতো প্রকৃত স্বাধীনতা। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজীর অনুপস্থিতিতে খালি ময়দানে নেহেরু রাজনীতি বা পলিটিক্স করে যা সর্বনাশ ঘটালেন তার ক্ষতিপূরণ কয়েক শতাব্দীতে হবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ কথার যথার্থতা

আমরা কাশ্মীরের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি। ভারত বিভাজনের প্রসঙ্গ না হয় বাদই থাকল।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যে আজও পৃথিবীতে বর্তমান সকল কর্মকাণ্ডে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত এবং স্বামী বিবেকানন্দের ইঙ্গিত কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং রাজযোগের মহাযোগী তার সাক্ষ্যপ্রমাণ শুধু গবেষকদের গবেষণাগারে কিম্বা দেশবিদেশের মহাফেজখানায় শোভা পাচ্ছে না। এসব কথা আজ আর নতুন করে ঘোষণার অপেক্ষায় নেই। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের মহামান্য ভারত সরকারের প্রযত্নেই রয়েছে প্রায় দশহাজার গোপন নথিপত্র বিশিষ্ট ফাইল। এবার ভাবুনতো একজন ব্যক্তি সম্পর্কে ভারত সরকারের হাতেই রয়েছে যখন দশহাজার গোপন ফাইল-বন্দী নথি তখন আলোচ্য বা কথিত ব্যক্তির পরিধির ব্যাপকতা কত সুদূর প্রসারী হতে পারে? পারবেন কি আপনি বা যে কেউ অথবা আমি পারবো কি তার পরিমাপ করতে? আর এত বিপুল সংখ্যক যে ফাইল-বন্দী নথি আছে তাতো শুধু ভারত সরকারের মহাফেজখানার চিত্র। এমনি যে কত ফাইল ও নথি নেতাজী সুভাষ সম্পর্কে বিশ্বের দেশে দেশে মজুদ আছে তা কি কোন মানুষের থাকতে পারে? এমনটি কি ভাবা যায়? এত স্তূপীকৃত ফাইল যে ভারত সরকারের মহাফেজ খানায় আছে এ কোন গালগপ্প নয়। সাম্প্রতিক কালের পত্রপত্রিকায় তার তথ্য সম্বলিত এই ফাইলের পরিসংখ্যানটাও আমরা সবই জানতে পেরেছি। আশা করি দেশের লোকেরও তা দৃষ্টি এড়ায়নি, এখানেই কিন্তু ব্যাপারটার পূর্ণচ্ছেদ ঘটেনি। বর্তমানে এখন ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য রাজ্যপাল ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্যামল সেন মহাশয়। তিনি কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তখন তাঁরই এজলাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সংক্রান্ত মরণোত্তর ভারতরত্ন দেবার ব্যাপারে একটি মামলা চলছিল। এই মামলা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে রুজু করেছিলেন বিজন ঘোষ নামক একজন এ্যাডভোকেট এবং তাঁর কিছু সহযোগী যাঁরা অবশ্যই নেতাজী অনুরাগী বলে পরিচিত। এই মামলা চলাকালীন মহামান্য প্রধান বিচারপতি ভারত সরকারের নিকট আদেশ জারি করেছিলেন নেতাজী সংক্রান্ত ঐ দশহাজার ফাইল ও নথি আদালতে জমা দেবার জন্য। কিন্তু ভারত সরকার ফালতু অজুহাতে তা জমা দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য তখন সংবাদপত্রে যথেষ্ট শোরগোল শোনা যায় যে ঐসব ফাইলের মধ্যে অনেক মূল্যবান খাস তথ্য সম্বলিত ফাইল চুরি গেছে বা উধাও হয়েছে। এইসব তথ্য সমকালীন সংবাদপত্রে জনগণ প্রত্যহই দেখে থাকবেন। এখানেই শেষ নয়। ভারত সরকার বেগতিক দেখে প্রিভিলাইজ মোশন এনে এই মামলা দিল্লীর সুপ্রিম ন্যায়ালয়ে স্থানান্তরিত করেন। তাতেও কি ভারত সরকার পরিত্রাণ পেলো? সেখানেও মহামান্য প্রধান বিচারপতি ঐ একই আদেশ বহাল রাখলেন। সেখানেও ভারত সরকার বললেন, জনস্বার্থের খাতিরে নেতাজী সংক্রান্ত কোন ফাইলই তারা আদালতকে দিতে সক্ষম নয়। এবার ভাবুন, এই সরকার কাদের সরকার? এই সরকার কি ভারতীয় জনগণের নির্বাচিত সরকার নাকি বৃটিশ শ্বেতপ্রভুদের কাছে নাক-খত দেওয়া সফেদ চামড়ার পরিবর্তে কালো চামড়ায় মোড়কে মোড়া বৃটিশের

আবহমানকালের ভারতীয় নেটিভ দাস? সুভাষচন্দ্রের ইস্যুতে এদের এই তো ট্র্যাডিশনাল বীজমন্ত্র। বুঝুন অর্ধশতাব্দী যাবৎ ভারত সরকার এবং তার অনুচরবর্গরা বলছে নেতাজী মৃত। অথচ তারা তার সাক্ষ্য হিসাবে কোন নথি দেখাতে পারবে না। পারবে কোথা থেকে? ব্যাপারটাইতো একটা সহস্রাব্দের সেরাতম আন্তর্জাতিক ব্লাফ বা চক্রান্ত। ভাবুন এই প্রতারক ব্লাফবাজ সরকারের প্রযত্নে আমাদের এই দেশে বসবাস! আরও ভাববার আছে। একজন তৃণমূলীও যদি মারা যায় তবে ডাক্তারি নথি বা সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া সেই মৃতকে মৃত বলা যায়না বা দাহও করা যায়না। এই সরকারেরই কিন্তু এইসব নিয়মাবলী। অথচ নেতাজীর মত এক সহস্রাব্দের খ্যাত ব্যক্তিকে কথার যাদুতে কবর দেবো তবু নথি দাখিল করবো না। কত বড় দুরাচারী এই সরকার। শ্বেত আলখাল্লার বদলে নেটিভ দেশী আলখাল্লা বই আর কি ব্যবধান ঐ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে এদের? ওরাও দেশের শত্রু, নেতাজীর শত্রু, এই কালো বা বাদামী চর্মাবৃতরাও দেশের শত্রু ও নেতাজীর শত্রু। নেতাজীর শত্রু হলেই তো দেশেরও শত্রু। কারণ ঐ দুটোই তো সমার্থক। নেতাজী বেঁচে আছেন এই কথা স্বীকার করলে তাদের যে করে কম্মে খাওয়া তা একেবারে চিরতরে ঘুচে যাবে। তখন জনরোষ ঠেকাবে এসে কোন জওহরলাল বা মাউন্ট ব্যাটেনের দল। এবার ভারত সরকার মহামান্য সুপ্রিম আদালতে এসে আপন পঙ্কেই আপনি নিমজ্জিত হলো। এই হলো ভারত সরকারের মত এক বিশাল শক্তিশালী সরকারের পরিণতি। **পরিশেষে মহামান্য রাষ্ট্রীয় ন্যায়ালয়ের প্রধান যা ইতিকর্তব্য তাই ঘোষণা করলেন। সুপ্রিমকোর্টে মামলা রুজুকারীদের নথিপত্র সাক্ষ্যপ্রমাণে যে তথ্য পাওয়া গেল তার ভিত্তিতে চুলচেরা বিচার করে গত ১৯৯৭ সালের ৪ঠা আগষ্ট এক ঘোষণাপত্রে মহামান্য প্রধান ন্যায়ালয়ের সিদ্ধান্ত, নেতাজী সুভাষকে আর মৃত বলা যাবে না। এখানেই এই অধ্যায় শেষ নয়। সুপ্রিমকোর্ট এক আদেশ নামায় জানিয়ে দিল নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে বলে এ যাবৎকাল যতকিছু বইপত্রে গালগপ্প লেখা হয়েছে তা ভারত সরকারের ঘরে জমা দিতে হবে অথবা সরকারকে জানাতে হবে। অথবা সরকার এই সংক্রান্ত ঐ জাতীয় সবকিছু বাজেয়াপ্ত করে নেবে। ঐরূপ আদেশনামা কলিকাতা হাইকোর্টেরও ছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের আদেশনামার তারিখ ছিল ৩০শে এপ্রিল ১৯৯৮ সাল।**

আমাদের পরম সৌভাগ্য দেশটা হচ্ছে ভারত নামক একটি মহান দেশ, আবার দুঃখের সঙ্গে আক্ষেপের সঙ্গে এও বলতে হচ্ছে এ দেশটি একটি আজব দেশও বটে। এরূপ আদেশ যদি ভারত না হয়ে পৃথিবীর অন্য কোন দেশ হতো তবে ঐসব প্রতারকের দল, গালগপ্প লেখকের দল আজ হাড়েহাড়ে টের পেতো কত ধানে কত চাল। এই জাতীয় প্রবঞ্চনার দায়ে স্বয়ং সরকার বাহাদুরকেই লালবাতির আশ্রয়ে আশ্রিত হতে হতো। কিন্তু দেশটা ভারত বলে দুষ্টচক্রীর দল না সরকার, না ঐসব ভ্রষ্টাচারী লেখকের দল কিছুই হদিস করতে পারল না। বলাবাহুল্য যারা মৃত্যু-তত্ত্ব লিখে দু' পয়সা করে-কম্মে খাচ্ছিল তাদের বাড়া ভাতে চাই পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত হবার কারণও ঘটল। শুধু এখানেই পূর্ণচ্ছেদ নয়। তাদের এই যে 'হামহনু' এক নেতাজী বিশেষজ্ঞ এরূপ

হুঙ্কার দিয়ে চলার ও বলার একটা কায়দা রপ্ত করে ফেলেছিল তা আজ কোন এক অদৃশ্য শক্তি চিরতরে ছিনিয়ে নিল। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে ভারত সরকার বিগত পঞ্চান্ন বৎসরাধিককাল যাবৎ তাদের মন্ত্রগুরুর 'বীজমন্ত্র' বুক উচিয়ে বিশ্বের হাটে ঘাটে মাঠে একই ভাঙ্গা রেকর্ড বাজিয়ে বাজার মাত করে চলছিল। এই ভারত সরকারের সাথে ঐসব তাত্ত্বিক বিশারদদেরও একই করুণ অবস্থা প্রাপ্ত হলো। অর্থাৎ 'পুনর্মুষিক ভব' হয়ে তারা আপন আপন শ্রীঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই বন্দী হয়ে গেল। অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলো। কোথায় গেল গত পঞ্চান্ন বছরের বাগাড়ম্বর আর হম্বিতম্বি। এর নামই হচ্ছে নেতাজী সুভাষ। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আজীবন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চরণে নিবেদিত প্রাণ স্বামী আনন্দভারতী মহারাজ তাঁর বক্তৃতায় একস্থানে বলেছেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র সশরীরে উপস্থিত না হয়েও যদি মহাশক্তিধর ভারত সরকারের তথা বৃটেন, আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় পঞ্চান্ন বৎসরের লালিত পালিত স্বপ্ন ও সাধকে এক নিমেশে এক কথায় সৌধস্থ করতে পারেন তবে তিনি উপস্থিত হলে কি যে করবেন তা কি কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারেন? বিগত অর্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবৎ বিশ্বের শক্তিজোট ও তাঁর শক্তিতে নাস্তানাবুদ ও নাজেহাল প্রতি পদক্ষেপে। অথচ লোকটির হদিস আজও কেউ করতে পারলো না। এতো সেই যেন দৈত্যপতি হিরণ্যক্যশিপুর সর্বত্র চক্রধারী নারায়ণ দর্শন। এর চেয়ে পরম আশ্চর্য আর কি কিছু পৃথিবীতে হতে পারে? তাঁর হাতে আজ যে সকল খেল খতম হবার পালা। সেই বোধজ্ঞান এখনও না হলে কোন যাদুকর বা আরব্য জীন এসে তাদের বাঁচাবে? এখন যে সবার অবস্থা ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। তবু চৈতন্য উদয় না হলে কারো কিছু করার নেই। সুতরাং যা ভবিতব্য তাই ঘটবে এবং তাই ঘটতে চলেছে।

এখানে স্বামী আনন্দভারতী মহারাজের জের টেনে বলতেই হয় এর চেয়ে সুন্দর বাস্তব ও যুক্তিযুক্ত জিজ্ঞাস্য আর কিছু কি হতে পারে? এই প্রসঙ্গে দীন এ অভাজনের দাবি নেতাজী সুভাষচন্দ্র উপস্থিত হলে যা করতে পারেন তার পরিধি পরিমাপ করা কোন পার্থিব জীবের কম্ম নয়। সে যে পরিধির যত বড়ই পণ্ডিত দার্শনিক হোক না কেন। তিনি স্বয়ং ছাড়া যদি নেতাজী সুভাষের আপন হাতে-গড়া কেউ তেমন থাকেন তবে তা স্বতন্ত্র কথা। তবে এই দীনজনের অন্তরাত্মা বলছে নেতাজী সুভাষ তথা শ্রীমদ্ সারদানন্দজীকে উপলব্ধি করতে বা বুঝতে পারেন শুধু আর একজন নেতাজী সুভাষ বা আর একজন শ্রীমদ্ সারদানন্দ মহারাজ। কারণ নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে বোঝার পাণ্ডিত্য ফলাতে গিয়ে পৃথিবীর বিশারদরা যে পরিচয় দিয়ে চলেছেন সেই ১৯৪৫ সাল বা তার আগে থেকে আজ পর্যন্ত, এমনকি আগামী যুগেও হয়ত দেবেন অনেকে। কিন্তু সেটা যে অন্ধের হস্তী দর্শন বই অন্য কিছু হবেনা, হতে পারেনা, তো বলার অপেক্ষা রাখেনা। যেমন মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাঙ্গস্বরূপ পৃথিবীর কাছে আজও রহস্যময় ও অধরা তেমনটি যে নেতাজী সুভাষের বেলায়ও ঘটবে তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠেই বলা যেতে পারে। এই বক্তব্যের সমর্থনে আসুন একটু যাচাই করে

দেখা যাক কিছু হদিস করা যায় কিনা। কোন বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে সংক্ষেপে একটু অনুশীলন করে দেখা যেতে পারে।

আমরা একটু পিছনে তাকালে দেখতে পাই সুভাষচন্দ্রের তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের কিছু কর্মকাণ্ড। ঐ আন্দোলনের শেষার্ধে ১৯৩৯ সালে আমরা দেখেছি গান্ধীজীর মত প্রতাপান্বিত ব্যক্তিকে যুবক সুভাষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে হেরে যেতে। তাই গান্ধীজী বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "পট্টভির পরাজয়ই আমার পরাজয়।" অথচ গান্ধীজী তখন ভারতগ্রাসী একব্যক্তিত্ব। তাঁর জনপ্রিয়তার পরিধির এত ব্যাপকতা। বৃটিশ কর্তারা এই গান্ধীকে 'কাইজার অব হিন্দ' এই মহাভূষণে ভূষিত করেছিল। এমনি একজন ভারতখ্যাত জনসম্মোহিনীর প্রবাদপুরুষ ১৯৪৬ সালে আক্ষেপ করেছেন যে, সুভাষ দেশে থাকলে দেশের এই বেহাল হতো না। স্মরণীয় যে, যে-সুভাষচন্দ্র তৎকালীন নেতৃকুলের মাঝে কনিষ্ঠতম ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর পরিধি তখনই এমন গগনস্পর্শী যে তাঁর পরিধির নাগাল কোন নেতাই পাচ্ছিলেন না। এমনকি সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশরাও সদ্য সদ্য এক রাজনৈতিক যুবকের পরিধি ও কূটনৈতিক দূরদর্শীতার কাছে ছিল দূর অস্ত। এ কথার সত্যতা তো এখানেই প্রতীয়মান যে, ১৯৪১ সালে যখন তিনি গৃহবন্দী অবস্থা হতে পলায়ন করেন তারপর বৃটিশের সাম্রাজ্যের শেষদিন তো বটেই এমনকি আজ পর্যন্ত তারা সুভাষচন্দ্রের কোন হদিস করতে পারেনি। শুধু তাই না। সুভাষচন্দ্র সেদিন থেকে আজও ঐ বৃটিশ কিম্বা বিশ্বশক্তির সঙ্গে সমানে কূটনৈতিক প্রতিটি ব্যাপারে চাল চেলে চলেছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বীর মতই। মোদ্দা কথা সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি সকলের দুরধিগম্য। এককথায় অজেয় পুরুষ ও পৌরুষ। তাই বলতেই হয় প্রকৃত অর্থে সুভাষচন্দ্রকে বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারেনি। আরও স্মরণীয় যে, ভারতবর্ষ হতে সুদূর বার্লিন এবং বার্লিন থেকে দূর প্রাচ্য সিঙ্গাপুরে গমন ঘটেছিল জল, স্থল, অন্তরীক্ষের ভয়ঙ্করতম শত্রু পরিবেষ্টিত ব্যূহের ভিতর দিয়ে। এই অভিযান বা পৃথিবীর অবিস্মরণীয় সেরাতম ও চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়ে ছিলেন এই সুভাষচন্দ্র। তখনও তাঁর নেতাজী পর্যায়ে উত্তরণ ঘটেনি। তখনও সুভাষ বসু নামেই তিনি নামী বা খ্যাত। এই চিত্র থেকে পাচ্ছি ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীই সুভাষচন্দ্র বসুকে চিনতে জানতে বা বুঝতে পারেনি। তাই বলছিলাম নেতাজী তো তারও সহস্র যোজন দূরের নক্ষত্র। তাতেই পরিষ্কার আমরা ভারতবাসীরা সুভাষচন্দ্র বসুকে দেখে থাকলেও বা কিঞ্চিৎ মাত্রায় বুঝে থাকলেও নেতাজীকে আমরা কখনও দেখিনি। আর বোঝা তো সুদূরের অধ্যায়। আবার শুনছি তারও সহস্র সহস্র যোজন বা সহস্র সহস্র আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রের নাম হচ্ছে শ্রীমদ্ সারদানন্দজী মহারাজ। এবার বলুনতো এ দীন অভাজনের যে দাবি সুভাষচন্দ্র বা সারদানন্দজীকে চিনতে জানতে হলে চাই আর একজন সারদানন্দজীকে একথা কি সত্যই উন্নাসিকের প্রলাপ? নাকি তার মধ্যে কিঞ্চিৎ বাস্তববোধ আছে। তাহলে বলতেই হয় স্বামী আনন্দভারতী মহারাজ যা বলেছেন তা একবিন্দুও অতিশয় উক্তি বা আবেগের কথা নয়। এবার একবার চিন্তা করুন কি কারণে ভারতবর্ষের তথাকথিত কাণ্ডারীর দল

কেন সুভাষ বিরোধিতা করবে না। এহেন সুভাষচন্দ্রের বিকিরণের আলোচ্ছটা বা মহাজাগতিক রশ্মি তারা বরণ করবে কোন মাহাত্ম্যে বা দৈববলে? এইসব নষ্ট চণ্ডীরা তো তাঁর রশ্মিচ্ছটায় ভস্মাবৃত হয়ে যাবে। তাই তো তাদের সুভাষ বিরোধিতায় এমন ঘৃণ্য চক্রান্ত। তবে তাদের চক্রান্তে যে তারা পরিত্রাণ পেয়েছেন বা পেয়ে গেছেন তাতো নয়। তারা পরিত্রাণ পেয়েছে নেতাজী সুভাষের অন্তহীন করুণায় ও অনুগ্রহে মাত্র। তবে চিরকাল যে তারা সীমাহীন অপরাধ করে ক্ষমা পেয়ে যাবেন বা পরিত্রাণ পেয়ে যাবেন তার কোন নিশ্চিত গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না বা বলা যায় না। তাই বলতেই হচ্ছে সাধু সাবধান। কারণ মানবতার শত্রু সে যেই হন তাকে তিনি ছেড়ে দেবেন না। একদিন যে সেই সৌরশক্তি প্রকটিত হবে তা অনিবার্য সত্য। আর সে সত্য মেঘাবৃত ভেদ করে উদ্ভাসিত হতেও খুব দেরী নেই। তখনই প্রমাণিত হবে স্বামীজীর সেই ঐতিহাসিক বাণী 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'-এর গোপন তাৎপর্য কি ও কত সুদূরপ্রসারী।

এখানে সহজাতভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে এমন যিনি এক সৌরশক্তির আধার তাঁর কিসের ভয় বা কিসের ভাবনা? অন্তত তাঁর তুল্যমূল্য বিচারে ভারতীয় অপরাপর নেতাদের কাছে? এর উত্তর হচ্ছে যেহেতু তিনি ক্ষমতালোভী বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদে বিশ্বাসী নন তাই তিনি কারো ক্ষমতা কেড়ে নেবার পাত্র নন। এ ব্যাপারে আলোচনার পর্যাপ্ত অবকাশ আছে, যা আমরা পরবর্তী কোন উপযুক্ত প্রেক্ষাপটে আলোচনা করবো। উপরের পর্যালোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হলো যে সুভাষচন্দ্র বা নেতাজীকে পৃথিবীর কেউই চিনতে বা উপলব্ধি করে উঠতে পারেনি। যাঁরা কিঞ্চিৎমাত্র উপলব্ধি করেছিলেন তাঁরাই বলতে বাধ্য হয়েছেন, আমরা স্তালিন, তোজো, বা হিটলারের ভয়ে ভীত নই। আমরা ভীত সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে। বৃটিশ নায়ক চার্চিল আরও বলেছিলেন যে, "It will take thousand years for them to enter the periphery of philosophy of politics. রাজনৈতিক দর্শনের শুধু বাইরের আবরণ স্পর্শ করতে ভারতীয় নেতাদের হাজার বছর সময় লেগে যাবে"। (নেতাজীর অজ্ঞাত অধ্যায়। ড: সুশান্ত মিত্র)। সেই কারণেই সেই ১৯৪১ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে যেনতেন প্রকারেণ বন্দী করতে বা হত্যা করতে যতপরনাস্তি সচেষ্ট। যদিও বৃথা, সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কিন্তু বলাবাহুল্য তাঁদের নাকের ডগার উপর দিয়ে তিনি চলাফেরা করলেও তাঁরা সুভাষচন্দ্রের চিহ্নটুকু পর্যন্ত হদিস করতে পারছে না। এ থেকেই তারা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে তাদের সম্পর্কে ঐ ঐতিহাসিক উক্তির মর্মার্থ কতখানি নিষ্ঠুরতম ও বাস্তব। বলাবাহুল্য এঁর নাম নেতাজী সুভাষ। কাজেই ভারতীয় নেতারা তো কোন ছার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষে উপস্থিত থেকেও যদি নেতৃত্বপদ থেকে দূরে থাকতে চাইতেন তবে কি তা সম্ভব হতো? পণ্ডিত জওহরলালকে কি সফল রাজনৈতিক নেতা বলা যায়? সুভাষচন্দ্র কেন ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন? সুভাষচন্দ্র কি স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করেছিলেন? ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতি ও জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ খারিজ করার পশ্চাৎভূমি কী ছিল? সুভাষবৈরিতা করতে গিয়ে জওহরলালের ভূমিকা কি? জওহরলালকে কি খলনায়ক বলা যায়? জওহরলাল কি সুভাষবৈরিতা করতে গিয়ে স্ববিরোধিতা করেননি? ভারতবর্ষ বিভাজন গান্ধী হত্যা, সুভাষ বর্জন এই তিন মহাকাণ্ডের নায়ক কে বা কারা?

আসুন আবার আমরা আমাদের মূলপর্বে ফিরে যাই। স্মরণীয় যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে সুভাষচন্দ্র চিঠির পর চিঠিতে জানিয়েছিলেন তিনি ভারতবর্ষে ফিরতে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। কারণ ৩৮ কোটি ভারতবাসী (তৎকালীন অখণ্ড ভারতবর্ষের জনসংখ্যা) তাঁর ভারতে আসার পথ চেয়ে বসে আছে। কিন্তু জওহরলাল ওইসব পত্রের উত্তর দিয়েছেন বলে জানা যায়নি। যদিও বা দিয়ে থাকেন তা যে হবে বিভ্রান্তিকর সেটাই প্রত্যাশিত। অন্তত ইতিপূর্বে জওহরলালের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে কিন্তু সেটাই স্বাভাবিক। সুভাষচন্দ্র যে স্বাধীনোত্তর খণ্ডিত ভারতবর্ষে ফেরার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা ঐসব পত্রেই প্রকাশিত ছিল সন্দেহ নেই। ১৯৪৭ সালে ফিরবেন বহুবার বলেছেন।

এবার ধরুন তিনি আসলেন ভারতবর্ষে। এবং তখন যে রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা কার্যকরী হতে যাচ্ছিল তাতে নির্বাচনের আয়োজন হচ্ছে ধরে নিলাম। এবং এও ধরে নিলাম যে তিনি আয়োজিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছেন না। এবার ভাবুন যে ভারতবাসী একটি নামের সম্মোহিনী শক্তিতে উদ্বেল, এমনকি সেই ব্যক্তির অর্ধশতাব্দীকাল তাঁর

অনুপস্থিতিতেও তাঁর দেশবাসী আজও পূর্ববৎতো বটেই এমনকি ততোধিক সম্মোহিত এবং উদ্বেলিত তাঁকে কি সহজে তাদের নেতৃপদে নির্বাচন না করে ছাড়তো? তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। অথবা বলা যেতে পারে গোটা কংগ্রেসী কর্মকাণ্ডই-চলে যেতো সুভাষচন্দ্রের করতলে। তখন ঐসব নেতাদের পলায়নই হতো বাঁচার একমাত্র পথ। অথবা সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করা। উল্লেখ্য ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাদের কাণ্ডারী ছিল স্বয়ং গান্ধীজী। সেই গান্ধীজীও কিন্তু ১৯৪২ সালের বোম্বাই এ. আই. সি. সি. সম্মেলন থেকে, হয়ে পড়েছিলেন পরোক্ষে নেতাজীপন্থী। "Now we find many of Gandhiji's decision have been coloured those of Subhas's. His mysterious escaped from India inflamed him much". গান্ধীজী কেন এবং কিভাবে নেতাজীপন্থী হলেন তা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এমন অবস্থায় অবশিষ্ট নেতাদের যা পরিণতি হতো তার অবশ্যম্ভাবী ফল সহজেই অনুমেয়। তাহলে এক্ষেত্রেও দেখছি যে জওহরলালরা সুভাষচন্দ্রকে না চাইলেও দেশবাসীর আর্তির কাছে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য হতো। উভয়ক্ষেত্রে উভয় প্রচেষ্টারই ফল এক। একদিকে সুভাষচন্দ্র দেশবাসীর চাহিদাকে উপেক্ষা করতে পারছেন না। আবার অপরদিকে জওহরলালরা নেতাজীকে দেশবাসীর কাছে অচ্ছুৎ প্রমাণ করতে পারছেন না। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র উপস্থিত থাকলে নেতৃত্বের আসনে আসীন না হয়েও রেহাই পাচ্ছেন না। তাহলে কোন অবস্থাতেই জওহরলাল ভারতের কর্ণধার হচ্ছেন না। অতএব ছলে বলে কৌশলে সুভাষ বিরোধিতাই হবে জওহরলাল, প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি নেতাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বাঁচাবার একমাত্র পথ বা উপায়। এখন এই উপায় বা পন্থাকে কার্যে রূপায়িত করতে হলে এবং সুভাষ বিরোধিতাকে রূপ দিতে হলে এবার যা যা প্রয়োজন তার সব কিছুই বিনা দ্বিধা ও লাজে করে ফেলতে হবে। তাই পণ্ডিত জওহরলাল সুভাষ চরিত্র হনন থেকে আরম্ভ করে কোন কিছুই করতে জীবনে বাদ রাখেননি। এবং ইতিহাস বলছে জওহরলাল যা করেছেন সুভাষচন্দ্রকে হেয় করতে গিয়ে তার সব কিছুই একতরফা খেলা। এখানে যেন সেই ছায়ার সঙ্গে জওহরলালের যুদ্ধ ঘোষণা। সুভাষচন্দ্র যদি জওহরলালের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হতেন তবু কথা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্রতো তা ছিলেন না। প্রতিপক্ষীয় যদি বলতে হয় তবে সুভাষচন্দ্রের প্রতিপক্ষীয় ছিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ। তিনি তাদের সাথেই রাজনৈতিক দাবা খেলা খেলেছেন। এটাই স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা।

এবার অবশ্যই ভেবে দেখার আছে জওহরলাল কতখানি দূরদৃষ্টির অধিকারী? বা কত বড় কূটনৈতিক ছিলেন। উত্তরে বলা যায়, ছিলেন তো বটেই। তবে ভাববার আছে, সুভাষচন্দ্রের তুলনায় কি খুব বড় মাপের? সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তিনি যে আজ কূটনৈতিক বিজয়ীবীর তাতো স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু বস্তুতপক্ষে যে তা নয় তার প্রমাণও ইতিহাসই বলে দিচ্ছে। জওহরলালের কূটনৈতিক ব্যর্থতার কোন সীমা-সংখ্যা ছিল না। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। এখানে প্রসঙ্গের খাতিরে

যা বলার তাই আমরা স্মরণ করবো। হ্যাঁ, বৃটিশের দ্বারা যে তিনি বারে বারে প্ররোচিত হয়ে দেশবৈরিতা করেছেন তা সম্পূর্ণই সুভাষবৈরিতার পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে। প্রথমতঃ সিঙ্গাপুরের ঘটনা এবং দ্বিতীয়ত ১৯৪৬ সালে নৌ-বিদ্রোহের সময়। ১৯৪৬ সালে নৌ-বিদ্রোহের ফলে অখণ্ড ভারতবর্ষকে হাতের মুঠোয় পেয়েও এককথায় বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে তা নস্যাৎ করেছিলেন। ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললেন। কারণ ঐ এক— সুভাষচন্দ্র। তখন নেহেরুর অবস্থা এমন একস্থানে পৌচেছিল তাতে শুধু বন্দী ভারতসম্রাট শাজাহানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় বারবার। কারণ তখন এমন একটা মানসিক অবস্থা জওহরলালের যে যখনই তাঁর মানসপটে সুভাষচন্দ্রের চেহারা মনে পড়েছে বা ভেসে উঠেছে তখনই তিনি দুঃস্বপ্ন দেখার মত চমকে চমকে উঠেছেন ভীতিবিহ্বলে কাতর হয়ে। কারণ জওহরলাল যে তাঁর বিবেকের দরবারে চূড়ান্ত অপরাধী অন্তত সুভাষচন্দ্রের ব্যাপারে তা তিনি মর্মে মর্মে জানতেন। তথাপি সুভাষের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনে বৃটিশের সাথে যেকোন শর্তে কোলাবরেশনে আপত্তি কোথায় এবং কেনই বা? কেননা জওহরলল তো সর্বক্ষণ একটা কথাই স্মরণে মননে রেখেছেন সেটা হলো সুভাষচন্দ্র তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী। অথচ সুভাষচন্দ্রের একটি ছাড়া দুইটি লক্ষ্য ছিল না। একমাত্র ধ্যানজ্ঞান তাঁর মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচন। তারপরের অধ্যায় তো ভারতবাসীর বিচার্য। এবং সেটা তাদের হাতে। তারপরের অধ্যায়ে তাঁর আর প্রয়োজন হবে কি হবে না তা নিয়ে সুভাষচন্দ্রের কোন মাথাব্যথা ছিল না। এই ব্যাপারটা যে কতখানি সত্য তারও যথার্থ তথ্য আছে। ব্রহ্মযুদ্ধের পর তিনি ইচ্ছা করলেই আসতে পারতেন এবং ভারতবর্ষের ক্ষমতাও দখল নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেই জগতের লোকই ছিলেন না। তারও প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে। এই ব্যাপারটা যে কতদূর সত্য তা আমরা দেখতে পাই যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থান করছেন তখন টোকিওতে গ্রেটার এশিয়া সম্মেলন হয়েছিল। সেই সম্মেলনে জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তেজো সুভাষচন্দ্রকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠনেতা বলে অভিহিত করেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিনম্রচিত্তে প্রতিক্রিয়ায় জানালেন যে তিনি নিজে ভারতবর্ষের নেতা নন। তিনি শুধুমাত্র একজন এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত উপস্থিত পর্যবেক্ষক। তার বেশী কিছু নয়। ভারত স্বাধীন হলে ভারতবাসী যাঁকে তাদের নেতা নির্বাচন করবেন তিনি হবেন ভারতবর্ষের নেতা। এ থেকেই প্রতীয়মান হচ্ছে তাঁর একটি লক্ষ্য ছাড়া দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল না। ভাবা যায় তাঁর কি দেবদুর্লভ চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও সুমহান ত্যাগ! আর তিনি কিনা হবেন ভারতীয় নেতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী? তিনি যে ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সভাপতির জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন তা শুধু স্বাধীনতা আন্দোলনকে লক্ষ্যে পৌছাইবার এক অদ্বিতীয় উদ্দেশ্যে। ইতিপূর্বে যতজন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন তাঁদের কারোই স্বাধীনতার চরম লক্ষ্য ছিল না বলেই তিনি ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে

বাধ্য হয়েছিলেন। এবার আমাদের বুঝতে আর অসুবিধার কথা নয় কেন এবং কি অশনিসঙ্কেতের তাড়া খেয়ে ভারতবাসীকে অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতা থেকে কংগ্রেসী নেতারা চিরতরে বঞ্চিত করেছিল। এবার বলুন এই প্রতিবেদক যে মূল্যায়নের ছবি এখানে এঁকেছে তা যুক্তিসিদ্ধ কিনা।

তাই যদি বাস্তব ছবি হয় তাহলে বলতেই হয় জওহরলাল ও তাঁর অনুগামীরা যা করেছেন তা সম্পূর্ণ সুভাষচন্দ্রের প্রতিপক্ষীয় রাজনৈতিক শিবিরের লোকের ধর্মই পালন করেছেন। তাহলে কি এটাই প্রতীয়মান হচ্ছেনা, জওহরলাল, প্যাটেলদের মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা দখল। দেশের স্বাধীনতাটা ছিল তাদের কাছে উপলক্ষ মাত্র। এ পর্যন্ত চুলচেরা বিশ্লেষণে এটাই প্রমাণ হচ্ছে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তী ক্ষেত্রেও তাই প্রমাণিত। গান্ধীজীকে সুভাষচন্দ্রের লাইনে চলতে দেখে পৃথিবী থেকেই তাঁকে চিরতরে সরানো হলো। আর অপরদিকে অনিবার্য কারণে সুভাষচন্দ্রতো দেশের মাটিতে অনুপস্থিত বটেই। তথাপি জওহরলাল, প্যাটেলরা এক ঘৃণ্য খেলায় মেতে গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতির মহা সুযোগে রাজনীতির ময়দানে ওয়াকওভার নিয়ে পূর্ণ সুযোগের সৎব্যবহার করলেন আজীবন। জওহরলাল, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি নেতারা প্রতিপক্ষীয় শিবিরের হয়ে যা করণীয় তা যে অতি দক্ষতার সঙ্গে করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। অথচ তখন ভারতবর্ষের মাটিতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ যদি কিছু বোঝায় তা হলে তারা হচ্ছেন বৃটিশরা। তারা তো শুধু গান্ধী-সুভাষদের প্রতিপক্ষ নয়। তাঁরা গোটা ভারতীয় জাতিরই প্রতিপক্ষ। তাই যদি হয় তবে জওহরলাল, প্যাটেলরা প্রতিপক্ষ হচ্ছে কোন যুক্তিতে? অথচ কার্যক্ষেত্রে তাঁরা তাই করেছিলেন। তাহলে এটাই প্রমাণ হয় জওহরলালরা বৃটিশের ইশারায় চলছিল বা চলত। তা না হলে তাঁরা গান্ধী-সুভাষের বিরুদ্ধে যায় কোন যুক্তিতে?

গান্ধীজী প্রথম প্রথম সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রাজনীতির লুকোচুরি খেলা খেললেও, দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন সুভাষচন্দ্রের লাইনেই চলতে চেষ্টা করেছিলেন বা সুভাষচন্দ্রের লাইনকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন তখন তিনি বা সুভাষচন্দ্র কোন ক্রুর রাজনীতি জাতীয় কংগ্রেসের অন্য নেতাদের সাথে করেন নি। এই দুই মহানায়ক যদি তথাকথিত নেতাদের সঙ্গে ক্রুর দাবার চাল চালতেন তবে কি জওহরলাল প্রভৃতি নেতারা সাফল্যলাভ করতেন? (স্মরণীয় যদিও সুভাষচন্দ্র তখন দেশের মাটিতে অনুপস্থিত)। এসব প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই আসছে ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে। কাউকে ছোট করা, বড় করা কিন্তু ব্যক্তির ব্যাপার নয়। কারণ এইসব চরিত্র কোন নভেল নাটকের চরিত্র নয়। এই চরিত্রগুলো স্বতঃসিদ্ধ ইতিহাসের চরিত্র। এ-সবই ইতিহাসের উপাদান। এগুলি কেউ ইচ্ছা করলেই হেরফের ঘটাতে পারেন না। একথা যেকোন প্রাজ্ঞই আশা করি স্বীকার করবেন।

উপরের বর্ণিত তথ্যচিত্রের একটু গভীরে প্রবেশ করলে আমরা দেখতে পাবো

যে জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল ও তাদের সহযোগীদের ঐ কর্মসূচী কোন তাৎক্ষণিক ঘটনা নয়। এসব ক্রুর কর্মসূচী তাদের বহু বৎসর পূর্বেই স্থিরীকৃত ছিল। এটা তাঁদের অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী। সুভাষ বিরোধিতার ব্যাপারটা জানতে ও বুঝতে হলে আমদের অবশ্যই একটু পিছন ফিরে তাকাতে হবে। এবং এর অন্তর্নিহিত তথ্য উপলব্ধি করতে হলে আমদের চলে যেতে হবে ১৯৩৯ সালের তৎকালীন কংগ্রেসী ইতিহাসে। ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। দ্বিতীয়বার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া সুভাষচন্দ্রের নিকট খুব একটা সুখকর হয়নি। সেই ইতিহাসটাও আমাদের জানা একান্ত দরকার। বিশেষ করে যারা নবীন প্রজন্মের তাদের জন্য ব্যাপারটা তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর ইতিহাসের ছাত্রের কাছে তো অপরিসীম গুরুত্ব আছেই। সেদিন যে দৃষ্টির আড়ালে কি ঘটছিল তা কেবল বৃটিশ শীর্ষকর্তারা জানতেন। আর জানতেন গান্ধীজী। এই ঘটনার সময় গান্ধীজীর যে ভূমিকা সেই ভূমিকা জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে বলতে গেলে সবথেকে দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক। বিশেষ করে এই সময়ই গান্ধীজী যেন 'কাইজার অব হিন্দের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। উল্লেখ্য কাইজার হচ্ছে জার্মানদেশের একসময়ের রাষ্ট্রপ্রধানের সর্বোচ্চ সম্মান বা উপাধি। বৃটিশ সরকার গান্ধীজীকে এই উপাধিতে একসময় ভূষিত করেছিলেন। তা আমরা পূর্বেই অবগত হয়েছি।

সুভাষচন্দ্র যখন ১৯৩৯ সালের নির্বাচনে দাঁড়াবার কথা স্থির করলেন তখন গান্ধীজী এক জরুরী 'তার'বার্তায় তাঁকে অনুরোধ করলেন যেন সুভাষচন্দ্র আগত নির্বাচনে কংগ্রেস সভাপতির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে দূরে থাকেন। কারণ ইতিমধ্যে গান্ধীজী এবং জাতীয় কংগ্রেস তাদের প্রার্থী কে হবেন তা স্থির করে ফেলেছেন। তাদের প্রার্থীর নাম ড: পট্টভি সীতারামিয়া। সুভাষচন্দ্র যখন গান্ধীজীর প্রেরিত তারবার্তা পেলেন তখন সুভাষচন্দ্র ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে শান্তিনিকেতনে। সেখান হতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে জবাবি তারের মারফৎ জানলেন যে, "Bapuji bless me for the coming election". ভাবুন একটু ব্যাপারটা। কারণ ইতিহাস থেকে জানা যায় তখন জাতীয় কংগ্রেস সুভাষ বিরোধিতায় ছিল চরম অবস্থায়। এই পরিস্থিতিতেও কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু বিজয়ী বীরের সম্মান পান। এই বিজয় ছিল সুভাষ অনুরাগীদের নিকট তথা যুব ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের পর অন্য কোন ভারতীয় নেতার পক্ষে গান্ধীজীর মতের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব গ্রহণ বা পাশ করানোই ছিল অকল্পনীয়। এমত অবস্থায় এক মহামান্য কাইজার অব হিন্দের বিরুদ্ধে কিছু করা গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য করা হতো। এহেন এক অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের মত এক সদ্যযুবক জাতীয় কংগ্রেসের মত একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী গোষ্ঠীর এবং গান্ধীজীর মত অদ্বিতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাঞ্জা কষার কথা ভাবা এককথায়

ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্র কি করলেন, না, তিনি বাপুজীকে সম্মানের শীর্ষে বসিয়ে তাঁর আশীর্বাদপ্রার্থী হলেন। অথচ আজকের রাজনৈতিক ভূমিতে দাঁড়িয়ে মূল্যায়ন করলে বলতেই হয় গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে, 'মুর্দ্দাবাদ, মুর্দ্দাবাদ' কিম্বা আরও কত কি। তাই বলছিলাম একটু ভাবুন।

উপরের কাহিনী বলছে গান্ধীজীর দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র অপ্রার্থীত বা প্রতিপক্ষীয় হলেও সুভাষচন্দ্রের মানস দৃষ্টিতে কিন্তু গান্ধীজী প্রতিপক্ষীয় ছিলেন না। এটা যে চরম সত্য তা সুভাষচন্দ্র আজীবনব্যাপী অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন। প্রমাণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যখন সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ সরকার প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪৩ সালে, ২১ শে অক্টোবর, তখন তিনি সর্বপ্রথম বাপুজীর আশীর্বাদ কামনা করে রেডিও ম্যাসেজ পাঠান। এ-সংবাদ সকলেরই জানা আছে। আরও কথিত আছে বা শোনা যায় যে, যখন সুভাষচন্দ্র ১৯৪৫ সালে সাময়িকভাবে যুদ্ধে পিছু হটেন জাপানের আত্মসমর্পণের পর, তখন তিনি সায়গন থেকে অন্তর্ধানের পূর্বে তাঁর সেনানীদের নাকি নির্দেশ দিয়েছিলেন পরবর্তী পদক্ষেপের নির্দেশ নেবার জন্য বাপুজীর কাছে যেতে। অবশ্যই এখানে স্মরণীয় তিনি নিজেও কিন্তু ১৯৪৫ সালে আত্মগোপনের পরপরই গান্ধীজীর সকাশে উপস্থিত হয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করে যান, এই হচ্ছেন সুভাষচন্দ্র। আর এই হচ্ছে সুভাষচন্দ্রের মূল্যবোধ। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট ঘটনা এখানে সন্নিবেশিত করছি যা খুবই প্রাসঙ্গিক ও গভীর তাৎপর্যময়। যথা, ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি থেকে বিতাড়িত হবার পর সদ্যসদ্য কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমানে সুবোধ মল্লিক উদ্যানে) এক জনসভা করেন। ঐ জনসভায় তখন কংগ্রেসী বড় বড় দিকপালরাও উপস্থিত। এমত অবস্থায় আমজনতার মধ্যে একজন গান্ধীজীর বিরুদ্ধে অশোভন উক্তি করে। সেই উক্তি সুভাষচন্দ্রের গোচরীভূত হওয়ামাত্র তিনি ঐ ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন এবং জনসভাস্থল থেকে চলে যেতে বলেন। ব্যাপারটা কত ছোট! কিন্তু তাৎপর্যটা বিচার করুন। আর আজকের মঞ্চের নায়করা স্বয়ং অশ্লীল ভাষায় বক্তৃতার সূচনায় ফিতা কাটেন। এই ছিলেন সুভাষচন্দ্র। এমন আদর্শ মূল্যবোধ কোথায় পাবেন? বলতে গেলে স্বয়ং গান্ধীজীও জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একমাত্রায় তাঁর আদর্শবোধ সমান ভাবে ধরে রাখতে পারেন নি। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আচরণেই তো তাঁর মাত্রাবোধ ফ্লাকচুয়েট করেছে বা ডিগ্রী পরিবর্তন হয়েছে। অথবা বলা যেতে পারে, মানদণ্ড এক জায়গায় থাকেনি। যাক, ঐ মূল্যবোধের বিচারে আজকের মূল্যবোধ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? অথচ বলতে নেই মূল্যবোধটা তো আজকের মানদণ্ডেই সেরা হওয়া উচিত ছিল। কারণ আমরা নাকি আজ শিক্ষায়, সভ্যতায়, আচার-আচরণে, কৃষ্টিতে এতটাই উন্নত হয়েছি যার ফলে মঙ্গলগ্রহে বসবাসের ভাবনায় ভাবিত। অর্থাৎ কিনা উন্নতিতে সমস্ত যুগের সবকিছুকে হার মানিয়েছি। অথচ বলাবাহুল্য আজ এক প্রতিদ্বন্দ্বী অপর প্রতিদ্বন্দ্বীকে অশালীন ভাষায় সম্বোধন ছাড়া কোন ভাষাই যেন অভিধানে পাননা। এবার ভাবুন, সুভাষচন্দ্রের সৌজন্যতা, নম্রতা, ভদ্রতা এবং সর্বোপরি শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা কোন্ স্বর্গীয় সুষমায় সঞ্জীবিত ও মণ্ডিত ছিল।

প্রেক্ষাপটের সৌজন্যে আমরা ১৯৩৯ সালের মূলস্রোত থেকে অনেকটা সরে পড়েছিলাম। আসুন আবার আমরা মূল প্রতিপাদ্যের ও মূল বিষয়বস্তুর জগতে ফিরে যাই। সুভাষচন্দ্রের যে ১৯৩৯ সালে অভূতপূর্ব জয়, সেই ঐতিহাসিক জয়কেই জাতীয় কংগ্রেসীরা ইতিহাসের আর এক নিকৃষ্টতম ঘৃণ্যতার দ্বারা আচ্ছন্ন করেছিল যা আজকের প্রজন্ম বা ভাবীকালের প্রজন্ম শুনলে আঁতকে উঠবেন। এখানে গান্ধীজীর সেই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়। যথা, "পট্টভি সীতারামায়ার পরাজই আমার পরাজয়"। এই উক্তিই শেষ নয়। গান্ধীজী সঙ্গীদের সান্ত্বনা দিতে ও তাদের মনের বল যোগাতে আরও যা বলেছিলেন তা আরও মারাত্মক। সেই কথা আজ যেকোন ভারতবাসীই বিশ্বাস করতে নিশ্চিতভাবেই সন্দেহ পোষণ করবেন। পরবর্তী উক্তি ছিল আরও তীক্ষ্ণ ও বিষধর। তিনি বলেছিলেন, "শত হলেও সুভাষ তো আর দেশের শত্রু নয়।" তাহলে এইসব বক্তব্যে কি এটা প্রতিপাদ্য হয়না যে জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধীজীর চোখে সুভাষচন্দ্র তাদের যথার্থই শত্রু? ১৯৩৯ সালের ঘটনাবলীর এই তো মাত্র সূচনা। আসুন তারপর কি কি ঘটেছিল তা কিঞ্চিৎ নিরীক্ষণ করি। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের পর যা যা পার্টির প্রশাসনিক পরিকাঠামো অনুসারে করণীয় তার পালা এবার শুরু। সাধারণতঃ নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট কংগ্রেস গঠনতন্ত্র অনুসারে কার্যকারী সমিতি গঠন বা ওয়ার্কিং কমিটি তৈরী করেন। এখানে স্মরণীয় যে ঐ নির্বাচেনের পর সুভাষচন্দ্র বসু ১০৪°/৫° জ্বরে আচ্ছন্ন এবং খুবই দুর্বল হয়ে পরেছিলেন, এই অবস্থায় তাঁকে স্ট্রেচারে করে মূল অধিবেশনে আসতে হয়েছিল। তারপর ঐ জ্বর অবস্থায়ই সেখানে এসে তাঁর সভাপতির বক্তব্য রাখেন। কংগ্রেসের অপরাপর কর্তাদের অভিযোগ সুভাষচন্দ্রের এই স্ট্রেচারে করে আসাটাও ছিল তাঁর নাটক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসীদের কটাক্ষের অন্ত ছিল না। এই সময় কংগ্রেসী প্রখ্যাত নেতা জে. বি. কৃপালনির উক্তি ছিল যে, সুভাষের মস্তকে খিল ঠুকে দিলে তা 'স্ক্রু' হয়ে ফিরে আসবে। কৃপালনি আরও বলেছিলেন, 'সুভাষ মুর্খের স্বর্গে বাস করছে।' 'বসুর নির্বাচন দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে।'—প্যাটেল। 'সাবধান নর্মদার জল খুব গভীর। ফুটো নৌকোয় চড়ে নদী পার হতে গিয়ে শেষে ডুবে মরব নাকি?'—গোপালাচারীয়া। ব্যঙ্গবিদ্রুপের তো একটা মাত্রা আছে। কিন্তু গান্ধীজী থেকে কংগ্রেসী বড় বড় নেতাদের সেই কাণ্ডজ্ঞানটুকু পর্যন্ত ছিলনা। তখন সুভাষচন্দ্রের পরিধি আর কিছু না হোক কংগ্রেসের যেকোন নেতার সমপর্য্যায়ের তো ছিলেন, যদি তাই হয় তবে কি এটুকু প্রত্যাশা করা অন্যায় যে সমানে সমানে সমান আচরণ বা সৌজন্যতাবোধ প্রদর্শন? সেই কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত ঐ কংগ্রেসীদের ছিল না।

অবশেষে সুভাষচন্দ্র যখন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের জন্য উদ্যোগী হলেন তখন তৎকালীন মহারথিরা সবাই যথা, পণ্ডিত জওহরলাল, পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, রাজা গোপালাচারীয়া, জে. বি. কৃপালনি, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রভৃতি নেতারা এক অভিনব দূরভিসন্ধিমূলক জঘন্য প্রস্তাব পাশ করালেন

জাতীয় কংগ্রেসে। সুভাষচন্দ্রকে সম্পূর্ণ কোনঠাসা করার জন্যই যে এই ব্যবস্থা তার কি কোন ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন আছে? এই কংগ্রেসের জন্ম ১৮৮৫ সালে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত শতাধিক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু সেই জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসে কোনদিনই এই জাতীয় কোন ব্যতিক্রমী প্রস্তাব পাশ হয়নি। ঐ সময়ই কেবল এরূপ এক চক্রান্তমূলক ঘৃণ্য ঘটনা ঘটেছিল। কারণ সুভাষচন্দ্রকে নিষ্ক্রিয় করাই ছিল—এই চক্রান্তের মূল লক্ষ্য। ঐ প্রস্তাবে ছিল, গান্ধীজীর অনুমোদন ব্যতিত কোন ওয়ার্কিং কমিটি করা যাবে না বা কোন সদস্য নির্বাচন করাও চলবে না। এই যে প্রস্তাব পাশ হলো এটা গান্ধীজীর ইঙ্গিত ছাড়াই ঘটে গেল বলতে হবে? যদি তাঁর কোন সম্মতি না থাকবে তবে এমন কংগ্রেস গঠনতন্ত্র বিরোধী অবৈধ কর্মকে তো গান্ধীজী এককথায় নাকচ করে দিতে পারতেন। এককথায় কংগ্রেসের মাঝে শুধু সুভাষ বোসের পায়ে বেড়ী পরাবার অছিলায় গান্ধীজীর এমন কাইজারীয় শাসন কায়েম হলো অত্যন্ত ঘৃণ্য কায়দায় বাঁকা পথে। অথচ গঠনতন্ত্র অনুসারে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টই ঐ ওয়ার্কিং কমিটি গঠনেরও সকল কর্মকাণ্ডের কর্তৃত্বের সর্বময় অধিকারী। এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে এই ঘৃণ্য খেলা যখন চলছে কংগ্রেসে, তখন বিশ্বকবি ˉ বীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধীজীকে এক জরুরী বার্তা মারফৎ অনুরোধ করেন তিনি অর্থাৎ গান্ধীজী যেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। এমন আশ্চর্যের ব্যাপার যে গান্ধীজী বিশ্বকবির এই আবেদনেও সাড়া দেননি। এবার বলুন আমরা যারা গান্ধীজী গান্ধীজী করে তাঁকে অতি মানবীয় স্তরে পৌছে দিই, তারা তাঁর এমন আচরণ কি দিয়ে ঢাকবো? এই বক্তব্য বা তথ্য কোন ব্যক্তির মনগড়া ব্যাপার নয়। এই সবই ইতিহাসের উপাদান। বলুন ইতিহাস থেকে এসব তথ্য মুছবেন কি করে। এসব কলঙ্ক তো গান্ধীচরিত্রে আবহমানকাল জ্বলজ্বল করে ভাস্বর হয়ে তাঁর কথা ঘোষণা করবে।

গান্ধীজীর অনুরাগী কংগ্রেসীরা যখন সুভাষচন্দ্রকে এরূপ ঘৃণ্য চক্রান্তের বেড়াজালে বেড়ী পরাবার গবেষণায় ব্যস্ত, তখন সুভাষচন্দ্র কিন্তু ভারতমাতার বৃটিশ শৃঙ্খল মুক্ত করার স্বপ্নে বিভোর। তাঁর মাথায় তো তখন মুক্তির অদম্য চিন্তা। এই মানসে তিনি তখন বহির্ভারতে বিদেশী রাষ্ট্রসুমহের সহিত অস্ত্রচুক্তি সম্পাদন করছেন অতি গোপনে। যদিও বৃটিশ গোয়েন্দাদের দৃষ্টি তা এড়ায় নি। তাঁদের গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুসারে "বৃটিশ কর্তৃপক্ষ গান্ধীজীকে ডেকে হুঁশিয়ারী দিলেন এবং জানতে চাইলেন ইতিপূর্বে যে বৃটিশকর্তারা সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসী মঞ্চ থেকে বিতাড়নের কথা বলেছিলেন তার কতদূর কি হলো?" কেননা তাদের হাতে যেসব খবরাখবর আছে তাতে দেখা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্র গোপনে গোপনে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রায় প্রস্তুত। এখানে খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করার মত ঘটনা হচ্ছে যে জাতীয় কংগ্রেস থেকে কোন সক্রিয় রাজনৈতিক সহযোগিতা না পাওয়া সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র তাঁর কর্মসূচী থেকে এতটুকুও বিচ্যুত নন। এইভাবে যখন তিনি প্রায় বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মুখোমুখি তখনই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হলেন। যদিও ইতিপূর্বে যখন তিনি ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন তখন প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন, কিন্তু এবার তিনি সাধারণ সদস্যপদ থেকেও বহিষ্কৃত হলেন অর্থাৎ কংগ্রেসী মঞ্চ ও ব্যানার যাতে তিনি ব্যবহার করতে না পারেন তার পাকা ব্যবস্থা স্বরূপ তাঁকে তিন বৎসরের জন্য বিতাড়িত করা হলো। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসীদের চূড়ান্ত বিরোধিতা বা পরবর্তী স্তরে কংগ্রেসের সদস্যপদ খারিজ করার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না এতদিন এবং বোঝাও যাচ্ছিল না ব্যাপারটা কি হতে পারে? তখন এক অঘটন ঘটল। তাতেই যাবতীয় জট খুলে সব প্রাঞ্জল হলো। "তৎকালে কে. এম. মুন্সি নামে একজন খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ছিলেন। তিনি হাটে হাড়ি ভাঙলেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে গোপন তথ্য আদান-প্রদানের নির্বাচিত ব্যক্তি বা সঞ্চালক। তিনি জানালেন তার মাধ্যমে বৃটিশকর্তারা গান্ধীজীর সহিত গোপনে পত্র বিনিময় করেন। এইরূপ একটি পত্রের বিষয়বস্তু ছিল যাতে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়ন করা হয়। এবং সুভাষচন্দ্রের হাত থেকে কংগ্রেসের সাংগঠনিক সকল ক্ষমতা কেড়ে তাঁকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করা হয়। তারপরই কার্যত পর্যায়ক্রমে গান্ধী থেকে কংগ্রেসের সবাই বৃটিশের অত্যন্ত অনুগত হয়ে সেই মোতাবেক কাজ করে গেলেন নিশ্চুপে যাতে সুভাষচন্দ্র বসু ও দেশবাসী কেউ আঁচ করতে না পারেন।" (এ তথ্যের সোর্স—বক্তৃতামালা আনন্দভারতী)

এখানে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে এই গোপন সংবাদ শ্রীযুক্ত কে. এম. মুন্সি প্রকাশ না করলে আজও হয়ত কোন গবেষক বা ঐতিহাসিক তা জানতে পারতেন না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এক্ষেত্রে গান্ধীজীও একজন বৃটিশের অনুগত ব্যক্তিত্ব বই আর কিছু নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ নায়ক চার্চিলের একটি বিশেষ উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি যা বলেছিলেন ভারতীয় নেতৃবর্গ সম্পর্কে তা যে সম্পূর্ণ সঠিক ছিল তা উপরের বর্ণিত ঘটনাতে প্রমাণিত। তিনি বলেছিলেন, "নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বাদে অন্যান্য ভারতীয় নেতারা হচ্ছেন প্রতারক, দুরাত্মা, ও যথেচ্ছ লুণ্ঠনকারীর দল"। "রাজনৈতিক দর্শনের শুধু বাইরের আবরণ স্পর্শ করতে ভারতীয় নেতাদের হাজার বছর সময় লেগে যাবে।" "It will take thousand years for them to enter the periphery of philosophy of politics". (নেতাজীর অজ্ঞাত অধ্যায়, ড: সুশান্ত মিত্র)

উপরের চিত্র থেকে গান্ধীজীর কর্মকাণ্ডের ধারায় আরও বোঝা যাচ্ছে যে এখানে তিনি প্রকৃত অর্থে কংগ্রেসের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নয়, কর্তা হচ্ছেন ইংরাজ রাজশক্তি। এই যদি ঘটনা হয়, তাহলে কি গান্ধীজীকে ভারতবরেণ্য শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ও সর্বোচ্চ আসনে আসীন একজন যুগান্তকারী মহাপুরুষ বলে বিনা বাক্যব্যয়ে বিনা দ্বিধায় বলা যায়, না মেনে নেওয়া যেতে পারে? এর বিচারের ভার রইল আপনার বিবেকের

ন্যায়ালয়ের উপর। গান্ধীজী একাধারে মহাত্মা এবং একাধারে জাতির জনক। এ ব্যাপারে তো কোন প্রশ্ন নেই, এটা স্বতঃসিদ্ধ। যদি তাই হয় তবে ঐসব প্রশ্নের অবকাশ হচ্ছে কেন? এসবই ইতিহাস বলছে। কারো তো মনগড়া তথ্য নয়। এইসব প্রশ্ন সম্পূর্ণ ইতিহাসের ছাত্রের।

উপরের তথ্যচিত্র থেকে আমরা দেখলাম জাতীয় কংগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্র বসুকে বিতাড়নের এক চমকপ্রদ নাটক। এই প্রহসন নাটকের পর সুভাষচন্দ্রের পক্ষে আর দেশের ভিতর বসে মাতৃভূমিকে যে উদ্ধার করা একতিলও সম্ভব না বা কাম্য নয় তা সুভাষচন্দ্রের থেকে কে বেশী বুঝবেন? তাই তিনি কংগ্রেসীদের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে এবং অনন্য উপায় হয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। অথচ আজকের প্রজন্ম আমরা কি জানি? জানি, সুভাষচন্দ্র বসু স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে গেছেন। কিন্তু এই যাওয়া মুখের কথায় হবার ছিল না, খুব সহজ ব্যাপার ছিলনা। এই যাওয়া যে কি ভয়ঙ্কর এবং তা যেকোন কল্পকাহিনীর চেয়েও রোমহর্ষক। কেননা এই ঘটনার রোমাঞ্চকতার যে ইতিবৃত্ত তা পৃথিবীর ইতিহাসে মানব সভ্যতার সূচনা থেকে আজও পর্যন্ত অদ্বিতীয়। এমন কাহিনী পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত অন্য কেউ সৃষ্টি বা রচনা করতে পারেন নি। এর প্রাকৃতিক ফিচার চিত্রের জন্য নয়। এর যে রাজনৈতিক ফিচার চিত্র তা পৃথিবীর মানব ইতিহাসে ইতিপূর্বে তো ঘটেইনি, বরং দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যেতে পারে এমনটি বোধহয় সৃষ্টি যতকাল বেঁচে থাকবে সেই ভবিষ্যৎ কালেও এমন রাজনৈতিক ফিচার বা পটভূমি আর সৃষ্টি হবে না। কারণ সমগ্র ভূমণ্ডলের জল-স্থল-অন্তরীক্ষ সমকালীন মারনাস্ত্রের শ্যেনদৃষ্টিতে নিবদ্ধ এমন একটি পরিবেশকে এবং শত্রুর কবলিত পরিমণ্ডলকে একবস্ত্র পরিহিত পলায়নরত একব্যক্তির তা বোধহয় আর কখনও ঘটবে না। শুধু এই ঘটনাই নয়। সুভাষচন্দ্রের মহাজীবনে তাঁর চলার শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত ১০৩ বৎসরের জীবনে যখন যা ঘটেছে সমস্ত কিছুই মহাব্যতিক্রমী ঘটনা। যাক সে কথা। আমরা যা বলছিলাম সেখান থেকে আবার শুরু করবো। সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ তাহলে কোন প্রকারেই স্বেচ্ছাকৃত দেশত্যাগ নয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখবো এই ভাবেই যুগে যুগে কিছু মতলববাজ দুষ্টলোক ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিপথে চালিয়ে কলুষিত করেছে। তারপর কোন প্রশ্ন উঠলেই হয়ে যায় প্রশ্নকর্তার অপরাধ। এছাড়া তো আছেই বিদেশী ঐতিহাসিকদের প্রস্তের পর প্রস্ত বিকৃতির পলেস্তারের প্রলেপ। যে কারণে আজও ভারতবাসী হিসাবে আমরা আমাদের প্রকৃত ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হয়ে পরের শেখানো বুলিকেই বলছি ভারতবর্ষের ইতিহাস। এখানে আলোচ্য মহানায়কের যে-ইতিহাস এ-পর্যন্ত আমরা পেয়েছি তার আগাগোড়াই বিভ্রান্তিতে ভরা। সুভাষবিরোধিতার যে চক্র, এই চক্র শুধু ভারতেই বিদ্যমান নয়। এই চক্র সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী। তার কারণ সুভাষবিরোধিতার যথার্থ অর্থ হচ্ছে মানবিকতার বিরোধিতা। এই দুটোই এক কথায় সমার্থক ও ধ্রুব।

বস্তুতপক্ষে সুভাষবিরোধিতা সেই ১৯৩৯ সাল থেকেই তীব্রভাবে শুরু। আর তাকে বিদেশী ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় গন্‌গনে আঁচের তাপ দিয়ে করে তুলেছে পৃথিবীর সেরা ন্যক্কারজনক। যার গতিপ্রকৃতি আজ ২০০১ সালের অন্তিমলগ্নে দাঁড়িয়েও দেখা যাচ্ছে পূর্বের তুলনায় আরও ব্যাপক আরও গতিশীল। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা যত পরিপক্ক হচ্ছে ততই যেন বিরুদ্ধবাদীদের নাভিশ্বাস উঠছে আর তার সাথে সাথে তাদের বৈরিতার মাপ পরিসীমা দিগন্তভেদি হয়ে উঠছে।

অথচ পর্দার আড়ালে যে কি ভীষণ ভূমিকম্প প্রবাহিছে তার প্রতি কারো ভ্রূক্ষেপ নেই যদিবা কেউ কখনও অজান্তে ফাঁকফোকরে চুপিসারে কিছু দেখতে চায় তখন তাকে সমাজ ও রাষ্ট্র বলে বিকৃত মস্তিষ্ক। যেহেতু সমাজ ও রাষ্ট্রের হাতেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও আইন রয়েছে তাই তাদের কোন ব্যক্তিকে উন্মাদ প্রতিপন্ন করা কোন কঠিন বা দুরূহ ব্যাপার নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রখ্যাত সুভাষ অনুরাগী ও সুভাষভক্ত এম. পি. মথুরালিঙ্গম থেবর সুভাষচন্দ্রের সাথে চীনে নয় মাস অবস্থান করে এসে নেতাজী সুভাষের বর্তমান কর্মকাণ্ডের কথা এবং সে সম্পর্কে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণার চেষ্টা করলেন ১৯৫১ সালে তখন তাঁকে সমাজ ও রাষ্ট্র বিকৃত মস্তিষ্কের বলে ঘোষণা করল। যে দেশের আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলকথা হচ্ছে মিথ্যার বেসাতি করা সেই রাষ্ট্রের কাছে এরচেয়ে বেশী কি প্রত্যাশিত হতে পারে? হ্যাঁ, সুভাষচন্দ্রকে বিতাড়িত করেছিল যারা ভারতবর্ষের মাটি থেকে সেই ভেকধারী স্বাধীনতা সংগ্রামী খল তথা শঠতাচারীর দল বৃটিশের আঁচল ধরে তখনকার মত রক্ষা পেলেও আজ আর তারা তাদের পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছে না। এবং শান্তিও পাচ্ছে না। পাবে কোথা থেকে? তা যদি তারা পেয়েই যায় তবে যে স্বামী বিবেকানন্দ মিথ্যা হয়ে যায়। আর যাই হোক স্বামীজী তো মিথ্যা হতে পারেন না। হয়ত কেউ বলবেন এই উন্নাসিক আবার স্বামীজীকে ধরে টানাটানি করছে কেন? উত্তরে বলতেই হয়, এত সহজ তত্ত্বটাও বুঝলেন না? স্বামীজীর উপর যে ভিত্তি করেনি সে তো মোমের পুতুল। অদৃশ্য হবেই। কারণ তথাকথিত সবাইতো চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ সর্বদা করতে অভ্যস্ত ও ব্যস্ত। কিন্তু চালাকির আয়ুতো ক্ষণস্থায়ী। এটার ধর্মই তো চালাকি ও শেষ তার অস্তিত্বও শেষ। তারপর চালাকির রামধনুক বা মেঘাবৃতি কেটে পড়লেই প্রতাপান্বিত সূর্যের স্বপ্রকাশ, তাঁকে ঠেকায় কে? এ তথ্যের সত্যতা কত সুগভীর ও কঠোর তা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মাঝে ও আমাদের ভারতরাষ্ট্রের মধ্যেই প্রকটিত। আসুন ব্যাপারটা একটু অনুধাবন করি। যথা, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে সুভাষচন্দ্র আজ পৃথিবীর শুধু অদ্বিতীয় পুরুষ ও পৌরুষ নয়, পৃথিবীর পৃথিবী-কাঁপানো সিংহপুরুষরাও নতজানু নতশির তাঁর কাছে। এর জীবন্ত উদাহরণ আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি ও আলোচিত হয়েছে এবং আগত অধ্যায়েও আলোচনার অবকাশ আছে। আর মিথ্যার বা চালাকির উপর দাঁড়িয়েছিল বলে আজ ভারতীয় নেতারা দেশটাকে নিয়ে এবং দেশের জনগণকে নিয়ে এমন নয়ছয়

খেলছে। এরচেয়ে বড় সত্য আর কি হতে পারে? এই তথাকথিত নেতারা চেয়েছিল চরমতম সত্য যে সূর্য, সেই সূর্যকে একটি মৃতপদার্থ বলে প্রতীয়মান করতে আর যা নাকি চরম শঠতার মাধ্যমে তারা করেছে অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তর তাকে তারা প্রমাণ করতে চেয়েছিল চরমসত্য। কিন্তু তাদের চালাকির পরিণতি তারা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। তাদের ভেকধরার ফল যে আজ তাদের প্রতি পদে পদে তাড়া করছে। সেই ইতিহাসটা কি বলে আসুন তা একটু দেখি।

যদিও ইতিমধ্যে তার কিছু কিছু তথ্যচিত্র আমরা পেয়েছি। তবু আরও গভীরে আর কোন তথ্য লুক্কায়িত আছে কিনা বা জাতীয় কংগ্রেস ছাড়াও অন্য কোন জাতীয় পার্টির কিছু কৃতিত্ব আছে কিনা তাও আসুন একটু দেখে নিই অন্য পরিচ্ছদে যাবার আগে। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি নেতাজী সুভাষচন্দ্র জওহরলালকে একাধিক পত্রে জানিয়েছিলেন তিনি দেশে আসতে উদ্‌গ্রীব। ঐ সকল পত্র সম্পর্কে গান্ধীজীও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। আর ছিলেন বলেই তিনি বলেছিলেন সুভাষ যথাসময়েই ভারতবর্ষে ফিরবেন। এখানে উল্লেখ্য ১৯৪৫ সালে সুভাষচন্দ্র বৃটিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করে যান। কাজেই দেখা যাচ্ছে গান্ধীজী এসব ব্যাপারে বিস্তৃত ভাবেই অবহিত ছিলেন। তাই তিনি তথাকথিত রেণকোজি মন্দিরের ছাই সম্পর্কে বলেছিলেন ওই ছাই আদৌ কোন মানুষেরই নয়। "কিসিকো লাশ জ্বালা দিয়া হোগা"। এরই কিছুদিনের মধ্যে তিনি সুভাষচন্দ্রের জননী প্রভাবতীদেবীকে এক জরুরী তারবার্তায় অবহিত করেন যাতে সুভাষচন্দ্রের বাড়ীতে তাঁর কোন পারলৌকিক ক্রিয়াদি না করেন। সেই সময় গান্ধীজী এক টেলিগ্রামে জানিয়েছিলেন প্রভাবতীদেবীকে, "Thank God what purported to be authentic has proved to be wrong". (৩০/১১/৭০, আ. বা.) এ ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও গান্ধীজীকে পত্র মারফৎ অনুরোধ করেছিলেন মাতা প্রভাবতীদেবীকে ঐ সংবাদটি পৌঁছে দেবার জন্য। এছাড়া গান্ধীজী জাতীয় কংগ্রেসকেও সুভাষচন্দ্রের পারলৌকিক ক্রিয়া বা শোকপ্রস্তাব থেকে বিরত রাখেন। এইসব তথ্যাতথ্যই হয়েছিল গান্ধীজীর কাল। তার ফলেই গান্ধী হত্যা। এইসব তথ্যের খবরাখবর যে বৃটিশ গোয়েন্দা রাখত এবং বৃটিশ সরকারের জানা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাই তার ফলও গান্ধীজী হাতে হাতেই পেয়েছিলেন। যদিও আমরা ভারতবাসী এবং বিশ্ববাসী জানি যে নাথুরাম গড়সেই ছিল গান্ধী হত্যার নায়ক। কিন্তু বস্তুতপক্ষে কি তাই? আসুন এই প্রবাহমান চালচিত্রটাকে একটু ওলটপালট করে দেখি কিছু তথ্য পাওয়া যায় কিনা। গান্ধীজীর ওই সব উক্তি বা সংবাদ পরিবেশন যখন হয়েছিল সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল কেমন ছিল। সে কথা আমাদের কঠোরভাবে মনে রেখে সব বিচার করতে হবে। গান্ধীজী ১৯৪২ সালের বোম্বাই এ. আই. সি. সি. সম্মেলনের পর থেকেই যে সুভাষগীতি শুরু করেছিলেন একথা ভুলে গেলে চলবে না। কারণ ওই সুভাষগীতির মাঝেই নিহিত ছিল গন্ধীহত্যার বীজ। জাতীয় কংগ্রেসের নিকট বিশেষ করে নেতাদের নিকট এবং বৃটিশ সরকারের দৃষ্টিতে তখন থেকেই তিনি হচ্ছেন আপদবালাই। একথা কোন

অবস্থাতেই ভোলা চলবে না। অপরদিকে জওহরলাল বেয়নেট নিয়ে শিকার সুভাষচন্দ্রকে খুঁজছেন। সর্বোপরি ইংরাজের বিশ্বখ্যাত গোয়েন্দা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বিশ্বের জল, স্থল, অন্তরীক্ষ মথিত করছে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ শিকার নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে ফাঁদে ফেলার জন্য। তখন গান্ধীজীকে সুভাষগীতি থেকে নিরস্ত করতে না পেরে জাতীয় কংগ্রেসের সৌজন্যে ধূর্ত বৃটিশ সুভাষচন্দ্রকে না পেয়ে গান্ধীজীকেই লক্ষ্যবস্তু করেছিল এবং তাঁকেই জালে বদ্ধ করেছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকের ওরফে। তা আর যেই জানুক বা না জানুক ধুরন্ধর বৃটিশ ও তার সাগরেদরা খুব ভালভাবেই জ্ঞাত ছিল। এসব যে আদৌ পাগলের প্রলাপ নয়, আসুন তা একটু প্রমাণের চেষ্টা করি। জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা তখন সুভাষচন্দ্রের যথারীতি শত্রু। আর সুভাষচন্দ্র তো বৃটিশের নিত্যসত্য শত্রু ছিলই। তাহলে সুভাষচন্দ্রের ভাষায় বলা যায় যে শত্রুর শত্রুই আমার পরম মিত্র। বৃটিশের কাছে সুভাষের এই তত্ত্ব একটি মহা তত্ত্ব। এই সূত্রের লাইন ধরে অগ্রসর হলেই দেখা যাবে গান্ধী হত্যা ও সুভাষ বোসকে বন্দী করার প্রচেষ্টা দুটো চিত্রপটই পরিষ্কার। বৃটিশ খুব ভালোভাবেই অবগত ছিল সুভাষের অনুপস্থিতিতে ভারতবর্ষের জনগণকে একমাত্র গান্ধীজীই প্রয়োজনে যেমন শান্ত করতে পারেন তেমনি উত্তালও করতে পারেন। পরন্তু অপরদিকে সুভাষচন্দ্র নামক সিংহপুরুষটি তো তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে আগেই বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু ১৯৪৫/৪৬-এর ভূমিতে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে যে গান্ধীজী আর সেই ১৯৩৯ সালের বা তৎপূর্বের গান্ধীজী নেই। তাঁর মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। যেন সুভাষের শক্তিই গান্ধীজীর আত্মায় ভর করেছে। অতএব বৃটিশের দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষবৃক্ষের ফসল ভারতবর্ষের মাটিতে ফলাতে হলে নেতাজীর ভর-করা আত্মা গান্ধীজীকে যেনতেন প্রকারেন কব্জায় রাখতেই হবে। গান্ধীজী বিন্দুমাত্র বেলাইন হলেই বৃটিশের ১৭৭৬ সালের মাস্টার পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে নিমেশে। (১৭৭৬ সালের বৃটিশ পরিকল্পনায় পরে আসছি।) অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসের রুই-কাতলারা তো আগেই হয় বৃটিশের জালে বন্দী অথবা নিজ নিজ মাহাত্ম্যে বৃটিশ সিংহের ফেউ বনে বসে আছে। সুভাষচন্দ্রও অনিবার্য কারণে নেই। এমন সুবর্ণ সুযোগে গান্ধীজীকে একটু বাড়তে দেওয়া মানে বৃটিশের দ্বিজাতিতত্ত্ব তো যাবেই সাথে সাথে জওহরলাল, প্যাটেলদের দিল্লীর ঐতিহাসিক কোহিনূর স্পর্শমণি স্পর্শিত ভারত সম্রাটের সিংহাসন ও সৌধে পরিণত হবে। বৃটিশের দান এমন বিশ্বসেরা উপঢৌকন কি কোন মূর্খও ছাড়ে? জওহরলাল তো বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত। সে কেমন করে মহামূর্খের পাদানির তলায় যায়? তার জন্য প্রয়োজনে একটি প্রাণী জবাই, তার বেশী বই তো নয়। অতএব গান্ধী আপদকে হটাও। কেননা আজকাল তিনি বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন, অতএব যেই কথা সেই কাজ। একাজ করতে না পারলে যে বৃটিশের একূলও যাবে ওকূলও যাবে। অর্থাৎ ভারত সাম্রাজ্য তো যেতেই বসেছে পরন্তু যদি বৃটিশের সাম্রাজ্য ছেড়েও তাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা না যায় তবে তাদের চলবে কোন দৌলতে। অতএব রাজার জাতির স্বার্থের কাছে তো গান্ধী বলে একজন ব্যক্তি তুচ্ছ। পরন্তু জাতীয় কংগ্রেসের মিরজাফর বা কুইসলিঙ্‌রা তো বৃটিশের কবজায় ক্রীড়নক হিসাবে তৈরী

হয়েই আছে। অতএব গান্ধী আপদকে হটাতে তো কোন কসরতই প্রয়োজনই নেই। সুতরাং আর কালবিলম্ব কেন? এর থেকে সুবর্ণ সুযোগ আর কি হতে পারে?

এই ছিল বৃটিশ কূটনীতির খেলা। আসল লক্ষ্য। অপরদিকে ভারতের তৎকালীন জাতীয় স্তরের সকল নেতাদের (অবশ্যই গান্ধীজী বাদে) দিল্লীর মসনদ পাবার দুর্বার লালসা। ইংরেজদেরও ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়া ব্যতীত গতি নেই। তাদের সে ঘোষণাও হয়ে গেছে। এমন একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে একটু ভিন্নপথে পরিচালনা করতে দোষ কোথায়? যুগেযুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসতো এভাবেই দুষ্টচক্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার স্বাভাবিক গতিপথ ভ্রষ্ট হয়েছে। এবার হলেই বা ক্ষতি কি? তাই উপস্থিত জাতীয় পর্যায়ের উচ্চাভিলাষিত নেতারা ইংরেজের সঙ্গে কোলাবরেশনে যদি তাদের অভীপ্সিত গোল হাসিল করতে পারে তাতে সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছাও পূর্ণ হবে আর ভারতীয় লোভী নেতাদের কাজও হাসিল হবে। বৃটিশের যে মূল অন্তঃর্নিহিত মতলব তাতো আমরা আগেই জেনেছি। বৃটিশের ভারত ছাড়তেই হচ্ছে। এমন অবস্থায় দেখা গেল খণ্ডিত ভারত পরিকল্পনা কার্যকারী করার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছেন তখন গান্ধীজী। গান্ধীজী ১৯৪৬ সালে নোয়াখালির পথে যাত্রার প্রাক্‌কালে বলেছিলেন,

"If the Congress wishes to accept partition, it will be over my dead body. So long as I am alive, I will never agree to the partition of India. Nor will I, if I can help it allow Congress to accept it."

(31st March 1947) (India wins freedom : Page 186)

এমন একটি অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতেই বৃটিশরা তাদের ইতিপূর্বে সৃষ্ট উপচারগুলিকে যথাযথ কাজে লাগাল। বৃটিশের মতলব যাই থাকুক না কেন নৈতিক প্রশ্ন তুলে এখানে অবশ্যই প্রশ্ন করা যায় বৃটিশ কি অন্যপথে কার্য হাসিল করতে পারত না? অন্তত লর্ড ওয়াভেল তো ঐ নৈতিকতার প্রশ্নটা উঠিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের এত বড় যুগান্তরকারী সর্বনাশ না করেও তো তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষা করতে পারত। তাদের ঐ সর্বনাশা সিদ্ধান্তের ফলে ভারতবর্ষের কি কি ক্ষতিসাধন করেছিল তা একটু দেখা যাক। প্রথমতঃ দেশকে দ্বিখণ্ডিতকরণ (কার্যত তখনই ত্রিখণ্ডিত হয়েছিল)।

দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার নামে ক্ষমতা হস্তান্তর।

তৃতীয়তঃ স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় তাতো নয়ই, ডোমিনিয়ান স্টেটাস এবং তার পশ্চাতে দাসত্ব শৃঙ্খলের অনেকগুলি শর্ত (যা অন্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে এই পুস্তকে)।

চতুর্থতঃ ভারতবর্ষের মাটিতে চিরকালের জন্য সুপ্রাচীন ভারতের একান্ত ঐতিহ্য বিরোধী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বীজ বপন। এবং দাঙ্গা সৃষ্টি। যার ফল আজও চলছে।

পঞ্চমতঃ শতাব্দীর সেরা ভারত সন্তান মহাত্মাগান্ধীর মত মহামানবকে চিরতরে বিনাশের পথ সুগম করে দেওয়া।

ষষ্ঠতঃ সহস্রাব্দের সেরা বিশ্ববরেণ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত নেতার নেতৃত্ব থেকে চিরতরে ভারতবাসীকে বঞ্চিত করা।

বৃটিশরা ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালে যে অবস্থা উদ্ভুত হয়েছিল তা সামাল দেবার ক্ষমতা কি তাদের ছিল? যদি না থাকে তবে তারা এমন সর্বনাশা পথে গেল কেন? তারা তো সমগ্র পৃথিবীকে একসময় শাসন করেছিল। একথা তো ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু তারা তাদের প্রতিবেশী আয়ারল্যাণ্ড দ্বীপকেই তো শাসন করতে পারছে না। বা ঠাণ্ডা রাখতে পারছে না। তবে কিসের ভিত্তিতে কি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লর্ড এ্যাটলি, লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও তাদের দুষ্টচক্রীরা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশের বুকে-পিঠে ছুরি মেরে এমন বিভাজনের মত এক ভয়ঙ্কর খেলায় মত্ত হয়েছিল? এইসব প্রশ্ন এবং ভারত বিভাগের ভয়ঙ্কর পরিণতির নৈতিক দায় কি জাতি হিসাবে ইংরেজরা ইতিহাসের বিচারে কোনদিক থেকে ক্ষমার যোগ্য? তারা কি কোনদিন ইতিহাস থেকে এই মসিলিপ্ত ঘটনা মুছতে পারবেন? তারা আজও কিন্তু আয়ারল্যাণ্ডের দাবী মানতে প্রস্তুত নয়। অথচ পৃথিবীর প্রাচীনতম একটি ঐতিহ্যশালী জাতিকে তাদের কলমের এক ঘায়ে দ্বিধা, ত্রিধা বিভাজিত করে দিল। এই কি তাদের দক্ষতা ও দূরদৃষ্টির মাপকাঠি? এসব ঐতিহাসিক প্রশ্নের কি তারা বা তাদের প্রজন্মান্তরেও জবাব দিতে পারবে? এই যদি হয় তাদের সুসভ্যতার নিদর্শন তবে তারে শত ধিক্। এটাই ইতিহাসের রায় তাদের জন্য, তাদের জাতির জন্য।

বৃটিশ জাতির এই ঐতিহাসিক ব্যাভিচারিতার ফলে তখন ভারতবর্ষের বুকে চলছিল এক সাম্প্রদায়িকতার মহাসাইক্লোন। এই সাইক্লোনের ফলে তখন ভারতবর্ষের বুকে কি কি ঘটেছিল তার একটু নমুনা আমরা পাচ্ছি বৃটিশ ভাষ্যকার লিওনেড মোসলের বিখ্যাত গ্রন্থে, উদ্ধৃতি সরকারী তথ্যনির্ভর বিবৃতি অনুসারে।

"60,000 of them were killed. But no, not just killed. If they were children, they were kicked up the feet and their heads. If they were girls, they were raped and then their breast were chopped off. And if they were pregnant they were disembowelled. (Page—279)"

"আর এক সরকারী হিসাবে নিহত ৬,০০,০০০। গৃহহারা ১,৪০,০০,০০০, ধর্ষিতা ১,০০,০০০, ধর্মান্তরিতা বা নীলামে বিক্রি করার সংখ্যা নির্ধারণ করা যায়নি।"

(সঙ্কলন : শুনুন ধর্মাবতার : পৃষ্ঠা—৬৯, নাথুরাম গডসে, গোপাল গডসে)।

এইসব ঘটনাই ভারত বিভাজনের পূর্বাপর ঘটনা। প্রাক-বিভাজনের দিকে তাকালে যা পাওয়া যাচ্ছে তা হলো মুসলিম লীগের ক্রিয়াকলাপ এবং তার সূত্র অনুসারে—

"মুসলিম লীগ কাউন্সিল ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তারই সূত্রে ওয়ার্কিং কমিটি ১৬ই আগষ্ট থেকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরু করবার হুমকি দেয়। জিন্না বলেন যে এতদিন লীগ গঠনতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করেছে। এবার,

"Today we have also forget a pistol and are in a position to use it." (V. P. Menon : The transfer of power in India, Page—284)

অপ্রতিহত বেগে চলল তিনদিন ১৬, ১৭, ১৮ই আগষ্ট কলিকাতার বুকে মুসলমানদের নারকীয় হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুঠ ও ধর্ষণের লীলা।

"It was only when the Hindus and Sikhs had come out in retaliation that the Chief Minister had called for military aid."
(Leornad Mosley : The last days of British Raj). (সঙ্কলন : শুনুন ধর্মাবতার)

ভারতবর্ষে তখন এই দাঙ্গা-দাবানলের মত ছড়াতে শুরু করে। মুসলিম লীগের কলিকাতার পথ অনুসরণ করে দাঙ্গা শুরু হলো নোয়াখালি, পাটনা এবং সমগ্র বিহারে; তার সাথে সাথে বোম্বাই, লাহোর ও পাঞ্জাবের স্থানে স্থানে। এসব ঘটছে ভারতবর্ষের প্রাক্-বিভাজন মুহূর্তে। তখনও সরকারী ভাবে ভারত ভাগ হয়নি। এটাই ছিল মুসলিম লীগের বা পাকিস্থানের প্রবক্তা মোহম্মদ আলি জিন্নার প্রত্যক্ষ আন্দোলনের নমুনা। এই অগ্নিগর্ভ ভারতবর্ষের সার্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রশ্ন ছিল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে,

"If the country was divided in such an atmosphere there would be rivers of blood following. in different parts of the country and the British would be responsible for the carnage.

Without a moment's hesitation Lord Mount Batten replied, atleast on this one question, I shall give you complete assurance. I shall see to it that there is no blood shed and riot. I am a soldier, not a civilian."

(India wins freedom : Abul Kalam Azad : Page—190)

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যা দেখা গেল তা সমগ্র পৃথিবীর কাছেই আজ পরিজ্ঞাত। ইতিহাসের এমন জঘন্যতম অধ্যায় কি বৃটিশকর্তা লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন আর পৃথিবীতে দেখাতে পারবেন দ্বিতীয় নজির হিসাবে? আসুন, মৌলানা আজাদের ভাষাতেই তা আমরা শুনি। তিনি বলছেন—

"The whole world knows what was the sequel to Lord Mount Batten's brave declaration. When partition actually took place rivers of blood flowed in large part of the country."

(India wins freedom : Page—190, Abul Kalam Azad).

এটাই ছিল গান্ধীহত্যার পটভূমিকা। কিন্তু গান্ধীজীকে পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে দেবার মূল উদ্দেশ্য কি? তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। কিন্তু শতাব্দীর সেরা একজন মহামানবকে সরাতে হলেও যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হবে বইকি! এমন সময় এসে গেল সেই সুবর্ণ সুযোগ। এলো ভারত বিভাগের মত এক ধূলিঝঞ্ঝাময় দুর্যোগপূর্ণ অধ্যায় ভারত ইতিহাসে। নির্দ্বিধায় আজ বলা যায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ঘৃণ্যতম ভারত বিভাগই সেরা কলঙ্ক ও অন্ধকারতম অধ্যায়। এই বিভাজনজনিত কলঙ্কের নায়ক যিনি বা যারাই হন এবং ভারতীয় নেতৃকুলের মধ্যে যারাই এই ঘৃণ্য চক্রান্তের

উপনায়ক বা সহনায়ক হন না কেন ইতিহাস তাদের মিরজাফর, কুইসলিঙদের আসনেই স্থান দেবে। তার বেশীকিছু প্রত্যাশা তাদের বাতুলতার সামিল হবে।

এই যে ভারত বিভাজন তার প্রতিবিধান করার প্রত্যাশা করা বৃটিশের কাছে প্রশ্নই আসেনা। কারণ এই ঘটনা যাতে অনিবার্যভাবেই ঘটতে পারে সেই রাস্তা ধরেই তো সাম্রাজ্যবাদীরা দীর্ঘকাল যাবৎ মহড়া দিয়ে আজ তার দ্বারদেশে উপনীত হতে পেরেছে। এই পরিকল্পনা তো সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের বহু পুরানো। ভারত বিভাগের পরিকল্পনা তাদের কতদিনের সুচিন্তিত তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যখন জানতে পারা গেল উত্তরকালের এক বৃটিশ সেনাপ্রধান অচিনলেকের স্বীকার উক্তিতে। অচিনলেক সাহেব অকপটে বলেছেন কোন এক প্রেক্ষাপটে,

"সম্পূর্ণ ভারতবর্ষকে আমরা দখল করতে পারিনি। যতটুকু দখল করেছি তার প্রতি ইঞ্চে ইঞ্চে আমাদের কঠোর লড়াই করতে হয়েছে। তাই ছেড়ে যাবার আগে হিন্দু-মুসলমানের হিসেবনিকেশ করেই যাব।" (যুগান্তর : ৬/২/৯০ ইং.)

আজ ১৯৪৭/৪৮ সালে এসে দেখছি ঐ বৃটিশ সেনাপ্রধানের উক্তি কোন ব্যক্তি বিশেষের উক্তি নয়। এটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের আসল মতলবের সার্থক প্রতিধ্বনি। এটাই হচ্ছে তাদের গোটাজাতের জাতীয় প্রতিধ্বনি। আমরা পরে আরও ইতিহাস পাবো তাদের এই ঘৃণ্য পরিকল্পনার। আজ ১৯৪৭ সালের মুখে এসে দেখছি তাদের পরিকল্পনাকে তারা কেমন সার্থকভাবে তথা রূঢ়ভাবে কার্যকারী করল। পরিকল্পনাটা তাদের পুরানো বটে কিন্তু সময় নাহলে তো কিছু ঘটে না। যখন তারা দেখল সময় আসন্ন তার পূর্বেই তারা এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও মশলা তৈরী শুরু করেছিল। তাদের কু-মতলবের জন্য যে এত বড় সর্বনাশ ভারতবর্ষের জন্য অপেক্ষা করছিল তা ভাবলে সর্বাঙ্গে কার না ঘৃণায় তাদের প্রতি নাসিকা কুঞ্চন হয় বলুন? এমন একটি সুযোগ যখন হাতের মুঠোয় তখন তারে ছাড়ার প্রশ্নই বা কোথায়?

বৃটিশরা এদেশে এসেছিল যখন, তখন তারা কয়জন এসেছিল? এসে কিন্তু তারা মিরজাফরকে চিনতে ভুল করেননি। এবং সাথে সাথে গোটা ভারতীয় জাতিটাকেই আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে নিয়েছিল ঠিকঠিক ভাবে। তাতে কোন ত্রুটি রাখেনি। তাদের পূর্বপুরুষ লর্ড ক্লাইভ, হেস্টিংস থেকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন পর্যন্ত দেখুন কি সুন্দর অপূর্ব রক্তের মিল ও তার ট্র্যাডিশন বা ধারাবাহিকতা। আবার এটাও দেখতে হবে মিরজাফর, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ থেকে আজকের ভারতীয় অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের মাঝে কেমন অপূর্ব বেইমানী ও বিশ্বাসঘাতকতার সমন্বয় ও ধারাবাহিকতা। দেশ বিভাজন যে সেই ধারাবাহিকতারই একটি দিক চিহ্ন, তা কি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে?

এমন যে একটি বিশ্বের সুপ্রাচীনতম জাতি, তাদের মাঝে যে এমন দেশকে বিকিয়ে দেওয়ার বা মাতৃ অঙ্গচ্ছেদ করার মত যুগে যুগে ধারাবাহিকভাবে কুলাঙ্গার ও মিরজাফররা থাকতে পারে তা কি ভাবা যায়! বলাবাহুল্য এই ভূমিতেই জন্মগ্রহণ করেছেন গান্ধী, সুভাষ, বীর সাভারকার, বিনয়, বাদল, দীনেশ, চন্দ্রশেখর আজাদ, যতীন

দাস, চাপেকার ভাতৃত্রয়, ক্ষুধিরাম, মঙ্গল পাণ্ডের মত দেশপ্রেমিক। যদিও এদের সংখ্যাটা বড়ই নগণ্য। যাক যা আলোচ্য সেই চর্চাই করা যাক। প্রসঙ্গের খাতিরে একটু অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরানো হয়েছিল। আমাদের আলোচ্য ছিল গান্ধীহত্যার বিষয়। আসুন সেই দৃশ্যপটেই ফিরি।

এখানে গান্ধীহত্যার পশ্চাৎভূমি বলছে দেশভাগটা হচ্ছে উপলক্ষমাত্র কেননা ভারতকে দ্বিখণ্ডিত বা ত্রিখণ্ডিত করতে হলে গান্ধীজীকে পৃথিবী থেকে না সরালে তা কার্যকরী করা যাচ্ছে না। তারও কারণ হচ্ছে তিনি আজ বড় বেশী সুভাষগীতিতে অভ্যস্ত। সুতরাং ওঁকে সরিয়ে দেওয়াই সঠিক পথ। এর মূল রহস্য কি এবং কেন তা আমরা কিঞ্চিৎ পূর্বেই দেখেছি। দেশভাগটা এই পটভূমিকায় উপলক্ষ ছাড়া কিছুই নয়। উপলক্ষ হিসাবেই এখানে দেশভাগ হাজির। এই ঘনঘটা অন্ধকারতম অধ্যায়টি সাম্রাজ্যবাদীরা সৃষ্টি করার ফলে জাতির পিতাকে সহজেই তারা পৃথিবী থেকে সরানোর পরিকল্পনাটা বাস্তবায়িত করতে পেরেছিল।

এবার চলুন ১৯৪৭/৪৮ সালের ভারতবর্ষের বিভাজনজনিত উদ্ভুত পরিস্থিতিটার একটু গভীরে প্রবেশ করে দেখি সেখানে কি হচ্ছে। সেই চিত্রটা পরিষ্কার হলেই গান্ধীজীকে হত্যার উপস্থিত কারণটাও বুঝতে আমাদের অসুবিধা হবেনা। গান্ধীজীকে হত্যা করার প্রাক্-চিত্রে আমরা দেখছি গোটা ভারতবর্ষটাই সাম্প্রদায়িক তাপমানে টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। এমন পরিস্থিতিতে গান্ধীজীর মানবিক ও ন্যায়নীতির আবেদন নিবেদন অনেক সময়ই আক্রান্তদের কাছে পরিহাস বলে ঠেকেছে। আবার অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে দেখলে দেখা যাবে অনেক সময় সত্যসত্যই পক্ষপাত দোষেও দুষ্ট তিনি। এখানে গান্ধীজীর একটু প্রাক্-কথন আমরা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবো তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এদেশে আসা এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করার সময় থেকেই তাঁর মনে একটা ইচ্ছা সুপ্তভাবে ছিল—তা হচ্ছে তিনি ভারতের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের স্বীকৃত এক অদ্বিতীয় নেতা হবেন। সেই অভিপ্রায়ে অনেক কাজও করেছেন। এবং চেষ্টাও করেছেন সেই পর্যায়ে দাঁড়াবার জন্য।

বলাবাহুল্য তিনি তো ইতিমধ্যে হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায় কর্তৃক অলিখিত ভাবে তাদের স্বীকৃত নেতা হয়েই ছিলেন। কিন্তু তিনি কি সত্যই ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় দ্বারা স্বীকৃত নেতা হতে পেরেছিলেন? বোধহয় সেই মর্যাদা তিনি আদায় করতে পারেননি। গান্ধীজীর বেদনায় অনেক সময় তারা ব্যথিত হলেও বা তাদের মনের কাছাকাছি পৌঁছোতে পারলেও তিনি তাঁর অভীপ্সিত স্থানে পৌঁছোতে পারেননি। অর্থাৎ তিনি ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট তাদের সর্বোচ্চ নেতার আসনে আসীন হতে পারেননি। যদি তাই হয় তবে মোহাম্মদ আলি জিন্নার অবস্থান মুসলমানদের কাছে কোথায়?

মোহাম্মদ আলি জিন্না প্রথম পর্যায়ে মোটেও সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। এমনকি

তিনি এদেশের রাজনীতিতেও ভূমিকা নিতে চাননি। পাকিস্তান কথাটা আদৌ জিন্নার মন থেকে সৃষ্ট নয়। ১৯৩০ সালে ক্যামব্রিজের ছাত্র রহমৎ আলি খান নামে একজন 'পাকিস্তান' নামক কথাটির উদ্ভাবক। পাকিস্তান নামের এ্যালফাবেটিকেল বিশ্লেষণ করে একটি আড়াই পৃষ্ঠার নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন, তা থেকেই পাকিস্তান কথাটির প্রথম অভিধানে আগমন। যাইহোক আমরা দেখছি যে মোহাম্মদ আলি জিন্না সাম্প্রদায়িক ছিলেন না বলেই তো তিনি তাঁর ব্যারিস্টারীকে উপজীব্য করে ত্রিশের দশকে লণ্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাসের পরিকল্পনা করে সেখানে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অনিবার্য্য কারণে তাঁর সেই পথ তিনি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখানেই গান্ধীজী ব্যর্থ নয় কি? জিন্না যে তাঁর পথ পরিবর্তন করলেন সে অধ্যায়ে আমরা যাবো না। কারণ সেটা আমাদের প্রসঙ্গ নয়। ত্রিশের দশকে জিন্না ভারতের উপস্থিত তৎকালীন নেতৃবর্গের উপরই ভারতবর্ষের ভূত-ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন কিন্তু হিন্দু-মুসলিম প্রশ্ন ছিল না। বা থাকলেও তা ছিল নিতান্তই গৌণভাবে। কিন্তু এই প্রশ্ন যখন আর গৌণ না থেকে অত্যন্ত উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করল তখনই কিন্তু এক কথায় মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে গান্ধীজী আর সেই গান্ধীজী রইলেন না তাদের চোখে। বলতে গেলে তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ে নেমে গেলেন। অর্থাৎ প্রথম গুরুত্বের স্থান তাঁকে হারাতে হলো। অথচ তিনি মুসলমানদের অনেক কর্মকাণ্ডই এমনভাবে বিচার করতে লাগলেন যাতে হিন্দু সম্প্রদায় অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুব্ধ হতে শুরু করল। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশী করার জন্য প্রকারান্তরে চেষ্টা করলেন। এই প্রকারান্তরে গান্ধীজীর মুসলমান সম্প্রদায়ের মন জয় করার একটি চেষ্টা হচ্ছে ভারতের বুকে খিলাফৎ আন্দোলন। এ-ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি শৌকত আলি ভাতৃদ্বয়কে ভারতে নিয়ে আসেন এবং মোহাম্মদ আলি জিন্না হলেন তাঁর কাছে পরিত্যক্ত। এবারও তিনি ব্যর্থ। তাছাড়া দাক্ষিণাত্যের মল্লারপুরের ঘটনা সেটাও ছিল হিন্দু-মুসলমান সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। সেটা ১৯২১ সালের ঘটনা যা ইতিহাসে 'মোপলা' বিদ্রোহ নামে খ্যাত। সেখানেও গান্ধীজীর পক্ষপাত দুষ্টের চিত্র পরিষ্কার। কাজেই দেখা যাচ্ছে এত করেও তিনি কিন্তু মুসলমানদের চোখে জিন্নার উপরে স্থান করতে পারেননি। এসব ছাড়াও কূটনীতিতে জিন্নার নিকট সম্পূর্ণ পরাভূত। তার জ্বলন্ত উদাহরণ জিন্নার ভারতের বুকে পাকিস্তান সৃষ্টি। আর পাকিস্তান সৃষ্টি মানেই তো মুসলমান সম্প্রদায় থেকে তিনি শতযোজন দূরের এক ব্যক্তিত্ব। নয় কি? এর কি আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে? কাজেই তাঁর মনের যে একান্ত অভীপ্সা তা শেষ পর্যন্ত অপূর্ণই রয়ে গেল। এইসব ঐতিহাসিক ঘটনাই বলে দিচ্ছে গান্ধীজীর উপর হিন্দুদের একটা বিশাল অংশই ক্ষুব্ধ ছিল বরাবরই। এসব ছাড়াও আরও কারণ আমরা ইতিহাস থেকে পাই।

আসুন সেই তথ্যচিত্র কি বলে তাও দেখা যাক। আগেই বলা হয়েছে দেশভাগের পর সাম্প্রদায়িক ভারতবর্ষের মানচিত্রটা তাপমানে টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। অর্থাৎ হিন্দু-

মুসলমানের দাঙ্গা তখন এক চরম পর্যায়ে। যা নাকি শিবের বাপেরও অসাধ্য তারে স্তিমিত করে। এমন অবস্থায় গান্ধীজী চুপচাপ বসে নেই। তিনি তাঁর সামর্থ ও শক্তি দ্বারা যতটুকু করণীয় তার সবই করছেন। কিন্তু তা মহাসিন্ধুর বুকে বারিবিন্দু। কিছুই হচ্ছেনা তা দ্বারা। ইতিপূর্বে দেখা গেছে হিন্দু সম্প্রদায় তাঁর উপর খুশী নয়। পক্ষান্তরে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মুসলমানদের খুশী ও বেজারের কোন বক্তব্য নেই। এতেই প্রমাণিত হিন্দুদের বক্তব্য আংশিক হলেও সত্য। কেননা মুসলমানরা যদি ক্ষুব্ধই হবে তবে তা অবশ্যই প্রকাশ পেতো। তাতেই পরিষ্কার হয়ে যেতো যে তিনি হিন্দুদের ব্যাপারে পক্ষাপাতিত্ব করছেন। কিন্তু তার সারাজীবনে এমন ঘটনা নেই বললেই চলে। হিন্দুরা তো পূর্ব থেকেই ক্ষুব্ধ। আর দাঙ্গা কবলিত অবস্থায় তো যথেষ্টই ধৈর্য্যচ্যুত। এইরূপ একটা পরিস্থিতিতে গান্ধীজী যে হিন্দুদের উপদেশ দিতেন তেমন দুই একটি তাঁর প্রদত্ত বাণী আসুন আমরা পর্যালোচনা করি বা দেখি। তাতেই তাঁর পক্ষাপাত ব্যাপারটা আরও সুষ্ঠুভাবে আমরা জানতে পারবো।

....."নোয়াখালিতে মুসলমানরা যে আতঙ্কজনক ও মারাত্মক হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠছিল হিন্দুদের মধ্যে কোথাও কোথাও তার প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল।.....মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলোতে হিন্দুদের উপর যে আক্রমণ চলছে তার প্রতিক্রিয়াতেই যে এগুলি ঘটছে, একথা গান্ধীজী জানতেন না—একথা কখনও সত্য নয়। (কার্যত তিনি নোয়াখালির দাঙ্গা থামাতে সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন)। আর হিন্দুদের কাজের তীব্র নিন্দা করে চলেছেন। আর কংগ্রেস সরকার এতদূর গেলেন যে বিহারের হিন্দুরা যদি তাদের আক্রমণাত্মক ভঙ্গি না থামায় তবে বিমান থেকে বোমা ফেলে তাদের গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে বলে শাসাতে থাকেন।.....গান্ধীজী তাঁর প্রার্থনা সভায় প্রায় বলতেন, পাকিস্তানে হিন্দুদের যদি মারতে মারতে নিঃশেষই করে দেওয়া হয় তবু ভারতের হিন্দু ও শিখরা এখানকার মুসলমানদের শ্রদ্ধা ও উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করবে। আর সুরাবর্দ্দিসাহেব যদি গুণ্ডাদের সর্দ্দারও হয়ে থাকেন, তবু দিল্লীর পথে তাকে স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে ঘুরতে দিতে হবে।" এসব বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে, গান্ধীজীর প্রাক্-প্রার্থনা বক্তৃতামালা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

(ক) "আবেগের বশে ভেসে যাবার আগে নিশ্চয় আমরা ঠাণ্ডামাথায় বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করব। মুসলমানরা যদি হিন্দুদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করেও দিতে চায়—যদি তারা এবিষয়ে সঙ্কল্পও করে, তবু হিন্দুরা মুসলমানদের উপর কখনও ক্রুদ্ধ হবে না। যদি তারা আমাদের সকলকেই হত্যা করে তবে আমরা বীরের মতই সে মৃত্যু মাথা পেতে নেবো। তারা গোটা পৃথিবীও জয় করে নিতে পারে—তবু আমরা এই পৃথিবীতে বাস করব। অন্ততপক্ষে আমরা মরতে ভয় করবো না। আমরা যখন জন্মেছি, মৃত্যুতো অবধারিত। তবে মৃত্যু নিয়ে এত বিমর্ষ কেন? আমরা যদি মুখে হাসি নিয়ে মরতে পারি তবে আমরা এক নতুন জীবনে প্রবেশ করব। এক নতুন হিন্দুস্থান গড়ব।

(৬ই এপ্রিল ১৯৪৭)

(খ) .....কেউ যদি আমাদের মারে, তবে আমাদের মরতেই দাও না। তবে আমরা বীরের মত মরব, আমাদের মুখে থাকবে ঈশ্বরের নাম। আমাদের প্রিয়জনদেরও যদি মেরে ফেলা হয়—তবু আমরা কেন কারো উপর ক্রুদ্ধ হবো? এ কথাটা বুঝতে হবে যে কাউকে যদি মেরে ফেলা হয়, তবে তাদের একটা যোগ্য এবং মঙ্গলময় পরিসমাপ্তি হলো।" (২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সাল, সঙ্কলন : শুনুন ধর্মাবতার, গোপাল গডসে, নাথুরাম গডসে।)

গান্ধীজী কর্তৃক প্রদত্ত যে বাণীগুলো, এই বাণীগুলোই তো পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে তিনি এই বাণী প্রদান করছেন হিন্দু সম্প্রদায়কে। তবে কি তাঁর বাণীর মধ্যে এ চিত্রই ফুটে উঠছে না যে হিন্দু সম্প্রদায়ই আক্রান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে? যদি তা না হবে তবে এমন একটি শ্রেণীকে লক্ষ্য করে কেন তাঁর মত মহাত্মা এমন বাণী প্রদান করবেন? মহামানবদের বাণী তো কখনও একপেশে বা নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর জন্য হতে পারে না, বা হয় না। মহামানবদের বাণীর অর্থ হতেই হবে সমগ্র মনুষ্য জগতের জন্য। এমনকি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেও যদি কোন মহামানব বাণী প্রদান করেন তবু তার অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে তার অর্থ নিত্য সত্য এবং সব মানবের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য এবং যুক্তিযুক্ত তথা Universal truth. কাজেই দেখা যাচ্ছে গান্ধীজী নিজেই পরোক্ষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর যে অভিযোগ তা অনিবার্য ভাবেই স্বীকার করে নিচ্ছেন। আবার দ্বিতীয়ত তিনি বলছেন 'বীরের মত মরব"—এই কথা কয়টি অনুশীলন করলে আমরা কি পাচ্ছি—পাচ্ছি যে তিনি পরোক্ষে বলছেন যুদ্ধ করতে করতে মরতে। যুদ্ধ না করলে কোন ব্যক্তির বীরগতিপ্রাপ্ত হয় কোন যুক্তিতে? 'বীরগতি' কথাটার মানে কি? তা কি তিনি জানেন না? একথাই বা মানা যায় কি করে? রামায়ণ, মহাভারত, কি গীতার শিক্ষাতেও 'বীরের মত' মানে যুদ্ধ করতে করতে বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক মৃত্যুকে বরণ করা, তাই নয় কি? তবে কি বলতে হয় তিনি যা বলেছেন তাতে সঙ্গতির অভাব? এ কথাই বা বলা যায় কেমনে? এ কথা বলাও অশোভনীয়। কারণ মহাত্মা গান্ধীর ত্রুটি ধরা বা সমালোচনা করাতো কোন তৃণমূলীর সাজেনা বা তার সমালোচনা কারো অন্তরে ব্যথার কারণও হতে পারে। গ্রহণযোগ্য তো নয়ই। কাজেই দেখা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে গান্ধীজীর সম্পর্কে হিন্দুদের বিরূপ যে সমালোচনা তা কোনভাবেই নিরর্থক নয়।

যাক এসব বাদ দিয়ে আসুন আমাদের মূল প্রতিপাদ্যে ফিরে যাই। আসুন দেখি আমরা পরবর্তী পর্যায়ে গিয়ে কোথায় পৌছাতে পারি। বা আমাদের জন্য ইতিহাস কি তথ্য রেখে দিয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি দেশবিভাগজনিত উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বৃটিশকর্তা লর্ড মাউন্টব্যাটেনও তা সামাল দিতে পারেনি বা তাদের মতলব হাসিল করার জন্য ঐ ব্যাপারে সচেষ্ট হয়নি। যা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য। কিন্তু দেশভাগের পর দেশরক্ষার দায় এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ

বা অন্যান্য দায়গুলো তো স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয়দের হাতে এসেছে। একথা তো আর কারো পক্ষে অস্বীকার করার রাস্তা নেই। সুতরাং সেই সূত্র ধরে বলা যায়, গান্ধীজীর মত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারত সন্তানকে রক্ষার দায়দায়িত্ব তখন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে। এমত অবস্থায় ভারতের সাম্প্রদায়িক মানচিত্র যাই বলুক না কেন গান্ধীজীকে বিনা কসরতে অক্লেশে হত্যার কবলে পড়তে হলো কেন? এই প্রশ্ন চিরকালই ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে তাড়া করবেই। সাথেসাথেই বলা যায় এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে তার দায়ও সমকালীন ভারত সরকারের সর্বোচ্চ আসনে আসীন ব্যক্তিদের উপরই বর্তাবে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই নীতিগত দায় ও প্রশ্নের হাত থেকে ঐসব নেতৃবৃন্দকে সুপ্রিমকোর্ট তো দূরের কথা ভগবানের আদালতও তাঁদের রেহাই দেবে না। কোনদিন রেহাই দেবে না তাঁদের নিজনিজ বিবেকের ন্যায়ালয়ও। অযাচিত ভ্রষ্টপথে আপাতত পরিত্রাণ হলেও সেই পরিত্রাণ কিন্তু পরিত্রাণ নয়। বিবেক দংশন তাঁদের তিলতিল করে ধ্বংস করবে। যতদূর শোনা যাচ্ছে সেই অবস্থায় তাঁদের নাকি পড়তেও হয়েছিল। সেই তথ্যে আমরা পরে যাবো এবং যুক্তির বিচারে দেখা যাবে তাও সত্য। বিপথে পরিত্রাণে বরং পাপের বোঝা বাড়ানো বই আর কিছু নয়। কারণ ঐ দায় থেকে পরিত্রাণের জন্য তখন তাঁরা বাঁকাপথে চলতে বাধ্য হয়। কিন্তু মনুষ্য জগতের উর্ধের ন্যায়ালয়ের কাছে জবাবদিহি হতেই হয়, কৈফিয়ৎ দিতেই হয়। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা বুঝতে বা জানতে পারিনা বা মানতে পারিনা বা চাইনা একথা সত্য। তবু বলছি এমনটি ঘটেই। বিবেক তা অবশ্য জানতে ও উপলব্ধি করতে পারে। সেটা আমরা বুঝতে পারি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরবর্তী প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছিল সেটা আমরা জানতে পারি তারই অপর সহকর্মী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বর্ণিত চিত্র থেকে। আসুন মৌলানা আজাদ এ-সম্পর্কে কি বলতে চেয়েছেন তা একটু পর্যালোচনা করে দেখি।

গান্ধীজীর assassination হয়ে যাবার পর ভারতে অতি সাধারণ লোক থেকে বিখ্যাত নেতৃবর্গ কেউ সর্দার প্যাটেলকে accused করতে ছাড়েনি। এই assassination -এর জন্য প্যাটেলকে কেন accused করা হলো আমাদের সেই ইতিহাসটাও অবশ্য জেনে নেওয়া প্রয়োজন। এই assassination যে দেশ পার্টিশনের মূলে তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেনা। আসুন ব্যাপারটা কি ছিল এবং কেন ছিল তা একটু দেখি।

ভারত বিভাগের যে মূল লক্ষ্য কি তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। সেটা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ ও ভারতীয় নেতাদের অতি লোভের মতলব হাসিল করার জন্য। কিন্তু হাতেনাতে স্থূলত যা ঘটেছিল বা যা মানুষের চর্মচোখে দেখা বা বোঝার আওতায় ছিল তা হচ্ছে এই প্যাটেল পর্ব। দেশ তখন খণ্ডিত। আগেই বলা হয়েছে এমত অবস্থায় ভারতের প্রতিরক্ষার সামগ্রিক দায়িত্ব তখন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ওপর।

স্বভবতই ভারতীয় নেতাদের সিকিউরিটির দায়ও তখন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে। সেই সূত্র ধরে গান্ধীজীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়টাও স্বভাবতই ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। কিন্তু এখানে এসে আমরা দেখছি ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গ যখন সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের সাইক্লোনে চূড়ান্ত পর্যায়ে, তখন গান্ধীজীর উপর কিছু লোক ক্ষুব্ধ। এই ক্ষোভের প্রকাশ বিভিন্নভাবে চর্তুদিকে প্রকাশিত। সেই প্রকাশও কোন যেমন তেমন প্রকাশ নয়। একেবারে গান্ধীজীকে হত্যা করার জন্য প্রত্যক্ষ হুমকী।

এই প্রত্যক্ষ হুমকীর প্রথম প্রকাশ ২০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে ঘটে। ঐদিন গান্ধীজী যখন দিল্লীর বিড়লা ভবনে প্রার্থনাসভায় প্রার্থনার জন্য ব্যস্ত তখন তাঁর উপর বোমা নিক্ষেপ করে আক্রমণ করেছিল মদনলাল পাওয়া। যে আক্রমণের ফলে তখন বিড়লা ভবনের চত্ত্বরে চার ফুটের ব্যসার্ধের গর্ত সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং আক্রমণটা যে কোন সাধারণ আক্রমণ ছিলনা তা বলার বা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এই রূপ প্রত্যক্ষ হুমকী যখন চলছে তখন ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব কি ছিল না কঠোর সতর্ক হওয়ার? কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁরা চূড়ান্ত গাফিলতি প্রদর্শন করেছেন। তার প্রমাণ তখনকার সর্বময় সিকিউরিটির বা নিরাপত্তার কর্তা ছিলেন ভারতের সেরাতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। অথচ বল্লভভাই প্যাটেল তখন অযথা অজুহাতে চলে গেলেন বোম্বাই। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল। বল্লভভাই প্যাটেলের এই দিল্লী ত্যাগের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কি কোন কর্তব্য ছিল না? বিশেষ করে যখন দিল্লীর নিরাপত্তার দায়িত্ব তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে। অথচ ইতিহাস তখন কি বলছে এমন একটা চরম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে, আসুন তা আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সহকর্মী এবং ভারতের অন্যতম ক্যাবিনেটমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ভাষায়ই শুনি। তিনি বলছেন—,

....."How they had succeeded in entering the garden of Birla House. It was also strange that adequate steps were not taken even after this incident to protect his life. The attack made it clear that however small in number, there was a determined group that was trying to kill Gandhiji. It was therefore natural to expect that the police and the C.I.D. of Delhi should take special measures for Gandhiji's protection. To our eternal shame and sorrow, I have to say that the most elementary precautionary measures were not taken even after this warning." (India Wins Freedom : Page 222)

তার ফল যা হবার তাই অনিবার্যভাবেই ঘটল। অর্থাৎ গান্ধীজীকে পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া হল। ১৯৪৮, ৩০শে জানুয়ারী নাথুরাম গডসে নামক এক আততায়ী এ কাণ্ড ঘটান। এই চিত্র থেকে আমরা কি পাচ্ছি, পাচ্ছি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা বলতে গেলে গান্ধীজীকে প্রায় শিকারীর মুখের

উপরই ছুড়ে দিয়েছিলেন। একথা তখনকার চিত্রই প্রমাণ করছে। আর এই চিত্রের প্রতিবেদক হচ্ছেন তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা স্বয়ং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব। যিনি আবার তাঁদের উভয়েরই বিশেষ করে জওহরলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মীও বটে। এই পরিস্থিতির পর সমগ্র ভারতের আপামর জনসাধারণ তো বটেই এমনকি বিখ্যাত বিখ্যাত নেতারা বা সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রধান ব্যক্তিরাও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিই অপরাধী বলে তর্জনী তুলেছেন এবং নিন্দামন্দ করেছেন। এমন অনেক ঘটনাই আছে তেমন দুই-একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তখন ড: প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ছিলেন একজন অন্যতম এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং নেতা। তিনি যা বলেছেন তা আবুল কালামের ভাষায় শোনা যাক :

"Mr. Prafulla Chandra Ghosh of Calcutta raised the same issue. He also condemed the Government of India for its failure to save Gandhiji's life. He pointed out that Sardar Patel was reputed to be a strong and efficient Home minister. How could he then explain why no effort had been made for the saving of Gandhiji's life."

(India wins freedom : Page—224, Maulana Azad)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বা High command-এর ব্যক্তিরাই প্যাটেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে এতটুকুও পিছপা হয়নি। অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভিযুক্ত অপরাধী হিসাবে। কংগ্রেসেরই অপর বিখ্যাত নেতাদ্বারা।

এই ঘটনার সঙ্গে তৎকালীন হিন্দু মহাসভা যে জড়িত ছিল তা আমরা সবাই অবগত আছি। তার কারণ আপাতত দৃষ্টিতে যে নাথুরাম গডসে এই হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষভাবে করেছে সে ছিল মহাসভার একজন সক্রিয় সদস্য। তার জীবনী থেকে পাই তিনি ছিলেন অখণ্ড ভারতবর্ষের একজন সক্রিয় পূজারী অথচ সেই ব্যক্তি কেন এমন একটি যুগান্তরকারী হত্যাকাণ্ড ঘটাতে গেল তা নিরপেক্ষভাবে বিচার করা হলে দেখা যাবে তার সঙ্গে মহাসভার এতদ্ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু সহজাত ও স্বাভাবিক সাইকোলোজিক্যাল কারণেই মানুষ অপরাধীর সঙ্গে সংস্পৃক্ত সংস্থাকেই প্রথম আক্রমণ হানে। যার পিছনে অনেক সময় কোন যথার্থ কারণ থাকে না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বীরসাভারকারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু এই মামলার মহান বিচারকরা বীরসাভারকারের উপর একটু সামান্যতম বা ছিটেফোঁটা দোষও আরোপ করতে পারেন নি। অন্তত এতদ্ সংক্রান্ত ব্যাপারে। এইরূপ এই ঘটনার জন্য ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও অনেকে বা কোন কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত গোষ্ঠী ইচ্ছাকৃতভাবে ও সচেতনভাবেই কলুষিত করে এব্যাপারে। অথচ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মত প্রত্যক্ষ উপস্থিত মহাজনেরাও কিন্তু তাঁর প্রতি কোন সন্দেহের তর্জ্জনী তুলতে সচেষ্ট হননি। কিন্তু তথাকথিত রাজনীতির ব্যবসাদাররা তাঁকে কথায়

কথায় এই চিত্রে টেনে আনে, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যিনি সারাজীবন মানবতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, যিনি অখণ্ড ভারতের শুধু পূজারীই ছিলেন না, যিনি অখণ্ড ভারতের সত্তা রক্ষা ও মর্যাদার জন্য জীবন বলি দিলেন। তাঁর প্রচেষ্টাই আজকের পাঞ্জাবের পাঞ্জাবী এবং পশ্চিমবাংলার বাঙ্গালীরা অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে আছেন এমন এক মহামান্য মানবপ্রেমিক ও দেশপ্রেমিকের গায়ে সাম্প্রদায়িকতার নামাবলী চড়াতে চায়। অথচ যারা এই সাম্প্রদায়িকতার দোষে সংক্রামিত তা তারা মরে গেলেও স্বীকার করে না। বলাবাহুল্য মহাত্মা গান্ধীর এই লজ্জাজনক ও চরম দুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হিন্দু মহাসভার সাথে আজীবনের জন্য সকল সংস্রব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। হিন্দু মহাসভাকে সেই দায়ে দায়ী করা কি রাজনীতির স্বার্থে নয়?

আমরা মূল প্রসঙ্গ থেকে একটু স্থানান্তরে চলে গিয়েছিলাম অনিবার্য কারণে। আসুন আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই। গান্ধীহত্যার আপাত কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে যে এই কাজের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দুই ব্যক্তিই মূলত দায়ী। তাঁরা হলেন প্রথমত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যিনি ভারতখ্যাত এক ব্যক্তিত্ব এবং দ্বিতীয়ত ঐ হত্যাকারী নাথুরাম গডসে। এটা হচ্ছে পর্দার উপর প্রতিফলিত প্রত্যক্ষ চিত্র। কিন্তু সত্যই এই চিত্রটাই কি সবকিছু? পৃথিবীব্যাপী এই জাতীয় রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড যতগুলো আজ পর্যন্ত ঘটেছে বা আগামী যুগেও ঘটবে তা কি প্রকাশিত হয়েছে না হবে? এইসব কর্মকাণ্ডের পিছনের তথ্যচিত্র কি তদন্ত হলেও প্রকাশ করা হয়? কোথাও আজ পর্যন্ত হয়নি হতে পারে না। এক্ষেত্রেও হয়নি। নাটের গুরুরা কখনও ধরা পড়ে না। পড়বেই বা কি মাহাত্ম্যে? কারণ এসব কাণ্ডের ঘটকরাই তো তখন সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। তাদের নির্দেশকে উপেক্ষা করা সাধ্য কার? কারণ জীবনকে কে স্বেচ্ছায় ফাঁসীর কাঠে ঝুলাতে চায়? কাজেই সত্য চিরদিনই চাপা থাকে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ জাতীয় ক্ষেত্রে তাই সত্যকে চাপা দিতে এবং মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য তখন জনাকয় তৃণমূলীর কাঁধেই ব্যাপারটা চাপিয়ে তাদের ফাঁসীর কাঠগড়ায় এনে হাজির করা হয়। নাথুরাম গডসে এক্ষেত্রে প্রধান বলি হলেও নাটের গুরুরা তাকে যে সুযোগ করে দিয়েছিল তার কারণ কি? এ প্রশ্নের হাত থেকে পরিত্রাণের কৈফিয়ৎ কি? এই কৈফিয়ৎটা খুঁজতে গেলে যে-চিত্রটা জ্বলজ্বল করে বড় বড় পদক্ষেপে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়, তা কি কোন অজুহাতেই তাঁরা এড়াতে পারেন? পারেন না। এটিকে ফাঁকি দেবার জন্য আইনের চোখে ঐসব অপরাধীরা সাধু মহাজন সাজবার জন্যই আমজনতার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্যই যুগেযুগে কালেকালে এইসব খলনায়করা একে তাকে ধরে এনে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বা ফাঁসীতে লটকায়। ঐক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

কেন পারেন না তারও পর্বত প্রমাণ কারণ বিদ্যমান। আসুন সেই চিত্রটা কি তা

আমরা সংক্ষেপে একটু দেখার চেষ্টা করি। এই রচনার বা এই গ্রন্থের আগাগোড়াই দেখছি এর প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছেন পর্দার আড়ালে অবস্থানরত একটি মানব সম্মোহিনী মহানাম নেতাজী সুভাষচন্দ্র। এই নামটি এই ইতিহাস পর্যালোচনা গ্রন্থে না থাকলে গান্ধীহত্যার প্রয়োজনই হয়না। প্রয়োজনই হয়না ভারত বিভাগ। হয়ত কেউ কেউ বলবেন ভারত বিভাগের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক কি? ভারত বিভাগ তো হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়ার ফল। কিন্তু ইতিহাস তা বলছে না। সেকথা বিস্তারিতভাবেই আমরা অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ তথ্য সহকারে আলোচনা করেছি এই পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সুতরাং তা নিয়ে আর আলোচনায় যাব না। শুধু এইটুকুই বলবো যে ভারত বিভাজন হিন্দু-মুসলমান ইস্যুতে মোটেও নয়। ভারত বিভাজন সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থে এবং ভারতীয় ক্ষমতালোভী কয়েকজন নেতার দিল্লীর সিংহাসন লাভের স্বার্থে। স্মরণীয় যে বৃটিশদের স্বার্থ ও দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য ভারতীয় অতিলোভী নেতারা যা করেছিল তারই পরিণতি ছিল ভারতব্যাপী ভ্রাতৃদাঙ্গা। যে দাঙ্গার সম্পর্কে গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া ছিল যা এক কথায় তিনি অর্থাৎ গান্ধীজী নিজেও কংগ্রেসের সকল নেতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গান্ধীজীর এ-সম্পর্কে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তাতেই সেই ছবিটি পরিষ্কার। এ-সম্পর্কে অতি সুন্দরভাবে বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত কানাইলাল বসু তাঁর 'নতুন করে দেখা' পুস্তকে বলেছেন,

"কংগ্রেসেরই কিছু স্বার্থান্বেষী নেতা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, ১৯৪৭ সালের আগেই ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার অনুপাতে দেশ ভাগাভাগি করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। গান্ধীজী এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন। তিনি এর বিরোধীও ছিলেন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার মত কার্যকরী কোন পন্থা বা কোনও ব্যবস্থা তিনি নেননি। গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ ও দেশসেবক নির্মলকুমার বসু দেশ ভাগাভাগির বিষয়ে, কার্যকরী প্রতিবাদের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর নিষ্ক্রিয়তার কারণ জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। উত্তরে গান্ধীজী সখেদে তাঁর অক্ষমতার কথা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন—

"কাকে নিয়ে আমি লড়াই করবো? তুমি কি বুঝতে পারছো না, যে গত এক বছরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সমস্ত ভারতের অধিবাসীরা সাম্প্রদায়িক হয়ে গিয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিষ ছাড়া, অন্যসব কিছুই তাদের কাছে মূল্যহীন। তারা আজ ক্লান্ত ও শঙ্কিত। সমগ্র জাতির এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তুলে ধরেছে। তাহলে আমি কিভাবে এর বিরুদ্ধতা করবো?" সুতরাং দেখা যাচ্ছে গান্ধীজীর মতে কংগ্রেসও সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছে। এরপরেও কংগ্রেস বলে তারা ধর্মনিরপেক্ষ? সেকুলার? এই লেবেল হাস্যকর ছাড়া আর কি হতে পারে?"

(নেতাজী : নতুন করে দেখা : পৃষ্ঠা—৭১/কানাইলাল বসু)

কাজেই এখানে পরিষ্কার যে দেশভাগ দাঙ্গার ফল নয়। দেশভাগ হচ্ছে জাতীয় স্তরের কংগ্রেসী নেতাদের ও বৃটিশের এবং সেই সাথে লিগ নেতাদের

স্বার্থ চরিতার্থ করার ফল। একথা কবুল করছেন ভারতের সর্বোচ্চ নেতা স্বয়ং গান্ধীজী। ইতিপূর্বে দেখেছি গান্ধীজীকে হত্যার পিছনেও গান্ধীজীর সুভাষগীতি বা সুভাষ নীতিগ্রহণই মূল কারণ। আরও তলিয়ে বললে বলতে হয় যদি গান্ধীজীর জনসম্মোহিনী ক্ষমতাও না থাকত তবে গান্ধীজীর স্থান হতো জাতীয় কংগ্রেসে জওহরলাল প্যাটেলদের পরের ধাপে। তাহলেও গান্ধীহত্যার দরকার হতো না। সুভাষচন্দ্রের পর অর্থাৎ তাঁর অনুপস্থিতিতে একমাত্র গান্ধীজীই ছিলেন ভারতকে উথালপাথাল বা স্তিমিত করার মত ব্যক্তি। তা যদি না হতেন তবে আর গান্ধীহত্যা প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এবার আমরা অবধারিত সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, গান্ধীহত্যা, ভারত বিভাজন এবং সুভাষ বর্জন এই তিন মহাকাণ্ডের মূল নায়করা হচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ এবং সমকালীন ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষতম ব্যক্তিবর্গের জনা কয়েকমাত্র। গান্ধী হত্যার ব্যাপারে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি সদস্যেরও তাই মতামত। তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। সেই সাথে বৃটিশ ও মুসলিম লিগেরও স্বার্থ সংক্রান্ত মহা চক্রান্ত। তা সত্ত্বেও আজও ভারতীয় নেতারা হিন্দুমহাসভা, জনসঙ্ঘ বা আর. এস. এস.-এর প্রতি তর্জনী তুলে তাদের দোষারূপ করতে ছাড়ছে না। ভাঙ্গা রেকর্ড বাজিয়েই চলেছে। অথচ স্বাভাবিক গতিতে ও স্বাভাবিকভাবে যদি সবকিছু সংঘটিত হতো এবং বৃটিশের কুচক্রে ভারতীয় নেতারা না চলত তবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুই হতেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী। দেশ বিভাগজনিত হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাও হতো না। আর করাচি দিল্লী বা ইসলামাবাদ দিল্লীর ব্যবধানের জন্য হিন্দু-মুসলমানের যে গ্রেটবেরিয়ার রিফ তাও রচিত হতো না। তার ফলে জওহরলাল, গান্ধী ও সুভাষের স্বর্গীয় মন্ত্রণা ভারতবর্ষকে নেতৃত্ব দিত। এমনকি গান্ধী, সুভাষ, জওহরলাল এবং কায়দে আজম জিন্নার সমন্বয়ে ভারতবর্ষ হয়ে উঠত পৃথিবীর অদ্বিতীয় স্বর্গরাজ্য। এমনটি যাতে না ঘটে সেইটাই ছিল বৃটিশের চাল। সেই চালে তারা শুধু ষোল আনা নয় বত্রিশ আনাই সফল। বলাবাহুল্য ভারত মানচিত্র যদি ঐ চার প্রধানের হাতে গড়ে উঠতো তবে পৃথিবীর মানচিত্রও অন্য রংয়ে রঞ্জিত হতো কবেই। সেইটা প্রতিহত করাই ছিল বৃটিশ নীতি। যাইহোক এই সমগ্র ছবিটি অর্থাৎ আজকের চিত্রপট বলছে জওহরলালের অবস্থান কত নীচে! ইতিহাস কি তাঁকেই বলবে না পৃথিবীর সেরা খলনায়ক? ঐ তিন মহাকাণ্ড ভারত বিভাগ, গান্ধীহত্যা, এবং সুভাষ বর্জনের জন্য তবে কে বা কারা বৃটিশের হাতের পুতুল হয়ে খেলা করছে? গান্ধীহত্যার দায় অন্যের কাঁধে চাপালে ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে কি সার্বিক ও নৈতিক দায়ে তাঁরা দায়ী নয়? তবে দায়ী ইতিহাসের বিচারে কে বা কারা?

সুভাষ বর্জন, গান্ধীহত্যা বা দেশভাগের মত ঘটনার অনুশোচনা কি তাঁদের আত্মদংশন হয়নি? ১৯৫২ সালে জওহরলাল কি আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে বলেননি বিভাজিত ভারতবর্ষের চলমানচিত্র দেখে এমন ঘটনা ঘটবে জানলে আমরা দেশভাগ করতুম

না। গান্ধীজীর হত্যায় কি তিনি দগ্ধে দগ্ধে দিন কাটাননি? সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যে আচরণ করেছেন তার জন্যও কি তিনি তিলতিল করে জ্বলেননি? তারও প্রমাণ আছে। তিনি মৃত্যুর বৎসর উড়িষ্যার এ. আই. সি. সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রকে সাধুর বেশে উপস্থিত দেখে যে অজ্ঞান হয়েছিলেন সেই অজ্ঞানতার হাত থেকে মুক্তি পেতে তাঁকে জীবনের বাকী দিনগুলো দগ্ধে দগ্ধে মরতে হয়েছিল। এবং কথিত আছে সেই যে সুভাষচন্দ্রকে সাধুজীর আড়ালে দেখে অসুস্থ হয়েছিলেন সেই অসুস্থতাই হয়েছিল তাঁর কাল। হয়ত কেউ বলবেন তিনি কি মরতেন না? অবশ্যই মরতেন কিন্তু এমন দগ্ধেদগ্ধে অনুশোচনায় দিন কাটাতে হতো না। অথচ এই চিত্রটাই যদি তাঁর বিপরীত হতো অর্থাৎ তিনি প্রধানমন্ত্রী আর গান্ধী-সুভাষ-জিন্না তাঁর প্রধান ভরসা ও উপদেষ্টা সহায়ক ও সহমর্মী তবে ছবিটা কত সুন্দর ও স্বর্গীয় মাধুর্যে ও আনন্দে ভরপুর হতো, তাই নয় কি?

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকেও সারাভারত এবং ভারতীয় নেতারা বিশেষ করে জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এমন অনেকেই গান্ধীহত্যার ব্যাপারে তাঁর কর্তব্যের গাফিলতির জন্য ক্ষমা করেননি। দেশবাসীরা ক্ষমা করেননি। এমনকি তিনি তাঁর বিবেকের ন্যায়ালয়ে ক্ষমা পাননি। তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের কথা থেকেই। আসুন আজাদ সাহেব কি বলছেন তা শোনা যাক। মৌলানা আবুল কালাম বলছেন—

"Hardly two months had passed since Gandhiji's death when Sardar Patel had a heart attack. My own reading is that this was the result of the shock he had received. So long as Gandhiji was alive, Patel's anger against him remained. When Gandhiji was murdered and people openly accused Sardar Patel of neglect or inefficiency, he felt deep shock and humiliation. Besides, he could not forget that he owned everything to Gandhiji. Gandhiji unfailing affection and consideration for Patel must have also made the situation more painful to him. All these worked on his mind and troubled him till he was attacked with thrombosis. He lived for some three more years, but never regained his health."

(India wins freedom—225 Page, Maulana Azad)

উপরের চিত্রে ভারতবর্ষের দুই শীর্ষনেতার যেসব কর্মকাণ্ডের ছবি আমরা অতি বিস্তারিতভাবে দেখলাম তাতে কিন্তু দেখছি তাঁরা তাঁদের অপরাধজনিত জাতীয় কর্মকাণ্ডের জন্য নিজ নিজ অনুশোচনার হাত থেকে রেহাই পাননি। অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের বিবেকের ন্যায়ালয়ে প্রদণ্ড শাস্তির হাত থেকে পরিত্রাণ পাননি। এটাই বিধাতার বিধান। আমরা তা মানি বা না মানি তাতে বিধাতার কিছু এসে যায় না। এই দুই পুরুষের স্থান আজ ভারতবাসীর কাছে কোথায়? আর অপরদিকে গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র আজ কালজয়ী। দেশবাসীর হৃদয়ে তো বটেই এমনকি মহাকালের বিচারেও তাঁরা অমর অনির্বাণ এবং জাতের ও জাতীয় ধারার দিশারী। তাঁদের হত্যা করে বা ইতিহাস থেকে

মুছে ফেলে কোন্ জওহরলাল বা প্যাটেলরা?

এবার আমাদের পিছনে ফেলে আসা ঘটনায় যেতে হচ্ছে। কারণ মূল আলেখ্যে যা হচ্ছিল তা একঝলক পরখ করার প্রয়োজন। আগেকার ঘটনায় আমরা দেখেছি গান্ধীজীর জন্য জাতীয় কংগ্রেস সুভাষচন্দ্রের তথাকথিত মৃত্যুর কারণে শোকপ্রকাশ থেকে বিরত হতে বাধ্য হয়েছে। গান্ধীজীকে বাতিল করে শোকপ্রস্তাব নেবার হিম্মৎ তাদের হলো না। এখানেই তীব্রভাবে প্রতীয়মান হয়ে গেলো সুভাষচন্দ্র বর্তমান এবং যথাযথ ভাবেই তিনি তাঁর কর্মকাণ্ড লয়ে বহাল তবিয়তে বিরাজমান। আর এই তথ্যচিত্রে এটাও প্রমাণ হলো যে গান্ধীজীর জীবনে এক আমূল পরিবর্তন এসেছে। তিনি যে এখন পরোক্ষভাবে সুভাষচন্দ্রের তৈরী পথের এক অনন্য পথিক তা বলাই বাহুল্য। গান্ধীজী ইতিপূর্বে যে সুভাষচন্দ্রের প্রতি ভুল করেছিলেন তার মাশুলও তিনি গুণতে শুরু করেছিলেন। যদিও তাঁর এই ভুল বুঝতে যথেষ্ট দেরী হয়েছিল। তবু বলতেই হবে 'যার শেষ ভালো তার সব ভালো'। বলার অপেক্ষা রাখেনা গান্ধীজী যদি এই হিমালয়ান ভুলটি না করতেন তবে ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর মানচিত্রটাই আজ অন্য রং-এ রঙিন হতো। এবং ভারতবাসীর ভাগ্যও আজ অন্য খাতে প্রবাহিত হতো। এই ব্যাপারে পরে আরও কিছু আলোচনার অবকাশ রেখে চলুন আমরা একটু জাতীয় কংগ্রেসের ও জওহরলালের আরও কিছু কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখি।

সুভাষচন্দ্রের পত্রে তাঁর অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাগমনের কথা মাথায় রেখে জওহরলাল অত্যন্ত উত্যক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সেই ক্ষোভের যে অভিব্যক্তি ঘটেছিল, আসুন আমরা জওহরলালের নিজের ভাষাতেই সেকথা শুনি। এই ক্ষোভের ফল তিনি আপন বয়ানে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে বলেছিলেন, "If Subhas comes I will resist him with sword—" ভাবুন জওহরলালের মদগর্বী দম্ভোক্তি এবং তার মনোভাব। এই ঐতিহাসিক উক্তি তৎকালে ভারতবর্ষের কে না জানতেন? এই উক্তি আজকের প্রজন্ম তথা জাতীয় কংগ্রেসী পরিবারভুক্ত কোন সদস্য কি বিশ্বাস করতে চাইবেন? কিন্তু সত্য-সত্যই তার কোন বিকল্প হয় না। তার কোন বিধিবিধান, ফাঁকফোকর বিধাতাপুরুষ রাখেননি। এটা বোধহয় আমাদের মাটির পৃথিবীবাসীর জন্য বিশেষ করে দুষ্ট লোকেদের জন্য চরম দুর্ভাগ্য। যদি বিধাতাপুরুষ এই ভুলটি না করতেন তবে হয়ত আমরা যারা ফাঁকির অলিগলি দিয়ে আত্মত্রাণের চেষ্টা করি তাদের অনেকেই বেঁচেবর্তে যেতাম। এবং বহাল তবিয়তে থেকে আরও কিছু নষ্টামি দ্বারা নিজেদের লাভের অঙ্ক বাড়াতে পারতাম।

যা বলা হচ্ছিল। জওহরলালের ঐ উক্তিকে অনুশীলন দ্বারা বিশ্লেষণ করলে কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ছে। আসুন এবার সেই চিত্রটার সঙ্গে একটু পরিচিত হই। ঐ উক্তিটিই কি বলে দিচ্ছে না অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে যে নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু একটা কল্পনার রঙিন ফানুস? হয়ত কেউ বলতে পারেন এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কোন মূর্খ কল্পনার রঙে রঙিন হতে যাবে? কিন্তু ভুলে যাবেন না এমন একটি ব্যাপারে যারা কল্পনার ফানুস নিয়ে আজও খেলছেন তারা কেউই আপনার

আমার মত গালিভার ট্রাভেলস্-এর লিলিপুট নয়। তারা নাকি এক একজন বিশ্বের দিকপাল, বিশ্বদিশারী। বিশ্বকবির ভাষায় হয়ত একেই বলে 'এযে দেখি জলে ভাসে শিলা'। যাক জওহরলালের ঐ ঐতিহাসিক উক্তি বুঝতে আসুন আমরা একটা গল্পের আশ্রয় নিই। তাতে ব্যাপারটা অতীব প্রাঞ্জল হয়ে উঠবে। এবং অনুধাবন ও অনুশীলনে অনেক সহজ হবে। গল্পটা ধরুন নিম্নরূপ :

একব্যক্তি তার বাসগৃহ ত্যাগ করে চলে গেছেন। এ ঘটনাটা এতদ্ অঞ্চলের সবাই জানেন। খুব ভালোভাবে এবং নিশ্চিত রূপে। কিন্তু যেকোন কারণেই হোক তিনি বাড়ীর বাইরে বিদেশে বেশকিছু কাল অতিবাহিত করে বাড়ীতে গৃহস্বামীকে জানিয়েছেন তিনি ফিরে আসতে চান শীঘ্রই। ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়েছে ঐ ব্যক্তি মারা গিয়েছেন। এই গুজব ছড়ানোর পরই কিন্তু গৃহস্বামীর নিকট ভদ্রলোকের পত্র আসে তিনি ফিরে আসছেন। ইতিমধ্যে বিভ্রান্তি বশত বাড়ীর লোকের ধারণা হয় বা সিদ্ধান্তে আসে গৃহত্যাগী ব্যক্তিটি আর পৃথিবীতে নেই অর্থাৎ মারা গেছেন। এমন সময় পত্র পেল ঐ ব্যক্তি গৃহে ফিরতে দৃঢ় ইচ্ছুক। এবার ঐ ব্যক্তির প্রত্যাগমনের কথা জানতে পেরে গৃহস্বামী অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছেন এবং বলছেন ঐ পলাতক ব্যক্তি ফিরলে তাঁকে তরবারি দ্বারা পথরোধ করবেন। এবার আপনি বলুন গৃহস্বামীর তরবারি নিয়ে পথরোধ করার কি কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকতে পারে? বড়জোর এইটুকু যাচাই করতে পারে গৃহকর্তা, যে ব্যক্তিটি ফিরে আসতে চাইছে সে এবং তার বাড়ী থেকে পলায়নকারী ব্যক্তি দুইজনই একব্যক্তি কিনা। তবে কি গৃহস্বামীর আচরণে বুঝতে বাকী আছে যে ঐ পলাতক ব্যক্তি মারা যায়নি আদৌ।

তাহলে বলতেই হয় যে জওহরলালের তরবারি নিয়ে তাড়া করা বা পথরোধ করাই কি বলে দিচ্ছেনা যে সুভাষচন্দ্রের তথাকথিত মৃত্যুজনিত কল্পকাহিনী একটি স্বতঃসিদ্ধ মিথ্যা রটনা? যদি তাই না হবে, তবে resist with sword এসব কার উদ্দেশ্যে এবং কেন? এতেই কি আসল সত্যটা উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাচ্ছে না? এতেই বোঝা যাচ্ছে আসল ঘটনাটা তবে কি এবং কেন? এবং তা কতটা মিথ্যা বা সত্যাশ্রিত হতে পারে। ঐ উক্তিটার মধ্যেই তো উত্তরটা লুক্কায়িত আছে। সেটাই কি প্রমাণিত নয়? এইরূপ ঘটনার পরও পণ্ডিত নেহেরু স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের লোকসভায় দাঁড়িয়ে আবার সেই পূর্ববৎ দৃপ্তকণ্ঠেই সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু একটি স্থায়ী ঘটনা। যদি এই হয় জওহরলালের বক্তব্য তবে কি প্রশ্ন করা চলেনা যে, হে পণ্ডিত জওহরলাল, তুমি তরবারি হাতে কার পথ অবরোধ করছিলে? সদম্ভে প্রচার ছিল সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে। আবার তোমারই বিখ্যাত উক্তি, "If Subhas comes....." ইত্যাদি। জওহরলাল লোকসভার ঘোষণার বয়ানে বলেছিলেন, "Subhas Chandra's death is a permanent death"—এবার জওহরলালের আর এক অভূতপূর্ব চমক। নয় কি? বলুনতো কস্মিনকালেও কি শুনেছেন মৃত্যুর permanancy আবার temporary অথবা settled বা unsettled বলে কিছু? জওহরলালতো তাত্ত্বিক প্রবর এবং বিখ্যাত পণ্ডিতও বটে। তিনি পৃথিবীর কোন অভিধানে এমন গুহ্যতত্ত্বের

সন্ধান পেলেন? তাহলে বুঝতে কি এতটুকু অসুবিধার কারণ আছে জওহরলালের চাতুরীর দৌড় কতদূর? তাঁর চাতুরী যে, কথার মারপ্যাঁচেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। তবে তিনি জনতাকে ফাঁকে ফেলবেন কেমন করে? তিনি যে ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল অর্থাৎ মৃত্যুর দ্বারদেশ পর্যন্ত একটা মহান জাতির প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শুধু তাঁর জাতিকেই প্রতারণা করে গেছেন একাধিকক্রমে প্রায় দুই দশক তাই নয় কি? বলতে গেলে গোটা বিশ্ব তথা সমগ্র মানব জাতিকেই কি তিনি প্রতারণা করেন নি? এই কি তিনি সেই জওহরলাল, অক্সফোর্ডের শিক্ষায় শিক্ষিত? যে জওহরলাল ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়া, গ্লিমসেস অব ওয়ার্লড হিস্ট্রি ও এ বাঞ্চ অব লেটার টু ডটার ইত্যাদি বিশ্বখ্যাত পুস্তকের গ্রন্থকার? ১৯৪৬ সালে তিনি লিগ ও কংগ্রেসী কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এখানে সেই কথাটাই বলা হয়েছে। মাঝে শুধু অল্প কিছুদিনের জন্য মন্ত্রীত্ব ছিলনা। এবং কাকতালীয় ব্যাপার সুভাষচন্দ্রের তথাকথিত কল্পমৃত্যুর প্রহসন নাটক সেইদিন থেকে আজ একবিংশ শতাব্দীর ঊষার প্রাকলগ্নেও পদধ্বনি করছে। তবেই বুঝুন জাতি হিসাবে আমরা কি সুমহান! এই যদি জাতির চেহারা না হয় তবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ কোন্ মূলধন বলে এমন একটা বিশাল ঐতিহ্য সম্পন্ন মহান জাতিকে দুই শতাব্দীর অধিককাল পদপিষ্ট করে রাখে? মহাত্মা গান্ধীর মত লোককে নিমেষে পৃথিবী থেকে বিনাশ করতে পারে? বা নেতাজীর মত সহস্রাব্দের সেরা বিশ্ববরেণ্য শ্রেষ্ঠতম নেতৃত্ব থেকে দেশকে বঞ্চিত করে রাখতে পারে? না; এসবের একটি কথাও এ অভাজনের নয়। এসবই ইতিহাসের খনিগর্ভের সঞ্চিত সম্পদ। ইতিহাসের ছাত্র শুধু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজছে।

আবোল তাবোলের পালা বা কিস্‌সা এখানেই শেষ নয়। আরও শুনুন তবে। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে সর্বভারতীয় এক বিপ্লবী সম্মেলনে শ্রীনেহেরুর আমন্ত্রণে কিছু বিপ্লবী সমবেত হন। সম্মেলন চলাকালে প্রসঙ্গক্রমে ঐ বিপ্লবীরা নেহেরুজীর কাছে নেতাজীর কথা উঠান। নেহেরু তখন বলেছিলেন—

"My lips are sealed. I cannot go beyond Shanwaz Committee Report." (৩০.১১.৭০—আ: বা: প:)। অথচ মজার ব্যাপার যে, নেহেরু মারা যাবার কিছুদিন পূর্বে সুরেশ বসুকে একপত্রে তিনি জানিয়েছিলেন, "I have no direct sufficient and precised evidence of Netaji's death. —Jawaharlal's letter to Suresh Chandra Bose. (13.05.62).

এই ছিলেন আমাদের বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত জওহরলাল তথা স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। অত্যন্ত লজ্জা, ঘৃণা ও পরিতাপের কথা ঐ জওহরলালের উত্তরসূরী কংগ্রেসীরা আজও সেই একই অবস্থানে বিরাজমান। এবং জওহরলালের সেই ধ্বনিতে প্রতিধ্বনি জুড়ে তারা আজও আহ্লাদে আটখানা। আজও তারা ভারতবর্ষের শতকোটি মানুষকে যতপরনাস্তি বিভ্রান্ত করে চলেছে অন্তত কম করেও অর্ধশতাব্দী কালব্যাপী। এতসব ঘটনা যাঁরা জ্ঞাত, বলুন কেমন করে তাঁরা ঐ জওহরলালকে শ্রদ্ধার আসনে আসীন রাখেন?

সপ্তম অধ্যায়

সুভাষবৈরিতা ও দেশপ্রেম দেখাতে গিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্টদের ভূমিকা কি ছিল? সুভাষবৈরিতায় কংগ্রেস কমিউনিস্টদের মধ্যে কি কোন মৌলিক ব্যবধান আছে? আজও কি কংগ্রেস, কমিউনিস্ট বা ভারতীয় অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা সুভাষবৈরিতা থেকে মুক্ত? সুভাষচন্দ্রের ব্যাপারে জাতিপুঞ্জের ঘোষণায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীদের ভূমিকা কী?

এবার চলুন আমাদের দেশের তৎকালীন কমিউনিস্টদের সাথে একটু সখ্যতা বা আলাপ পরিচয় করে আসি। দেখা যাক তাদের আবার কোন স্বর্গীয় স্বরূপ। হয়তবা কেউ বলবেন তাদের কথা তো সর্বজনবিদিত। কথাটা হয়ত সত্য, তবু সখ্যতা বা আলাপচারিতার মাধ্যমেই পরিচয় করা কি ভালো নয়? চলুন আমরা তাই করি।

১৯৪২ সালে যখন ভারতবাসী ঘরেবাইরে আত্মত্রাণে বা মরণপণ সংগ্রামে রত তখন ভারতীয় কমিউনিস্টরা যথার্থই নির্ভেজাল পঞ্চম বাহিনীর কাজটা ঐ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের কাছ থেকে কন্ট্রাক্ট নিয়েছিল। যে কারণে তাদের সেই ন্যক্কারজনক মিরজাফরীয় অধ্যায়টি আজও ইতিহাসে জ্বলজ্বল করছে এবং আবহমানকাল ব্যাপীই তা করবে। এই কমিউনিস্টরা একদিন জনযুদ্ধের দোহাই দিয়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী কর্মী ও নেতাদের পিছনে বৃটিশ টিকটিকিদের উপটিকটিকির কাজ করে সাম্রাজ্যবাদীর ব্যবসার যে তারা কন্ট্রাক্ট নিয়েছিল তার যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য যতপ্রকার ঘৃণ্য দেশবৈরিতামূলক কর্ম সবই তারা সিদ্ধহস্তে ও সার্থকভাবে সুসম্পন্ন করেছে। এই যদি দেশপ্রেম হয় তবে দেশ বৈরিতা কাকে বলে? সুভাষচন্দ্র যখন এলগিন রোডের বাড়ী থেকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাকে ফাঁকি দিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে সবে মাত্র বৃটিশ ভারতের সীমানা অতিক্রম করেন তখন বৃটেন লাল সোভিয়েতের সাথে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়। সেই সূত্র ধরেই ভারতীয় কমিউনিস্টদের স্বদেশী জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে গর্জন ও তথাকথিত শান্তিযাত্রা শুরু বিশ্বত্রাসি স্তালিন সাহেবের হাত ধরে। আজও কিন্তু বঙ্গীয় কমিউনিস্টরা বিদেহী স্তালিন সাহেবের হাত ছাড়তে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছুক নয়। তার প্রমাণ আমরা বাংলার হাটে ঘাটে মাঠে প্রতিদিন যে পাচ্ছি

তা বঙ্গবাসীর চেয়ে কে ভাল জানেন, তাই না?

এবার দেখা যাক ১৯৪২ সালের ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সূত্র ধরে কিছু তথ্য পাই কিনা, আসুন সেটাই একটু তালাস করি। স্মরণীয় সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ সালেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলেন। সেই সময় সুভাষচন্দ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথেই কাবুল হয়ে বার্লিনে পৌঁছান। কাবুল যাবার প্রাক্কালে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করার সময় পাঞ্জাবের কীর্তিকৃষাণ পার্টি সুভাষচন্দ্রকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্যদিকে যখন সেই সময় হিটলারের ত্রাসে ইংরেজরা সহ সারা বিশ্ব কম্পমান তখন তাদের দোসর ভারতীয় কমিউনিস্টরা তারে নামকরণ করে জনযুদ্ধ। এই জনযুদ্ধ যখন ঘোষিত হয়েছে তার পূর্বেই সুভাষচন্দ্র বৃটিশ ভারতের সীমা অতিক্রম করে কাবুল পৌঁছেছিলেন। ইত্যবসরে জনযুদ্ধের দেশদ্রোহী স্লোগানে সারা দেশ মথিত হচ্ছিল ভারতীয় কমিউনিস্টদের কল্যাণে। সেই সময় কীর্তিকৃষাণ পার্টির কর্মীদের সৌজন্যে সুভাষচন্দ্রকে বৃটিশের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা স্বরূপ তিনি যে যে পথ দিয়ে গিয়েছিলেন বা যেসব ব্যক্তি ও সংস্থা ইত্যাদি সুভাষচন্দ্রকে সহযোগিতা করেছিলেন তাদের সকলকেই ধরিয়ে দেয় বৃটিশের হাতে। এই ছিল কীর্তিকৃষাণ পার্টির নৈতিক কীর্তি। শুধু বিধাতার কৃপায় সুভাষচন্দ্র এ যাত্রায় লক্ষ্মণ গণ্ডী পার হয়ে যাওয়ায় শেষ রক্ষা হয়েছিল। অবশ্যই স্মরণীয় যে ঐ কীর্তিকৃষাণ পার্টি ছিল কমিউনিস্ট পার্টিরই একটি প্রশাখা। এ যাত্রায় সুভাষচন্দ্র যদি ধরা পড়তেন তবে গোটা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসটাই সম্পূর্ণ উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু হয়ে যেতো। এবং তথাকথিত হলেও আমাদের স্বাধীনতাটা তো স্বাধীনতা বটেই। এই স্বাধীনতা নামক গোলটি যে ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে চলে যেতো তা একমাত্র ইতিহাস স্রষ্টা পরমপুরুষ বলতে পারতেন। কিন্তু একটা কথাই লাখ কথার এক কথা। অর্থাৎ ধর্ম যেথায়, জয়ও সেথায়। তাই নব্য দুর্য্যোধনদের দল সুভাষচন্দ্রের নাগাল সেদিনও যেমন পায়নি আজও তা পাচ্ছে না। শুধু পাচ্ছে না বললেই শেষ নয়। উল্টো তারা চরম নাকানি চোবানিও খাচ্ছে তাঁর হাতে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে সমগ্র বিশ্ব সুভাষচন্দ্রকে পিষ্ট করতে চেয়েছে বারবার এবং এখনও তাদের সে চাওয়ার শেষ নেই। কিন্তু সুভাষচন্দ্র কাউকেই এই দৃষ্টিতে দেখেননি কোনদিন। তিনি শুধু বিশ্বের মানুষের জন্য ন্যায়, সত্য, সততা এবং মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার চেয়েছেন। অবশ্যই যারা মানুষের সেই অধিকার হরণ করছে তাদের বিরুদ্ধে মহাভরমা নাদে হুঙ্কার জানিয়ে এবং সেই রূপ কর্মকাণ্ডে নিজেকে ব্যাপৃত করে। হয়ত কেউ বলবেন তবে ধর্মের সেই প্রকাশ কোথায়? এর উত্তর আপনি আমি দেবার কেউ নয়। এর উত্তর অবশ্যই সময়ই বলবে। সুতরাং সত্যের জন্য অপেক্ষাই হবে শ্রেয়। আজকের বিশ্ব সেদিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করছে।

আমরা আমাদের প্রতিপাদ্যের বিষয় থেকে একটু দূরে এসে গেছি। আসুন আসল

স্রোতে আবার ফিরে যাই। এখানে স্মরণীয় যে ভারতবাসীর নিকট যিনি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম শৌর্য্যবীর এবং যাঁর সংগ্রাম বিনে আজও ভারতবর্ষ স্বাধীন হতো কিনা প্রশ্ন তোলা যায়, সেই বিশ্ববিখ্যাত বীর নেতাজী সুভাষ সম্পর্কে এইসব কমিউনিস্ট কমরেডদের মূল্যায়ন কি ছিল জানেন? আসুন সেই ছবিটা একটু ওলট পালট করে দেখি। তৎকালীন কমিউনিস্টদের নেতা কমরেড সোমনাথ লাহিড়ি নেতাজী সম্পর্কে যা বলেছিলেন তাতে আজকের প্রজন্মের যেকোন বাঙ্গালী তো বটেই এমনকি যেকোন পৃথিবীবাসী, নেতাজী অনুরাগী বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত আঁতকে উঠবেন। কমরেড সোমনাথ লাহিড়ির আপন বয়ানেই আসুন আমরা শুনি তার মুখঃনির্গলিত মহান বাণী। তিনি বলেছিলেন,—

"If Subhas Chandra Bose comes, people of Bengal will greet him not with flowers but with showers of bullet." তৎকালীন ভারতবর্ষে এ কথা কে না জানতেন? মুখে মুখে সারা দেশে তা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই ছিল কমিউনিস্ট তথা বৃটিশের মন্ত্রশিষ্য পদলেহীদের মদ গর্বী দম্ভোক্তি। এছাড়া ১৯৪২ সালের জাতীয় আন্দোলনের সময়ে তাদের পদাবলী অমর কীর্তিগাঁথার কথা কে না জানেন? হয়ত কেউ বলবেন অতীতকে নিয়ে পড়ে থাকার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু অতীতই তো মানুষের ও জাতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য। অতীতকে অস্বীকার করা মানে তো আত্মপরিচয়কে অস্বীকার করা। আমরা ভারতবাসী হিসাবে যে আজও এত গর্ববোধ করি যা পৃথিবীর কেউ করতে পারেনা তা তো একমাত্র অতীত ঐতিহ্যের কারণে। নইলে তো বংশগৌরব জাতীয়গৌরব এই কথাগুলো অর্থহীন হয়ে যেতো। অভিধানেই এসব থাকতো না। আপনার কথা যদি তর্কের খাতিরেও মেনে নিই তবে সাথে সাথে এও তো সত্য আত্মশুদ্ধি বা আত্মসংশোধন দরকার। শুধু মাঝে মাঝে মানুষের মানসিকতাকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভুল হয়েছে ভুল হয়েছে বলে চিৎকার করলেই কি ইতিহাসের গতিরোধ করা যায় না ইতিহাসকে পাল্টানো যায়? না কোন অবস্থাতেই ইতিহাস তাদের ক্ষমা করতে পারে? তাছাড়া অপরাধের তো মাত্রাজ্ঞান থাকা উচিত। এইসব দেশদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর ইংরেজ চাটুকারীতা ও দেশপ্রেমের রূপটাই দেখা যাক না। তারপরতো ঐসব তর্কবিতর্ক। **ভারতীয় কমিউনিস্টরা সেই সময় সুভাষচন্দ্রকে কী বলেনি? তারা সুভাষচন্দ্রকে বলেছে কুইসলিঙ্, তোজোর কুকুর, গাধা, ফ্যাসিস্ট, দেশদ্রোহী, স্টুজ ইত্যাদি। একটি কুকুরকে শেকলে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে জাপানি সমরনায়ক তাঁর মুখটা হচ্ছে সুভাষচন্দ্রের। একটি গাধার পিঠে চড়িয়ে তোজোকে নিয়ে যাচ্ছে। এই গাধার মুখ হচ্ছে নেতাজী সুভাষ বোসের। এবং জাপানী কামানের গোলার মাথায় আঁকা আছে নেতাজী সুভাষের মুখ। এই ছিল ভারতীয় কমিউনিস্টদের দিনের পর দিন মাসের পর মাস তৎকালে ভারতবর্ষব্যাপী প্রচার এবং ভারতের গ্রামেগঞ্জে সহরে সহরে দেওয়ালে দেওয়াল লিপি ও ব্যঙ্গচিত্র।** এই সব

প্রচার করতো তাদের জনযুদ্ধ নামক বা People's war পত্রিকায়। এই ছিল তাদের দিবারাত্রের কাব্য। ১৯৪২-১৯৪৩ সালের জানুয়ারী থেকে বছর বছর ব্যাপী কর্মসূচী। (পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থে People's war পত্রিকার ব্যঙ্গচিত্রগুলির ফটো কপি পরের পাতায় দেওয়া হল) এসব কর্মকাণ্ড ও ঘটনাবলী দেখে তখনকার ইংরেজরা মুচকে মুচকে হাসতো। কারণ তাদের মন্ত্রগুপ্তির সাফল্যতা দেখে। এবং এই ভেবে যে, তারা অর্থাৎ স্বয়ং ইংরেজরাও সুভাষচন্দ্রকে এমন সভ্যতাবর্জিত কদর্যপূর্ণ তকমা বা কালিমার কলঙ্কে বিবর্ণ করতে পারেনি বলে। আরও শুনুন কমিউনিস্টদের বদান্যতার অপার মহিমা। এরাই হচ্ছে আজ আমদের টি. ভি. বেতার বা সংবাদপত্র মাধ্যমের সাক্ষাৎকারের বাণী তথা উপদেশ দাতা। এবং পরিত্রাতা মহামান্য কাণ্ডারীর দল। শুধু রাজনীতির রঙ্গমঞ্চেই নয় সমাজের সকল ক্ষেত্রে সকল স্তরে। ধন্য আজকের আঁতেল মিডিয়া কূলপতিরাও। তারা ওদের বাণী প্রচারের মহৎ ভূমিকা নিয়ে আজ মেকি দেশপ্রেমের দীপশিখা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে দেশউদ্ধারেও ব্যস্ত। যাইহোক আসুন আরও কিছু তৎকালীন কমিউনিস্টদের বাণী শোনা যাক, তাদের বিশ্বখ্যাত জনযুদ্ধ নামক মুখপত্রের বয়ান থেকে যা পাওয়া যায়। তাতে ছিল ঃ

".....The Communist Party will rise to occasion and give the only reply., which traitors and quislings have got from honest patriots. Bose's—mercenary army of liberation of repine and plunder will feel the warth and indignation of our people if it dare rest its foot on Indian soil to enact acts of pillage and robbery."

(People's war—10th January 1943)

এই ছিল সে সময়ের বৃটিশের বন্ধু ভারতীয় কমিউনিস্টদের ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে নেতাজী সুভাষ সম্পর্কে উচ্ছিষ্ট উক্তি বা প্রসাদ বিতরণ। সারা পৃথিবী তল্লাসি করে আসুন। দেখুন কোন দেশের দেশপ্রেমিকদের সম্পর্কে তাঁরই দেশবাসী এমন কদর্যপূর্ণ কোন প্রচার করছে কিনা। বিশেষ করে সেই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় বীর সম্পর্কে। বিভিন্ন দর্শনে বিশ্বাসী বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের লোক বা পার্টি থাকতেই পারে। বিশেষ করে গণতন্ত্রে থাকাটাইতো স্বাভাবিক। এইরূপ বৈচিত্র্যটাইতো গণতন্ত্রের ধর্ম। উপরে বর্ণিত যে কদর্যময় ব্যাপার এটাই কমিউনিস্ট প্রথা। কমিউনিস্ট ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বিরুদ্ধবাদীদের মূল উচ্ছেদ। বিরোধী মতাদর্শতা এক্তিয়ারেই থাকা চলবে না। এই তত্ত্ব যে তাদের কত বড় রূঢ় সত্য তা পৃথিবীর সকল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর দিকে তাকালেই পরিষ্কার। যে কারণে পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এমন বিধ্বংসী রাজনৈতিক ধ্বস। তাহলে বলতেই হয় বা তারাই বলতে বাধ্য করছে যে এজাতীয় ধ্বংসাত্মকতাই তাদের আত্মপরিচয়। আপন গোষ্ঠীগত জাতীয় ধর্ম কোন মানব গোষ্ঠীই সহসা ছাড়তে পারে না। কাজেই তারাও পারছে না। এটাই স্বাভাবিক। সেই কারণে আজ একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নেও তারা তাদের স্বভাব বা গোষ্ঠীগত ধর্ম ছাড়তে

SUNDAY. JULY 19th 1942

EDITOR
P.C. JOSHI

ENGLISH, URDU, HINDI MARATHI
2AS No 2

(গ) কম্যুনিষ্টদের ঐ কাগজেই (১৩।৯।৪২) আর একটা ব্যঙ্গ চিত্র এঁকেছে। তাতে আছে—জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো দাঁড়িয়ে একটা কুকুরের ঝুঁটি ধরে মাইক্রোফোনের সামনে তুলে ধরেছেন। সেখান থেকে কুকুরটা রেডিওতে কেঁউ কেঁউ করে বলছে—আমি ভারতের স্বাধীনতা আনব। এই কুকুরের মুখে বসিয়ে দিয়েছে নেতাজীর মুখ, চোখে চশমা মাথায় গান্ধী টুপি। ছবির তলায় লেখা আছে 'সুভাষ বোস'।

নেতাজীকে কুকুর এঁকে দেখানো হয়
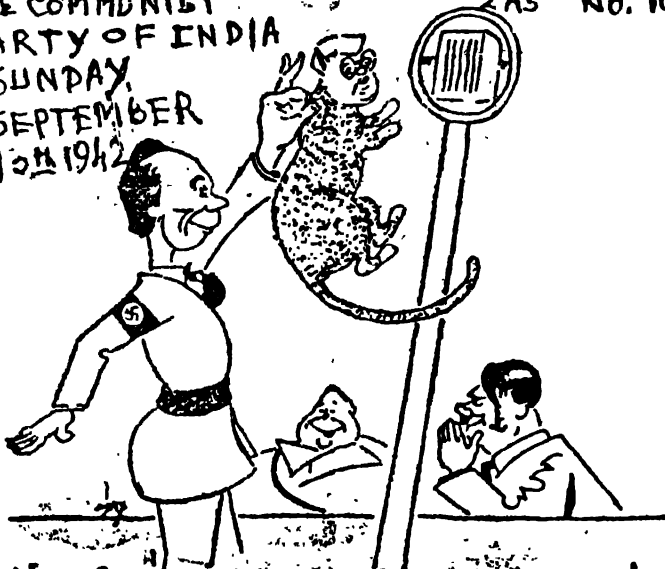
(ঘ) ওদের ঐ 'পিপলস্ ওয়ার' কাগজে (২১।১১।৪২) আরও একটা ব্যঙ্গ চিত্র ছেপেছে। একটা প্রকাণ্ড বোমাকে আঁকড়ে ধরে নেতাজী আকাশ পথে ভারতের বুকে নেমে আসছেন। নীচে নগ্ন, ক্ষুধার্ত, মুমূর্ষু বালক-বালিকা হতাশ ভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে। আবার ঐ কাগজে (১১।১২।৪৩) ছবি ছাপান। তাতে আছে বোমাটা ভারতের বুকে ফেটে পড়েছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। মানুষ পুড়ে মরছে। শিশুকে

পারছে না বা ছাড়তে ইচ্ছুক নয়। তাদের যে ঐ নৈতিক বিধান সেই বিধানেই তাদের মৃত্যুর গহ্বরের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে বা তাড়া করে ফিরছে। এই সেদিনও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের শতবার্ষিক জন্মজয়ন্তীতে বর্তমান প্রজন্মের বিখ্যাত বঙ্গীয় কমরেডরা কি বলেছিলেন তা নিশ্চয় ভোলে যাননি। তারা বলেছিলেন, যারা সুভাষবাবুকে নেতাজী বলেন তারা অতি নিম্নমানের কমরেড। তাদের মত উচ্চাসনের কমরেডরা কখনও সুভাষ বোসকে নেতাজী বলতে পারে না। কারণ তারা তাদের মনে করে তারা নিজেরা বিশ্বমানের কমরেড। কিন্তু তারা জানেনা তাদের যে গুরু পদবাচ্য তাঁরা সকলেই সুভাষচন্দ্র বা নেতাজীর উপদেশের মুখাপেক্ষী। শুধু মুখাপেক্ষীই না, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ঐসব বিশ্ববিখ্যাত কমরেডদেরও পরিচালক বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ এই পুস্তকে প্রদর্শিত ছবিতেই লক্ষ্য করুন সুভাষচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন মহান কমরেড মাও-সে-তুং ও চৌ-এন-লাই-এর মধ্যস্থলে! এতে কি প্রমাণিত হচ্ছে? এবার বলুন, কে কার নেতা? এমন যে আমাদের বঙ্গীয় কমরেডকুল তা সত্ত্বেও আমরা বঙ্গবাসীরা এহেন কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসীদের নাম কীর্তনে আজ মশগুল এবং তাদেরেই আমরা কোয়ার্টার শতাব্দীব্যাপী জনাদেশের মাধ্যমে আমাদের মা-বাপ বানিয়ে রেখেছি। আরও কতকাল যে রাখবো তার খবর জানি না। সেই চৈতন্য বঙ্গবাসীর কি আদৌ হবে? এটা বোধহয় বঙ্গবাসীর দুঃর্ভাগ্য নয়। বলাই বাহুল্য এটা ইতিহাসেরই দুঃর্ভাগ্য। নইলে আজ যে বঙ্গে এককথায় বলতে গেলে গৃহযুদ্ধ চলছে তারপরও চৈতন্যের সাক্ষাৎ নেই কেন? ইতিপূর্বে প্রথম পরিচ্ছদে বর্তমান প্রতিবেদক তথ্য সন্নিবেশের প্রেক্ষিতে বলেছিলেন যে, ভারতীয় জাতিটা এমন মহান না হলে কি সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশরা দুই শতাব্দীর অধিককাল জাতিটাকে গোলামির কাঠগড়ায় ফেলে পদপিষ্ট করতে পারে? একই কথা আজ বাঙ্গালী জাতির ক্ষেত্রে আরও কঠোরভাবেই প্রযোজ্য। অথচ ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, এই বাঙ্গালীরই ছিল শ্রেষ্ঠ অবদান বৃটিশকে তাড়ানোর সংগ্রামে। আর আজ আমরাই নপুংসকত্বের সেরা আদর্শ হয়ে উঠেছি। এবং এমন নপুংসক বলেই সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠতম জাতীয় শৌর্যবীরকে এই কমিউনিস্টরা কুইসলিঙ্, তোজোর কুত্তা ইত্যাদি বলার পরও তাদের আজও বঙ্গের মসনদে বসিয়ে রেখেছি এবং দিবারাত্র তাদের কুর্নিশ করছি। এমত অবস্থায় আমরা পৃথিবীর জাতিগুলোর মাঝে আজ কোথায় অবস্থান করছি এই প্রশ্ন যদি আত্মজিজ্ঞাসিত হয় তবে তার উত্তর যে হবে এককথায় নিকৃষ্টতম তা বলাই বাহুল্য। সবচেয়ে দুঃখের কথা এখন ভারতীয় কমিউনিস্টদের সেই জেল্লাধারি সাম্রাজ্যবাদীর মন্ত্রসিদ্ধ রজনী পাম দত্তও নেই, আর লালবিশ্বের লালদুর্গ সোভিয়েত কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যও নেই। আর মন্ত্রগুরু বৃটিশরা তো বহুকাল আগেই টেমস্ নদী ও ইংলিশ চ্যানেলে ডুবে হাবুডুবু খেয়েছে। ঐ হাবুডুবু যিনি খাইয়েছেন তাঁরই নাম যে সিংহপুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তা শুধু আপনি আমি জানি তা নয়, সমগ্র বিশ্ব তা জানে। ইংরেজের উপায়ই বা কি ছিল টেমস্ বা ইংলিশ চ্যানেলে হাবুডুবু

না খেয়ে? কারণ ভারত সাম্রাজ্য ছাড়ার পর তাদের আর স্থান কোথায়? আর অন্যদিকে বঙ্গীয় কমরেডরা আজ পিঠ বাঁচাতে কথায় কথায় লেনিন, স্তালিন, মাও ছেড়ে নেতাজীর নামে জপমালার মানব শৃঙ্খল তৈরী করে সাগর থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিধৌত করে প্রায়শ্চিত্তের নামে আত্মত্রাণের পথ খুঁজছে। এরই নাম ভারতীয় তথা বঙ্গীয় কমিউনিস্ট, এরই নাম দেশসেবা! তাই বিখ্যাত কবি ডি. এল. রায়ের ভাষায় প্রতিধ্বনি তুলে বলতেই হয়, "বাহবা বাহবা বাহবা বেশ, ভ্যালারে নন্দ বেঁচে থাক চিরকাল"।

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা জাতীয় কংগ্রেসের চেহারা ও তার কর্মধারার সঙ্গে পরিচয়লাভ করেছিলাম। এবার পরিচয় হলো কমরেডকুল তথা কমিউনিস্টদের সাথে। আসুন এবার আমরা কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট নামক দুইটি আলখাল্লার খোলনলচে ফেলে দিয়ে ভেতরের সত্তাদুটির সাথে একটু পরিচিত হই। এই প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে বৃটিশরা তাদের ভারত সাম্রাজ্য ছেড়ে ছিল মূলত তিনটি ঐতিহাসিক কারণে। এই তিনটি কারণ হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপ।

প্রথমতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীতে উদ্ভূত পরিস্থিতি সাম্রাজ্য লোলুপ বৃটিশকে এক দুর্বিসহ অবস্থায় এনে ফেলেছিল। দ্বিতীয়তঃ এই সুবর্ণ সুযোগের সৎ ব্যবহার করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ সরকার গঠন ও আজাদী ফৌজের ব্রহ্মরণাঙ্গনে বৃটিশ-আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণায় বৃটিশকে আরও অনেক বিপাকে এনে দাঁড় করিয়েছিল। এবং তৃতীয়তঃ গান্ধীজীর ভারতবর্ষের মাঝে অভ্যন্তরীণ জনজাগরণ তথা গণআন্দোলনের ফলে বৃটিশের পক্ষে এই তিনের একাত্ম কোলাবরেশনকে সামাল দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এইরূপ একটি পরিস্থিতিতে বৃটিশের ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তখন খলরাজ ইংরেজ সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে গান্ধীহত্যার সুচারু ব্যবস্থা করে। তারপর তাদের ক্রীড়নকদের মাঝে দিল্লীর ময়ূর সিংহাসন সঞ্জাত অমৃতের রসনা ভাণ্ডারটি এমনভাবে বন্টন করল যাতে বৃটিশের স্বার্থ অন্তত বেশ কিছুকাল তারা সাতসমুদ্র তের নদীর ওপারে বসেও ভোগদখলে পরোক্ষে রাখতে পারে। কার্যত এই পরিকল্পনার ফলই হচ্ছে ভারতবর্ষকে বিভাজন। (যদিও এই বিভাজনের আরও প্রাচীন পরিকল্পনার ইতিহাস আছে, যা আমরা পরের কোন অধ্যায়ে দেখবো)। তাই বৃটিশরা যেন অভিভাবক সেজে পিতৃস্থানীয় অবস্থানে থেকে ক্রীড়নক মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসীদের মাঝে চিরস্থায়ী বৈরিতা ও তিক্ততা সৃষ্টি করে তাদের মাঝে দ্বিজাতি তত্ত্বের বীজ বপন করল। এবং সেই সুবাদে তাদের মধ্যে বিভাজনের সুচারু ব্যবস্থাও সুসম্পন্ন করল। ইতিহাস বলছে, এই পরিকল্পনা তাদের ১৭৭৬ সালের। কিন্তু এতদিনে সুযোগ এলো, এবার ১৯৪৭ সালে তারে কার্যকরী করার। ১৭৭৬ সালের ঘটনায় আমরা পরে আসছি।

এবার বৃটিশজাত ক্রীড়নকদের মধ্যে ভারতবর্ষের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বন্টনের পালা। তাই তারা এক অংশ কনিষ্ঠকে অর্থাৎ মুসলিম লীগকে এবং অপরাংশ

জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমকে অর্থাৎ কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট এই দুই দলকে সম্মিলিত ভাবে বন্টন করল। এখানে স্মরণীয় যে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট ছাড়াও মুসলিম লীগ ছিল তৃতীয় তথা কনিষ্ঠতম বৃটিশজাত ক্রীড়নক। এই মুসলিম লীগ এবং জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেই ঘটেছিল ভারত বিভাজনের দ্বিজাতিতত্ত্বের আসল জমজমাট খেলা। মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালে লাহোর কনফারেন্সে তাদের পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। এবং এই কনফারেন্সের দাবি ছিল ভারতবর্ষে মুসলিমদের আলাদা নিজস্ব বাসভূমি বা হোমল্যাণ্ড থাকা প্রয়োজন। এই দাবিকে ভারতীয় কমিউনিস্টরা জোরালো সমর্থন করেছিল। মুসলিম লীগের ঐ দাবিকে কার্যকরী রূপ দেবার জন্য তখন তারা direct action-এ অবতীর্ণ হয়ে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাঁধালো। ঐ দাঙ্গা শুরু করেছিল মুসলিম লীগ ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ সালে কলিকাতায়। মুসলিম লীগের পরিকল্পনা ছিল এই দাঙ্গা বাঁধিয়ে তারা কলিকাতা নগরীকে পাকিস্তান ভুক্ত করার। এই দাঙ্গাকে শুধু তারা কলিকাতায় সীমাবদ্ধ রাখেনি! স্মরণীয় ভারত বিভাজনের কার্য ত্বরান্বিত করবার জন্যই ছিল বৃটিশের এই ঘৃণ্য চাল। কলিকাতার এই জাতি-দাঙ্গা ভারত বিভাগের ইতিহাসে great killings নামে খ্যাত। তখন শুধু কলিকাতা নয় সমগ্র ভারতবর্ষে (তখন অখণ্ড ভারতবর্ষ) ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তথাপি কমিউনিস্টরা লাহোর প্রস্তাবের উগ্র সমর্থক ছিল। এই ছিল ঐ মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্টদের চরিত্র। এককথায় এই দুটি গোষ্ঠীই হচ্ছে চরম সাম্প্রদায়িক চরিত্রের। অথচ তারাই দিনরাত্রি চিৎকার করে মরে অন্যকে সাম্প্রদায়িক বলে।

এবার চলুন সেই ভারতবর্ষ নামক দেশের ভাগবাঁটোয়ারার প্রক্রিয়াটা কেমনভাবে হয়েছিল তা একপলক দেখে নিই। হ্যাঁ, এই বাঁটোয়ারা প্রক্রিয়া অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে, এই তিন অংশিদারের মাঝে বিলিবন্টিত দুটি অংশের নাম হচ্ছে যথাক্রমে ভারতীয় ডোমিনিয়ান, বা ইণ্ডিয়া। এবং নবজাতক দেশের বা রাষ্ট্রের নাম হলো পাকিস্তান ডোমিনিয়ান। এই পাকিস্থান আদায় করার জন্য যে দাঙ্গা বাঁধানো হয়েছিল তখন তারা গান বেঁধেছিল এই বলে যে,

"লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, ছাড়বোনা পাকিস্তান জীবন থাকিতে
নোয়াখালির ঘটনা বিহার হলো কল্পনা
সেই প্রতিশোধ নেবো মোরা। সোনার বাংলাতে
কাফের চিনতে লাল ঝাণ্ডাকেও লও সাথে।।"

লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান ছাড়বো না পাকিস্তান জীবন থাকিতে। এই ছিল মুসলিম লীগের গান। ১৯৪৬ সালে। এই মুসলিম লীগের বয়ানেই পাচ্ছেন কমিউনিস্ট আলখাল্লার নীচের চেহারাটা। আবার এরাই দেশপ্রেম আর সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে অপরকে ঘায়েল করে। যা ছিল আলোচ্য, সেই বাঁটোয়ারাতেই চলুন ফিরে। ভারত পাকিস্তান নামে দুটি দেশে, ভারতবর্ষ খণ্ডিত হবার পর দুটি দেশের যিনিই যখন রাষ্ট্রপ্রধানের শপথ নেবেন তখন তাদের মন্ত্রগুপ্তি নিতে হতো ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর নামে।

বত্তাকালে কি হবে সেটা পরে দেখা যাবে। এই হচ্ছে ভারত পাকিস্তানের তথাকথিত স্বাধীনতা। পূর্বেই আমরা জেনেছি এই তিনটি গোষ্ঠীই ছিল বৃটিশজাত। কাজেই তারা যে সবাই অভিভাবকের অঙ্গুলী হেলনে উঠাবসা করবে সেটাই স্বাভাবিক। এই ভাগ বন্টন হয়েছিল ১৯৪৬/৪৭ সালে। তখন থেকেই দুই ভাগীদার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম একই রাষ্ট্রে তথা একই ভবনে অবস্থান করছিল। স্বার্থের খাতিরে হোক বা স্বভাবের দোষেই হোক তখন তারা একরাষ্ট্রেই ভিন্ন হেসেলে বন্দী। কিন্তু যেহেতু কমিউনিস্টরা দিল্লীর রাজ রসনা থেকে প্রত্যক্ষভাবে বঞ্চিত তাই তারা প্রথম প্রথম ১৯৪৭-এর পর মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই হোক আর যে কারণেই হোক কিছুদিন চেঁচামেচি করেছে এই বলে যে, "এ আজাদী ঝুঠা হ্যায়, ঝুটা হ্যায়"। যদিও তারা জীবনে জাতীয় পতাকা স্পর্শ করেনি।

এই কংগ্রেসীদের একসময়ে যে ঐতিহ্য ছিলনা তা নয়। যথেষ্ট ঐতিহ্যই ছিল। কিন্তু ত্রিশের দশকের শেষপ্রান্ত থেকেই শুরু হয়েছিল এদের নষ্টামির যাত্রা শুরু। যা আজও বিদ্যমান। সুভাষ ও গান্ধী বিতাড়নের মাধ্যমেই ওরা তাদের মহান ঐতিহ্য হারাতে ও নষ্ট করতে শুরু করেছিল একথা বলাই বাহুল্য। হ্যাঁ, বলতে নেই সুভাষ ও গান্ধী বিদায়েরও মন্ত্রগুরু বৃটিশ। এই পটভূমিকায় বৃটিশের অবদানই শ্রেষ্ঠ অবদান। তখন থেকেই বৃটিশের সাথে একাত্ম কোলাবরেশনে সুভাষ ও গান্ধী বিরোধিতায় হয়ে উঠেছিল সকলে হরিহর আত্মা। বিশেষ করে যখন গান্ধীকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেওয়া হলো তারপর থেকে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও বৃটিশ যেন এক অভিন্ন আত্মা সুভাষবৈরিতায়। যা নাকি আজও একই গাঁটবন্ধনে তারা বন্দী। শুধু দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য ও করে-কম্মে খাবার জন্য একে অপরের ছায়া মাড়াতে কৃত্রিম ঘৃণার বাতাবরণ এতকাল তৈরী করে রেখেছিল যাতে সর্বসাধারণরা আসল তথ্যের আসল সত্যের তিলার্ধও আঁচ করতে না পারে। কিন্তু আজ অর্ধশতাব্দী পার হবার পর তাদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে আপনা থেকেই খোলনলচেটি খসে পড়েছে। বয়সের সাথে সাথে যেমন বোধজ্ঞানের পরিপক্কতা আসে তেমনি আজ যেন কংগ্রেস কমিউনিস্টদের চৈতন্যের দ্বার খুলতে চাইছে। তাই তারা প্রকাশ্যেই যেন বলতে চাইছে আমরা এক জনকের দুই সন্তান। অতএব ঝগড়া বিবাদ কেন। আমরা একের ব্যথায় অপরজনও সমব্যথী। কারণ দেখা যাচ্ছে এইরূপ কলহে ও ভিন্নসত্তায় বন্দী থাকলে দিল্লীর রসনাগারটি কারো হাতেই আমাদের থাকছে না। সেটি হলে তো বিপদ। আমরা চলবো কোন দৌলত আহরণে? এছাড়াও সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে সুভাষ নামক একজনকে নিয়ে। সে তো এতদিন মৃত-বলে লোককে বিভ্রান্ত করতে পেরেছি। কিন্তু এখন যে আবার সেই আসল তথ্য ও সত্য জনগণের গোচরে এসে গেছে। সুতরাং সুভাষ বিরোধিতায় আমরা ইংরাজদের সাথে যতই এক ছিলাম এক আছি ও এক থাকিনা কেন আজ আর কোন অস্ত্রেই এ ব্যাপারে ধার উঠছে না। যতই ধার শানাবার চেষ্টা করিনা কেন ততই তা ব্যুমেরাং হতে চাইছে। এখনও হয়নি বটে তবে হবেই যে তা তাদের বুঝতে বাকী নেই। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তাই সুভাষ

বিরোধিতার কোলাবরেশনটা তো ধরে রাখতেই হবে। ওটা তো আমাদের অর্থাৎ ইংরাজ, কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের জন্ম জন্মান্তরের কোলাবরেশন। যাকে বলে আবহমান কালের চুক্তি। আজ ২০০২ সালের শুরুতে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে ঐ চুক্তিটা আজ আরও জোরালো করা প্রয়োজন। আর এও দেখা যাচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রত্যেকটি পার্টিই অন্তত সুভাষ বিরোধিতায় এক অভিন্ন সত্তায় সত্তাবান সকলেই এই অভিন্ন কর্মসূচীতে বৃটিশের আজ্ঞাবাহক দাস। অবশ্যই বলতে হবে এখানে কংগ্রেসের ভূমিকাটাই মূখ্য। যেহেতু তারা রসনাভাণ্ডারের সিংহভাগের মালিক ছিল সুদীর্ঘ দিন যাবৎ। এমনকি আজ বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে বলা যেতে পারে বৃটিশরা এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হলেও ভারতীয় মন্ত্রসিদ্ধ বৃটিশ চেলারা একবিন্দুও এধার ওধার হতে প্রস্তুত নয়। বৃটিশ ক্রীড়নকরা তাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততায় অটল অনড়। তাই বলতেই হয় ধন্যহে ধন্য কংগ্রেস, ধন্য কমিউনিস্ট, সর্বোপরি ধন্য ও নমস্য তোমায় হে শ্বেতপ্রভু বৃটিশ।

এই কংগ্রেসীদের কীর্ত্তি গাথার কি কোন শেষ আছে? ১৯৭১ সালে কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্যে বিশ্বসংস্থা জাতিপুঞ্জের তথ্য অনুসারে যে-সুভাষচন্দ্রের নাম যুদ্ধাপরাধীর তালিকায় ছিল তার মেয়াদকাল যদিও ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ছিল বলে জানা যায়, তাকে তিনি বিশ্বসংস্থার সনদে হাজার বছরের জন্য বাড়িয়ে দেন। কারণ ইতিমধ্যে তিনি সুভাষচন্দ্রের ভূত ১৯৬৪ সালে নেহেরুর মৃতদেহের সম্মুখে দেখে চমকিত হন। এছাড়াও সুভাষচন্দ্রের বর্তমান অবস্থান তো তিনি জ্ঞাত ছিলেনই। সেই ইতিহাসও পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এইসব তথ্যের ফলে কংগ্রেস কমিউনিস্টরা তো বটেই এমনকি সকল ভারতীয় রাজনৈতিক কর্তাবাবুরাই শঙ্কিত হয়ে প্রহর গুণছেন। তাই আজ তারা চতুর্দিক থেকে নিরুপায়। এখন তাদের বাঁচাবে কোন মাউন্টব্যাটেনের দল?

১৯৭১ সালে সুভাষচন্দ্র বসু সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধাপরাধী তালিকায় যে পরিবর্তন করা হয়েছিল তাতে ভারত সরকারের কী ভূমিকা ছিল সেই বিষয়ে সাম্প্রতিক কালের পত্র পত্রিকায় যে সব মূল্যবান তথ্যাতথ্য পাওয়া গেছে তার কিছু কিছু নমুনা এখানে সন্নিবেশিত করা হলো। ১৯ শে অক্টোবর ২০০০ সালে বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত যে-তথ্য ঐ বিষয়ে আমরা পাচ্ছি তা নিম্নরূপ। এই তথ্যের ভাষ্যকার হচ্ছেন পবিত্রকুমার ঘোষ। তিনি বর্তমান পত্রিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেও পরিচিত। সেই তথ্য ও ভাষ্যে ছিল ঃ

"১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে, যখন নুরেমবার্গে নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছিল সে সময় রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, যেখানেই কোন যুদ্ধাপরাধীকে দেখতে পাওয়া যাবে সেখানেই তাকে গ্রেপ্তার করবে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদেশ। গ্রেপ্তার করে তাকে পাঠিয়ে দিতে হবে যেখানে সে অপরাধমূলক কাজ করেছে সেই দেশে, যাতে তার বিচার ও শাস্তি হয়।

উপরোক্ত প্রস্তাব ১৯৪৭ সালে আবার গ্রহণ করা হয়। ভারত রাষ্ট্রসংঘের ওই

প্রস্তাবের দ্বারা ১৯৪৬ সাল থেকেই আবদ্ধ হয়ে আছে। রাষ্ট্রসংঘের ওই প্রস্তাবের সমর্থনে সই দিয়েছিল বৃটিশ ভারতের সরকার। কিন্তু ১৯৪৮ সালে ঐ একই প্রস্তাবে ট্যাঁড়া সই দিয়েছিল স্বাধীন ভারতের নেহেরু সরকার।

সেখানেই শেষ নয়। ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের যুদ্ধাপরাধী সংক্রান্ত প্রস্তাবটি নবীকৃত করা হয়েছে। শুধু নবীকৃত নয়, যুদ্ধাপরাধীদের পাকড়াও করার সময়সীমাও উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কোন যুদ্ধাপরাধীকে যদি একহাজার বছর পরেও পৃথিবীর কোন প্রান্তে দেখা যায় তা হলে তখনই তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে, এই হলো রাষ্ট্রসাঙ্ঘের সর্বশেষ আদেশ। (ইউনাইটেড নেশনস্-ট্রিটি সরিজ ১৯৭১ / নং ১০৮২৩। কনভেনশন অন দি নন-অ্যাপ্লিক্যাবিলিটি অফ স্ট্যাটুটরি লিমিটেশনস টু ওয়ার ক্রাইমস অ্যান্ড ক্রাইম এগেইন্স্ট হিউমিনিটি অ্যাডপটেড বাই দি জেনারেল অ্যাসেমব্লি অফ দি ইউনাইটেড নেশান্স অন ২৬ নভেম্বর ১৯৬৮। টু টেইক এফেক্ট অন ১২ এপ্রিল ১৯৭১।)**

ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এই প্রস্তাবে বিনা দ্বিধায় সই দিয়েছিল। অটল বিহারী বাজপেয়ির সরকার এই প্রস্তাব মেনে চলেছে।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বিমান দুর্ঘটনায় কিম্বা অন্যভাবে মারা গিয়েছেন এমন কোন ঘোষণা বৃটিশ সরকার আজও করেনি। কিন্তু তিনি যে একজন যুদ্ধাপরাধী এ কথা ঘোষণা করে গিয়েছে বৃটিশ ভারতের সরকার। তারা রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধাপরাধী তালিকায় নেতাজীর নাম ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর বৃটিশ ভারতের ওই চুক্তির দায় স্বাধীন ভারতকেও মাথা পেতে নিতে হয়েছে। সে দায় অস্বীকার করার ক্ষমতা অটলবিহারী-লালকৃষ্ণ আদবানীদের নেই।

বৃটিশ সরকার কর্তৃক লন্ডনে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত সুবিখ্যাত 'ট্রান্সফার অফ পাওয়ার'—গ্রন্থ থেকে দুটি অতি উচ্চ পর্যায়ের সরকারি ডকুমেন্ট এখানে তুলে ধরছি। ভাইসরয় ওয়াভেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি স্যার ই. এম. জেনিকনস লিখেছেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি স্যার এফ. মুডিকে, তারিখ ১১ আগষ্ট ১৯৪৫। (ওয়াভেল পেপারস, অফিসিয়াল করসপন্ডেস, জানুয়ারী-ডিসেম্বর ১৯৪৫ সাল)।

টপ সিক্রেট

নং ১১৫৭,

প্রিয় মুডি,

হিজ এক্সেলেন্সির নির্দেশ অনুযায়ী বিদেশ দপ্তর ইণ্ডিয়া অফিসের কাছে একটি সরকারি টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছে। জাপানের ওপর আত্মসমর্পণের যে সব শর্ত আরোপ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে ভারত যে-কয়টিতে বিশেষভাবে আগ্রহী সেই সব পয়েন্ট ওই টেলিগ্রামে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ওই পয়েন্টগুলি সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করা হোক। আমাদের হাতে যে বিশ্বাঘাতকদের তুলে দেওয়ার কথা আমরা বলেছি তাদের একটি "সমর্পণ তালিকা" — স্বরাষ্ট্র দপ্তরে প্রস্তুত করা হয়েছে।

ইন্ডিয়া অফিসে সে তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিদেশ দপ্তরের টেলিগ্রামে যে সব পয়েন্ট উল্লেখিত হয়েছে তার মধ্যে দুটি হল ঃ

(১) জাপানীদের হাতে যে-সব ভারতীয় যুদ্ধবন্দী আছে তাদের এবং

(২) বসু এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা।

হিজ এক্সেলেন্সি মনে করেন, বিষয়টি অতি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। বিশেষত বসু এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের বিচার করার জন্য দেশে ফিরিয়ে আনা উচিত হবে কিনা সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত নন। বরং ভারতের বাইরে যুদ্ধাপরাধী রূপে তাঁদের ব্যবস্থা করাই ভালো হবে। হিজ এক্সেলেন্সি এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে চান। তিনি ইতিমধ্যেই সেক্রেটারি অফ স্টেটকে এ বিষয়ে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। — ষষ্ঠ খন্ড ঃ পৃষ্ঠা ঃ ২৬২।

দ্বিতীয় ডকুমেন্ট বৃটিশ মন্ত্রীসভায় গৃহীত প্রস্তাব। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর বাসভবন ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে— ১৯৪৫-এর ২৫ শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলির সভাপতিত্বে মন্ত্রীদের ওই বৈঠকে এই প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রস্তাবের বিষয় ঃ ট্রিটমেন্ট অব ইন্ডিয়ান সিভিলিয়ান রেনিগেডস। ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বেসামরিক বিশ্বাসঘাতক হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। (ইট ওয়াজ জেনারেলি অ্যাগ্রিড দ্যাট দি ওনলি সিভিলিয়ান রেনিগেডঅফ ইমপট্যান্স ওয়াজ সুভাষ চন্দ্র বসু)। বৈঠকে ভারত সরকারের মতই অনুমোদিত হল। সে মতটি হলো পশ্চিম ইউরোপে যেমন করা হচ্ছে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বেসামরিক বিশ্বাসঘাতকদের বেলায়ও তাই করা হবে। ধরা পড়া মাত্র ঐ স্থানেই যুদ্ধাপরাধীরূপে তাদের সামরিক আদালতে বিচার করা হবে। সেক্রেটারি অফ স্টেটকে বিষয়টি বিবেচনা করতে বলা হচ্ছে। — ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা : ৪০২-৪০৮।

বৃটিশ ভারতের সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, নেহেরু থেকে বাজপেয়ি সরকার পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্তে-বাঁধা শিকল ছেঁড়ার স্বপ্ন কেউ দেখেনি। হিম্মৎও নেই। আগুনের আঁচ যাতে নিজেদের গায়ে না লাগে বাজপেয়ি-আদবানীরা সেই জন্যে সত্য গোপন করার পথ নিয়েছেন।"

ওপরে বর্ণিত তথ্যচিত্রে যা প্রকাশ পেয়েছে — তার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা কী পেতে পারি, আসুন তা একটু অনুশীলন করা যাক সংক্ষেপে।

পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি ঘাটলেই আমরা দেখতে পাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে যত চরিত্র আছে তার মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুই অনন্য ও সেরা এবং তাঁকে নিয়েই যেন যত শিরঃপীড়া এবং সাম্রাজ্যবাদী তথা পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যবাদী ক্রীড়নক গোষ্ঠীর আহার নিদ্রার ব্যঘাত। এই মাথা ব্যথা আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যেমনটি ছিল আজও ঠিক তেমনটিই রয়েছে। তবে একটা ব্যাপারে সামান্য একটু হেরফের ঘটেছে। তা হচ্ছে ভারত তথাকথিত স্বাধীনতা পাবার আগে শুধু মাথা ব্যথা ছিল বৃটিশ ও আমেরিকার। আজ কিন্তু তাদের সঙ্গে

দোসর হিসাবে বর্তমান খণ্ডিত ভারতও সেই সুভাষ নিধন মহাযজ্ঞের এক মহান অংশীদার। আজ তারও মাথা ব্যথার অন্ত নেই। তাই আমরা বিগত পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর ধরে দেখছি কখনও এ্যামেলি শেঙ্কল কখনও এ্যানিটা ব্রিজেটের বা কখনও রেণকোজি মন্দিরের নাটক দক্ষতার সঙ্গে নাট্যায়নের চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে আর একটি নাটকও অনুষ্ঠিত হয়েছে যে নাট্যায়ন বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসী ভুলেই গিয়েছে। সেটা হল নেতাজীর ব্যবহৃত তরবারী, যা একদিন দিল্লী থেকে কলিকাতা পর্যন্ত একটি ভি. আই. পি. ট্রেনে করে প্রদর্শিত হয়েছিল। সেটাও ছিল একটি ভূয়ো ব্যাপার। এভাবেই ভারতের প্রত্যেকটি সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের মর্মপীড়ায় সমব্যথী ও সমান অংশীদার। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এ যাবৎ যতগুলো সরকার ভারতে গদীয়ান হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই এক প্রতিধ্বনি নেতাজীকে নিয়ে।

বলাবাহুল্য ভারতবর্ষের ঐ দিল্লীর তখতে আজ পর্যন্ত একে একে ভারতের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক পার্টির প্রতিনিধিরা রাজত্ব করার সুযোগ পেয়েছে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের ব্যাপারে বৃটিশের শেখানো বুলির ওপর তারা যে ইন্টিগ্র্যাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার কাছে গ্র্যানাইটও তুচ্ছ, তাদের মাঝে স্বয়ং ভগবান এসেও সামান্য মাত্রার চিড় ধরাতে পারবেন না। আবার মজার ব্যাপার, তারাই যখন অনিবার্য কারণে তাদের কারো গা থেকে সরকারী আলখাল্লাটি ছেড়ে সাময়িক ভাবে জনতার সাথে মাঠে ময়দানে নামে তখন তাদের মায়াকান্নার অন্ত থাকে না নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের ব্যাপারে। জনগণকে যে ঐ বৃটিশ আমেরিকার ক্রীড়নকরা এইরূপ কত ভাবে বিভ্রান্ত করে চলেছে গত অর্ধশতাব্দী ব্যাপী তার কোন ইয়ত্তা নেই। ওপরে বর্ণিত ব্যাপারগুলো হচ্ছে ভারতীয় জনগণকে বিভ্রান্ত করার এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণ। এরূপ বিভ্রান্তির বৃহত্তম সংস্করণ হচ্ছে একের পর এক নেতাজী সংক্রান্ত কমিশন গঠন ও জাতিকে ঐ সব কমিশনের প্রসবিত এক একবার এক একটি অশ্বডিম্ব উপহার স্বরূপ প্রদান। তার প্রমাণ প্রত্যেকটি সরকারই বলতে গেলে একের পর এক কমিশন বসিয়ে সহজ সরল ভারতীয় জনগণকে মিথ্যা প্রতারণা করে চলেছে আজ অর্ধ শতাব্দীর ওপর।

প্রত্যেকটি সরকারই জাপানের রেণকোজি মন্দিরকে ভারতবাসীর কাছে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। অথচ সেই সুভাষচন্দ্রের নামের সাথে জুড়ে দিয়ে যে-মন্দির আজ জগৎ বিখ্যাত হয়েছে সেই মন্দির গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ সালে এক বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকেই বিলীন হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য ভারতীয় সরকারগুলো ব্যক্তির চেয়ে কমিশনের মূল্যই অধিকতর দিচ্ছে। সেই সূত্র ধরে বলা যেতে পারে অনায়াসেই যে, ভারতের এই সরকারগুলো হচ্ছে কমিশন প্রধান সরকার। অথচ অশ্বডিম্ব ছাড়া কমিশনগুলি অন্য কিছুই প্রসব করছে না, বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎই এক অভিন্ন চিত্র।

এই যদি হয় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক পার্টির চেহারা তবে আর জনগণই বা কেন পার্টির ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে উদ্‌গ্রীব? তার বোধ হয় মাত্র একটিই কারণ। সেটা হচ্ছে রাজভক্তি। অর্থাৎ এক কথায় দাসত্ব, যে দাসত্বে আমরা এতকাল মশগুল ছিলাম।

খুব স্বাভাবিকভাবেই, তা ত্যাগ করা, কষ্টকর। তারই বহিঃপ্রকাশই হচ্ছে এই পার্টির আনুগত্য। আর একটু পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় যে, আজও বৃটিশের দাস হচ্ছে ভারতীয় শাসক গোষ্ঠীর প্রতিভূরা, আর আমরা ভারতীয় জনগণ হচ্ছি সেই দাসস্য দাস, নয় কি? তাই বলতে হচ্ছে, তবে আর স্বাধীন সার্বভৌম পৌরুষ ও পুরুষ নেতাজী সুভাষ, নেতাজী সুভাষ বলে মায়া কান্না কিসের জন্য? আর এত দরবার, নেতাজীর নামে মানব শৃঙ্খল এ সবই বা কেন?

এত সব সত্ত্বেও কিন্তু বলতে বাধ্য যে, বৃটিশ আমেরিকা ও ভারত সরকাররা যতই হরিহর আত্মা হোক না কেন — নেতাজী সুভাষচন্দ্রও তাদের সেই Challange একদিন তাসের ঘরের মত চুরমার করবেনই করবেন। ভারত সরকার স্বীকার না করুক বৃটিশ, আমেরিকা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে নেতাজী সভাষচন্দ্র বসু তাদের নিকট কত বড় Challange। সুভাষচন্দ্রের ঐ Challange যে কী বিশাল তা কিন্তু প্রমাণ করছে বৃটিশ, আমেরিকার তল্পীবাহক রাষ্ট্রসংঘই। যদি তাই না হবে, তবে কি ঐ রাষ্ট্রসংঘ আর হাজার বছরের জন্যে ফরমান জারি করে যুদ্ধাপরাধীদের সময় সীমা নির্ধারণ করতো? সাম্রাজ্যবাদীরা খুব ভালো ভাবেই অবহিত আছে তাদের ঐ ব্যবস্থাপত্র কার জন্য এবং কেন? ভারতীয় যোগী পুরুষরা তবে হাজার বছরও বেঁচে বর্তে থাকতে সক্ষম, আর সক্ষম এই যোগীরা কর্মক্ষম থেকে এত দীর্ঘকাল পরেও সাম্রাজ্যবাদীদের নাস্তানাবুদ করতে পারে?—একথা কিন্তু ভুলেও প্রতিবেদক বা কোন ভারতীয় দাবি করছে না, এ দাবি স্বয়ং রাষ্ট্রসংঘের। নতুবা তাদের হাজার বছরের ফরমান কোন্ মহান উদ্দেশ্যে? এতে তো তারা এটাই পরোক্ষে প্রমাণ করছেন যে তাদের হিসেবে নেতাজী সুভাষ হাজার বছর পরও তাদের বিপদে ফেলতে পারে। আশ্চর্য! ভাবুন এ সব কথা যাঁরা বলছেন তাঁরা হচ্ছেন বিশ্বের অধীশ্বর, আর যাঁকে উদ্দেশ্য করে ঐ ফরমান তিনি হচ্ছেন এক নাঙ্গা ফকির। অথচ এই নাঙ্গা ফকিরের বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডের কাছে সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে একের পর এক ঘটনায় নাস্তানাবুদ হচ্ছে তাই তাদের এত শঙ্কা এত ভয়। তাই তারা ভাবছে নেতাজী সুভাষের হাজার বছর বেঁচে থাকাও বিচিত্র কিছুই নয়। এর থেকে অবিস্মরণীয় আশ্চর্য আর কী হতে পারে? আপনি আমি হতবাক হলেও তারা কিন্তু সেভাবে দেখছে না, দেখছে না বা ভাবছে না বলেই তাদের ঐ সূত্র ধরে চলা বা বলা। বলতে নেই এরই নাম নেতাজী সুভাষ। এরই নাম ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, অধ্যাত্মবাদ বা বেদান্তবাদ। অথচ অপর দিকে তাদেরই ক্রীড়নকরা শুধু ভাঙ্গা রেকর্ড বাজিয়ে বাজার মাত করতে বদ্ধপরিকর। তাই ঐ ক্রীড়ানকের দল দিন রাত্রি চেচাচ্ছে — মৃত, মৃত, মৃত। ছাই, ছাই, ছাই! পরন্তু দেখা যাচ্ছে তারা নিজেরাই ঐ বিদেহী দ্বারা ভস্মলোচনে পরিণত হচ্ছে একে একে প্রত্যেকে। তাই বলতেই হয়, ওহে ক্রীড়নকের পরাকাষ্ঠার দল, এবার তোমাদের বাঁচাবে কোন্ মাউন্টব্যাটেনরা এসে?

অষ্টম অধ্যায়

জওহরলালের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? তিনি সারাজীবনই অন্যের ছত্রছায়ায় কাটিয়েছেন, একথা কতখানি ঐতিহাসিক সত্য? তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কতখানি সাফল্যমণ্ডিত? গান্ধীদর্শনের একটি দিক ছিল প্রেমের দ্বারা অপরের হৃদয় জয়। এ তত্ত্ব কি গান্ধীজীবনে সার্থক রূপায়ণ ঘটেছিল সর্বক্ষেত্রে? গান্ধীজী কি তাঁর ভাবাদর্শের মানদণ্ড এক সমমাত্রায় চিরদিন রক্ষা করতে পেরেছিলেন? পরন্তু দেখা যায় সুভাষচন্দ্র স্বীয় ভাবাদর্শে আজীবন অটুট। এবং সুভাষচন্দ্রের ভাবাদর্শে তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও সুভাষচন্দ্রের কাছে নত, একথা কি সত্য? সুভাষচন্দ্র কি ভারতীয় নেতাদের সাথে কূটনৈতিক খেলা খেলেছেন? সুভাষচন্দ্রের কূটনীতির কাছে কি বৃটিশ কূটনীতি ব্যর্থ নয়? সুভাষচন্দ্রের বিবাহ কি জওহরলালের একটি আন্তর্জাতিক চক্রান্ত নয়?

এবার চলুন শনি, রাহু, কেতুর পাঁচালী বাদ দিয়ে আবার একটু অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করি। সেই ম্যাক আর্থার, যিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে পারতেন তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে কব্জায় পেয়েও গুলিবিদ্ধ করতে পারলেন না। কারণ বলতেই হয় সুভাষচন্দ্রের ঐশীশক্তি অথচ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যিনি যথার্থ অর্থেই ছিলেন স্বদেশী এবং অবশ্যই স্বাধীনতা যোদ্ধা। পণ্ডিত জওহরলাল ছিলেন সুভাষচন্দ্র বোসের সহযোদ্ধা, সহকর্মী এবং বন্ধুও বটে। এমন সম্পর্ক যাঁর সাথে তাঁর সাথে, কি করলেন বা কি পরিচয় দিলেন? এক কথায় সুভাষচন্দ্রকে মেনে নেওয়া বা বরণ করার দায় থেকে পরিত্রাণের জন্য পবিত্র মাতৃভূমি ভারতবর্ষের বুকে পিঠে শাণিত কৃপাণ চালালেন বৃটিশ মন্ত্রণায়। এই কি তাঁর দেশপ্রেম? এবার কিন্তু তিনি

আর বাপুজীর কোলের আশ্রিত কেউ নন। তিনি এখন সোনার চামচ হাতে বৃটিশের ক্রোড়ে এক নবজাতক। এবং বৃটিশের রাজকীয় সূত্রে যেন পিতার উত্তরাধিকার বলে রাজার অবর্তমানে রাজসিংহাসনের অধিকারী রাজপুত্র তথা মহান এক রাজা। এই অবধারিত সূত্র ধরেই যেন আজ তাঁর অবস্থান। এবং বলাবাহুল্য এই অবস্থানের সোপান ধরেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর উত্তরণ। এই দর্পণে যদি জওহরলালের জীবনালেখ্য দেখা যায়, আমরা তবে তাঁর কি কি মাহাত্ম্য পাই আসুন তা একটু দেখা যাক।

প্রথম যৌবনে তিনি ইংল্যাণ্ডে থেকে পড়াশুনো সমাপ্ত করেন এবং ব্যারিস্টারি উত্তীর্ণ হয়ে স্বদেশে ফিরেন। স্বদেশে ফিরে পিতা মতিলাল নেহেরুর হাত ধরে তাঁর ছত্রছায়ায় স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে স্বদেশযজ্ঞে আত্মনিবেশ করেন। কিন্তু ঐ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার সাক্ষ্য রাখেননি কোথায়ও। কারণ যখন তিনি স্বদেশ কর্মকাণ্ডে জড়িত তখন জাতীয় কংগ্রেসের অভিভাবকদের মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ছিলেন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তখন জওহরলাল ছিলেন পণ্ডিত মতিলালের প্রযত্নে। কাজেই তখন তাঁর কোন অসুবিধার প্রশ্ন ছিলনা। এবং সেই সুবাদে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিও হয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে ত্রিশের দশকের কথা। সে সময় তিনি অভিভাবক শূন্য নন। তখন থেকেই তিনি এক রাজনৈতিক টগবগে যুবক এবং জাতীয় রাজনীতিতে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তৎকালে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় যুবনেতা সুভাষচন্দ্র বসুর পথের ও মতের একজন অনুগামী। বলা যেতে পারে ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের এ. আই. সি. সি. পার্কসার্কাস ময়দান সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ প্রস্তাবের দৃপ্ত কণ্ঠের সমর্থক। কিন্তু যখন ঐ প্রস্তাব মূল অধিবেশনে গৃহীত হবার জন্য ভোটাভুটির ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হলো তখনই তিনি সুভাষচন্দ্রকে বিপর্যয়ে ফেলে গান্ধীজীর পক্ষ অবলম্বন করেন। এইভাবে তিনি অনেক ব্যাপারেই সুভাষচন্দ্রকে বিপর্যয়ে ফেলে গান্ধীজীর প্রভাবে প্রভাবিত হন। এ তথ্য জাতীয় কংগ্রেসের পাতায় পাতায় সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু এই সময় জাতীয় কংগ্রেসের মাঝে যেসব ব্যক্তিরা ছিলেন তাদের মধ্যে গান্ধীজীকে বাদ দিলে যাঁরা অগ্রগণ্য ছিলেন তাঁদের মাঝে জওহরলাল অবশ্যই অন্যতম এবং উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সন্দেহ নেই। সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল এই দুইজন তখন ভারতবর্ষে অন্য যেকোন নেতাদের চেয়ে নামীদামীও বটে। এমন একটা স্থানে থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত ও কুক্ষিগত হবেন? অন্তত সাধারণ যুক্তি তো তাই বলে। এ থেকেই পরিষ্কার জওহরলাল কোন দৃঢ়তা কখনও অবলম্বন করতে পারতেন না বা পারেনওনি। সে প্রমাণও যথেষ্ট আছে। কাজেই তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যিনি সেই গান্ধীজীকেই তিনি ভরসা ও আশ্রয় করতেন। অর্থাৎ গান্ধীজীর পক্ষতলে আশ্রিত হয়ে বাঁচতে চাইতেন এবং সেই সূত্র ধরেই জাতীয় কংগ্রেসে তাঁর ভূমিকা পালন করতেন। নিজস্ব সত্তায় সত্তাবান হয়ে দায় পালন সেটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে পিতার অবর্তমানে গান্ধীজী হচ্ছেন তাঁর ছত্রছায়া বা অভিভাবক। ভাবা যায়! যে গান্ধীজী এক কথায় জওহরলালের পিতৃস্থানীয় স্থানে অবস্থান করছিলেন সেই গান্ধীজীকে কিনা

দেশীয় নেতারা বৃটিশের চক্রান্ত জালে জড়ালেন অজ্ঞাতসারে শুধু বৃটিশের স্বার্থে ও নিজেদের দিল্লীর তখতে আসীন হবার ঘৃণ্যলোভে! যে কথা হচ্ছিল। তাঁর মত ব্যক্তির কি কখনও অপরের মুখাপেক্ষীর প্রয়োজন ছিল? বলতে নেই তাঁর জীবন চর্চা করলে আমরা এ সত্যই দেখতে পাবো। অর্থাৎ শিবির পরিবর্তনই ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মূলধন বা চালিকাশক্তি। এইভাবে শুধু অভিভাবক পরিবর্তন করতে করতে তিনি জীবনের উত্তরণ ঘটিয়েছেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে ছিলেন তিনি বৃটিশের ছত্রতলে। সে অধ্যায়ে আমরা একটু পরেই প্রবেশ করবো। যা বলছিলাম। ইতিহাসে দেখা গেছে এজাতীয় ব্যক্তিত্ব কখনও কোন কঠিন সিদ্ধান্ত বা কোন বীরত্বপূর্ণ কাজেরই সম্মুখীন হতে পারেন না। জওহরলালও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তেমন কোন সাক্ষ্য রাখতে পারেন নি। তার নজিরের কথা যদি বলেন তবে অনেক উদাহরণ উপস্থাপনা করা যেতে পারে। যথা ঃ দেশ বিভাজনের মত ভয়ঙ্কর এক ঐতিহাসিক ও যুগান্তরকারী ভুলের দায় যদি কারো থাকে তবে জওহরলাল প্রথম অপরাধী। দ্বিতীয় উদাহরণ জ্বলজ্যান্ত কাশ্মীর সমস্যা। কাশ্মীর সমস্যা শুধুমাত্র তাঁর দৃঢ়তার অভাবের পরিণতি। এই কাশ্মীর সমস্যার জন্য তাঁর অন্য কোন সহকর্মীকেও কেউ এমনকি ইতিহাসও দায়ী করবে না। কারণ সে সময় গান্ধীজী বারবার বলেছেন শয়তানের চক্রে যেন তিনি পা না দেন। তাদের মতলবে না পড়েন বা পাকিস্তানী শঠতাকে যেন কঠোর হাতে দমন করেন। তাছাড়া যিনি তৎকালে আয়রনম্যান বলে খ্যাত সেই বল্লভভাই প্যাটেলের কথাতেও কর্ণপাত করেননি জওহরলাল। এ সবই ইতিহাস বলছে। তারপর ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের ফল ঐরূপ হবার জন্য কি অন্য কেউ দায়ী? কাজেই উদাহরণের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি আছে? সব বাদ দিলেও যদি শুধু কাশ্মীর ইস্যুতেই ভারতের যে তিনটি যুদ্ধ পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘটিত হয়েছে তার জন্য জাতিকে পঞ্চাশ বৎসরে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে তার কি খতিয়ান কেউ কখনও দিতে পারবেন? এছাড়া তো আজকের প্রজন্ম শুনলে বিশ্বাস করবেন না, যা নাকি তাঁর কর্মকাণ্ড ইতিহাসের ভাণ্ডে গচ্ছিত আছে। যথা, পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জল চুক্তি, পূর্বপাকিস্তান সংক্রান্ত নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি, নেহেরু-নুন চুক্তি। এসবই তো নেহেরুর ব্যর্থতার সাক্ষ্য। জওহরলাল দেশকে বৃটিশের হাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য লিজ দেওয়া নামক চুক্তি আর ক্ষমতা হস্তান্তরের চুক্তি ছাড়া কোন্ অধ্যায়ে সফল? যে দুটি অধ্যায়ে সফল সে দুটি চুক্তিতো মিরজাফরীয় কাপুরুষতার চুক্তি। এ ব্যাপারে শোনা যায় লক্ষ্ণৌর বিশ্বনেতা পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিত জওহরলাল ও ভারতীয় তৎকালীন নেতারা নাকি বৃটিশের সঙ্গে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই গোপন চুক্তি ছাড়া যে বৃটিশ কোন অবস্থাতেই এদেশ ছেড়ে যেতো না, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যপূরণ করতে হলে এমন নাগপাশে ভারতবর্ষকে বন্দী করাই তাদের কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় ভারতীয় নেতাদের কর্মকাণ্ডে। তৎকালীন

প্রত্যেকটি প্রথম শ্রেণীর কংগ্রেস নেতা বৃটিশের এই বিভাজন-এর প্রস্তাবকে স্বর্গলাভ বলেই মনে করেছেন। এ-ব্যাপারে স্বয়ং গান্ধীজী বিরোধীতা করলেও প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ দেশভাগ যখন অবশ্যম্ভাবীভাবে খণ্ডিত রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে তখন তিনি বাধা দিতে এগিয়ে আসেননি। এমনকি তিনি বিভাজনের জন্য বৃটিশকেও দায়ী করেননি। তার প্রমাণ আমরা তাঁর স্বীকৃত বয়ান থেকেই পাই।

.....Gandhi said in the prayer meeting. "The British Government is not responsible for partition. He said Viceroy has no hand in it. In fact he is as opposed to division as Congress itself, but if both of us Hindu and Muslims cannot agree on anything else, then the Viceroy is left with no choice."

(History of freedom movement in India. Volume—III,
Dr. R. C. Mazumder, Page—799)

এই যদি গান্ধীজীর বয়ান হয় তবে আর তিনি অদ্বিতীয় ভারতবর্ষের নেতা তারই বা অর্থ কি? তিনি নেতৃত্বের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে বৃটিশের সাফাই গাইছেন এখানে। অনুরূপভাবে ইতিহাস বলছে কংগ্রেসের প্রত্যেকটি নেতাই বিভাজনের পথকে একমাত্র সমাধানের পথ বলে ভেবেছেন। এব্যাপারে প্রত্যেকটি নেতার নিজ নিজ বক্তব্যই আছে। গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, রাজা গোপালাচারীয়া, প্যাটেল, কৃপালনী প্রভৃতি নেতাদের ছিল একই প্রতিধ্বনি। তারও যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ হচ্ছে তাঁরা প্রত্যেকেই ছিল লোভী ও স্বার্থপর নেতা। তাঁরা স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত ছিল না। এসম্পর্কে তাঁদের মুখপাত্র পণ্ডিত জওহরলাল বলেছেন,

"The truth is that we were tiredmen and we were getting on in years too. .....He added : But if Gandhi had told us not to, we would have gone on fighting and waiting."

(History of freedom movement in India, Volume—III,
Dr. R. C. Mazumder, Page—797)

এই স্বীকার উক্তি থেকে এটাই প্রমাণিত তখন তাঁরা রাজত্ব করার লোভে মরিয়া— দেশ জাহান্নামে যাক তাতে কারো কিছু যায় আসে না। সে কারণেই তাঁরা বৃটিশের চিরদিনের দাসত্ব শৃঙ্খল স্বাধীনতার নামান্তরে transfer of power-এর ঘৃণ্য শর্তে এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। এখানে এসে আমরা যেসব শর্তের কথা শুনতে পাই তা কোন আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি বা মর্যাদা সম্পন্ন জাতি মেনে নিতে পারেনা। কিন্তু ভারতীয় নেতারা তাকে স্বর্গলাভ বলে ভেবে তা গ্রহণ করেছিলেন। শোনা যায় শর্তগুলো নাকি নিম্নরূপ।

ওই শর্ত 'গুলো যাই থাকুক না কেন, সেগুলো যে একটি মর্য্যাদা সম্পন্ন জাতির নিকট গ্রহণযোগ্য ছিলনা তা বোধ হয় সত্য। কারণ ঐ শর্ত সম্পর্কে যা শোনা যায় তাতে এটাই প্রতীয়মান হয়। বহুশ্রুত সেই সব শর্ত নাকি তখনকার ভারতীয় কর্তৃপক্ষ

ও মেনে নিয়েছিলেন। তৎকালীন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে ছিলেন সেই সময়ের জাতীয় নেতারা। শোনা যায় চুক্তিটি তাদের সঙ্গেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হয়েছিল।

সেই শর্তের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নাকি ছিল শর্তের কোন অংশই ১৯৯৯ সালের পূর্বে জনগণকে জানানো যাবে না। সেই শর্তে বৃটিশ প্রভাবই প্রাধান্য লাভ করেছিল। যেমন সুভাষচন্দ্রের ভারতে প্রবেশাধিকার দেওয়া চলবে না বা তাঁকে ধরতে পারলে বৃটিশের হাতে প্রত্যার্পণ করতে হবে। এমন ব্যবস্থা নাকি তাতে ছিল।

বৃটিশের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণের জন্য কিছু বিশেষ দ্রব্য বা বস্তু নিয়মিত সেখানে পাঠাতে হবে।

বৃটিশ কমনওলেথ ভুক্ত করে ভারতকে বৃটিশাধীন করে রাখা বা কমনওয়েথ-এর অঙ্গ করে তার স্বাধীন গতিবিধির উপর নজর রাখা।

ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে ত্রিরঙ্গা পতাকা উড়ান চলবে না, যা নাকি পরবর্তী কালে ২৯.৭.৭১ তারিখে এ্যামেণ্ডম্যান্ট করা হয়েছিল।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী বৈদেশিক প্রভাবাধীন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে গ্রহণ করতে হবে। এই রূপ শ্রুতী এমনটি সত্যহলে স্বাধীনতার মূল্য আর রইল কী? ইংরেজ সরকারকে বেশ কয়েক কোটী টাকা বড়লাটের পেনশন বাবদ ভাতা হিসাবে টাকা দিতে হয়েছিল বলে শোনা যায়, লর্ড মাউন্টব্যাটেন যেহেতু খণ্ডিত ভারতের গভর্ণর ছিলেন। ভারতকে খণ্ডিত করে যে অপর আরও একটি রাষ্ট্র বা ডেমোনিয়ান সৃষ্টি হবে তারে কখনও আক্রমণ জাতীয় কাজ করতে পারবে না। এইরূপ কিছু মারাত্মক শর্ত ছিল বলে, শোনা যায়, যা নাকি একটি আত্মজ্ঞান সম্পন্ন জাতির কখনও মর্য্যাদা সূচক হতে পারে না। এ ব্যাপারে বলতে গেলে জাতি আজও প্রায় অন্ধকারেই নিমজ্জিত আছে। অথচ আমরা স্বাধীন জাতি বলে পরিচিত। তা যে আদৌ সত্য নয় সেই বোধজ্ঞান আর আমাদের কবে উদয় হবে বিধাতাই জানেন! এ সবই ইতিহাদের সত্যকারের গবেষকদের দৃষ্টির গোচরই আছে। কিন্তু আসল সত্য প্রকাশে তারাও শাসকদের কোপ দৃষ্টিতে পরার ভয়ে ভীত। সত্যপ্রকাশে যখন আমরা ভীত তবে আর সেই জাতিকে স্বাধীন জাতি কি বলা শোভা পায়? যে জাতি প্রকৃত অর্থে স্বাধীন নয় সে জাতির তবে আর রূপকারের প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? তবু আমাদের চিৎকার করে ধ্বনি দিতে হবে রাষ্ট্রনায়কদের জয়ের! এর চেয়ে আশ্চর্য্যের কি হতে পারে?

অথচ দেখুন তৎকালীন ভারতবর্ষের অসংখ নেতাদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ সুভাষচন্দ্রের তখনকার বীরত্বব্যঞ্জক কাজের ধারা। প্রসঙ্গ ছিল আমাদের ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেস। তাই সেই সূত্র ধরেই আমরা এখানে সুভাষচন্দ্রের একটি ঘটনা না বলে থাকতে পারছি না। ১৯২৮ সালে পার্কসার্কাস এ. আই. সি. সি. সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি বা রাষ্ট্রপতি (তৎকালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রপতি বলা হতো সেকথা আমরা অনেকেই জানিনা), পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে ঐ ময়দানে বি. ভী. তথা বেঙ্গল ভল্যান্টিয়ার্সকে নিয়ে সুভাষচন্দ্র জি. ও. সি. বেশে গার্ড অব অনার যাকে বলে রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদর্শন করেন। তৎকালে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় পুরুষ গান্ধীজী যুবক সুভাষচন্দ্রের প্রদর্শিত ঐ গার্ড অব অনারকে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, "পার্কসার্কাসের

সার্কাস''। এই কি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম পুরুষের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি না মহাত্মের পরিচয়? এই সবই ইতিহাসের উপাদান। কিছুই কারো মনগড়া নয়। এমন ব্যক্তির এমন উক্তি কি ভাবা যায়? আপনি কি বলছেন? কিন্তু বিধাতা পুরুষেব কি কঠোর পরিহাস। যে গান্ধীজী একদিন সুভাষের কাজকে বালখিল্য ভেবে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছিলেন, সেই সুভাষচন্দ্রই দেশের বাইরে বিভূঁইয়ে দাঁড়িয়ে বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে সেই গান্ধীজীর আশীর্বাদই প্রথম নিয়েছিলেন। সেবার ১৯২৮ সালে শুধু কংগ্রেস সভাপতিকে গার্ড অব অনাব দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার শুধু গান্ধীজীকে জানানো নয়, গোটা ভারতবর্ষকে দেখানো বা সম্মানিত করা নয়, সমগ্র বিশ্বকে চমকিত ও বিহ্বলিত করলেন। সুভাষ গান্ধীজীকে যথার্থই তাঁর কর্ম দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন বেঙ্গল ভল্যান্টিয়ার্সের গার্ড অব অনারটা আসলে কি? এটা বুঝিয়ে ও জানিয়ে দিলেন যে সুভাষচন্দ্র যা করে তা কখনও বালখিল্য লোক ঠকানো বা তামাসা করে না। এবার গান্ধীজীর মুখটা রইল কোথায়? গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রকে আর পাঁচজন কংগ্রেসী নেতার মতই ভেবেছিলেন। তাই নয় কি? অথচ গান্ধীজীবে যদি কেউ যথার্থ মর্যাদা ও সম্মান করে থাকেন তবে তাঁর নাম অবশ্যই সুভাষচন্দ্র বসু। পরবর্তীকালের ঘটনাবলীই তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রমাণ। এমন যে সুভাষ, তাঁকে গান্ধীজীর মত ব্যক্তি পরিমাপই করতে পারলেন না। অবশ্যই এই ভুলের জন্য তাঁকে এক সময় কাঁদতে হয়েছিল। এই চিত্রপটে কিন্তু গান্ধীজী তাঁর আপন দর্শনের কাছেই হেরে গেলেন। কারণ গান্ধীজীর জীবন দর্শনে একটা দিক ছিল সদাচারের মাধ্যমে অপরের হৃদয় জয় করা। এখানে দেখা যাচ্ছে গান্ধীজীর সেই দর্শন সুভাষচন্দ্র ছিনিয়ে নিল গান্ধীজীর এইটুকু ভুলের জন্য, শুধু তাঁর জীবনই দিতে হয়নি ঘাতক দেশীয় ও বৃটিশ শয়তানচক্রের হাতে, পরন্তু ভারতবর্ষ চির দিনের জন্য টুকরো টুকরো হলো এবং সুভাষচন্দ্রের মত বিশ্ববরেণ্য নেতৃত্বের উজ্জ্বল হাত থেকে চিরবঞ্চিত হলো ভারতবর্ষ। যাক্ যে প্রেক্ষাপটে আমরা বিচরণ করছিলাম সেই পথে হাঁটলে আমরা কি পাই। সুভাষচন্দ্র শুধু একটার পর একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত নন। আবার তিনিই সেই সব সৃষ্টি করা তাঁরই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সংস্কারকও বটে। ইতিহাস পুরুষরা ইতিহাস সৃষ্টি করে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যান। ফিরে দেখার আর তাঁদের অবকাশ হয় না। এটাই প্রকৃতির ধারা ও বিধান। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সেই বিধানকে নস্যাৎ করে তাঁরই সৃষ্ট ইতিহাসকে সংস্কার সাধন করতে গিয়ে যা দরকার অর্থাৎ সংযোজন বিযোজন, যেথায় যা প্রয়োজন, তাই তিনি করে চলেছেন। বিশ্ব মানব ইতিহাসে আপনি কি এমন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন? তাই বলতেই হয় সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির মাঝেও তিনি ব্যতিক্রমের ব্যাকরণ সংযোজন করে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। এমন পুরুষ ও পৌরুষের হাত থেকে আজ ভারতবর্ষ বঞ্চিত। এর চেয়ে দুঃখের, পরিতাপের ও আক্ষেপের কি থাকতে পারে?

গতিপ্রকৃতির প্রবাহে আমরা কিছুটা অন্য খাতে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। এবার আমরা আমাদের আসল ধারায় ফিরে যাবো। ক্রমে এলো ১৯৪২ সাল। গান্ধীজীর সেই ঐতিহাসিক 'করেঙ্গে-ইয়ে-মরেঙ্গে' বর্ষ। এখানে পৌঁছে দেখা গেল পণ্ডিত জওহরলাল এবং তাঁর সাথীরা বেশ বেগতিক অবস্থায় পড়েছেন। কারণ জাতীয় কংগ্রেস যাই করুক না কেন তাদের একটা লক্ষ্য ছিল যেনতেন প্রকারেণ সুভাষচন্দ্রকে স্তব্ধ করে দেওয়া। কাজেই সুভাষ দর্শনকে স্তব্ধ করতে যা যা প্রয়োজন এখন থেকে তার সব কিছুই করতে হবে। যদিও ১৯৪২ সালে সুভাষচন্দ্র আর ভারতের মাটিতে নেই, তবু তাঁদের অশেষ ভয়। তবেই ব্যাপারটা বুঝুন। যে ব্যক্তিটি তখন সহস্র সহস্র যোজন দূরে তাঁর প্রভাবের আতঙ্কেই জাতীয় কংগ্রেসে নেতা উপনেতাদের খাওয়া ঘুম এক কথায় চির বিদায় নিয়েছে। এর থেকেই তাঁর দিগন্তব্যাপী পরিধির দিকচিহ্ন নির্দেশ করছে নাকি? শুধু জাতীয় কংগ্রেসেরই ভয় না। সাম্রাজ্যবাদী সাম্রাজ্যেশ্বর বৃটিশরাও সুভাষ নামক এক সৌরশক্তির ভয়ে যবুথবু। সেই সৌরকর্তা ভারত নামক উপগ্রহে উপস্থিত নেই। কিন্তু তাঁর বিচ্ছুরিত মহাজাগতিক রশ্মিকে বৃটিশ ঠেকাবে কোন কর্ণের মহাকবজ বা ব্রহ্মাস্ত্র বলে? যদিও স্মরণীয় ইংরেজের সুভাষ মূল্যায়ন আর তথাকথিত ভারতীয় নেতাদের সুভাষ মূল্যায়নে মৌলিক ফারাক আকাশ পাতাল। বৃটিশের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র হচ্ছেন যেন একটি মহাকাশের জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক। এ-সত্য লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও জেনারেল ম্যাক আর্থারের উক্তিতেই যথেষ্ট, যা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। আর ভারতীয় নেতাদের ছিল নিজস্ব হীনমন্যতার তীব্র জ্বালা ও চরম নীচতা। এই হীনমন্যতা ছিল স্বয়ং গান্ধীজী থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি ভারতীয় নেতা উপনেতার। নেতাজী সম্পর্কে তাদের সকলের এক দৃষ্টি, এক ইতিবৃত্তি। আসুন এই তথ্যটাও একটু যাচাই করে দেখি, তা কতদূর সত্য বা যথার্থ। যদিও এব্যাপারে ইতিপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু তথ্য আমরা পেয়েছি তবু আবার কিঞ্চিৎ পুনরুক্তি করছি মূল প্রতিপাদ্যের প্রসঙ্গে যাবার স্বার্থের খাতিরে। যথা, ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে গান্ধীজীর বিদ্রুপাত্মক উক্তি ছিল, "শত হলেও সুভাষ তো আর দেশের শত্রু নয়"। এবং এখানেই শেষ নয়। সুভাষচন্দ্রকে জাতীয় কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত এব্যাপারে শত্রুতা তো ছিলই, আর ছিল কংগ্রেসী নেতাদের হীনমন্যতা। এই হলো ভারতীয় চরিত্র এবং ভারতীয় নেতাদের পরিচয়। সেদিনের জওহরলাল থেকে আজকেরও সকল নেতার একই ধারা, একই ঐতিহ্য। এর মাঝে এতটুকু ব্যবধান নেই। অবশ্য এখানে স্মরণীয় সুভাষচন্দ্রকে উপলব্ধি করতে যে মাপের ব্যক্তিত্ব হওয়া প্রয়োজন সেইরূপ এই কংগ্রেসীদের ভিতর কেউ কি ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর যখন নির্বাক, তখন স্বাভাবিক ভাবেই বলতে হয় এইসব নীচুমানের নেতাদের কাছ থেকে এর বেশী কি হতে পারে প্রত্যাশিত? কাজেই তাঁরা তাদের পরিধির বাইরের ওজন করবে কোন্ মননশীলতা দ্বারা? পরন্তু ঐ বিজাতীয় ইংরেজদের মানদণ্ড কি ছিল

তা যথেষ্ট ভাববার অবকাশ রয়েছে। যে ইংরেজ অধ্যাপক ওটেন সাহেবের জন্য সুভাষচন্দ্র ছাত্রজীবনে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, সেই ওটেন সাহেব সম্প্রতি অতি বৃদ্ধ বয়েসেও সুভাষ বন্দনা করে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতায় সুভাষচন্দ্রের জন্য তিনি ভীষণ গর্বিত বলে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য কথিত আছে সুভাষচন্দ্র ঐ প্রেসিডেন্সি কলেজের সেই সংঘটিত ঘটনার সঙ্গে আদৌ সংস্পৃক্ত ছিলেন না। জাতীয় মর্যাদার প্রতি যখন ইংরেজ অধ্যাপক কটাক্ষপাত করেছিল তখনই সুভাষ মাত্র তার প্রতিবাদ করেন। এর জন্যই তিনি নিষ্ক্রমিত হয়েছিলেন। এই হচ্ছেন সুভাষ। সুভাষচন্দ্র এমন একটি নাম, যিনি আজ শত্রুমিত্র বিজয়ী, সারা বিশ্বে এক অজেয় তথা অতিন্দ্রীয় পুরুষ ও পৌরুষ। আসুন ওটেন সহেবের সেই সুভাষ বন্দনা কেমন ছিল শোনা যাক।

Subhas Chandra Bose. (Oblit—1945).

Did I once suffer, Subhas at your hand?
Your patriot heart is stilled! I would forget
Let me recall but this, that while as yet
The Raj that you once challenged in your land
Was mighty, Icarus—like your courage planned
To meet the skies and storm in battle set
The ramparts of high heaven, to claim the debt
Of freedom owed, on plain and rude demand.
High heaven yielded, but in dignity
Like Icarus, you sped towards the sea
Your wings were melted from you by the sun,
The genial patriot fire that brightly glowed
In India's mighty heart and flamed and flowed
Forth from her army's thousand victories won!

১৯৬৭ সালে মুদ্রিত ই. এফ. ওটেনের "Song of Atom and other verses" নামক গ্রন্থে কবিতাটি আছে। কবিতাটির বাংলা ভাবার্থ অনুবাদ করা হল :—

সুভাষ তোমার হাতে কি আমি একদিন নিগৃহীত হয়েছি? তোমার দেশপ্রেমিক হৃদয় আজ স্তব্ধ। আমি তা ভুলতে চাই। আমি মনে রাখতে চাই যে তোমার দেশে একদা তুমি যে রাজশক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছিলে তা ছিল শক্তিমান। কিন্তু তুমি সাহসের সঙ্গে আইকারাসের মতো আকাশে পাখা মেলে অমরাপুরীর দুর্গ-প্রাচীর সংগ্রামের ঝড়ে ভেঙে ফেলার সাহসিক সঙ্কল্প করেছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার দেশের যে-স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল এবং যার জন্য সকল (নিয়মতান্ত্রিক) ও রূঢ় রক্তাক্ত দাবী করা হয়েছিল (কবি—'ক্যাবিনেট মিশন' প্রেরণের কথা বলছেন—অনুবাদক।) কিন্তু তোমার সম্মান ও মর্যাদাবোধ তোমাকে আইকারাসের মতো সমুদ্রের অভিমুখে

ধাবিত করেছিল। (অর্থাৎ আপোষহীন সংগ্রামের পথে—অনুবাদক।) তোমার পাখা সূর্যের তাপে গলে গেল ও সেই তাপ হচ্ছে ভারতের বিরাট হৃদয়ের দেশপ্রেমের আগুনের উত্তাপ, যা ভারতীয় সেনাদলের সহস্র বিজয়ের মধ্যে দীপ্তমান ও প্রবাহমান।

(সঙ্কলন : জয়তু নেতাজী স্মারক গ্রন্থ—পৃষ্ঠা ২৪)

আমাদের আবার ফিরতে হবে গান্ধী তত্ত্বে। এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে গান্ধীজীর জীবনদর্শন থেকে আমরা পাই তিনি বলেছেন, আচার আচরণের দ্বারা শত্রুর হৃদয় পরিবর্তন করেই তাকে জয় করতে হবে। তিনি এত বিশাল মহৎ হওয়া সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ব্যবহারে যে-মানের সাক্ষ্য রেখে গেলেন তা শত চেষ্টা করেও কি কোন দিন মোচন করা যাবে? পরন্তু এ-পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের চরিত্র সম্পর্কে যতটুকু জানা সম্ভব হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে গান্ধীজী কথিত ঐ দর্শন সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন। এবং বিপুল সাফল্য লাভ করেছেন। এখানে সুভাষচন্দ্র তথা শ্রীমদ্ সারদানন্দজীর একটি বাণী মানব সমাজের জন্য অমূল্য সম্পদ, যা এই আলোকে স্মরণীয় ও গভীরভাবে অনুধাবনীয়। তিনি বলেছেন.....“ক্ষমা ও দণ্ড সহ বর্তমানশীল হইতে পারে এবং হওয়া উচিত। ক্ষমা একটি মানসিক অবস্থা। বাহিরে তোমার আচরণ কিরূপ তাহার সঙ্গে ইহার অপরিহার্য সম্বন্ধ নাও থাকিতে পারে। কোন কোন গুরুতর অপরাধ করার জন্য কোন দুষ্কৃতকারীকে কখনও দণ্ড দিবার প্রয়োজন হইতে পারে। **তুমি যখন হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিয়াছ একমাত্র তখনই দণ্ড দিবার অধিকার তোমার আছে। শাস্তি প্রতিশোধ নয়।**” (তাইহোক থেকে ভারত, পৃষ্ঠা—৩৮৯)। আমরা প্রচলিত অর্থে যাকে শত্রুমিত্র বলে ভাবি সেই অর্থে সুভাষচন্দ্রের নিকট কেউ শত্রু নয়। কাজেই এই পরিমাপের পরিধি তো আমাদের সম্পূর্ণ অগম্য। সুভাষচন্দ্রের প্রতি যে সকলেই বৈরিতা সুলভ আচরণ করেছে সর্বদা তা অবশ্য আমাদের দৃষ্টির বিচারে। এই আলোয় দেখতে গেলে আমরা তথাকথিতরা তো বটেই এমনকি গান্ধীজীও মুক্ত নন। যদি অতি হালকা করেও দেখা যায় তবে বলতে হয় গান্ধীজী বিভ্রান্ত বা ভুল করে হলেও সুভাষচন্দ্রকে প্রথম প্রথম প্রতিপক্ষীয় বলেই মনে করেছেন। অথবা এও ভেবে থাকবেন যে তাঁর উপরে কথা বলার সাহস হবে কেন? তখন হয়ত গান্ধীজীর নিজের 'ইগো'ই ছিল ঐরূপ আচরণের কারণ। কিন্তু গান্ধীজীর মত ব্যক্তির এমনটি হবে কেন? এটাই তো প্রশ্ন। সকলের মানদণ্ডের সাথে তাঁর মানদণ্ড এক তরাজুতে অবস্থান করবে কেন? তবে সে মহাত্মার মাহাত্ম্য কোথায়? মনে রাখতে হবে যেকোন ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করার ক্ষমতা যেমন গান্ধীজীর ছিল তেমন সুভাষচন্দ্রেরও সমান নীতি প্রণয়ন ক্ষমতা ছিল, বরং অনেক ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ১৯৩৯ সালের গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীই তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। সুভাষ বৈরিতা সেদিন হতে আজও ভারতীয় নেতাদের কাছে একই ডিগ্রীতে, একই গ্রেডিয়ান্টে বাঁধা। তার পরিবর্তনের

প্রশ্নই নেই। এমনকি আজকের কোন কোন নেতার সম্পর্কে যদি অন্য কিছু কেউ ভেবে থাকেন তবে এ অভাজন তাকে বলতে বাধ্য হচ্ছে যে বন্ধু আপনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। সুভাষচন্দ্র যে পৃথিবীর কাউকে শত্রু রূপে কখনও দেখেনি তার সাক্ষ্যের কিন্তু অভাব নেই। তিনি যে এক এক করে সকলের হৃদয় জয় করেছেন তেমন এক দুটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ্য যে, আচার্য জে. বি. কৃপালনি কংগ্রেস ইতিহাসের মাঝে বলেছেন, বিগত ষাট বছরে কংগ্রেস জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে যা করতে পারেনি সুভাষচন্দ্র বসু মাত্র আড়াই বছরে তারচেয়ে অনেক অনেক বেশী অবদান রেখেছেন। এইরূপ উক্তি কি কোন সুভাষ বিরোধিতার পরিচায়ক? অথচ বাস্তবে তিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্রের বিপরীত মেরু তো বটেই এবং কট্টর সুভাষ বৈরিতার একটি উৎসকেন্দ্র। তেমনি ডঃ সীতারামায়া, বিখ্যাত কংগ্রেসী নেতা ভুলাভাই দেশাই, তাঁরা প্রত্যেকেই তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। সুভাষচন্দ্র কি কাউকে অনুনয় বা কাকুতি করেছিলেন? কথিত আছে ভুলাভাই দেশাই আজাদী সেনানীদের বিচারের সময় সেনানীদের পক্ষ অবলম্বন করে সওয়াল করতে করতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ক্রমে কিছুকাল বাদে দেহত্যাগ করেন। তিনি আজাদী সেনানীদের সওয়াল করতে গিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী, আজাদ হিন্দ সরকার এবং নেতাজীর সম্পর্কে যে সকল কর্মকাণ্ডের তথ্যাতথ্য পেয়েছিলেন তাতে তিনি শুধু পরিবর্তিত হলেন না যাদের প্রচারের তিনি শিকার হয়ে সুভাষ বিরোধিতায় নেমেছিলেন তাঁদের প্রতিও অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করেন। এইভাবেই দেখা যায় পৃথিবীতে যত সুভাষ বিরোধী লোক বা গোষ্ঠী ছিল তারা সবাই একে একে স্বয়ং গান্ধীজী থেকে সকলে এমনকি ইংরেজ অধ্যাপক ওটেন সাহেব পর্যন্ত শেষ বেলায় হলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে তাঁদের ভুলের জন্য। তাহলে হৃদয় পরিবর্তনের গান্ধীদর্শন কার হাতে আজ বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াচ্ছে? বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম পণ্ডিত জওহরলাল ও তাঁর ভারতীয় কমিউনিস্ট বন্ধুরা এবং স্বাধীনোত্তর ভারতের তাঁর সকল সহযোগী অনুরাগিরা। শোনা যায় জওহরলালও নাকি সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে পরিবর্তিত হতে যাচ্ছিলেন। আর অল্পকাল বেঁচে থাকলে জওহরলাল, যে কোন কার্য কারণেই হোক বা বিবেকের দংশনেই হোক পরিবর্তিত হতেন তারও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। এইবার ভাবুন নেতাজী সুভাষ কি জিনিষ। রক্তমাংসের অবয়বধারী একটি দেহের দেহধারী সত্তায় সত্ত্বাবান একজনের নামই নেতাজী সুভাষচন্দ্র নয়। তিনি বর্ণিত এই সত্তা থেকে কম করেও লক্ষযোজন দূরের এক অনির্বাণ মহাজ্যোতিষ্ক, এরই নাম সুভাষচন্দ্র। তাঁকে চাই আমরা চর্মচক্ষে বিচার করে যা খুশী তাই ঘোষণা করতে।

আবার চলুন আমাদের পিছনে ফেলে আসা দৃশ্যপটে। তবু ভারতীয় নেতৃকুল কি কংগ্রেস, কি কমিউনিস্ট বা অন্যান্য গোষ্ঠীর নেতারা সবার কাছে নেতাজী হচ্ছেন পরম শত্রু তথা অচ্ছুৎ। আমরা তাঁর দেশবাসীরাই কি তাঁর পরম মিত্র? যদি তাই হবে তবে সত্যতার সাক্ষ্যপ্রমাণ কোথায়? **শুধু মুখে মুখে নেতাজী ভক্ত বলে দাবি করলেই**

কি সে দাবি যথার্থ হয়ে যায়? আমরা সবাই তো আমাদের আনুগত্যের শপথ নিয়ে রেখেছি প্রবাহমান পার্টির কর্তা বাবুদের নামে। কেউ যদি ইন্দিরা-রাজীব গান্ধীর কাছে দায়বদ্ধ, তবে কেউ বা জ্যোতিবাবুর নামে অজ্ঞান, আবার কেউ বা বাজপেয়ির চরণধুলো নিতে ব্যস্ত। যদি তাই হয় তবে নেতাজীর প্রয়োজনটা কোথায়? তা সত্ত্বেও যদি কেউ দাবি করেন আমরা সবাই নেতাজীর ভক্ত একেবারে রামভক্ত হনুমানের মত, তবে অভাজনের প্রশ্ন, এই আমরা যারা নেতাজী অনুরাগী বলে দাবি করি তারা কি কখনও ভুলেও সোচ্চারে রব তুলেছি বা কোন আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়েছি এই বলে যে, নেতাজী সুভাষের নামে যে নানা কুৎসা জাতীয়স্তরে হচ্ছে তা বন্ধ করতে হবে। অথবা নেতাজীকে কেন জাতীয় মর্যাদার আসনে আসীন করা হবে না? কেন আজ নেতাজী জাতির কাছে অচ্ছুৎ তার জবাব ভারতীয় সকল নেতা নেত্রীদের দিতে হবে। **শুধু একটি রাস্তার নাম, একটি রেল স্টেশনের নাম, কি একটি হাওয়াই স্টেশনের নামকরণ করে একদিন তাঁর ছবিতে দুটো গাঁদাফুলের মালা চড়ালেই নেতাজীভক্ত হয়ে গেলাম! ধিক্ ধিক্ তেমন ভক্তদের। সুতরাং অম্লানে বলা চলে দেশের নেতাদের চেয়ে আমরা কোন অংশেই কম বজ্জাত নই।** সুতরাং বলতেই পারি, "Govt. of a country it has which it deserves"—Lord Becon. এই কথা যেমন সত্য তেমনি সুভাষচন্দ্রের জন্য এই সরকারী ধারার প্রতিফলনও একই কারণে সত্য। অতএব দেখা যাচ্ছে আমরা সরকারকে নেতাজীর ব্যাপারে কোনই চাপ সৃষ্টি করতে পারছি না বলেই সরকার যা খুশী তাই করতে সক্ষম হচ্ছে ও সাহস পাচ্ছে। প্রকারান্তরে আমাদের সমর্থনে। তাই বোধহয় বলা চলে আমরা দেশবাসীরাই সুভাষচন্দ্রকে বিষাদ সিন্ধুর অতল তলায় ডুবিয়ে রেখেছি। আমরা তাঁর দেশবাসীরা আত্মশ্লাঘার পরম গর্বে ও চরম আনন্দে আত্মহারা ও উদ্বেলিত। যেন তাঁর এই অনুপস্থিতিই এই আনন্দের উৎসস্থল। বস্তুতপক্ষে নেতারা কিন্তু তার জন্যই আনন্দে বিগলিত। কারণ তাঁর বেঁচে থাকার কথা বা উপস্থিতির কথা মানেই তো নেতাদের করে কম্মে খাবার ও লোক ঠকাবার সব রাস্তা চিরকালের মত স্তব্ধ। কাজেই আনন্দের ব্যাপারতো বটেই। আবার আমরাই তথাকথিত নেতাদের ধ্বজা উড়িয়ে ও তাদের জয়ডঙ্কা বাজাতে কসুর করিনা। সুভাষচন্দ্রের মতন এমন একজন কালজয়ী জগৎবরেণ্য শৌর্যবীরের প্রতি ভারতবাসীর এইরূপ চরম দুঃখজনক কদর্য আচরণের জন্য বিশ্ববাসীও যে মর্মাহত তার নিদর্শন স্বরূপ বিশ্ব ইতিহাসও ভারতবাসীকে ক্ষমা করতে পারছে না। তাই বিশ্ব ইতিহাস ভারতবাসীকে কঠোর ভাষায় ধিক্কার ও ঘৃণা বিচ্ছুরিত করছে। তার প্রমাণ বিশ্বইতিহাসে চোখ রাখলে তা দেখতে পাবেন। যথা,

"It is a strange that a single man of a subjugated defeated nation could have raised such a big army of liberation but it was more strange that Indian people did not response to it."

(—World history, U.S.A. Govt.)

এই হচ্ছেন নেতাজী সুভাষ। এবার বলুন নেতাজী সুভাষ কি কারো সঙ্গে যেকোন দৃষ্টিকোনের বিচারে উপমেয়? বা তুল্যমূল্য? নয়কি তিনি জগৎজয়ী, কালজয়ী মহাবীর? তিনি শৌর্যবীর মহাক্ষত্রিয় বলেই ভারতীয় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কোন রাজনৈতিক পুরুষ বা নেতার সঙ্গে পাঞ্জা কষতে পলিটিক্সের ময়দানে বাহাদুরী ফলাতে নামেননি। কারণ তিনি তাঁর ওজন জানতেন। আরও জানতেন ঐসব তথাকথিত ভারতীয় নেতা উপনেতাদের ওজনও কতখানি, কতখানি তারা দৌড়বীর। ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয়বার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য হলেন অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তারপর থেকেই তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন নিজের কাছেই যে, তিনি আর যাই করুন রাজনীতির খেলায় অন্তত ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে নোংরামিতে নেই। তিনি তাঁর জীবনীতে বলেছেন তিনি রাজনীতির লোক নন। ভাগ্যচক্রে তিনি এ-পথের পথিক। সুভাষচন্দ্রের জীবনী চর্চা করলে এই কথার প্রমাণ একশ ভাগ সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি যদি রাজনীতি কিছুমাত্র করে থাকেন তবে তা করেছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে। এবং প্রতিপদেই বৃটিশকে জবরদস্ত শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর প্রত্যেকটি কূটনৈতিক চালে বৃটিশরা চূড়ান্তভাবে ঘায়েল ও দিশেহারা হয়েছে, যা বিশ্বজন বিদিত। এহেন সুভাষচন্দ্র কি জওহরলালদের চক্রব্যূহে বিদ্ধস্ত? না বেচাল হবার কথা? ইতিহাস বলছে বৃটিশরা সুভাষচন্দ্রের একটি চালকেও বিদ্ধস্ত করতে পারেনি! যথা, প্রথম যখন নজরবন্দী সুভাষ গৃহত্যাগ করেন ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে তখন বৃটিশ ব্যর্থ। দ্বিতীয়ত, জার্মান থেকে যখন দূর প্রাচ্যে গমন করেন তখন তাঁর গমনপথের সবটাই ছিল বৃটিশ-আমেরিকার কব্জায়। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, কোথায়ও শত্রুর নিঃশ্বাস ফেলার কোন ফুরসৎই ছিল না। তথাপি তাঁদের নাকের ডগা দিয়ে তিনি যথারীতি তাঁর ইপ্সিত গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন। তারপর ১৯৪৫ সালে সায়গন থেকে যে মেঘের আড়ালে আশ্রয় নিলেন তার হদিস আজও বৃটিশ-আমেরিকা কোনই কিনারা করতে পারছে না। এমনকি ইংরেজরা এদেশে থাকতে সারাবিশ্ব যখন মাতালের মত টালমাটাল, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পাকেচক্রে দিশেহারা তখন তিনি ১৯৪৫ সালে আগষ্টে গান্ধীজীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর পরবর্তী কার্যক্রম আলোচনা করে যথারীতি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে চলে গেলেন! সে কারণে বৃটিশ গোয়েন্দারা ২রা সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর আশ্রম তল্লাসি করে। সুভাষচন্দ্রের এই সকল কার্যক্রমই কিন্তু চলছে বৃটিশ-আমেরিকার নাকের ডগায়। আজও বৃটিশ-আমেরিকার গোয়েন্দাদের চোখে ঘুম নেই। এই সুখের ঘুম তাদের সুভাষচন্দ্র কেড়ে নিয়েছিল বলতে গেলে ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হবার পর থেকেই। আজও ঐ গোয়েন্দা কর্তাদের চোখের ঘুম ফিরিয়ে দেননি? আর বিশ্বগ্রাসী বিশ্বত্রাসি বৃটিশ-আমেরিকার কর্তাদের হৃদস্পন্দন যে সেইদিন শুরু হয়েছিল তাও তাঁদের শান্তিতে নিস্পন্দিত হতে দেননি আজও। মনুষ্য ইতিহাসের শুভ প্রাত যেদিন উদয় হয়েছিল সেদিন সেইক্ষণ থেকে আজ পর্যন্ত বলুন কোথায়

এর দ্বিতীয় উদাহরণ? এখানে একটি কথা মনে পড়ছে। সুভাষচন্দ্র যখন গৃহত্যাগের প্রাক্কালে ছদ্মবেশ অবলম্বন করে মাতা প্রভাবতী দেবীর সামনে এসে জানতে চেয়েছিলেন মায়ের কাছে যে, এই ছদ্মবেশীকে তিনি চেনেন কিনা? তার উত্তরে মাতা বলেছিলেন 'না'। তখন সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন তুমি যখন চিনতে পারনি তখন পৃথিবীতে কোনদিন কেউ আমাকে চিনতে পারবে না। আজ কি মনে হচ্ছেনা এ যেন বেদবাক্য? এরই নাম নেতাজী সুভাষ।

তাই বলছিলাম জওহরলালদের চক্রব্যূহ তো তাঁর কাছে ছিল নস্যি। কাজেই জওহরলালের কূটনীতি যে সুভাষচন্দ্রের কাছে বড় দড় একথা বা এই অঙ্ক কি কোন হিসাবে মিলে? মোটেই নয়। তিনি শুধু জওহরলালের কেন কোন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিই কখনও বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিলেন না। তিনি যদি এতটুকু কূটনৈতিক চাল ভারতীয় নেতাদের প্রতি চালতেন তবে তারা যে খড়কুটোর মত কোথায় ভেসে যেতেন সেকথা বলাই বাহুল্য। একথার প্রমাণ যে বৃটিশরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে তার প্রমাণ তো আমরা এইমাত্র পেলাম। পরন্তু তৎকালে গান্ধীজীকে বাদ দিলে সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তার পরিধির কাছে বলুন কাকে দাঁড় করাবেন? এই প্রেক্ষিতে গান্ধীজীর একটি বিখ্যাত উক্তি আসুন স্মরণ করি। গান্ধীজী ১৯৪৭ সালে In his last tribute to Subhas-এ বলেছিলেন, ..."I regard Subhas Bose as patriot of patriots." ইত্যাদি। কাজেই এ-বিচারেও গান্ধীজীকে বাদ দিলে আর যাঁরা থাকেন তাঁদের ব্যাপারে তো দেশপ্রেম নিয়েই প্রশ্ন থেকে যায়! কাজেই এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে অন্তত সুভাষচন্দ্র পলিটিক্সের গেমপ্ল্যানে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে পাঞ্জায় কোন অবস্থাতেই ছিলেন না। যদি তাই করতেন তবে সেদিনই শুধু নয়, আজও যেকোন মুহূর্তে তিনি ভারতবর্ষের দখল স্বীয় কব্জায় নিতে পারেন। আজও নিতে পারেন শুনে কেউ আঁতকে উঠতে পারেন। কিন্তু নেতারা আঁতকে উঠবেন না। অন্তত আপনি যে কারণে চমকাবেন সে কারণে নেতারা চমকাবে না। তারা অবশ্যই আঁতকে উঠবেন এই ভেবে যে এই বুঝি করে কম্মে খাবার পথটা চুকে গেল। বস্তুতপক্ষে তিনি তো এই গণ্ডীবদ্ধ সামান্য মিশনের জন্য পৃথিবীতে আসেননি। এই কথার তাৎপর্য আজকের বিশ্বনেতা শ্রীমদ্ সারদানন্দজী রূপের সুভাষচন্দ্রের দিকে তাকালে পরিষ্কার হয়ে যাবে। সুভাষচন্দ্র যখন এই সীমিত কাজের জন্য আসেননি, তখন অতি স্বাভাবিক ভাবেই তিনি কখনও কোন ভারতীয় নেতার প্রতিদ্বন্দ্বীও নন। যদি তিনি ভারতীয় কোন নেতার প্রতিদ্বন্দ্বী হতেন তবে একজন আমজনতার সাথী হিসাবে দৃপ্তকণ্ঠেই বলা যায়, তা হতো ভারতবর্ষের তথা ভারতবাসীর চরম সৌভাগ্যের কারণ। তিনি সেই পথে হাঁটেননি বলেই ভারতবাসী আজ এমন হঠকারী রাজনীতিবিদদের চক্করে পড়ে চরম দুর্দশার শিকার। এই মর্মবেদনা শুধু এই অভাজনের নয়। এই মর্মবেদনা আজ প্রতিটি ভারতবাসীর। পরন্তু পণ্ডিত জওহরলাল সর্বদাই নিজেকে সুভাষচন্দ্র বসুর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করেছেন। এবং সেই নিরিখে তার প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলেছেন। তার সাক্ষ্য ইতিহাস। যথা, জওহরলাল সেই পথের পথিক বলেই

সিঙ্গাপুরে মাউন্টব্যাটেনের এক কথায় কিস্তি মাত হয়েছিল। সেদিনের কথা বাদ দিলেও পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র যখন ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের কর্মসূচী ভারতবাসীকে বেতার মারফৎ ঘোষণার মাধ্যমে জানালেন বা ভারতীয় নেতাদের জানালেন তখন কি ইচ্ছা করলে তিনি ফিরে এসে ভারতের রাজনীতির আসনে আসীন হতে পারতেন না? গান্ধীজী যেমন ক্ষমতার ভাগীদার কখনও ছিলেন না বা রাষ্ট্রগুরুর ভূমিকায় থাকা অধিকতর কাম্য মনে করতেন অথবা বলা যেতে পারে ভারতবাসীর চোখে তিনি একজন রাজঋষিতুল্য ছিলেন তেমন সুভাষচন্দ্র তখন ঋষি বলে পরিচিত বা গণ্য না হতে পারেন কিন্তু তিনি কখনও ক্ষমতার ভাগীদার বা ক্ষমতালোভী ছিলেন না। একথা হলফ করেই বলা যায়। যদি ক্ষমতালোভী হতেন তবে ১৯৩৮ সালে জাতীয় প্ল্যানিং কমিশনের প্রতিষ্ঠা করে জওহরলালকে তিনি কমিশনের চেয়ারম্যান করতেন না। এই কমিশন গঠন এবং চেয়ারম্যানের আসনে জওহরলালকে বসানো এসবই সুভাষচন্দ্রের কৃতিত্ব। ইতিহাস সেকথা বলছে। এটা যে কত বড় ত্যাগ তা উপলব্ধির ক্ষমতা অন্য কোন ভারতীয় নেতাদের সেদিনও ছিলনা, আজও নেই।

ঐ চেয়ারম্যানের আসনে সেদিন থেকে স্বাধীনোত্তর ভারতেও কিন্তু জওহরলাল যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তিনিই তাতে আসীন ছিলেন। এমনকি সেই আসনটি আজও পদাধিকার বলে প্রধানমন্ত্রীই পেয়ে থাকেন। সেই দৃষ্টিতে বিচার করলে সুভাষচন্দ্রই কিন্তু সেদিনও কংগ্রেস সভাপতি রূপে তাঁরই ঐ চেয়ার পাবার কথা। কিন্তু তিনি জওহরলালকে সেখানে বসিয়ে তাঁকে অধিকতর মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

স্মরণীয় সুভাষচন্দ্র যেদিন থেকে সক্রিয়ভাবে জাতীয় কংগ্রেসে এসেছেন সেই ১৯২০/২১ সালে বা তার পূর্ব থেকে তিনি একটিমাত্র স্বপ্নের ধ্যান-জ্ঞানে বিভোর ছিলেন। সেটা হচ্ছে বৃটিশ শৃঙ্খলিতা ভারতমাতার মুক্তির সাধনা। দেশের মুক্তিসংগ্রামকে তিনি কি আলোকে দেখতেন এ-সম্পর্কেদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ইউরোপে ছিলেন তখন ইটালির রাষ্ট্রপ্রধান মুসৌলীনির এক প্রশ্নের জবাবে তা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। মুসৌলিনী প্রশ্ন করেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে তাঁর বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর বিবাহ তো ভারতবর্ষের স্বরাজ সংগ্রামের সঙ্গে একবার হয়ে গেছে। একজন লোক মাত্র একবারই বিবাহ করে। এছাড়া তিনি বলেছিলেন, তোমরা পাশ্চাত্যের নেতারা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পুরুষের চরিত্র অনুধাবন করতে পারবে না। এ দ্বারা তিনি বলতে চাইছেন ভারত মাতার মুক্তির সম্পর্কেই। এমন একটি প্রশ্ন করেছিলেন এক সময় আজাদী সেনানী মে: জে: এ. কে. চাটার্জী। তার উত্তরও ছিল অনুরূপ। এইসব তথ্য পাই আমরা সুভাষচন্দ্রের মহাজীবনের স্থানে স্থানে। ১৬.১০.৭৮ তারিখে পরিবর্তন কাগজে এমন একটি সংবাদ পাওয়া যায়।

সুভাষচন্দ্র যখন বার্লিনে গিয়ে হিটলারের সাহায্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করছেন তখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা উগ্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। তাদের সমালোচনার উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য

প্রয়োজনে শয়তানের সঙ্গেও সখ্যতা করতে দ্বিধা করবেন না। ধনতান্ত্রিক বৃটেন যদি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে তবে মাতৃশঙ্খল মোচনে হিটলালের সাহায্য চাইলেই যত অপরাধ? পরন্তু বলতে নেই সুভাষচন্দ্র হিটলারকে তোয়াজ করে তাঁর সাহায্য চাননি। তারও প্রমাণ ইতিহাসে আছে। এ-ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত তথ্যে যাবো পরবর্তী অধ্যায়ে। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূব এশিয়ায় চলে গিয়েছেন। তখন কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র পিপল ওয়ারের ২১/১১/৪২, ১৯/১২/৪৩ ইত্যাদি তারিখে প্রচারিত সুভাষচন্দ্রের উপর যে ব্যঙ্গচিত্র ভারতবর্ষে তথা বিশ্বে প্রচার করা হয়েছিল তা বিশ্বের যেকোন দেশের সুভাষ অনুরাগী মাত্রই প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হবেন।

সাধারণত একজন মানুষের আচার আচরণের মধ্য দিয়ে ও কথাবার্তার ভিতর দিয়ে সেই মানুষটির চারিত্রিক চিত্রটা অর্থাৎ ভিতরের চেহারাটাই ফুটে বের হয়। তেমনি এক একটি গোষ্ঠীর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মের ও তাদের আচার আচরণের মাধ্যমেই প্রকাশ পায় তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ; এটাই স্বাভাবিক ও সহজাত সাইকোলোজি। এই কমিউনিস্টরা যে কতদূর নিকৃষ্ট মানের আধার সেই ব্যাপারটাও তাদের ঐসব ব্যঙ্গ চিত্রই বলে দিচ্ছে। এটা কোন লোককে বা সম্প্রদায়কে বৃথা আক্রমণ নয়। তাদের কর্মধারা সেদিন যেমন ছিল আজও কি তার কোন পরিবর্তন ঘটেছে? আজকের বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাদের যে ব্যঙ্গচিত্র আচার আচরণ এ সবই তাদের একই কথা বলছে না কি? এটাই যে তাদের নৈতিক ধারা-এর থেকে তারা কেন কেউই মুক্ত হতে পারে না। মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা বানানোর কি এদের জুড়ি আছে? এই প্রথার জনক নাকি ছিলেন হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস্। সেই থেকে তাঁর কতই না বদনাম। অথচ আজ পৃথিবীর দেশেদেশে এর উপর যদি সমীক্ষা করা যায় তবে দেখা যাবে সেই মিথ্যার প্রচার বিশারদ গোয়েবল সাহেবও এই কমিউনিস্ট প্রচারের কাছে আজ মাতৃগর্ভে। এই চারত্রিক বৈশিষ্ট্যে কমিউনিস্টরা আজ বিশ্বের অদ্বিতীয়। এবার আসুন আমরা ফিরে যাই মূলস্রোতে। প্রসঙ্গের সৌজন্যে আমরা একটু লাইনচ্যুত হয়েছিলাম।

তথ্য বলছে পরবর্তীকালে খল ভারতীয় নেতারা বিশেষ করে পণ্ডিত জওহরলাল ঐ সুমহান দেবদুর্লভ সুভাষ চরিত্রকে কলঙ্কিত করার নামে কী না করেছেন? জওহরলালের যতদূর যাবার ক্ষমতা ছিল এ-ব্যাপারে তার চেয়ে বোধহয় অনেক বেশীই তিনি অধোগামী হয়েছিলেন। এই কিষ্কিন্ধার কাণ্ডে তিনি বোধহয় কমিউনিস্টদেরও হার মানিয়েছিলেন। তিনি যে এই কর্মটি করেছিলেন তার সাক্ষ্য স্বয়ং তিনি নিজেই। তিনি নাকি চোকোশ্লোভাকিয়ান এক সাংবাদিকের কাছে এই কথা নিজমুখে স্বীকার করেছেন।" (বক্তৃতামালা, আনন্দ ভারতী মহারাজ) সুভাষ চরিত্রকে নীচে নামাতে তিনি শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক চক্রও সৃষ্টি করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুইডিস বিগ্রেডিয়ারের কন্যা এ্যানিটাব্রিজেটকে আমদানি করে প্রমাণ করতে চাইলেন এই হচ্ছে সুভাষ দুহিতা। এই তথাকথিত মেয়েটিকে এনে উপস্থিত করলেন দিল্লীর দরবারে রাজকীয় সমাদর ও সম্বর্ধনা প্রদর্শনপূর্বক। বলতে গেলে ভারতবাসীর জন্য সেরা প্রদর্শনীই বটে! অথচ ১৯৪৮ সালে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত পদে থাকাকালীন ভারতে এসে

ভারতবাসীকে তাদের শ্রেষ্ঠতম উপহার ঘোষণা করতে চাইলেন। কিন্তু নেহেরুর নির্দেশে তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে গেল চিরদিনের জন্য। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বলেছিলেন যে ভারতবাসীর বিচারে এই ঘোষিত উপহারটি হবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির চেয়েও সেরা। ভাবুন স্বাধীনতার চেয়ে বড় জিনিষ সমগ্র জাতির বিচারে কী হতে পারে? কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য কোন উপহার সেটা কোন নির্দিষ্ট বস্তু হতেই পারে। কিন্তু একটা সমগ্র জাতির বিচারে তা কি হতে পারে? বলাবাহুল্য এই উপহারটি ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বর্তমান অবস্থান ও তাঁর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত তথ্য ও সংবাদ। যেকথা এই প্রবন্ধে একাধিকবার বলা হয়েছে সুভাষচন্দ্র ভারতে ফিরতে উদ্‌গ্রীব। এছাড়া সম্প্রতি কালের তথ্য অনুসারে আমরা ভারতবাসী মাত্রই অবগত হয়েছি যে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রখ্যাত গবেষকদের একটি দল রাশিয়ার মহাফেজখানার ভাণ্ডার থেকেও সুভাষচন্দ্র সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের মাঝে ড: পূরবী রায় ছিলেন অন্যতম। তাঁর গবেষণালব্ধ ফলে আমরা দেখছি তিনি বলছেন নেতাজী রাশিয়াতে ১৯৪৫-এর পরও তাঁর ক্রিয়াকর্ম নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। এই তথ্য থেকেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে ইতিপূর্বে পূর্বের অধ্যায়ে এই প্রতিবেদক যে দাবি করেছেন সুভাষচন্দ্র ভারতে আসার সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন তা কতখানি নির্মম সত্য। এও প্রমাণিত হলো বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত যা সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন তা কতদূর বাস্তব ও কঠোর সত্য। সুভাষচন্দ্র তখন রাশিয়ায় অবস্থান করে ভারতবর্ষকে অখণ্ড করার যে পরিকল্পনা নিয়ে কাজে মগ্ন ছিলেন তার প্রমাণ স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল নিজে। আসুন এ তথ্যই বা কতদূর সঠিক তা একটু যাচাই করি। নেতাজীর মৃত্যুর তদন্ত সংক্রান্ত ব্যাপারে ইতিপূর্বে জওহরলালের ও ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে যে দুটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল তার একুশ নম্বর সাক্ষী শ্যামলাল জৈন, যিনি ছিলেন আই. এন. এ. ডিফেন্স কমিটির স্টেনো, তিনি কমিশনকে বলেছেন, নেহেরু তাঁকে দিয়ে একটি চিঠি টাইপ করিয়েছেন, যা তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলিকে লেখা। তাতে যা ছিল তা শুনলে যেকোন ভারতবাসী যে স্তম্ভিত হবেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। আসুন সেই টাইপ-করা নেহেরু প্রদত্ত পত্রটি আমরা দেখি। তাতে ছিল—

Dear Mr. Atlee,

"I understand from a reliable source that Subhas Chandra Bose your war-criminal, has been allowed to enter Russian territory by Stalin. This is a clear treachery and betrayal of faith by Russians. As Russia has been an alley of British-Americans, it should not have been done."

(তারিখ : ২৬ অথবা ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪৫) Your sincerely

Jawaharlal

এই সব তথ্য ছাড়াও সুভাষচন্দ্রের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে গান্ধীজীর উক্তি ছিল ১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে যে, whatever you may tell me to the contrary still believe in my heart of hearts that Netaji Subhas

Chandra Bose is alive. The information that the above positive statement was made by Mahatma Gandhi during his talks with Major General Shah Nawaz and Col. Sehgal.

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের কথার জের টেনে বলা যায় মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খানও অনুরূপ বলেছিলেন ১৯৫১ সালের ২৩শে জানুয়ারী যখন কলিকাতা মনুমেন্টের পাদদেশে তিনি নেতাজী জয়ন্তীতে বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি বলেছিলেন জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ দেখে, "আজ আমাকে পেয়ে আপনারা যত খুশী তার শতগুণ খুশী হবেন আগামী বছর ২৩শে জানুয়ারী। কারণ স্বয়ং নেতাজী সেদিন এই মঞ্চে দাঁড়িয়েই বক্তৃতা করবেন।" এই ছিল শাহনওয়াজের আবেগ বিহ্বলিত কণ্ঠের ভাষণ। বলাবাহুল্য এমন একটি ঘোষণা এই অভাজনের স্বকর্ণে শোনা যার ফলে এই প্রতিবেদক নিজেকে পরমধন্য বলে অভিভূত হয়েছিল সেদিন। হ্যাঁ, আসুন আমরা আবার ফিরে চলি মূলপ্রসঙ্গে যা আলোচনা করতে করতে আমরা প্রসঙ্গেক্রমে অন্য তথ্যে সাময়িকভাবে চলে গিয়েছিলাম। জওহরলাল ভারতবাসীর জন্য যদি ঐ দর্শণীয় বস্তুটি নিয়ে অর্থাৎ এ্যানিটাকে নিয়ে ভারতবাসীকে বিভ্রান্ত না করে সঠিক পথে হাঁটতেন তবে তিনি শুধু ভারতবাসীর মাথার মণি নয় তিনি হতেন আজ বিশ্বপূজ্য। তাঁর সম্পর্কে কারো কোন কিস্‌সা লেখার প্রয়োজন হতো না। পরন্তু তাঁকে নিয়েই আজ নতুন নতুন গবেষণা চলত। গবেষণা হয়ত আজও চলবে তবে সেই গবেষণালব্ধ ফল যে তাঁকে একটি সৌগন্ধ ফুলের মালার পরিবর্তে ঘৃণার বাক্যবাণে বিদ্ধ করবে তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্যই যদি স্তাবকতা না করে সত্য মিথ্যার তুলাদণ্ডে বিচার করেন গবেষকরা। এই ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল। ভাবতে পারেন? এবং বলতে নেই তার অনুগামীরাও ছিল একই পথের দোসর। না হলে এমন কাণ্ড ঘটিয়ে পার পায় কি করে? শুধু সেদিনই এইসব ভারতীয় খলনায়করা চরিত্রহীন রাজনৈতিক ছিলেন না। আজকের নায়কদেরও একই নাট্যায়ন ভারতবর্ষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কাজেই এই সব খল মুখোসধারী স্খলিত চরিত্রের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সমন্বয় হয় কি করে? তা থেকেই প্রমাণিত হয় সুভাষচন্দ্র দেশের পাওয়ার পলিটিক্সের বহু বহু যোজন ঊর্ধ্বমার্গের লোক।

বিবাহ তথ্য : যেকোন লোকেরই বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু জওহরলাল এই ব্যাপারেও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পাওয়ার পলিটিক্সের খেলায় মেতে চূড়ান্ত কদর্যতায় নেমেছিলেন। যদিও এইসব ব্যাপারগুলোই জওহরলালের সম্পূর্ণ একতরফা খেলামাত্র। উল্লেখ্য যে ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল জওহরলালের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সুভাষ সংক্রান্ত যতপ্রকার চাল চেলেছেন এবং ভ্রষ্টাচারিতার খেলা খেলেছেন সমস্ত কিছুই ঘটিয়েছেন শুধু সুভাষ ভীতিতে। শুধু তাই নয়। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ছায়াযুদ্ধ। যেন কল্পিত একটি সুভাষের ছায়ামূর্তি তাঁকে সর্বদা তাড়া করে ফিরছে। এই ভাবনা থেকেই তাঁর সমস্ত কিছু নষ্টামি এবং ভ্রষ্টামি। এবার আমরা দেখবো

সুভাষচন্দ্রের দেবোজ্জ্বল চরিত্রকে কেমন ভাবে তিনি কলঙ্কিত করবার খেলায় মেতেছিলেন। তিনি এই কর্মটি করতে গিয়ে এক ইউরোপীয়ান মহিলাকে সংশ্লিষ্ট করে তাঁর গায়েও যে কলঙ্কের কালিমা বর্ষণ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। ঐ ইউরোপীয়ান মহিলার নাম হচ্ছে এ্যামেলি শেঙ্কল। তিনি ইউরোপের ভিয়েনা নিবাসিনী ছিলেন। তাঁর নাম আজ শুধু ভারতবাসীর নিকট বিদত না। তিনি আজ সারা বিশ্বের কাছেই একটি পরিচিত নাম। জওহরলাল এবং তাঁর সহযোগী আন্তর্জাতিক চক্রীরা বলছে এই ভিয়েনাবাসিনী এ্যামেলি শেঙ্কল নাকি সুভাষচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী। সুভাষচন্দ্র যখন চিঠির পর চিঠির মাধ্যমে জওহরলালকে লিখছেন তিনি ভারতবর্ষে ফিরছেন সত্ত্বর তখনই তিনি নতুন ফন্দিফিকির করে এই কদর্যময় ঘটনা নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হন। আসুন আমরা এই কাণ্ডের সত্যমিথ্যা একটু পরখ করে দেখার চেষ্টা করি। এবং কেন কোন্ উদ্দেশ্যে এমন একটি ব্যাপারকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আমদানি করা হলো সেটাও দেখি।

প্রথম প্রথম এই দুষ্টচক্রীরা প্রচার করেছিল নেতাজী সুভাষ (তখনও নেতাজী হননি) শ্রীমতী এ্যামেলি শেঙ্কলের সঙ্গে ১৯৩৫ সালে সাক্ষাৎ করেন ভিয়েনাতে। এবং সম্ভবত বিবাহ করেন শ্রীমতী শেঙ্কলকে ১৯৪১ সালে। (১২.০৪.৫১—*আনন্দবাজার পত্রিকা*)

দ্বিতীয়ত: সুভাষচন্দ্র যখন জার্মানিতে অবস্থান করছেন তখন শ্রীমতী শেঙ্কলকে বিবাহ করেন ১৯৪২ সালে। (১৬.০৪.৫১—*আনন্দবাজার পত্রিকা*)

তৃতীয়ত: সুভাষচন্দ্র এক বিদেশীনির প্রেমে পড়েন ১৯৩৪ সালে এবং বিবাহ করেন অত্যন্ত গোপনভাবে ১৯৩৭ সালে। এই তথ্য প্রকাশিত হয় স্বনামধন্য শিশির বসুর সহধর্মিণী কৃষ্ণা বসুর লেখাতে।

(২৭.০৩.৯৪—*আনন্দবাজার পত্রিকা*)

সুতরাং উপরের তথ্যে দেখা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্র ক্রমান্বয়ে তিনবার একই মহিলাকে অতি গোপনে বিবাহ করেছেন। প্রথম ১৯৩৭ সালে, দ্বিতীয়বার ১৯৪১ সালে এবং তৃতীয়বার ১৯৪২ সালে।

এবার আসুন সুভাষচন্দ্রের বিবাহ যখন হয়ে গেছে তখন তিনি যে ঘরসংসারে ব্রত হবেন তা নিশ্চয়ই কাউকে বলে দিতে হবে না। সুতরং ঘরসংসার যখন হলো এবার আমরা নেতাজীর পুত্র কন্যাতো আশা করবোই। এবং যিনি নাকি আমাদের সকলের এত প্রিয়নেতা তাঁর পুত্র-কন্যা হলে পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে বেশী উৎফুল্লিত কে বা কারা হবে বলুন? তাই আসুন সেই পটচিত্রটা কি হলো, কোথায় দাঁড়ালো তা একটু পর্যবেক্ষণ করি।

এখানে প্রথমই আমাদের আনন্দের খবর পরিবেশন করছে হিন্দি 'সান্মার্গ' পত্রিকা যে, সুভাষচন্দ্র একটি পুত্র সন্তানলাভ করেছেন। যার বয়েস হচ্ছে ৮ বৎসর ১৯৪৯ সালে। (*সান্মার্গ—২২.০৪.৪৯ সাল*)

এরপরই দেখা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্র একটি কন্যাসন্তানের ভাগ্যবান জনক যার বয়েস ১৯৫১ সালে ৮ বৎসর। (*আনন্দবাজার—১২.০৪.৫১ সাল*)। কন্যাটির জন্ম—১২.০১.৪৩ যখন শিশুটির বয়েস মাত্র ২৭ দিন তখন নেতাজী জার্মান ত্যাগ করেন দূরপ্রাচ্যের উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে। অথচ আনন্দবাজারের খবরানুসারে মেয়েটির জন্ম দেখা যাচ্ছে একবার ২৯.১১.৪২ (২৭.০৩.৯৪ *আ: বা:*)। তারপর পুনরায় কন্যাটির জন্মতারিখ দেখা যাচ্ছে ১২.০১.৪৩ সাল। (১২.০৪.৫১ *আ: বা:*)। এমন একটি কদর্যময় ঘটনা যিনি লিখিতভাবে প্রকাশ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত শিক্ষিকা ও শিশির বসুর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা কৃষ্ণা বসু। যার পরিণতি হিসাবে আনন্দবাজার বাজারীয় কর্ম দক্ষতার জন্য ব্যাপকভাবে ক্ষুব্ধ জনতা দ্বারা লণ্ডভণ্ড ও আক্রান্ত হয়েছিল।

উপরের সংবাদ পরিক্রমায় বলছে প্রথম প্রথম এই আন্তর্জাতিক দুষ্টচক্র সুভাষচন্দ্রের পুত্রসন্তান বলে প্রপোগাণ্ডা করেছিল। তারপরই বিখ্যাত এ্যানিটার আমদানি। প্রথম পুত্রসন্তান হলেও তাকে কন্যাসন্তানে রূপান্তরিত করতে তাদের এতটুকু বিবেকে বাঁধলনা। মনে হয় চক্রান্তকারীরা পৃথিবীতে ছলাকলায় পারদর্শী বা সুদক্ষ কোন পুরুষ সন্তানকে এই যজ্ঞে একাত্মতাবোধে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়নি। নতুবা পুত্রের বদলে কন্যায় রূপান্তরিত হলো কোন যাদুতে? এতো গেলো পুত্র-কন্যার নাটক।

এবার আসুন আমরা আসল নায়িকা এ্যামেলি শেঙ্কল বেচারাকে একটু যাচাই করি। সত্যি তিনি কোন্ জগতের নারী। আমাদের প্রথম প্রশ্ন : এ্যামেলি শেঙ্কল জীবনের এই সুদীর্ঘকালে কেন শেঙ্কল পদবীর পরিবর্তন করে বসু হলেন না? দ্বিতীয় প্রশ্ন : পৃথিবীর কোন পত্রপত্রিকা কেন তাঁর নামের পদবীতে বসু লিখতে সাহস পেলো না? তাহলে কি ধরে নিতে অসুবিধা আছে যে তিনি বসু লিখতে অনুমোদন করেননি। অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এইরূপ প্রোপাগাণ্ডা করছে চক্রীরা। তৃতীয়ত: এমন বিশ্ব-বিখ্যাত ব্যক্তি বিবাহ করলেন অথচ তার কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ বা Registration-এর নথি পর্যন্ত নেই কেন? কেউ বলতে পারেন, গোপন বিবাহ তাই নথি নেই। বেশ ধরে নিলাম গোপন বিবাহ। তবুতো বন্ধু প্রশ্ন এড়াতে পারবেন না। অতি গোপন বিবাহেও অন্তত পুরোহিত বা গীর্জার প্রিস্ট যিনি তিনি তো থাকবেনই। ধরে নিন আমাদের দেশের একটি গোপন বিবাহ। সেখানে কি দেখা যায়? অন্তত কোন মন্দিরের একজন পৈতাধারীকেও তো থাকতে হয়। তবে ইউরোপের ক্ষেত্রে অন্তত প্রিস্ট বলে কথিত ভদ্রলোক থাকবেন। তবে আর গোপন হলো কি করে? আরও আছে। বলাবাহুল্য পশ্চিমী জগতের রীতি অনুসারে যেকোন সাধারণ রামা-শ্যামারাও বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলে তাদের Registration অবধারিত। এমনকি আজকাল আমাদের প্রাচ্যদেশেও তা প্রচলিত সামাজিক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এমন এক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা থাকবে না কোন যুক্তিতে? চতুর্থত: সুভাষচন্দ্র বিবাহ করেননি একথা বলা সত্ত্বেও

যদি ধরে নেওয়া হয়, তিনি যে একথা বলেছেন তার সত্যতা বা প্রমাণ কোথায়? একথা বাদ দিলেও প্রশ্ন থেকেই যায়। এমন যে বিশ্বখ্যাত একজন আন্তর্জাতিক সমাজের স্বীকৃত রাষ্ট্রনায়ক তাঁর পারিষদবর্গ কি এব্যাপারে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারতেন? তাঁদের প্রত্যেকেরই নেতাজী সম্পর্কে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। অথচ তাঁদের ধ্যান জ্ঞানের যে স্বপ্নের নায়ক তাঁর সহধর্মিণীর সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ ও উদাসীন হবেন এটা ভাবাই বোধহয় ভাণ্ডামী। অথচ সেই সাক্ষ্য কি কোথাও পাওয়া যায়? এ ব্যাপারে যে হিতৈষীরা উদ্বিগ্ন হবেন এটাই কি সত্য ও স্বাভাবিক নয়? যখন ঐ ভিয়েনা বাসিনী এই মহিলার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রে তথাকথিত বিবাহের ঘটনা, চক্রীরা রটনা করেছিল, সেই সময় অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু যিনি আর একজন ভারত বিখ্যাত পুরুষ তিনি নিজে ভিয়েনা গিয়ে শেঙ্কলের সাথে সাক্ষাৎ করে ফিরে এসে তা এক কথায় জঘন্য প্রোপাগাণ্ডা বলেই উড়িয়ে দেন। আসুন এ ব্যাপারে ভারত বিখ্যাত বিপ্লবী এবং সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সহকর্মী সত্যরঞ্জন বক্সী কি বলেন তা শোনা যাক।

নেতাজীর ব্যাপারে শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী নিম্নলিখিত আবেদন প্রকাশ করেন। "নেতাজী পরিবারের কেউ কেউ সংবাদপত্র মারফৎ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর ব্যাপারে দ্বিধা প্রকাশ করছে না দেখে আমি গভীর বেদনাবোধ করছি। নেতাজীকে তাদের ভুল বুঝা অনুচিত। নেতাজী পরিবারের লোক হলেও তিনি কেবল ঐ পরিবারেরই ছিলেন না। তিনি শুধু জাতির বা দেশেরই নন। বিশ্বরাষ্ট্র মঞ্চের এক বিরাট পুরুষ। নিখিল বিশ্বের প্রবল পরাক্রমশালী সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। ১৯৪৮ সালে ইয়োরোপ থেকে ফেরার পর কিছুক্ষণের ভিতর আমি স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের সাথে দেখা করি। উডবার্ণ পার্কের ঐ বাড়ীতে আরও দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন—স্বর্গীয় অসীম কৃষ্ণ দত্ত ও স্বর্গীয় অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়। তাঁদের প্রশ্নোত্তরে শ্রদ্ধাষ্পদ স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু তাঁর ভিয়েনার অভিজ্ঞতাবলীকে "প্রবঞ্চনা" বলে খুবই জোরের সহিত বর্ণনা করেন। ড: সুনীলচন্দ্র বসু আমায় বলেছিলেন, তিনি বোম্বাই বিমান বন্দরে ভিয়েনা প্রত্যাগত শরৎবাবু অবতরণ করামাত্রই সাক্ষাৎ করেছিলেন। সুনীলবাবুর কাছেও শরৎবাবু একই উক্তি করেছিলেন, "প্রবঞ্চনা"। আমি একথা মানতে কখনও রাজী নই যে শ্রদ্ধেয় শরৎবাবু দু-মুখো ছিলেন। সে যা হোক নেতাজীর বিরুদ্ধে এই কুৎসা রটনা—তা যিনিই করুন না কেন বন্ধ হওয়া উচিত। তাহলে ভারতবাসী কৃতজ্ঞ থাকবে।"

(বসুমতী—শনিবার, ১৭ই ভাদ্র ১৩৬৮ বাং)

আসুন এ ব্যাপারে আর কি কি আলোচনার অবকাশ আছে দেখা যাক। যেমন তৎকালীন উত্তরপ্রদেশের ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক রামগতি গাঙ্গুলী মহাশয়ের এক চিঠি ও জিজ্ঞাসার উত্তরে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলীকে জানিয়েছিলেন যে—

1, Woodborn Park,
Calcutta-20
28th April, 1949

My Dear Ramgati Babu,

Your letter of the 24th instant with enclosure to hand. How can you take any action? You should completely ignore such articles.

With all good wishes.
Yours affectionately,

Mr. Ramgati Ganguly,
54, Bhuteswar,
Banaras

Sd/- S. C. Bose
(SARAT CHANDRA BOSE)

এমনকি স্বয়ং গান্ধীজীও এই সংবাদ আদৌ বিশ্বাসই করেননি। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এ ব্যাপার নিয়ে যখন বেশ একটু বাড়াবাড়ির চেষ্টা করেন তখন শরৎ বসুর হস্তক্ষেপে প্যাটেল পিছু হটেন। স্মরণীয় তৎকালীন সেন্ট্রাল এ্যাসেমব্লির নেতা তুলসী গোস্বামী তাঁর যুক্তিপূর্ণ তথ্যে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই ভেস্তে দেন। তাছাড়া এরপরও ঐ ব্যাপারে প্রশ্ন থাকে যদি চক্রান্তকারীদের দাবিই সত্য হয় এবং ধরে নিলাম তা সত্য, তাহলে প্রশ্নবান আপনাকে তাড়া করবেই। যথা, সত্যই যদি বিবাহিত স্ত্রী হতো তবে কি সুভাষচন্দ্র ঐ উথালপাথাল বিশ্বপরিস্থিতিতে তাঁর স্ত্রীর জন্য এমন নির্বাক হয়ে থাকতে পারতেন? না কোন ব্যক্তির পক্ষে এমনটি সম্ভব না শোভনীয়? এ ব্যাপারে বিপরীত দিক থেকেও কি একই প্রশ্ন প্রযোজ্য নয়? অর্থাৎ এ্যামেলি শেঙ্কল যদি সুভাষচন্দ্রের যথার্থই বিবাহিত স্ত্রী হতেন তবে তিনিও কি চুপ করে নিশ্চিন্তভাবে ঐ নির্বাসনে নির্বাসিতা হয়ে থাকতে পারতেন? বিশেষ করে বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলোর কাছে যখন সুভাষচন্দ্র ছিলেন ঘোষিত শত্রু এবং যুদ্ধাপরাধীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব। অথচ এ্যামেলি শেঙ্কলের যৎকিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নতার কোন চিহ্নই ছিলনা কোন দিনই, পত্রপত্রিকায় তা কখনও কোথাও প্রকাশ হয়নি। এই জাতীয় বিশাল ব্যক্তিত্বের একটু এপাশ ওপাশ হলেই খবরাখবর চাউর হয়ে যায়। এছাড়াও প্রশ্ন আছে। এ্যামেলি শেঙ্কল তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে কখনও কি দাবি করেছেন তিনি সুভাষচন্দ্রের সহধর্মিণী বলে? এমনকি তিনি যে একসময়ে সুভাষচন্দ্রের সেক্রেটারী ছিলেন সেকথাও তিনি কখনও প্রকাশ্যে বিশ্বের হাটে বলে বেড়াননি। এমন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির স্ত্রী হয়েও কি জীবনে একটিবারের জন্য তাঁর স্বামীর জন্মভূমিতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন? পৃথিবীতে ভারতবর্ষের যে অবস্থান তার জন্যও তো সাধারণ কৌতুহল বশতঃ তিনি বারেক ঘুরে যেতে পারতেন। তাহলে ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্ছে তা সম্পূর্ণ একতরফা নয় কি? অর্থাৎ শুধুই চক্রান্তকারীরা এ্যামেলি শেঙ্কল যে কখনও সুভাষচন্দ্রের সেক্রেটারী ছিলেন সেই সূত্র ধরে তাঁদের উভয়ের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছেন। এই তৃতীয়পক্ষ দুষ্টচক্র ছাড়া কেউই একটি শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করাও এব্যাপারে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেননি। এছাড়াও প্রশ্ন করতে পারেন যে এ্যামেলি শেঙ্কলের যে সকল সুভাষচন্দ্র সংশ্লিষ্ট পত্র চক্রান্তকারীদের মুখপাত্র বা ভারতীয় বিখ্যাত সংবাদপত্রে দিনের পর দিন

প্রকাশিত হয়েছে তা কি মিথ্যা? দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে হয় যে অবশ্যই মিথ্যা। কারণ কোন বিখ্যাত পরিবারেই এক ব্যক্তি সুভাষচন্দ্রের ও শেঙ্কলের হস্তলিপি নকলকারী হিসাবে বিশারদ ছিলেন। এবং তিনি অবশ্যই বৃটেনে বসবাসকারী। শুধু তাই নয়। তিনি সেখানকার সরকারী আশ্রয়েও পরিপুষ্ট এবং লালিত পালিত। এবং তাদের রসদে প্ররোচিতও বটে। যদিও তিনি সম্প্রতি গত হয়েছেন। এই সংবাদ বসুমতীতে প্রকাশিত ১০.১০.৭৯। এই হচ্ছে সুভাষচন্দ্র সংশ্লিষ্ট প্রেমপত্রের আদি ও মূল রহস্য। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যাঁরা কিছু মাত্র খবর রাখেন তাঁদের এসব ইতিবৃত্ত না জানার কথা নয়। এসকল তথ্য যেসব বিখ্যাত পত্রিকা গোষ্ঠীগুলো প্রোপাগাণ্ডা করছে তারা খুব ভালভাবেই সচেতন আছেন তারা কি রসনার দৌলতে এসব করছেন আজ সুদীর্ঘকাল ব্যাপী। একশ্রেণীর সাংবাদিক ও পত্রিকার মালিক আছেন তাদের দায় সত্যসংবাদ কতদূর বিকৃত করে জনগণকে ঠকানো যায় ও বিভ্রান্ত করা যায়। সত্যসংবাদ পরিবেশন তাদের আদৌ দায় নয়।

এই নাটক সম্পর্কে আরও শোনা যায় এই চক্রীরা নাকি এ্যামেলি শেঙ্কলকে দিয়ে অর্থাৎ তার মুখ দিয়েই সুভাষ চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাকে শতচাপ সৃষ্টি করেও সম্মত করাতে পারেনি। পরে এ্যানিটা ব্রিজেট বসে এক সুইডিস দেশীয় ব্যক্তি পি. ব্রিজেটের কন্যাকে জওহরলাল ও তাঁর আন্তর্জাতিক চক্রীগোষ্ঠী চক্রান্তের জালে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তা ফলাও করে প্রচার হয়। এই চক্রান্তকারীরা এমনি নিকৃষ্ট মানের যে এদের ব্যাপারে এ্যামেলি শেঙ্কল আজীবনে একটি শব্দ খরচা করেও এঁদের ওজন বাড়াননি এবং নিজের মর্যাদা ম্লান করেননি। এই যে ঘটনা এর পিছনেও জওহরলালের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে সন্দেহ নেই। **"অনিতা বসু জওহরলালের আর একটি মিথ্যা সৃষ্টি, দাবীটা কার বেশী, কন্যার না স্ত্রীর? এর আগে তাঁর পুত্রের কথা একটি ভারতীয় কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। চেহারায় না মেলার জন্য পুত্রের বদলে কন্যা সৃষ্টি হল"**(—শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসু, ২০-১২-৭০)

কারণ তৎকালীন সরকারের প্রধান কর্মকর্তার অনুমোদন ছাড়া এমন কাজ কখনও হতে পারে না। পাওয়ার পলিটিক্সের মোদ্দা কথা হচ্ছে গোল দিতে হবে। কিভাবে গোল করতে হবে সেটা মোটেও বিবেচ্য বিষয় নয়। গোলটা হলো কিনা সেটাই প্রতিপাদ্য বিষয়। একথা যে কত বড় সত্য তা অন্তত আজকের প্রতিটি বঙ্গবাসী মাত্রই জানেন এবং ভারতবাসী হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন। প্রত্যেক কমিউনিস্ট দেশের লোকেরই এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। বর্তমান কমিউনিস্ট বিশ্বের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। কিভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে হবে তার রকমফের বা পদ্ধতি বিচারের দরকার নেই। এই খেলার নামই পাওয়ার পলিটিক্স। এখানে স্মরণীয় যে, পণ্ডিত জওহরলাল ছিলেন একজন বিশেষ মার্কসবাদী। একবার এক বিতর্ক মঞ্চে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জওহরলালের বিতর্ক হয় যে আমরা যখন দেশের কর্তৃত্বের অধিকার পাবো তখন কোন পথ গ্রহণযোগ্য হবে? বা কোন পথে চলা সঠিক হবে? এ-ব্যাপারে জওহরলালের সাথে সুভাষচন্দ্র একমত হতে পারেননি। জওহরলালের মত ছিল

মার্কসীয় পথই হবে সেরা। বলাবাহুল্য জওহরলাল মার্কসীয় পথেই বিচরণ করেছেন বটে, তবে আলখাল্লাটি ছিল তাঁর অবশ্যই ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের এবং জাতীয়তাবাদের। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তিনি আজীবন যে আচরণ করেছেন তা যে মার্কসীয় দর্শনেরই শিক্ষা তা বলার বা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এখানেই জওহরলাল ও তার অনুগামী গোষ্ঠীরা জয়ী। সুভাষচন্দ্র রাজসিংহাসনে বসে রাজ্যভোগ করেননি সত্য। কিন্তু সমগ্র দেশবাসীর প্রত্যেকের হৃদয় সিংহাসনে আজ কার স্থান অমর? কোহিনূর সিংহাসনে বসে তাজমস্তকে জওহরলাল আপামর দেশের ঘৃণা কুড়াচ্ছেন, না মুকুটহীন অদৃশ্য সম্রাট আজ শুধু ভারতবর্ষের নয় সমগ্র এশিয়া তথা বিশ্বের অমর সম্রাট হয়ে পুষ্পাঞ্জলি পাচ্ছেন? এখানেই আসল জয় পরাজয়। এখানেই বিজয়বৈজয়ন্তীর সত্য পরিচয়।

বলতে নেই এ্যামেলি ও সুভাষ সংশ্লিষ্ট আরও প্রশ্ন আছে মানুষের। আসুন সেই পর্বটাও একটু ওলট পালট করে দেখি, মানুষের ঐসব বক্তব্যের কোন সারবত্তা আছে কিনা। সর্বসাধারণের জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এ্যামেলি শেঙ্কলের নামে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যেসব প্রেমপত্র বলে কথিত পত্রাদি আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় এতকাল থেকে থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল সেখানেও দেখা গেছে পদবী হিসাবে এ্যামেলি বসু বলে উল্লেখ নেই। এইভাবে গোটা চিত্রনাট্যটাকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে যে চিত্রটা প্রকট হয় তাতে অম্লানেই দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে হয় সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই একটা মিথ্যাভূমির উপর যেন স্কাইস্ক্রেপার সৃষ্টির অপচেষ্টা! এই ব্যাপারে আরও কিছু পর্যালোচনা করার অবকাশ রয়েছে। আসুন তার একটু চর্চা করি। স্মরণীয় যে মাঝে মাঝে প্রায়শঃই দেখা যায় অতি সাধারণ থেকে অতি অসাধারণ এমনকি গবেষক ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের বিবাহ নিয়ে বিতর্ক শুরু করেন। এবং অতি মুন্সিয়ানার সাথেই তা পরিবেশন করার চেষ্টা করেন। তাঁদের প্রতি একটি নিবেদন এই যে, তাঁরা সকলেই অন্তত একটি ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের ভক্ত বা অনুরাগী বলে যাঁদের তারা মনে করেন তাদের প্রতি কটাক্ষপাত করেন এই বলে যে, সুভাষচন্দ্র কারো একার সম্পদ নয় এবং তাঁর বিবাহ করাটাও গর্হিত নয়। বন্ধু মনে রাখা উচিত সুভাষচন্দ্রের ভক্ত অতিভক্ত যেই বা যিনিই থাকুন না কেন তিনি বা তাঁরা কখনও বিবাহকে গর্হিত বলেননি বা বলতে পারেন না। কিন্তু যিনি সত্যসত্যই বিবাহিত নন তাঁর সম্পর্কে বিবাহের ব্যাপারটা আরোপ করাই কি অপরাধ নয়? এবং আমরা বিশ্বাস করি, যা ঘটনা নয় তারে কেউ ঘটনা বলে চালাতে চাইবে কেন? আর যদি এরূপ অন্যায় দাবি কেউ প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হয় তবে তার বা তাদের প্রতি অভিযুক্তরা কেন ক্ষুব্ধ হবে না? সুতরাং একটা ভিত্তিহীন মিথ্যা আরোপের জন্যই কোন একটি শ্রেণী বা কিছু লোক বিরক্ত বোধ করেন। এটাই এখানে ঘটনা। যা নয় তা যদি আপনার আমার প্রতি কেউ আরোপ করতে চায় তবে আমরা কি খুব সহজে ছেড়ে কথা বলবো না বলি? এখানেই আসল রহস্য। সুভাষচন্দ্রের নামে জওহরলাল বা ঐ নেতা-নেত্রী-বর্গরা আতঙ্কিত হতেন বা হয়। একথা আমরা জানি। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের নামে তথাকথিত আঁতেল কিছু লোক বা কিছু বুদ্ধিজীবীরা কেন এখনও আঁতকে উঠেন? রাজনৈতিক বাবুদের আঁতকে উঠার তো অসংখ্য কারণ

আছে। কিন্তু আপনার আমার মত পাতি ব্যক্তিদের আঁতকে উঠার কারণ কি? যদি তা না হয় তবে সুভাষচন্দ্রের বিবাহ হলো, কি হলোনা, তা নিয়ে এত প্রচার প্রোপাগাণ্ডার আছেটা কি? এমনটি তবে কিসের জন্য কার স্বার্থে? হয়ত বলবেন বিবাহ সংশ্লিষ্ট প্রোপাগাণ্ডায় সুভাষ বিরোধীদের লাভটা কি? আর ব্যাপারটাইতো অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র নামটাইতো আজ একটি ডেড্ বা মৃত বিষয়। উত্তরে বলতেই হয়, যারা আপনি মৃত তারাই সুভাষচন্দ্রকে মৃত বলে ঠাওরাচ্ছেন। তা আপনারা যত ইচ্ছা ভাবুন তাতে অন্তত সুভাষ অনুরাগীরা বাধা দিচ্ছে না বা দেবে না। কিন্তু সুভাষ অনুরাগীরা কিছু করলে বা বললে আপনারা রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন কেন? এর জবাবে আপনারা বলতে পারেন এমন উদাহরণ আছে কি? এর জবাব যদি আমাদের দেবার সুযোগ দেন তবে কিন্তু আপনারা সত্যিই খুব বিপদে পড়বেন। যথা, সুভাষচন্দ্র দেশে আসতে চাইলে আপনাদের মাঝে কেউ তরবারি হাতে গর্জন করেন কেউবা বুলেটের মালা পরাতে ছুটেন। এর চেয়ে নির্মম কঠিন সত্য আছে কি কিছু? **এই প্রেক্ষাপটে একটি প্রশ্ন, ভারতসরকার কী কারণে অনিতা পাফের (অনিতা ব্রিজেটের পি ব্রিজেটের কন্যা) ব্যাপারে প্রিভিলেজ মোশান এনে ঐ সম্পর্কিত গোপন ফাইল নেতাজী এনকোয়ারী কমিশনকে দিতে চাইছে না? (File No. 2(67/68–P.M) Establishment / D–Identity, daughter of Subhas Chandra Bose, Ms. Anita Pfaff? জাতিকে কি তাতে Blackmailing করা হচ্ছে না? তবু বলবেন সুভাষ চরিত্র কলঙ্কিত করা হচ্ছে না? (বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত)**

হ্যাঁ, বলছিলেন সুভাষ চরিত্র কলঙ্কিত করে কি লাভ? লাভ হচ্ছে তাঁর জনপ্রিয়তাকে যেনতেন বিদ্ধস্ত করা। ও কিস্তি মাৎ করা। চরিত্র হনন তো একটা সহজতম রাস্তা। কোন্ যুগে কোন্ মহাপুরুষ চরিত্র হননের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন? বুদ্ধ থেকে বিবেকানন্দ, কৃষ্ণ থেকে খ্রীস্ট কে নয়? তাই বলছি যেন-তেন প্রকারেণ মিথ্যা নিয়ে কূট কেচাল করবেন না। সুভাষচন্দ্র বিবাহ করলে ভক্ত বলুন অনুরাগী বলুন বা অতি ভক্তই বলুন কেউই তাঁকে ভক্তি বা শ্রদ্ধা করা ছেড়ে সন্ন্যাস নেবেন না বরং গভীর ভাবেই আনন্দিত হবেন তাঁদের প্রত্যেকে। কিন্তু যা নয় তা কোন্ অধিকারে আরোপিত করবেন বা মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা করবেন? তাই বলতেই হচ্ছে সাবধান, খুব হুঁশিয়ার। এই হুঁশিয়ারী যে মিথ্যা বাগাড়ম্বর নয় বা ভিত্তিহীন নয় তা যোগীবর অঘোরিবাবার বয়ান থেকেই উপলব্ধি করার শিক্ষা নেবেন আশা করি। এ প্রসঙ্গের কলেবর আর না বাড়িয়ে চলুন আমরা সকলে যা সত্য, যা সঠিক সেই পথ ধরেই বিচরণ করি। কারণ আপনি যেমন আমার শত্রু নন আমিও আপনার শত্রু নই। অতএব সহঅবস্থান বা সমন্বয়ের দর্শনই সেরা দর্শন। এখানেই এই প্রসঙ্গ ইতি হোক। তবু যে কথাটা এই প্রেক্ষাপটে সহজাত ভাবে এসে যায় সেটা বলে ফেলাই ভাল। অপরাধ বিজ্ঞান বলে চক্রান্তকারীরা বা অপরাধীরা যত বড় বা ছোটই হোক না কেন তারা অবচেতনে

বা অজ্ঞাতে হলেও তার অপরাধের কিছু না কিছু চিহ্ন রেখে যায়। এই এত বড় মাপের এক আন্তর্জাতিক চক্রান্তেও এর যে ব্যতিক্রম ঘটেনি তা উপরের আলোচিত প্রশ্নগুলোই কি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়? এই জিজ্ঞাস্যগুলি তো এক অতি সাধারণের প্রশ্ন। তার বদলে বিশ্বখ্যাত গোয়েন্দারা অনুসন্ধান করলে যে আরও কঠিন কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত হবে তাতো বলাই বাহুল্য। তাদের প্রশ্নের উত্তর পেলেই তো অপরাধীরা বেড়জালের আওতায়। তখনই প্রমাণিত হয়ে যাবে প্রশ্নকর্তা মিথ্যাবাদী না ঐ চক্রীকুল অপরাধী, কাজেই দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই একটা মিথ্যাভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার জন্য কি আরও বিতর্কের প্রয়োজন আছে, না কোন গবেষণার প্রয়োজন আছে?

তাই বিশ্বকবির ভাষায়ই সুভাষচন্দ্রের বিবাহ নামক প্রহসন নাটকের এবং চক্রান্তকারীদের চক্রান্তের স্বরূপটা উদ্‌ঘাটন করা যাক।

"রইল বলে রাখলে যারে
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
তোমার কানাকানি টিঁকবে না ভাই
রবার যেটা সেটাই রবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

তৃতীয় নেতাজী তদন্ত কমিশন শিশির কুমার বসুকে সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করেছিলেন তার উত্তরে শিশির কুমার বসু কমিশনকে পত্রে জানান :

"১৯৪৫ সালের আগস্টে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত নেতাজীর কাছ থেকে কোন খবর পাইনি। কমিশন যে সব বিষয়ের উল্লেখ করেছে সে সব বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য নই।"

(২২/৯/২০০০ বর্তমান পত্রিকা)

তবু দেশের নেতৃবৃন্দ জাপান থেকে ছাই আনতে বদ্ধপরিকর, যে ছাই সম্পর্কে বৃটিশ-আমেরিকার গোয়েন্দা ও গান্ধীজীর মত হচ্ছে, ঐ ছাই কোন জানোয়ারের। ধন্য ভারত সরকার ধন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দ। যাঁর সংগ্রামের দান এই স্বাধীনতা, তাঁর প্রতি ভারতবাসীর কী অমূল্য প্রতিদান উপহার। এরই নাম ভারতবর্ষ! স্বর্গীয় ঋষিকুল কি এই ভারতবর্ষ সৃষ্টি করে গেছলেন এমন উত্তরসূরীদের জন্যে?

নবম অধ্যায়

১৯৪২ সালের বোম্বাই এ. আই. সি. সি. সম্মেলনে জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীজীর অবস্থান কি? দেশপ্রেমিক মানবপ্রেমিক হিসাবে কংগ্রেস কমিউনিস্টরা কি যথার্থ সার্থক ভূমিকা পালন করেছে ভারতবর্ষে? নেতাজী সুভাষ ও গান্ধীজী তথা জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে কি আমরা সাধারণ ভারতবাসীরা তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছি? সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে গান্ধীজীর কী আক্ষেপ ছিল? জাতীয় আন্দোলনের শেষ পর্বে জওহরলালের কি ভূমিকা ছিল? প্রকারান্তরে কি তিনি ইংরেজের সহযোগীর ভূমিকাই পালন করেননি?

ঐসব বিতর্ক রেখে আসুন আমরা পুনরায় একটু ফিরে যাই ১৯৪২ সালের চালচিত্রে। সেখনে কি হচ্ছিল তা একপলক নিরীক্ষণ করা যাক। সে বৎসরটা ছিল বৃটিশ ভারত ছাড় আন্দোলনের মহাত্মাজীর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' বর্ষ। এই প্রস্তাব কার্যত সুভাষচন্দ্রের অবদান বলা যেতে পারে। যদিও গান্ধীজীর উপস্থাপনায় জাতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে গৃহীত হয়েছিল ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট এ. আই. সি. সি. সম্মেলনে। যতদূর জানা যায় ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয়বার সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেস সভাপতি হলেন তখনই এই do or die মানসিকতায় তিনি উথাল পাথাল হচ্ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসীদের উৎপাতে তো চেয়ারে বসারই সুযোগ পেলেন না। ফলে তিনি আর এই প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হতে পারলেন না। স্বভাবতই তা আর বাস্তবায়িতও হলো না। কিন্তু তাই বলে মন থেকে তা মুছে ফেলেননি। তিনি গান্ধীজীর মাধ্যমে এটিকে বাস্তব রূপে রূপ দেবার নীরব প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। সুভাষচন্দ্র জানতেন, এই কথা ক'টি গান্ধীজীর মুখ থেকে ব্যক্ত করাতে পারলে তার ফল ফলবে অভাবনীয়। সুভাষচন্দ্রের এই ইচ্ছা যেন নিয়তির অমোঘ নির্দেশেই শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর মাধ্যমে প্রতিফলিত হলো। এটা হচ্ছে ১৯৪২ সালের বোম্বাই এ. আই. সি. সি. সম্মেলনে। এই প্রস্তাব পাশ হওয়ার ফল যে সুদূর প্রসারী হয়েছিল সুভাষ বোসের প্রত্যাশা মত তা বলাই বাহুল্য। সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা এইভাবেই পরোক্ষে সার্থকতার পথ ধরে এগিয়ে

চলল। বলতে নেই প্রস্তাব পাশ হবার সাথে সাথে কয়েক ঘন্টার মাঝে গান্ধীজীসহ সকল জাতীয় পর্যায়ের নেতা ও নেত্রীরা কারারুদ্ধ হলেন। পরিণতি সারাভারতে লাগাম ছাড়া আন্দোলনের রূপ নিল। জাতীয় কংগ্রেস গান্ধীজীর এই জঙ্গী প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ হলো যদিও তাদের কিছু করার ছিল না। কারণ গান্ধীজীকে বাতিল করে কিছু করার পর্যায়ে জাতীয় কংগ্রেস তখনও পৌঁছোয়নি। স্বভাবতই নেতৃবর্গরা এ প্রস্তাবে একেবারে হকচকিয়ে গেলন। গান্ধীজীকে বর্জন করলে ঐসব নেতারাই তখন দেশবাসী দ্বারা বর্জিত হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুড়োয় চলে যেতেন। তাই তাঁরা আপন অস্তিত্ব রক্ষার্থেই গান্ধীজীর আনা ঐ প্রস্তাব পাশ করাতে বাধ্য হলেন। নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বাঁচাবার জন্য। নতুবা গান্ধীজী জাতীয় কংগ্রেস দ্বারা তখনই পরিত্যক্ত হয়ে যেতেন। এবার গান্ধীজীকে নেতারা প্রশ্ন করলেন—তারপরে কর্মসূচী কি? আন্দোলন ঘোষণা হলে আন্দোলনের কর্মসূচী তো থাকবেই, থাকতে হবেই। উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন, কর্মসূচী দেবে সুভাষ। এতে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হয়েছিল। এক কথায় এর যে কি অর্থ হয়, তা বোধহয় একটি শিশুরও বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। প্রস্তাব পাশ করালেন গান্ধীজী আর কর্মসূচী দেবে সুভাষ! এতসব রথীমহারথী থাকতে কিনা সুভাষকে নিয়ে টানাটানি? তাদের ভাবখানা তখন, কেন আমরা কি কিছু কম? স্মরণীয় সুভাষচন্দ্র তখন সুদূর সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে বার্লিনে অবস্থান করছেন। এমত অবস্থায় কার বা মাথা ঠিক থাকে? কারণ সুভাষ কি শুধু বৃটিশের শত্রু? একই গাঁটবন্ধনের সুবাদে যে সুভাষচন্দ্র তাঁদেরও শত্রু। গান্ধীজীর কি মতিচ্ছন্ন হলো? তিনি একি অঘটন ঘটালেন! কংগ্রেসী নেতারা বুঝলেন এ হচ্ছে গান্ধীজীর এক অভিনব চাল। তিনি কি বলতে চাইছেন পরোক্ষে তা তাঁদের কাছে অতি সহজেই অনুমেয়।

এমন একটা অবস্থায় নেহেরু, প্যাটেলদের যে অবস্থা অতি করুণ তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। কারণ গান্ধীজী যদি হন সুভাষচন্দ্র কেন্দ্রীক তবে নেহেরু, প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ এইসব ভারত বিখ্যাত নেতারা যায় কোথায়? তাঁরা যে গান্ধীজীকে এতকাল যাবৎ 'কাইজার অব হিন্দ' বলে জয়ধ্বনি দিয়েছেন বা ভারতের একচ্ছত্র স্বেচ্ছাচারী সম্রাট বলে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। এবার তাঁদের গতি কি দাঁড়াবে? স্বয়ং গান্ধীজী যদি সুভাষচন্দ্রের পথের পথিক হন বা সুভাষচন্দ্রকে পরোক্ষে নেতা ভাবেন তবে তাদের এতকালের ছলচাতুরী সাধ্যসাধনা সবই যে ব্যর্থ হয়ে যায়। তবে আর ইজ্জতের অবশিষ্ট রইল কি? এখন তাদের অস্তিত্ব রক্ষাই তো দায়। অগত্যা জওহরলাল প্যাটেলদের শিবির পরিবর্তনই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হলো। গান্ধীজীর শিবিরেই গান্ধীজীর সাথে শুরু হলো বৈরিতা বা সংঘাত, যদিও পরোক্ষভাবে এতকাল তারা বৃটিশের অনুরাগীই ছিল তবু প্রকাশ্যে তো কেউ অভিযোগ করতে পারতো না! বা কোন অভিযোগ হানলেও তার কোন যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য ছিল না। এইসব নেতারা আর যাই করুক সুভাষ বোসকে মেনে নেয় কেমন করে? সুভাষচন্দ্রকে মেনে নেওয়া মানে

তো সুভাষচন্দ্রকে দেশের সর্বজন গ্রাহ্য নেতা বলে স্বীকার করা। তাই যদি করা হয় তবে তাদের এতকালের যে স্বপ্ন এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সবই যে বানচাল হয়ে যায়। অতএব বাঁচতে হলে শিবির পরিবর্তনই এখন একমাত্র পথ। এবার আর রাখঢাক প্রশ্ন রাখলে চলবে না। তাই তারা একেবারে সফেদ চামড়ার শ্বেতপ্রভুদের খাস শিবিরে।

এভাবেই ভারতবর্ষের ভাগ্য বারবার বিদেশীদের কবলে পড়েছে। ইতিহাস সেই সাক্ষীর সাক্ষ্যদাতা। বৃটিশ শিবিরে নাম লিখিয়েই জওহরলাল এক ঝটকায় গান্ধীজীকে বর্জন করলেন। তাই গান্ধীজীর মুখে শুনতে পাই তখনকার তাঁর বেদনাময় আক্ষেপ। তিনি তখন প্রায়ই বলতেন, 'আজ আমি বড় একা'। "Everybody is eager to garland my photo and salute, and not to follow me."—Gandhiji

তিনি বলতেন দুঃখ করে, 'ওরা আমার ছবিতে মালা পড়ায় কিন্তু ডাকলে শোনে না, এই হলো গান্ধীজীর অবস্থান ১৯৪২ সালের শেষ অধ্যায়ে। তাহলে একটু গভীরে ঢুকে মূল্যায়ন করলে দেখা যাচ্ছে যে গান্ধীজীকে জওহরলাল, প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদরা এতদিন শুধু গাছে উঠার মইরূপে ব্যবহার করেছে। মই-এর কাজ এবার শেষ, গান্ধীজীরও এখন থেকে জাতীয় কংগ্রেসের উর্বর জমিতে আর কানাকড়িও মূল্য রইল না। অথচ আমরা দেশের আমজনতা কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত নেতারা আজ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও দেশভাগের অভিযোগ এনে গান্ধীজীকে অপরাধের কাঠগড়ায় দাঁড় করায় এবং যৎপর নাস্তি তিরস্কার দ্বারা পুরস্কৃত করে। নেতারা পলিটিক্স করতে মাঠে নেমে কী না করেন? কিন্তু আমরা জনগণরা নেতাদের মতলব কিছু না জেনে বুঝে নেতাদের ফেউ বনে তাদের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনি করি ও শতগুণ উৎসাহে তাদের জয়ধ্বনিতে সোচ্চার হই। কদাচিৎ কেউ তার প্রতিবাদ করলে ফেউরা পারেতো তাড়া করে আসে। একবারও চিন্তা করেনা বিরুদ্ধ বাদীদেরও কোন কিছু যথার্থ বক্তব্য থাকতে পারে। বন্ধু অপরাধ নেবেন না, এই হচ্ছি আমরা নামক সাধারণ তৃণমূলীরা। বস্তুতপক্ষে তৃণমূলীদের প্রকৃতই কোন দোষ থাকেনা একথা সত্য। আবার একথাও তো সত্য যে, নেতারা যা ইচ্ছা পড়ায় বা পড়াচ্ছে আর তাই আমরা বদহজম করে এবং সেটাই অম্লঢেকুর তুলে যেথাসেথা উদ্গার করে বেড়াই। থাক এসব বেকার বিতর্ক। আসুন এবার আমরা কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের কিছু দেশপ্রেমের নমুনা সংগ্রহ করি।

তৎকালে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, তাদের কংগ্রেসী কর্মী ও সদস্যদের নিয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে যে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন তাতে অবশ্যই কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা ছিল গান্ধীজীর সুবিস্তির্ণ নেতৃত্বের ছত্রছায়ায়। এবং তাঁর একচ্ছত্র অসীম প্রভাবে। গান্ধীজীর প্রভাব ছাড়া যে বাকীদের খুব একটা প্রতিপত্তি ছিল, তা কিন্তু নয়। স্মরণীয় যে গান্ধীজীর পূর্বে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের একচ্ছত্র প্রভাব। তাঁর প্রভাব এমন ব্যাপক ছিল সমগ্র ভারতবর্ষে যে এক সময় স্বয়ং গান্ধীজীও

বিবর্ণ হয়ে তাঁর ওয়ার্দা সবরমতী আশ্রমে গ্রামসেবার জন্য চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। জাতির দুর্ভাগ্য দেশবন্ধু চলে গেলেন অসময়ে। সালটা ছিল ১৯২৫ সাল। তারপর থেকেই ভারতবর্ষের একচ্ছত্র নেতা হচ্ছেন গান্ধীজী। গান্ধীজীর যে জন সম্মোহিনী ক্ষমতা ছিল সে সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক রোঁমারোঁলা বলেছেন, "এই সেই মানুষ যিনি উদ্বোধন করেছেন মানবিক রাজনীতির এমন এক শক্তিশালী আন্দোলন যার তুলনা প্রায় দুই হাজার বছরের ইতিহাসে নেই"। (—পশ্চিমবঙ্গ-গান্ধীসংখ্যা, পৃষ্ঠা—১১২)। স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য অধীর মহাত্মাগান্ধী সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বলতেন যে, "তিনি জনজাগরণের যাদুকর"। (—পশ্চিমবঙ্গ-গান্ধীসংখ্যা, পৃষ্ঠা—৭৬)। সুতরাং চিত্তরঞ্জনের পর গান্ধীজীই হচ্ছেন কংগ্রেসের তথা ভারতবর্ষের তখন অদ্বিতীয় জনজাগরণী সংঘটক নেতা। এই তথ্যই বলছে, গান্ধীজীই তখন জাতীয় নেতা। এহেন গান্ধীজীর ছত্রছায়া থেকে কংগ্রেস যখন বঞ্চিত তখন তাদের ক্ষোভ তো অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। আমরা কথায় কথায় বলে থাকি জাতীয় নেতা, জাতীয় নেতা। এবং দিল্লী কেন্দ্রীক যে কোন রাজনৈতিক নেতাকেই জাতীয় নেতা বলতে দ্বিধা করিনা। কিন্তু শুধু দিল্লীকেন্দ্রীক রাজনীতি করলেই কি জাতীয় নেতা হয়ে যায়? আমরা বোধ হয় এখানেই মস্ত ভুল করি সবাই। জাতীয় নেতার সংজ্ঞা কি, তাই আমরা আদৌ জানি কিনা সন্দেহ আছে। জাতীয় নেতা তো সেই যিনি গোটা জাতির গোটা ভারতবর্ষের মানুষের প্রত্যেকের এবং প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কাছে সমান আদরণীয় সমান গ্রহণযোগ্য। কাজেই এই দর্পণে দেখতে গেলে তখন সমকালীন ভারতবর্ষে গান্ধীজী ছাড়া কে ছিলেন ঐ পর্যায়ের? এমনকি সুভাষচন্দ্র তখনও সে পর্যায়ের ছিলেন না। অন্ধ হওয়া আমাদের উচিত নয়। যা সত্য তাই বিশ্লেষণ করা বাঞ্ছনীয়। সেটাই আমাদের প্রতিপাদ্যের মূল লক্ষ্য। সেই অর্থে ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম থেকে আজ ২০০২ সালের ঊষালগ্ন পর্যন্ত ভারতবর্ষের মাটিতে কয়জন জাতীয় নেতাকে আমরা প্রকৃত অর্থে পেয়েছি? তা হাতে গোনারও কি প্রয়োজন আছে? তবু বলতে নেই জনসাধারণ থেকে নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত সবাই যাকে-তাকে বা যেমন-তেমন নেতাদের গায়েও জাতীয় নেতার তকমা এঁটে দিচ্ছে অহরহ।

আসুন এসব তাত্ত্বিক কচকচানি রেখে আমরা আসল প্রতিপাদ্যের ক্ষেত্রেই বিচরণ করি। তথ্য বলছে কংগ্রেসীরা গান্ধীজীকে ব্যবহার করেছিল কংগ্রেসের প্রয়োজনীয় মাটিটাকে উৎকর্ষতার সঙ্গে চাষ করার জন্য এবং তাতে উপযুক্ত ফসল ফলাবার জন্য। তাই চাষও শেষ গান্ধীজীও এক ঝটকায় শেষ। আর কংগ্রেসীদের দেশপ্রেম? তার তো যথেষ্ট পরিচয় আমরা পেয়েছি ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহের খাস জমিতে। এই ছিল তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের দেশপ্রেমের নমুনা ও চেহারা। আর সেই দিনই যখন তাদের ঐ চেহারা তবে আজকের কথা কি নতুন করে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে?

আর কমিউনিস্টদের দেশপ্রেমের পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি 'জনযুদ্ধ'—নামক মোড়কে-মোড়া মাকাল ফলটির মাধ্যমে। আসুন এই 'জনযুদ্ধ' নামক মাকাল ফলটির একটু উৎসের সন্ধান করি বা তার একটু ঐতিহাসিক পরিচয় নিই। তাদের

ইতিহাস বলছে—"ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গ্রেটবৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির চাপে পড়ে তাদের লাইন বদল ঘটান।.....৬ই নভেম্বর ১৯৪১ সালে সোভিয়েত বিপ্লবের ২৪তম বর্ষ উযাপন উপলক্ষে স্তালিন বিশ্বের মেহনতী মানুষের জন্য যে ভাষণটি পড়েন তাতেই নিহিত ছিল এতদিনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করার অমোঘ নির্দেশ। স্ট্যালিন বললেন, "গ্রেট বৃটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আজ একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং আমরা মিলিতভাবে শপথ নিয়েছি মানবতার শত্রু নাৎসীবাদকে ধ্বংস করে মানব জাতিকে মুক্ত করবার"।

(ওরা শুধু ভুল করে—শান্তনু সিংহ, পৃষ্ঠা—৩১)।

১৯৪২ সালে ১লা জানুয়ারী পাটনাতে যে সারাভারত ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে ৬০০-রও বেশী প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিপুল ভোটাধিক্যে জনযুদ্ধ নীতি গৃহীত হয়েছিল। মাত্র ৯ জন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। অতএব দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ স্ট্যালিনের যাদুমন্ত্রে 'জনযুদ্ধে' রূপান্তরিত হয়ে গেল।"

(ওরা শুধু ভুল করে—শান্তনু সিংহ, পৃষ্ঠা—৩২)

আসুন এই 'জনযুদ্ধ' নামক মাকাল ফলটি একটু যাচাই করে দেখি ব্যাপারটা কি? আপনারা সবাই জানেন মাকাল ফলের আকর্ষিত সম্মোহিনী শক্তি ও সৌন্দর্যে আমরা সবাই খুব বিমোহিত হই। কিন্তু যখন তার ভেতরটা দেখার সুযোগ ঘটে তখন সবারই আক্ষেপ বই আর কিছুই করার থাকে না। এইরূপ কমিউনিস্টরা 'জনযুদ্ধ' নামক একটি মাকাল ফলের মোড়ক উপহার দিয়ে ভারতবাসীকে কি না নাকাল তখন করেছে! আজও সেই মাকাল ফলের মোড়ক নিয়ে তাদের কোন কোন সঙ্গীসাথীরা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতে ব্যস্ত। এই ফলটির ফলিত ফসল সম্পর্কে আপনি আমি তখনকার ঘটনাবলীর পরিণতি সম্পর্কে কে না জানি! আরও অবগত হয়েছি এবং আপনারাও অবগত হয়েছেন এর জন্ম কবজ সম্পর্কে। আমরা এর ইতিহাস ঘাটতে গিয়ে দেখেছি দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যখন দেশবিভাজন হতে যাচ্ছে তখন কমিউনিস্টরা মুসলিম লীগ ও বৃটিশের লেজুড় বৃত্তি করেছিল। এই লেজুড় বৃত্তির জ্বলন্ত প্রমাণ বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা এস. এস. বাটলিওয়ালা। এস. এস. বাটলিওয়ালা বোম্বেতে এক প্রেস সম্মেলনে ২২.০২.৪৬ বলেছিলেন, কমিউনিস্টরা হচ্ছে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক এবং তাই তার পক্ষে পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। তিনি ১৯৪৩ সালে পার্টি ত্যাগ করেন। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের নিকৃষ্টতম শত্রু হিসাবেও কমিউনিস্টদের চিহ্নিত করেছিলেন। আজকের ভারতের ও বাংলার কোন কোন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতার কন্ঠে শোনা যায় যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস নাকি সঠিক ভাবে রচিত হয়নি। অথচ স্বাধীনতা আন্দোলনে যাদের ঐ ভূমিকা ছিল তাদের এমন দাবি। ভুল ইতিহাস অবশ্যই সংশোধনীয় তাতে কারো দ্বিমত হবার কথা নয়। কিন্তু সংশোধনের কথা কি তারা উঠাতে পারে যারা আজও জাতীয় পতাকাকে অস্পৃশ্য বলে মনে করে? তাদের আরও দাবি তারাই নাকি স্বাধীনতা আন্দোলন করেছেন! যদি তাই সত্য হয়, তবে আসুন এদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কিছ কিছু নমুনা সমীক্ষা

করে দেখা যাক। তাদের আন্দোলনের স্বপক্ষে এবং বৃটিশকে তাড়ানোর জন্য তারা কতদূর অগ্রগামী ছিল। এ-ব্যাপারে তাদেরই রচিত নমুনা স্বরূপ একটি গণসঙ্গীত আসুন আমরা শুনি।

"কমরেড ধরো হাতিয়ার—ধরো হাতিয়ার
স্বাধীনতা সংগ্রামে নহি আজ একলা
বিপ্লবী সোভিয়েত, দুর্জয় মহাচীন
সাথে আছে ইংরেজ নির্ভীক মার্কিন।"

উল্লেখ্য, এখানে মনে রাখতে হবে দুর্জয় মহাচীন বলতে চিয়াং কাইশেক অর্থাৎ মার্কিন দোসর বুর্জুয়া চীনের কথা বলা হচ্ছে। কারণ তখনও মাও-সে-তুং এর লাল চীন-এর উত্থান ঘটেনি। যে বিখ্যাত ভারতীয় কমরেডরা এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের বিকৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন তাদের মহাকীর্তি গাঁথার এই হচ্ছে নমুনা। যা বলে শেষ করার নয়। তবু একটু আধটু আজকের প্রজন্ম আমরা যারা, তারা জ্ঞাত হলে লাভ বই ক্ষতি নেই। আসুন ঐসব তথ্যের কিছু মূল্যবান বিবরণ শুনি। তাদের বিরচিত ইতিহাসই বলছে যে, **"ভারতবর্ষের একমাত্র দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বৃটিশ সরকারের সবচেয়ে সঙ্কটের মুহূর্তে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং সরকারকে সবপ্রকার সাহায্য করেছে। সরকার যেন কখনও একথা ভুলে না যান। যুদ্ধের সময় কমিউনিস্টরাই সরকারের সকল প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করে পঞ্চম বাহিনীদের প্রতিহত করেছে। People's war এ দাবী করা হয়েছিল, আমাদের দীর্ঘদিনের নীতি ও শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বের জন্যই দেশের কলকারখানাকে আমরা fifth column-এর আঘাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছি।"**

(ওরা শুধু ভুল করে—শান্তনু সিংহ, পৃষ্ঠা—৪৯)

ঐসব ভারতখ্যাত কমরেডরা যা ইতিপূর্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে দাবী করেছিল তাদের হচ্ছে এইসব কর্ম কীর্তির বৃত্তান্ত। তাতেই তারা কত বড় মহান দেশপ্রেমিক তাই বারবার প্রমাণিত করেছেন তারা নিজেরাই। তথাপি এখানে কমিউনিস্ট কর্তাদের মহান নেতা কমরেড পি. সি. যোশীর একটি পত্রের বয়ানে যা পাচ্ছি তাতে দেখা যাচ্ছে তাদের ঐ কর্মকাণ্ড ছিল এক কথায় নজিরবিহীন ঘটনা।

১৯৪২ সালের মহান জাতীয় আন্দোলনের প্রাক্কালে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষাধিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দ সকলে কারারুদ্ধ তখন বৃটিশরাজ আদেশ জারি করল এখন যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দিয়ে কোন স্বাধীনতা দাবী করা চলবে না। এরই প্রতিধ্বনি করে কমিউনিস্টরা বলতে লাগল যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দিয়ে এসময়ে বৃটিশকে বিড়ম্বনায় ফেলা অত্যন্ত অন্যায় কাজ হবে। ১৯৪২ সালে ২৫শে জানুয়ারী থেকে ১১ই মার্চ এই সময়ে বিভিন্ন জেলে আটক যেসব কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ বৃটিশ সরকারের কাছে মুচলেকা দিয়েছিলেন তারা হচ্ছেন—

সুনীল মুখার্জী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন (হাজারীবাগ জেল)

এ. কে. ঘোষ, আর. ডি. ভরদ্বাজ (বেরিলী সেন্ট্রাল জেল)
সাজ্জাদ জাহির (লক্ষ্ণৌ সেন্ট্রাল জেল)
এস. এ. ডাঙ্গে, এম. জি. পাটকর, বি. টি. রণদিভে (যারবেদা সেন্ট্রাল জেল) প্রভৃতি।

এখানেই শেষ নয়। ১৯৪২ সালের ২৩শে এপ্রিল ইংরেজ সরকারের নিকট এক আবেদনে জানানো হলো কমিউনিস্টদের উপর সকল বাধানিষেধ উঠিয়ে নেবার জন্য। তাদের এইরূপ নির্লজ্জ ঘটনার ভুরিভুরি উদাহরণ দেওয়া যায়। যাই হোক আসুন তাদের confidential আবেদনটা কি ছিল, তা একটু দেখা যাক।

CONFIDENTIAL
(Not for publication)

MEMORANDUM ON COMMUNIST POLICY AND PLAN OF WORK

.....We give below our demands on the government deamands which we think enable us to do all we can to help to resist the Japs to intensify the war efforts and win the support of our people for our policy and practice.

(1) Unconditional release of all communist prisoners and detenues.
(2) Removal of restrictions on all communists who have been intemed, externed or otherwise restricted.
(3) Withdrawal of warrants against all underground communists.
(4) Withdrawal of bans on the national fronts. The new age and all organs of communists.
(5) Immediate grant of press declarations for newspapers, journals and periodicals.

এই স্মারকপত্রে আরও বলা হলো আমরা সরকারকে যুদ্ধ বাধানোর জন্য কোন দোষারোপ করছি না বরং যুদ্ধ সংক্রান্ত বিচ্যুতি দূর করে তা আরও কঠোর ও কার্যকারীভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে সরকারকে দাবী জানাচ্ছি। বলাবাহুল্য এই আবেদনে সাড়া দিয়ে বৃটিশ সরকার জেনারেল সেক্রেটারী পি. সি. যোশীকে মুক্ত করে দিলেন যাতে সরকারের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হয়। এবং সরকারের সাথে কোনপ্রকার ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না ঘটে। ফলশ্রুতি ১২ই মে ১৯৪২ সালে মি: যোশী গোয়েন্দা দপ্তরের জি. আমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তারা আরও কত সক্রিয়ভাবে সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে সেই আলোচনা সম্পূর্ণ করেন। তারা সরকারকে দৃঢ়তার সঙ্গে জানালো তাদের পরিচয় কথায় নয় কাজেই যেন বিচার করা হয়। তাদের সকল কর্মপ্রচেষ্টাই হবে সরকারের পক্ষে। ১৯৪২ সালে ২২শে মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স যুদ্ধপ্রস্তাবের পক্ষে উকালতি

করতে লণ্ডন থেকে দিল্লীতে আসেন। যদিও জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে যারা ছিলেন তারা সকলে স্যার স্ট্যাফোর্ডকে প্রত্যাখ্যান করেছিল কিন্তু **কমিউনিস্টরা তার সঙ্গে শুধু সহযোগিতাই নয় বরং তারা বৃটিশ সরকারের কাছে প্রস্তাব রেখেছিল একটি B-category-র সৈন্যদল গড়ে কমিউনিস্টদের হাতে তার দায়িত্ব দিতে, যাতে এই সৈন্যদের নিয়ে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সাথে বৃটিশের secondary force হয়ে পঞ্চম বাহিনী তথা গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করতে পারে।**

ডঃ এ. কে. মজুমদারের লেখা থেকে পাওয়া যাচ্ছে এ-ব্যাপারে ইংরেজ সরকার একটি পরিকল্পনা বা schemeও চালু করেছিল। স্বভাবতই বন্ধুত্বের উপঢৌকন স্বরূপ বৃটিশ সরকার কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে যাবতীয় বাধা নিষেধ বিলোপ করে তাদের অবাধ বিচরণের সকল ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এই হচ্ছে আজকের কমিউনিস্টদের সত্যকারের স্বরূপ এবং আত্মপরিচয়। এবার আপনারাই বলুন এই কমিউনিস্টরা কি সত্যই ভারতবাসী বা ভারতবর্ষীয় বলে দাবী করার এক আনারও অধিকারী, না বৃটিশের মন্ত্রসিদ্ধ নেটিভ?

বিশেষভাবে স্মরণীয় কমিউনিস্টরা যখন এইভাবে বৃটিশের নিকট থেকে জাতীয়তা বিরোধী পঞ্চম বাহিনীর মৌরসীপাট্টা পেলো অর্থাৎ তাদের দ্বারা জাতীয় আন্দোলনের বুকে-পিঠে ছুরি মারার সুবন্দোবস্ত হলো বৃটিশের দরাজ সৌজন্যে তখনই ভারতবর্ষের অন্যান্য যাবতীয় রাজনৈতিক পার্টি বা আধা রাজনৈতিক পার্টি, ক্লাব ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলো অর্থাৎ বেআইনী বলে ঘোষিত হলো। এবং বৃটিশরা দরাজ হাতে এই কমিউনিস্টদের যতপ্রকার এবং যতভাবে দেশবৈরিতার সাহায্য প্রয়োজন, তা দিতে শুরু করল। **কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র পিপ্‌লস ওয়ার (People's war)-এর ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ সালের সংখ্যায় প্রচার প্রোপাগাণ্ডা চলল, 'ভারত ছাড়' আন্দোলন দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে স্বাধীনতা পাবার তো প্রশ্নই নেই বরং আক্রমণকারী বহিশত্রুর পথই সুগম হবে এবং তা হচ্ছেও। ভুলে যাবেন না এই বহিশত্রু হচ্ছেন ভারতের জাতীয় বীর এবং শ্রেষ্ঠতম সন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। শুধু তাই নয় "সুভাষচন্দ্র যখন বার্মাফ্রন্টে বৃটিশকে পর্য্যুদস্ত করার জন্য ব্যস্ত তখন এই কমিউনিস্টরা প্রচারে ব্যস্ত সুভাষচন্দ্র বার্মার পতিতালয়ে দিন কাটাচ্ছে।"** পিপ্‌লস ওয়ারে তখন টি. ভি. রণদিভে লিখেছেন, **"সুভাষ বোসের আবেদন যে ভারতবাসীর কাছে পৌঁচেছে তাতে সন্দেহ নেই। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনসাধারণ তাঁকে সেই উত্তর দেবে, যা একজন বিশ্বাসঘাতকের প্রাপ্য। বোসের মুক্তিফৌজ নামধারী তস্কর বাহিনী দস্যুবৃত্তি ও লুন্ঠনের অভিপ্রায়ে যদি ভারতের মাটিতে পা রাখার সাহস দেখায়, তবে সেই ঘৃণ্য কাজের যোগ্য জবাব তারা কমিউনিস্টদের কাছ থেকে অবশ্যই উপযুক্তভাবেই পাবে।"**.....এখানেই শেষ নয়, আরও আছে শুনুন।

১৯৪৩ সালের ১৮ই জুলাই পিপ্‌লস ওয়ারে পার্টির কমরেড গঙ্গাধর অধিকারী

লেখেন, "হিটলার সুভাষ বোসকে তোজোর কাছে পাঠিয়েছেন। তোজো এই তথাকথিত দেশগৌরবকে ভারতীয় সেনাদলের পঞ্চম বাহিনীর সেনাপতির পদ প্রদান করেন। আকাশ থেকে পড়া এই বিশ্বাসঘাতকের দল (আজাদ হিন্দ ফৌজ) ভারতীয় সামরিক পোষাক পরলেও এরা স্বাধীনতার অগ্রদূত নয় এবং ক্রীতদাসের পত্তনীদার মাত্র।"

তারপরের পদক্ষেপে ১৯৪২ সালের ২রা আগস্ট "গান্ধী দুর্গে কমিউনিস্ট ঝড়"—এই শিরোনামে পিপলস ওয়ার পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, "গান্ধীর পথ দেশকে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের কাছে উন্মুক্ত করবে। রাশিয়া ও চীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পথই হল দেশকে রক্ষার সঠিক পথ।"

(ওরা শুধু ভুল করে—শান্তনু সিংহ, পৃষ্ঠা—৩৬-৩৭)

এই কমিউনিস্টদের লক্ষ্য শুধু সুভাষ বোস ছিলেন না। তাদের লক্ষ্য ছিল গান্ধী, সুভাষ ও জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী নেতা ও তাদের সহযোগী দল। লক্ষ্য করুন একটি বিষয় আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোন কমিউনিস্টই জওহরলাল ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গকে তিলমাত্র আক্রমণও হানেনি। কারণটা আশা করি ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তিনি তো একাধারে কমিউনিস্ট আছেনই এবং অন্যধারে বৃটিশ আশ্রিত। পরবর্তীকালে তাই আমরা দেখতে পাই এই জওহরলালেরই আদরের দুলাল হচ্ছে কমিউনিস্টরা যা আজকের প্রজন্মের ভালো করেই জানা। সকলেই জানেন তিনি শুধু ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের লালন পালনই করেননি, তাঁর মন্ত্রীসভা ছিল মিশ্র মন্ত্রীসভা। খ্যাতনামা ছদ্মবেশী কমিউনিস্টরা ছিল তাঁর মন্ত্রীসভায়, যাদের অনেকের উপরই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায় ছিল। আপাতদৃষ্টিতে জওহরলালের অঙ্গের ভূষণটি ছিল অবশ্যই জাতীয়তাবাদীর আলখাল্লা তাতে সন্দেহ নেই। জাতীয়তাবাদী আলখাল্লা না পরলে তিনি দিল্লীর অধিশ্বর হতে পারতেন না। কারণ ভারতবাসী আর যাই হোক কোন অবস্থাতেই নাস্তিকতায় বিশ্বাসী নয়। কাজেই এদেশের জমিতে জমিনদারী ফলাতে হলে প্রজাকুলকে তো খুশী রাখা একান্ত প্রয়োজন। এখানে রাজত্ব করার এটাই প্রথম ও শেষ শর্ত। তারপর যা খুশী করুন। কাজেই কমিউনিস্টরা যে দরিদ্রের দোহাই পাড়ে তা একটি ডাহা মিথ্যা তথা ধাপ্পা। জওহরলালই শুধু নয়। দেখুন না আজকের ভারতের কমিউনিস্টদের যিনি বা যারা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তাদের কালোবাজারীদের সাথে কেমন দহরম মহরম। আসুন আবার আমরা আমাদের আদিকাণ্ডে ফিরে যাই।

আমাদের আদিকাণ্ডের বিষয় ছিল তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট কীর্তনের দোহারা পর্ব। আমরা তাই শুনছিলাম আসুন আবার সেই কীর্তনের আসরেই। দেখা যাক সেখানে আর কি কি পালা চলছে। হ্যাঁ, কমিউনিস্টরা শুধু গান্ধী-সুভাষের ব্যঙ্গচিত্রেই ক্ষান্ত ছিল না। পার্টির অপর এক পত্রিকা unmasked parties and politics-এ ১৯৪০ সালে একটি ব্যঙ্গচিত্রে দেখানো হয়েছিল—জয়প্রকাশ নারায়ণ লাফিয়ে লাফিয়ে ক্যাঙ্গারুর থলের মধ্যে প্রবেশ করছেন। বলাবাহুল্য ক্যাঙ্গারুটি হচ্ছেন গান্ধীজী। এই

কমিউনিস্টরাই দেখা গেল পরবর্তীকালে বাঁচার তাগিদে বা স্বার্থের তাগিদে নিজেরাই সদলবলে জয়প্রকাশ নারায়ণের থলিতে লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে পড়ছে অর্থাৎ আশ্রয় ভিক্ষা করছে। এ-ঘটনা কে না জানেন, যা ঘটেছিল ১৯৭৭ সালে ভারতে।

আবার ১৯২১ সালে পিপলস ওয়ারে লেখা হয়েছিল, "ঐসব শকুনের দল কংগ্রেসের খেয়ে কংগ্রেসেরই নামে সমস্ত অকংগ্রেসী সুলভ নোংরা কাজ করছে।"

(ওরা শুধু ভুল করে—শান্তনু সিংহ, পৃষ্ঠা—৩৮)

আসুন তাদের এই উক্তির অনুশীলনে কি আমরা সত্যাসত্য পাই একটু খতিয়ে দেখি। তাদের এ কথায় এটাই আরও পরিস্কার হয়ে গেল যে জাতীয় কংগ্রেসীরা হচ্ছে কমিউনিস্টদেরই সহোদর ভাই তথা বৃটিশ ক্রীড়নক। তার জন্যই তারা কংগ্রেসের হয়ে অন্যের দোষ ধরতে পারঙ্গম। এখানে শকুনি বলতে গান্ধী, জয়প্রকাশ ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদেরই বোঝাতে চাইছে। এখানে এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে জওহরলাল কর্তৃক পরিচালিত কংগ্রেসীরা আসলে কংগ্রেসী আলখাল্লার নীচে অবস্থান করছে কমিউনিস্টদেরই একটি প্রশাখা তথা তাদেরই একটি প্রজাতি। এই আসল সত্য আজ আর ঢাকা দিয়ে রাখা যাচ্ছেনা বলেই তারা আজ প্রকাশ্যে একে অপরের দোসর। তবু তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার কসুর করছে না। এই পদে পদে ধাপ্পা আর ভাঁওতা বাজিই কি কমিউনিজম বন্ধু? ঐসব তথ্য অবগত হয়ে আজকের প্রজন্মের কমিউনিস্ট বন্ধুরা কি বলছেন? আর কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী বন্ধুরাই বা কি বলছেন?

এভাবেই যারা সেদিন থেকে আজও এক অভাবনীয় ভূমিকা পালন করেছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে সে আন্দোলনের বুকেপিঠে ছুরিকাঘাত করেছে, তাদের বড় বড় নেতারা আজকাল প্রায়ই দাবী করেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে রচিত হয়নি। তারা কি বলতে চান তা আর একটু পরিষ্কার করে বললে মনে হয় ঠিক বলা হবে। নাকি তারা বলতে চাইছেন তাদের এইসব বৃত্তান্ত সঠিকভাবে ইতিহাসে নেই—সেটাই সঠিকভাবে রচিত হোক। বলুন বন্ধু এরপরও কি কিছু বলার থাকে? এই কমিউনিস্টদের কর্মকাণ্ড লিখতে গেলে রামায়ণ-মহাভারত, কি ইলিয়ড অডেসি নামের মহাকাব্যগুলো এই অভিধাটি অনায়াসে খোয়াবে অর্থাৎ হারাবে তাতে আমাদের সন্দেহ থাকলেও কমিউনিস্ট বন্ধুদের এতটুকু সন্দেহ থাকার কথা নয়। এমন যে একটা পর্যায়ে তারা অবস্থান করছে, তারাই চিৎকার চেঁচামেচি করছে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে রচিত হয়নি।

এভাবে লিখতে গেলে যার শেষ নেই, তাদেরই সৃষ্ট ইতিহাস থেকে আরও দুই একটি তথ্য আসুন উদ্ধার করা যাক। তাতে ঐসব হম্বিতম্বি ওয়ালাদের স্বরূপটা আরও পরিষ্কার হবে। তাতে নবীন প্রজন্ম ও অনাগত প্রজন্মেরই মঙ্গল সাধন হবে। তাছাড়া দেশের দেশব্রতীদের ইতিহাস জানা তো একান্ত কাম্য।

১৯৪৩ সালের ১৫ই মার্চ মিঃ পি. সি. যোশী তাদের পার্টির কর্মকাণ্ডের একটি রিপোর্ট তৈরী করে বৃটিশ সরকারকে প্রদান করেছিলেন। সেই রিপোর্টটি ছিল ১২০

পাতার এক ঐতিহাসিক দলিল। এইসব তথ্য প্রখ্যাত সাংবাদিক অরুণ শৌরী ১৯৮৪ সালে মার্চ-এপ্রিলে চারটি সংখ্যায় প্রকাশ করে নতুন ভারতীয় প্রজন্মের কাছে নমস্য হয়েছেন। এসব প্রকাশিত হয় মার্চ-এপ্রিলের Illustrated Weekly পত্রিকায়।

তৎকালীন Additional Home Secretary Mr. Maxwayal-কে লেখা যে পত্র তা অবহিত হলে আপনারা আরও হতবাক হবেন। আসুন সেই পত্রখানিতে ঐ মহামান্য স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে কমরেড পি. সি. যোশীসাব কি বলছেন তা দেখা যাক। লক্ষ্য করুন এখানে ঐ পত্রের xerox কপির হুবহু সংযোজন করে দেওয়া হল।

CENTRAL HEADQUARTERS

Communist Party Of India

(Section of The Communist International)

190 B Khetwadi Mala Road,
Bombay 4. March 15. 1943

Ref No.

<u>Personal</u>

Dear Sir Reginald,

In another cover I am sending you a Memo on behalf of the Party Centre with enclosures. on the situation in the Provinces. I am afraid we are not yet quite used to writing documents for the Government but you will see that we talk straight and are frank.

If any of our statements are involved or need further clarification you have only to send me a note and I will try my best to make our attitude as clear as in humanly possible.

If you think any useful purpose will be served by my visiting you and explaining things, I will be quite willing to do so. I was told by Mr Maokensie that our attitude about the Congress arouses suspicion in our bonafides. If it is so I could explain it in a Memo.

The situation in the Provinces is deteriorating very fast. I hope you will be able to intervene successfully and help us to do our bit against the Fifth Column and in saving the country.

I am going to Malabar on the 16th, and will be back on the 29th inst.

With good wishes,

Yours sincerely.

P.C. Joshi.

রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলকে লেখা পি. সি. যোশীর চিঠির ফটোকপি অর্থাৎ,

ব্যক্তিগত

বোম্বে—
১৫ই মার্চ ১৯৪৩

প্রিয় স্যার রেজিনাল্ড,

অপর একটি খামের মধ্যে আমাদের পার্টি সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাকে একটা স্মারক লিপি এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিবরণ পাঠাচ্ছি। আমার আশঙ্কা, সরকারের জন্য নথিপত্র প্রস্তুত করতে হয়ত আমরা এখনও যথেষ্ট অভ্যস্ত হইনি। কিন্তু দেখতে পাবেন যে আমরা খোলামেলা এবং সোজাসুজি কথা বলি।

যদি আমদের কোন বিবৃতির আরও স্পষ্টীকরণ দরকার হয়, তাহলে আপনি শুধুমাত্র একটা ছোট্ট চিরকূট আমাকে পাঠালেই আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যথাসাধ্য পরিষ্কার করে বোঝাতে।

যদি আপনি মনে করেন যে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করলে এবং বিষয়গুলো বুঝিয়ে বললে বিন্দুমাত্রও লাভ হবে, তবে আমি তা করতে খুবই আগ্রহি। মিঃ ম্যাকেঞ্জি আমাকে বলেছিলেন যে কংগ্রেসের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করে। যদি একথা সত্য হয় তাহলে আর একটি পত্রে আমি তা ব্যাখ্যা করতে পারি।

বিভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হচ্ছে। আমি আশা করি এ ব্যাপারে আপনি যথাযথ হস্তক্ষেপ করে পঞ্চম বাহিনীর বিরুদ্ধে ও দেশরক্ষায় আমাদের করণীয় কাজটুকু যাতে আমরা করতে পারি, তার জন্য আমাদের সাহায্য করবেন।

আমি আগামী ১৬ই তারিখ মালাবার যাচ্ছি এবং ২৯শে তারিখই ফিরে আসবো।

শুভেচ্ছাসহ আপনার বিশ্বস্ত—

Sd/—পি. সি. যোশী

উপরের পত্রেই পরিষ্কার কমিউনিস্টদের দেশবৈরিতার সুতীক্ষ্ণবাণ কত গভীরে গিয়ে লক্ষ্যভেদ করেছিল এবং দেশদ্রোহিতার নমুনা কী ও কতখানি হতে পারে। এই সাথেই ১২০ পৃষ্ঠার রিপোর্টটিতে সবিস্তার সবকিছু বর্ণিত ছিল। এবং এও পরিষ্কার কীভাবে তারা স্বদেশীদের ক্ষতিসাধন করে যুদ্ধরত ইংরেজকে গোপনে সাহায্য করেছিল। তারই কিছু কিছু খতিয়ান এখানে নীচে উপস্থাপিত করা হলো, আগামী ও বর্তমান প্রজন্মের জ্ঞাতার্থে।

উপরের চিঠির বয়ানেই যথেষ্ট প্রমাণিত হয় তথাকথিত কমিউনিস্টরা বিজাতি চাটুকারিতায় কতখানি সুদক্ষ ও পারদর্শী। তারাই কিনা কথায় কথায় জনগণের মুক্তির দোহাই পাড়ে। এর থেকে হাস্যকর আর কি হতে পারে? আজকের পৃথিবীর কমিউনিস্ট দুনিয়াও একই সত্যের প্রমাণ দিচ্ছে নাকি। তারা যা করে ও বলে তাতো গোষ্ঠীস্বার্থ বা ব্যক্তিস্বার্থ বই সমষ্টি-কল্যাণের প্রশ্নই আসে না।

১। ৯ই আগস্ট ১৯৪২-এর পর কংগ্রেসের সমস্ত নেতারাই জেলবন্দী হবার পর জাতীয় আন্দোলনের লাগামটা চলে যায় কংগ্রেসের সোসালিস্ট গোষ্ঠী এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের হাতে। কিন্তু সেই আন্দোলনকে কমিউনিস্টরা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করেছিল বলে ঐ রিপোর্টে দাবী করা হয়েছে।

২। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে আমরা কমিউনিস্টরা দেশবাসীকে বুঝিয়েছি যে এ সময় বৃটিশ সরকারের বিরোধী কার্যকলাপে শুধু ফ্যাসিস্ট (আজাদ-হিন্দ বাহিনী ও সুভাষ বোস এবং দেশের ভিতর গান্ধী, জয়প্রকাশ প্রভৃতি সুভাষপন্থীদেরই সাহায্য করবে। এভাবেই আমরা নেতাদের কাছে থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করতে বৃটিশকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছি। এই জন্য আমাদের কমরেডরা অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র এবং আমরা কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দও তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই কাজ শুধু বৃটিশ পুলিশের পক্ষে সম্ভব হতো না। আমাদের কমরেডদের নিপুণ দক্ষতা না থাকলে এমন কাজ সম্ভব হতো না।

৩। এমন কি ইংরেজ বশংবদ ইংলিশম্যান, স্টেটস্‌ম্যান এবং টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া যা করতে পারেনি, আমরা তাই করতে পেরেছি। ভারতীয় বুর্জয়াদের বিজ্ঞাপন হারানোর ভয়ে তারা পঞ্চম বাহিনীর বিরুদ্ধে একটানা প্রচার করতে পারেনি। কিন্তু আমরা পেরেছি। কারণ আমরা বিজ্ঞাপনের ধার ধারিনি।

৪। বৃটিশের তৈরী কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেসীরা গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারত, এমন কি তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করারও অপেক্ষায় প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আমরা অসাধারণ দক্ষতা ও কর্মতৎপরতায় তা লণ্ডভণ্ড করতে পেরেছি। আমাদের (কমিউনিস্টদের) এইসব কর্মকাণ্ডের সাক্ষী স্বয়ং বোম্বের পুলিশ কমিশনার নিজে।

৫। আমাদের অনুসৃত নীতি ও কর্মপদ্ধতি যে কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল তার প্রমাণ সোসালিস্ট ও ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রচারিত গোপন বুলেটিনগুলো। তারা সেইসব বুলেটিন বা গোপন সার্কুলারে স্বীকার করেছে যে, "The struggle failed because of Communist treachery....."

(ওরা শুধু ভুল করে—শান্তনু সিংহ)

এই হচ্ছে বন্ধু কমিউনিস্টদের দেশপ্রেমের নমুনা। আর আজও দেশে কোথায় কতদূর কি হচ্ছে সবই আপনার আমার জানা। তারপরও এইসব নির্লজ্জ বিবেক বর্জিত কমিউনিস্টরা বলছে দেশের ইতিহাস সঠিকভাবে রচিত হয়নি। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে আমরা দেখেছিলাম মাত্র একটি মিরজাফরকে। আর আজ শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতেই ওরা রক্তবীজের দল হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে তাদের মুখেই আজ শুনতে হচ্ছে ইতিহাস সংস্কারের কথা। ভাগ্য আর কাকে বলে! বলাবাহুল্য এখানেই শেষ হলে তবু ছিল ভাল। এদের কাণ্ডকারখানা অতি সংক্ষেপে বলতে গেলেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যেকোন লোকের।

ইতিহাসের গর্ভগৃহে অর্থাৎ মহাফেজখানায় প্রবেশ করলে দেখা যাবে এদের লীলার অন্ত নেই। তেমনি আরও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা তাদের যা লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটেছিল, তা না বললেই নয়। যথা, **১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর নেতাজী বৃটিশ-আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন আনুষ্ঠানিকভাবে। বৃটিশ এই যুদ্ধকে সামাল দেবার জন্য এক জঘন্য ফন্দি আটলেন। তারা স্থির করল যে, "যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্রন্টলাইনে যুদ্ধের সময় কোন গোরাসৈন্য রাখা হবে না। সেখানে মজুদ করতে হবে বাঙ্গালী যুবকদের। তাতে এক ঢিলে দুই পাখি বধ হবে।**

অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে যা প্রচার প্রোপাগাণ্ডা থাকবার সেটা তো রুটিন কর্মসূচী থাকবেই এবং চলবেই। পরন্তু বাঙ্গালী সেনারা যদি ফ্রন্টলাইনে থেকে কাতারে কাতারে জাপানিদের কাছে বা I.N.A.-র কাছে মরতে থাকে তবে গোটা বাঙ্গালী জাতিটাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। ফলে সুভাষ বৈরিতায় গোটা বাঙ্গালী জাতিটাকেই ক্ষেপিয়ে তোলা যাবে। আর তার ফল হবে সুদূর প্রসারী। এই কাজে যদি তারা সাফল্যলাভ করতে সক্ষম হয় তবে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষকে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা সহজসাধ্য হবে। এই ছিল বৃটিশ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার জন্য বৃটিশ প্রত্যেকটি বাঙ্গালী পরিবার থেকে এক বা একাধিক বাঙ্গালী যুবক সেনাবাহিনীর জন্য সংগ্রহ তথা নিয়োগের চেষ্টা করল। তাদের গোপন উদ্দেশ্য যেকোন ভাবেই হোক কার্যকরী করতে তারা ব্যর্থ হয়ে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট থেকে খাদ্যশস্য ধান বা চাল সংগ্রহ করল। এই খাদ্যশস্য ছিল পরিমাণে ২৫ লক্ষ টন।

এই চাল বা ধান্য সংগ্রহ করতে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টিকে তারা কাজে লাগাল। এবং সেই সঙ্গে মুসলিম লিগকে একই কাজে বৃটিশ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজে লাগল। এবং তাতে সাফল্য হল। "এই খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে তা তখনকার ডকশ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্যে ডায়মণ্ডহারবারের নিকট সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হলো। ডকশ্রমিকদের ছিল একাজে দরাজ সাহায্য। তার ফলে বাংলায় দেখা

দিল অভূতপূর্ব খাদ্যাভাব। তার পরিণতি ফল বাংলায় ঐ কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে সায়কুল্যে ৯০ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ দিল। একমাত্র কলিকাতা মহানগরীতেই ৯০ হাজারের অধিক মানুষ এই কৃত্রিম মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের বলি হলো। বলতে নেই অতিব লজ্জা, দুঃখ ও ক্ষোভের কথা এই বৃটিশের সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে তৎকালীন কমিউনিস্টদের হাত ছিল সীমাহীন যা কহতব্য নয়।" "ডকশ্রমিকদের সাহায্যে বৃটিশরা এই অমানবিক কাজ করেছিল। যা তৎকালীন সমগ্র ভারতবাসী তা প্রত্যক্ষ করেছিল। আর আজ যারা ইতিহাসের পাঠক ও ছাত্র তারা সকলেই এসব ঘটনার কথা জানেন। এই হচ্ছে বৃটিশজাত কমিউনিস্টদের ইতিহাস ও গোড়ার কথা। আর আজ তারাই দরাজ গলায় চেঁচাচ্ছে বিকৃত ইতিহাসের দোহাই দিয়ে। স্মরণীয় এই ডকশ্রমিকরা পরিচালিত ছিল অর্থাৎ শ্রমিক ইউনিয়ন পরিচালিত হতো C.P.I. দ্বারা।" (বক্তৃতামালা স্বামী আনন্দভারতী)

এই যুগান্তরকারী দুর্ভিক্ষের সময় "নেতাজী চেয়েছিলেন তাঁর আজাদ হিন্দ সরকারের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করতে, বাংলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য প্রদান করে। এই প্রস্তাব রেখেছিলেন তিনি ১৯৪৪ সালে। নেতাজীর শর্ত ছিল শুধু খাদ্যশস্য খালাস করে মালবাহি জাহাজগুলো ফেরৎ পাঠাতে হবে। বলাবাহুল্য বৃটিশ সরকার নেতাজীর এই সাহায্য গ্রহণ করেনি। অবশ্যই গ্রহণ করার প্রশ্নই অবান্তর। কারণ এই দুর্ভিক্ষ তো বৃটিশের হাতে গড়া বাংলার মুসলিম লিগও কমিউনিস্টদের সুচারু সহযোগিতায়। পরন্তু সুভাষ বোস ইংরেজের তো বটেই এবং এই ইংরেজের তল্পীবাহক কমিউনিস্টদেরও তো ঘোরতর শত্রু।" সেই শত্রুর সাহায্য নিয়ে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ নিরাময়ের প্রশ্নই বা আসে কোথা থেকে! (বি. ভি.-র বিপ্লবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

বৃটিশ চেয়েছিল সুভাষচন্দ্রের বঙ্গজাতিকে একটু শিক্ষা দিতে। কারণ শুধু সুভাষচন্দ্রই তো বৃটিশকে নাজেহাল করছে না। এই গোটা বাঙ্গালী জাতিটাই তাদের শাসনের গোড়া থেকেই হাজার উৎপাত করছে। নিশ্চিন্তে থাকতে দিচ্ছে কই তারা? অতএব এজাতিকে তিল তিল করে শেষ করতে না পারলে আমাদের বৃটিশদের স্বোয়াস্তি কোথায়? তাতে তারা ষোল আনায় দ্বিগুণ সাফল্য লাভ করেছিল। এই জাতির জাতীয় মিরজাফরের জন্য হয়ত ভারতে বৃটিশের রাজদণ্ড কায়েম, কিন্তু একথাও তো সত্য এ-জাতির আর এক মহানায়ক আমাদের নাকানি চোবানি খাওয়াচ্ছে, হয়ত সে কারণে বিদায়ও আসন্ন। কাজেই এদের সত্যানাশ না করলে বৃটিশের শান্তি বা সান্ত্বনা কোথায়? এই হচ্ছে লালমুখো বৃটিশ আর লাল অবগুণ্ঠনে ঢাকা শ্রমিক ও মেহনতী মানবদরদী গরিবের পিতা, মাতা তথা ত্রাতা কমিউনিস্টদের আদিঅন্তের রূপরশ্মি। তারাই আজ সুভাষচন্দ্রের নামে ২৩শে জানুয়ারী মানবশৃঙ্খল বেঁধে জাতিকে বিভ্রান্তি দ্বারা সুভাষপ্রেমে কতখানি ডগমগ তা প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর। অথচ কে. এল. পানিক্কর সম্পাদিত

টুওয়ার্ডস ফ্রিডম গ্রন্থে একজন কমিউনিস্ট ঐতিহাসিক বলেছেন "সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্বাসযোগ্য লোক ছিলেন না" (বর্তমান : ৮.১.২০০১) তবু লেনিন মাও ছেড়ে আজ সুভাষ নামের মানব শৃঙ্খল কেন?

লক্ষ্য করুন, এই কমিউনিস্টরাই একদিন গান্ধীজীর ৪২ সালের আন্দোলনকে বলেছে, দেশের সর্বনাশের আন্দোলন। **গান্ধীজীকে বলেছে ক্যাঙ্গারু। সুভাষচন্দ্রকে যে কী বলেনি সেটাই আজ গবেষণার বস্তু। আবার জয়প্রকাশ নারায়ণকে কটুক্তি করতে এতটুকু চিন্তা করেনি। সেই তারাই আজ গান্ধী হত্যার ইস্যু তুলে সেই বেদনায় প্রাণান্ত। আবার সুভাষ নামের মানবশৃঙ্খল বেঁধে সেই প্রেমে ডগমগ, আর জয়প্রকাশ নারায়ণের মূর্তি গড়ে লোকনায়ক উপাধিতে ভূষিত করে দরদে আটখানা।** আর এসব প্রায়শ্চিত্ত করে আত্মত্রাণে মরিয়া। তারাই কিনা নতুন প্রজন্মের কাছে সাজতে চাইছে সাচ্চা দেশদরদী আর কথায় কথায় ভারত ইতিহাসের সংস্কারক। আর এইসব হটকারীদের লাগি আমরা দেশবাসীরা দিনরাত্রি 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছি আজ দীর্ঘদিন যাবৎ। একেই বলে কপাল, তাই না?

আজকের প্রজন্মের কমরেড কি বলেন? কি, বিশ্বাস হচ্ছে না তো? কিন্তু ভাই চুরির দায়ে একবার ধরা পড়লে তার কি সহজে নিস্তার আছে? দেখছেন না মিরজাফর আর কুইসলিঙের অবস্থা। আজ শতশত বছর পরও অবস্থাটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। তবু যদি কমিউনিস্টরা তাদের ভুলভ্রান্তি অপরাধ স্বীকার করে জাতির কাছে অনুতপ্ত বলে স্বীকার করত, তবে জাতি নিশ্চয় তাদের ক্ষমা করতে দ্বিধা করত না। কথায় বলে না চোরের মায়ের বড় গলা। তদ্রুপ তাদেরও অবস্থান। চিরকাল এক এবং অপরিবর্তনীয়।

সম্প্রতি কালের কথাই ধরুন না। সম্প্রতি চীন-ভারত যুদ্ধের সময় ১৯৬২ সালে ভারতীয় কমিউনিস্টরা ভারতকে আক্রমণকারী বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তুতপক্ষে তখন ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল তা সকলেই জানেন। তখন ভারত পিছড়ে বর্গ রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম। সে তখন সম্পূর্ণ ক্রাচ্‌নির্ভরশীল এক দুর্বল রাষ্ট্র। সে কিনা যাবে চীনের মত এক শক্তির সাথে দ্বৈরথসমরে? আজ পর্যন্ত কমিউনিস্ট কার্যধারায় এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এই হচ্ছে কমিউনিস্টদের আজও দেশপ্রেমের নমুনা। এই ট্র্যাডিশন তো তাদের আজকের নয়। এই ট্র্যাডিশন তাদের কত পুরানো তা উপরের বর্ণিত চিত্র থেকেই পাচ্ছি। কাজেই দেখা যাচ্ছে এদের পরিবর্তনের কোন ন্যূনতম চিহ্নটুকু নেই। শাস্ত্রে বলে—

সর্প ক্রুর খলঃ ক্রূর সর্পাৎ ক্রূরতর খলঃ
মন্ত্রৌষধি বশঃ সর্প খলঃ কেননিবায়তে॥

(শুক্তি রত্নাবলী)

অথচ মাঝেমাঝেই চেঁচায় 'ভুল করেছি, ভুল করেছি' বলে। এই চেঁচানোর পেছনে তাঁদের কি দুরভিসন্ধি কাজ করছে তা একটু দেখা যাক। ভুল হয়েছে ভুল হয়েছে বলে তাঁরা যা বলেন, তা কি সত্য? তাঁদের কী ভুল হয়েছিল এবং কি ভুলই বা সংশোধন করেছেন বলে এমন দাবী বা চিৎকার?

আসুন এ সম্পর্কে একটু অনুশীলন করে দেখা যাক। সাম্প্রতিক কালে কয়েক বছর পূর্বে, আমাদের পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মহাশয় এক জনাকীর্ণ সভায় বলেছিলেন যে— নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে না কি তাঁদের মূল্যায়ন ভুল হয়েছিল। এ সম্পর্কে বঙ্গবাসী মাত্রেই ওয়াকিবহাল। তবু এ ব্যাপারে একটু বিচার বিশ্লেষণের বোধ হয় অবকাশ আছে। এখন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে শাসক গোষ্ঠী সি.পি.এম.-এর ছোট বড় সবাই ঐ প্রসঙ্গটির মুখোমুখি হলেই বলেন, আমরা তো এ ব্যাপারে ভুল স্বীকার করেছি, তবে কেন এসব নিয়ে আর বিতর্ক?

পাঠকবৃন্দের প্রতি বিশেষ অনুরোধ— আসুন তাঁদের ভুল স্বীকারের গতিপ্রকৃতিটা একটু বুঝতে চেষ্টা করি, তবেই আসল রহস্যটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে যে তাঁদের ভুল হয়েছে, সে ভুল স্বীকার করেছেন কে? —না, জ্যোতি বসু। জ্যোতি বসু কে? — না তিনি হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া তিনি তো মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লেবেল আঁটা অবশ্যই একজন নামী দামী ব্যক্তিত্ব। যে জনগোষ্ঠীর উপর তাঁর প্রভাব আছে — তাঁরা অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং কেরলের কিছু বাম সমর্থক জনগণ। তিনি তাদের এক অবিসংবাদী নেতা এতে কোন সন্দেহ নেই। এসবকেই পুঁজি করে তাঁরা বলেন এবং কিছু কিছু সংবাদপত্র দাবী করে — জ্যোতি বসু ভারতের এক অনন্য নেতা। যাক্ ঐ বিতর্কে না গিয়ে ঐ ভুলের ব্যাপারটাই আসুন পর্যালোচনা করা যাক।

নেতাজীর প্রতি যে এক সময়ে কমিউনিস্টরা মাত্রাহীন অপপ্রচার করে ভুল করেছিল সেই ভুলটা কেন তাঁরা কমরেড জ্যোতি বসুকে দিয়ে স্বীকৃতি দিতে গেল বা তাঁকে দিয়ে বলানো হলো? কেন তাঁদের পলিটব্যুরোর সর্বভারতীয় সচিবকে দিয়ে তা করানো হলো না? সেটার পেছনে যুক্তি কি? তার পেছনে যুক্তি তো একটাই তা হলো তাঁরা অর্থাৎ সি.পি.এম. সরকারীভাবে তাদের সুভাষবৈরিতা থেকে এক চুলও বিচ্যুত নয়। ভুলই যদি মানতে হয়, তবে সেটাই হলো পন্থা। নতুবা জ্যোতি বসুর ঘোষণার মূল্য যে কানাকড়িও নেই— তা যে কোন কমরেডই জানেন এবং বোঝেন। এই স্বীকৃতি অবশ্যই তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। তারও যথার্থ কারণ আছে। তা হলো— যেহেতু তিনি সি.পি.এম. বা বামপন্থীদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখেন তাই তাঁকে দিয়ে এমন কথা বলানো হলো। ঐ কথা বলানোতে ভোটের বাজার জমবে ভালো। ফলে ভোট ক্যাচিং সহজসাধ্য হবে বা হয়েছেও। এদেশে বসে রাজনীতি করতে হলে ভারতীয় মনীষীদের উপেক্ষা করে বেশিদিন গদীতে আসীন থাকা যাবে না। একথাটা, কমিউনিস্টরা

প্রথম প্রথম মূল্য না দিলেও এখন তাঁদের এ ছাড়া গতি নেই। এখন তাঁরা ভালোই দেখতে পাচ্ছে যে, তাঁদের আন্তর্জাতিকখ্যাত নেতাদের নামে এদেশের মানুষ তোয়াক্কাই করছে না। তাই দেশীয় নেতাদের ধরে টানাটানি। আর রাজনীতির ময়দানে তো নেতাজী সুভাষ ভারতবর্ষের জমিতে অদ্বিতীয়। কাজেই তাঁর সম্পর্কে উল্টাপাল্টা বক্তব্যের সংশোধন করা একান্ত দরকার। জ্যোতি বসুর মাধ্যমে বলানোর কারণ তিনি বললে জনগণ তার গুরুত্ব দেবে। দিয়েছেও। জ্যোতি বসুর মত একচ্ছত্র নেতা তো বামপন্থীদের মধ্যে আর কেউ নেই, তা তো যথার্থ। এ ছাড়া কিছু নিরপেক্ষ সাধারণ লোকও একদিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। কাজেই সাধারণ সরল প্রকৃতির লোকেদের বশীভূত করার জন্য জ্যোতি বসু ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। এক ঢিলে দুই পাখি বধ। অর্থাৎ রাজনীতিও করা হলো, জনগণকেও বশীভূত করা গেল। এক কথায় মতলব হাসিল। স্মরণীয় যদি তারা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইতো তবে তাদের সরকারী ঘোষণা বা **official declaration** করতে হতো। তা করতে হলে তাঁদের পলিটব্যুরোর সচিবকে দিয়ে করাতে হতো। এবং তা করতে হলেও তাঁদের পলিটব্যুরোতে আলোচনা বা ভোটাভুটিতে প্রস্তাব পাশ করাতে হতো অবশ্যই। তার চেয়ে সহজ পথ সরল বিশ্বাস প্রিয় জনগণকে জ্যোতি বসুকে দিয়ে ঘোষণা করলেই যথেষ্ট। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তাদের চিন্তায় ভুল ছিলনা অবশ্যই।

এটা যে কত বড় সত্য তা সাম্প্রতিককালে বাংলার কমরেডদের মুখেই শোনা গেছে। তাঁরা অনেকেই বলেছেন যাঁরা সুভাষবাবুকে নেতাজী বলেন তাঁরা নিম্নমানের কমরেড। কাজেই সরকারী, বেসরকারীভাবে স্বীকারের তাৎপর্য এখানেই। তাছাড়া স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করা যায় তিনি অর্থাৎ মাননীয় জ্যোতি বসু কেন কোন সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে তা ব্যক্ত করলেন না? অন্তত তাও যদি করতেন তাতেও কিছুটা আন্তরিকতার সাক্ষ্য আমরা পেতে পারতাম। কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত এক জনসভায় প্রসঙ্গক্রমে অর্থাৎ ক্যাজুয়ালি কেন ঐরূপ উক্তি করলেন? সেখানেও তো সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থেকেই যাচ্ছে! পরন্তু দিল্লীতে না বলে কলিকাতায় বলেছেন। সেখানেও জনগণের সন্দেহ উদ্রেক হবার অবকাশ রয়ে গেছে। এতেই পরিষ্কার তাঁর এই উক্তির মাঝে কোন সৎ ভাবনা আদৌ নেই।

এই প্রেক্ষিতে আমরা আর বিস্তৃত ঘটনায় পদচারণা না করে বরং জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধীজীর কিছু কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করবো এবার।

অপরদিকে গান্ধীজী ত্রিশের দশকে রাজনীতির ময়দানে যে গেমপ্ল্যান নিয়ে কাজকর্ম করেছেন আসুন তার একটু চর্চা করা যাক। গান্ধীজী এই গেমপ্ল্যান কার্যকরী করতে গিয়ে চক্রীদের প্ররোচনায়ই হোক বা নিজের প্রাধান্য বজায় রাখার মানসেই হোক যেসব ভুল ও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়েছিলেন তা কোন অবস্থাতেই মামুলি ব্যাপার ছিল না। বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যা করেছিলেন তা ছিল অত্যন্ত রূঢ় এবং

অকল্পনীয়। অন্তত তাঁর মত বিশাল মাপের ব্যক্তির কাছে এমন কর্ম মোটেও প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু যখন তাঁর স্বীয় কৃত ভুল তাঁর আপন দর্পণেই প্রতিফলিত হলো তখন তিনি তার প্রায়শ্চিত্তও করতে মাঠে নামলেন। যদিও এ ব্যাপারে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। আমদের মনে রখতে হবে তিনি এই প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়েই প্রতিপক্ষীয় চক্রীদের ঘাতকের হাতে নিহত হলেন। কারণ প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয়ে গেলে প্রতিপক্ষীয়দের যেসব দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে অবধারিত। তাই দুষ্টচক্র গান্ধীজীকে আর সহ্য করতে পারল না। প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ করার সময়ও তাঁকে দিল না। মহাত্মাজী যে সুভাষ নীতিতে প্রায়শ্চিত্ত শুরু করে নিজে এই মর্মপীড়া ও যন্ত্রণাদায়ক পঙ্ক থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি তখনকার যে তাঁর মানসিকতা তা থেকেই। তিনি মহাত্মা। তাই তাঁর ভুল ভাঙ্গাটাই প্রত্যাশিত। তাঁর পরিবর্তনশীল মানসিকতার নমুনা আমরা তাঁর পরবর্তী কর্মের যে ধারা তা থেকেই পাই। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাঁর ঘটেছিল বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন যে, **সুভাষচন্দ্র হচ্ছেন patriot of patriots, prince of patriots. শুধু তাই নয়। পরে আরও বলেছিলেন ১৯৪৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী দিল্লীর এক সভায় বেদনা মিশ্রিত কণ্ঠে,—"আমি কারও জন্মদিন পালন করি না। আমার নিজের জন্মদিনের কথাও মনে রাখিনা। কিন্তু আজ এমন একজনের জন্মদিন, যিনি জাতির জন্য, দেশের জন্য তাঁর যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করে গেছেন। .....আমি আমার দেশবাসীকে বলছি তোমরা সুভাষের দেশপ্রেম এবং তাঁর জাতীয় ঐক্যের আদর্শ ও ঐতিহ্য অনুসরণ কর।"**

উপরের এই আলোচ্য চিত্র থেকে আমরা যা পাচ্ছি তাতে এ কথাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে সত্যকারের দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক বলতে যা বোঝায় সেই অর্থে কংগ্রেস, কমিউনিস্টরা ছিল শত যোজন দূরে। তাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাকে কার্যকরী রূপ দেবার জন্য যেভাবে যতটুকু জমি চাষ করা দরকার তার বেশী তারা কিছুই করেনি। পক্ষান্তরে গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের সাত্বিক দেশপ্রেমের ডাকে তাঁদের পথে আমরা দেশবাসীগণ এক কদমও হাঁটিনি বা তাঁদের কথায় কর্ণপাতও করিনি। তার যা ফল হওয়া স্বাভাবিক তা আমরা হাতে হাতেই গরম গরম পেয়েছি ১৯৪৭ সালেই। আমরা দেশবাসীরা যে তাঁদের উপেক্ষা করেছি তার যথেষ্ট ঐতিহাসিক নজির আছে। এই সম্পর্কে একটি অতি মূল্যবান উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যখন গান্ধীজী ১৯৪৬ সালে কলিকাতার অদূরে সোদপুর আশ্রমে ছিলেন তখন বাংলার বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় বিপ্লবী এবং শীর্ষস্থানীয় নেতা যাঁদের মাঝে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন তাঁরা গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমগ্র বাংলাদেশকেই (তখন অখণ্ড বাংলাকেই বাংলাদেশ বলা হতো) ভিত্তিভূমি করে বৃটিশের চক্রান্তমূলক দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষবৃক্ষ চূর্ণ করতে তাঁর অনুমোদন চেয়েছিলেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল খণ্ডিত করে ভারতবর্ষের যে নব রূপায়ণ হতে চলেছে তাকে চিরতরে নস্যাৎ করে দেওয়া। অর্থাৎ অখণ্ড ভারতবর্ষই ছিল এর পশ্চাৎভূমি, বীজমন্ত্র। এই পরিকল্পনার গভীরে প্রবেশ

করলে দেখতে পাবো এখানেও সুভাষচন্দ্রেরই হাত এবং ছায়া কাজ করছে। প্রত্যক্ষভাবে ছিলেন না ঠিকই কিন্তু এই পরিকল্পনার যে আদি সুভাষচন্দ্র তা বৃটিশ ও তাদের সাকরেদেরা খুব ভালোভাবেই সচেতন ছিল। বলাবাহুল্য এই পরিকল্পনাকে গান্ধীজী অনুমোদন করেছিলেন আনন্দের সঙ্গে। কিন্তু এখানেও দেখা গেল গান্ধী-সুভাষ বিরোধী চক্র ও চক্রান্তের জাল বিস্তার করে বসে আছে। জওহরলাল ও তাঁর সহযোগীরা এখানেও ব্যারিক্যাট তৈরী করতে সক্ষম হলো। ফলে ব্যাপারটা ভেস্তে গেল। তার কারণ যদি অখণ্ড ভারতবর্ষই শেষ পর্যন্ত থেকে যায় তবে দ্বিজাতি তত্ত্বের তো সমাধি হবেই সাথে সাথে জওহরলালের আর দিল্লীর তখতে ইহজীবনে বসা হবে না। এ কথার যে গূঢ় অর্থ তা জওহরলালের থেকে বেশী কেউ জানতো না। কাজেই এমন পরিকল্পনার বীজকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা কর্তব্য, কালবিলম্ব না করে ঘটনাও ঘটল তাই। এভাবেই আমরা গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র ও তাঁদের পথের অনুসরণকারিদের পরিকল্পনা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বানচাল করেছি। হয়ত কারও প্রশ্ন থাকতে পারে এ তথ্যের সত্যতা কোথায়? এ প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু উত্তরটাও খুব সাদামাটা। এর ভিতর রাজনীতি খুঁজবেন না। তবে বিভ্রান্তিই শুধু গ্রাস করবে। উত্তরটা শুধু শুনুন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন সুদূর ইউরোপ থেকে দূর প্রাচ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে মানব ইতিহাসের দুর্গমতম চলার পরিক্রমাটি সমাপ্ত করে সেরা চমকটি পৃথিবীকে উপহার দিয়েছিলেন, তখন কিন্তু তাঁর একমাত্র সঙ্গী ও সেক্রেটারী আবিদ হাসানও জানতেন না তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়। এমনকি সাবমেরিনের নাবিকরাও ছিল এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। শুধু তাই নয় নাবিকরা একথাও জানতো না সাবমেরিনের দুই মহান যাত্রী কে বা কারা। বিপ্লবের ধর্মই হচ্ছে ডানহাতের খবর বাঁ হাত জানবে না বা জানে না। এমনকি এ-ব্যাপারে কোন কৌতুহলও পোষণ করবে না। কাজেই উল্লেখিত ঘটনার সাক্ষ্য একমাত্র ঐসব ব্যক্তিরাই, যাঁরা এই মহান পরিকল্পনার উদ্ভাবক ও নায়ক। পরিকল্পনা যখন রূপ পরিগ্রহ করলো না তখন তার সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করা নিশ্চয়ই দুরূহ। কিন্তু ঘটনা যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই। হয়ত আপনি-আমি এ-ব্যাপারে সন্দিহান হতে পারি কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় কোন বৈপ্লবীক মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি বা বিপ্লব তত্ত্বে সড়গড় ব্যক্তি এ তথ্যকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন। এই প্রেক্ষিতে তৎকালীন অনেক প্রখ্যাত বিপ্লবীরাই রাজরোষের শিকার হয়েছিলেন। সর্বোপরি এইটুকু দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলতে পারি যদি কোন গবেষক এ-ব্যাপারে গবেষণা করেন তবে তিনি কোন অবস্থাতেই ব্যর্থ মনোরথ হবেন না। সর্বশেষে এই তথ্য সম্পর্কে এই প্রতিবেদক শুধু এটুকুই বলতে পারেন যে, এ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সমকালীন বিপ্লবীদের মাঝে একাধিক শ্রদ্ধেয় বিপ্লব-পথিকের সৌজন্যে।

আলোচ্য অধ্যায়ের মধ্যে আমরা কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং দেশের আপামর জনগণের কিছু কিছু খণ্ডচিত্র বা তথ্য পেলাম। এবার অপরদিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্হিভারত থেকে ভারতমায়ের দামাল ছেলে সুভাষচন্দ্র বসু যখন সমগ্র জাতিকে এবং জাতীয় রাজনীতি কেন্দ্রীক সব নেতাদের আহ্বান করলেন

আপোশহীন সংগ্রামের জন্য, তখন শুধু কমিউনিস্টরাই তাঁর সঙ্গে বৈরিতা করেনি। গোটা জাতীয় কংগ্রেসই বৃটিশের হাতে তামাকু খেয়ে পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা পালন করেছে। যেন দেশটা কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং বৃটিশ নামক তিনটি জনগোষ্ঠীর পৈতৃক সম্পত্তি। তাই শত্রু সুভাষ নামক এক দোর্দণ্ড প্রতাপীয় শক্তি তাঁদের পরম আদরের মাতৃভূমি ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অতএব মাতৃভূমি রক্ষার দায় এখন ঐ ত্রিশক্তির। তাই তাদের পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে হাত মিলিয়ে সুভাষ নামক এক দানবীয় বর্হিশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। এই ছিল তখনকার কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট এই দুই বৃটিশজাতক সহোদর ভাইয়ের দায় তথা কর্তব্য। এইসব কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক অবস্থান শুধু সেই দিনই ঐরূপ ছিল, তা নয়। আজ ১৯৯৯ সালের অন্তিমক্ষণেও একই তাদের চেহারা। বরং বলা যেতে পারে তারা বোধহয় আজ আরও উগ্র অন্তত সুভাষচন্দ্রের ব্যাপারে তো বটেই। তারও অবশ্যই যুক্তিগ্রাহ্য কারণও আছে। তখন তাঁরা তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রকে মৃত সাব্যস্ত করেই ক্ষান্ত ছিল। কিন্তু এখন সেই তারাই আরও শক্তিশালী। কেননা এখন তাদের হাতে বৃটিশের বকলমে শক্তির চিটে গুড়ের রসনার ভাণ্ডারটি রয়েছে। তথা হর্তাকর্তা বিধাতা। এখন তাঁরা মনে করে তাঁদের কথাই শেষ কথা। এবং এখন তাঁদের সুভাষনীতিতে দুটি তত্ত্ব যথা, তাইহোকুতে তো সুভাষের মৃত্যু হয়েছেই। সুভাষের মৃত্যু যখন হয়েই গেছে অতএব এমন একজন বড় মাপের ব্যক্তিকে সম্মান না দেখানোই তাদের বিচারে জাতীয় অপরাধ। তাই তাঁকে সম্মান দেওয়া অবশ্যই জাতীয় কর্তব্যও বটে। অতএব কি করা উচিত? যুগপৎ তাঁকে দেওয়া হোক ভারতরত্ন ও তাইহোকুতে মৃত্যুজনিত ব্যাপারের পর তাঁর দেহাবশেষের ছাইটা এনেও দেওয়া হোক জাতীয় মর্যাদা। কাজেই তারা যে পূর্বপুরুষদের চেয়েও উন্নত মানের ও উন্নত মানসিকতার তা বলাই বাহুল্য। এখানে স্মরণীয়, শুধু কংগ্রেস কমিউনিস্টরাই দোষী নয়। অবশ্যই আর একটি পক্ষ বর্তমান। তারাই হচ্ছেন আমরা নামক দেশবাসী। এই আলোচ্য ঘটনাবলী থেকে এটাই প্রমাণিত আমরা দেশবাসীরা আমাদের সত্যকারের মিত্র—কে, তা চিনে নিতে আজও অক্ষম। এভাবেই আমরা ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদীদের বা দেশপ্রেমিকদের কোন কালেই যথার্থ মর্যাদা দিইনি। পরন্তু উপেক্ষা ও অবহেলাই করেছি চিরদিন।

কিন্তু যথার্থ সত্য বলতে হলে বলতেই হবে গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র এই দুই মহান ভারতরত্নই ছিল ভারতবাসীর আপনজন বা তাদের আত্মার আত্মীয়। অথচ মাটির সঙ্গেই যাদের কখনও কোন যোগ ছিলনা তারাই সেদিন থেকে আজও করে কম্মে খাচ্ছে আর জনগণের মাথায় কাঁঠাল ভাঙছে দিব্যি নির্ভাবনায়। তাদের দেখলে মনে হয় মোঘল বাদশারাও তুচ্ছ। শুধু ঐ দুই মহাপ্রাণই ভারতবর্ষের মাটির খবর রাখতেন। কিন্তু বস্তুতপক্ষে আমরা ভারতবাসীরাই এই দুই মহান জাতীয় নেতাকে না কখনও জানতে চেয়েছি, না বুঝতে চেয়েছি বা চেষ্টা করেছি। আজ ২০০২ সালের শুরুতেও একই কথা প্রযোজ্য। এই প্রতিবেদকের আরও দাবি হচ্ছে যে, যে জাতি গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের মত বিশ্বপূজ্য বিশ্ববরেণ্য নেতার প্রতি এমন কদর্য আচরণ করতে

পারে তার ফল তো জাতিকে পেতেই হবে। আমরা একটা ভুল করি সব সময়ই যে তাৎক্ষণিক ভাবে কাউকে উপেক্ষা করলেই সব শেষ হয়ে যায় না। যিনি বা যাদের বিরুদ্ধেই আমরা দুর্ব্যবহার করিনা কেন সেই ব্যক্তি যদি ন্যায় ও সত্যের আশ্রয়ে আশ্রিত হন তবে তিনি হাতে হাতে প্রত্যক্ষভাবে সততার ফল পাক, বা না পাক প্রকৃতি কিন্তু তাঁর হয়ে সব হিসেব নিকেশ উশুল করে নেন। তা আমরা মানি আর নাই মানি। তাই অভাজন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে আজ যে ভারতীয় জাতির এমন অবস্থা তা প্রকৃতির প্রতিশোধ ছাড়া কিছুই নয়। এতদ্ সত্ত্বেও বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের করুণায় জাতি হিসাবে অনেকবার বহির্শত্রুর আক্রমণ ও জাতীয় বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে জাতি। এসব তথ্য আমরা আমজনতারা না জানলেও প্রশাসনের কর্মকর্তারা খুব ভালোভাবেই অবগত আছেন। তাঁরা স্বীকার করুন আর নাই করুন। উদাহরণ হিসাবে অবশ্যই বলা যেতে পারে, চীন-ভারত যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে সুভাষচন্দ্রই জাতিকে রক্ষা করেছিলেন। এসব শুনে কেউ জ্ঞান হারালে আমাদের কাছে বরং সে ঘটনাই হবে বিস্ময়ের। সুভাষ তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা এত-টুকু সচেতন তাঁদের কাছে সুভাষচন্দ্রের এই কাজ মোটেও আশ্চর্যের নয়। আমরা অর্থাৎ সুভাষ-সচেতন লোকেরা মনে করি এটাই বরং নিতান্ত স্বাভাবিক। কারণ তিনি যে আজ বিশ্বের দিকে দিকে মানবতার রক্ষাকর্তা তা আপনি আমি খবর না রাখলেও বিশ্বের পরাক্রমশালী সকল নায়করাই জানেন খুব ভালোভাবেই। যাঁকে আমরা বলছি আত্মগোপন করে আছেন তা কি যথার্থ সত্য? তা যে সত্য নয় তার প্রমাণ, তিনি অবস্থান করছেন কখনও মাও-সে-তুং, চৌ-এন-লাই-এর শীর্ষে, কখনও বা ভিয়েৎনামি ডেলিগেশনের সাথে, আবার কখনও বা বিদেশী প্রতিনিধি দলের সাথে এই কলিকাতায় রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে। হ্যাঁ, মশাই এই কলিকাতায় রাষ্ট্রীয় অতিথি! এরপরও যারা বলছেন আত্মগোপনকারী নেতা বা মৃত জেনারেল তারা যা খুশী বলুন ক্ষতি নেই। কিন্তু যা হবার তা হচ্ছে, হবেও অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সাবলীল গতিতে। পারেন তো যা খুশী করতে পারেন করুন বা আপনাদের বৃটিশ আমেরিকা যা খুশী করুক। সুভাষচন্দ্র তার জন্য সেদিন ১৯৪৫ সালেও প্রস্তুত ছিলেন, আজও বলতে পারি আরও অধিকতর প্রস্তুত। বলা যায় He is more active than before. এই তত্ত্ব আপনাদের গবেষণাগারে নিয়ে গবেষণা করুন। এবার আমাদের ফিরতে হবে একটু পিছনে নতুন অন্য একটি সূত্র ও তথ্যের সন্ধানে।

১৯৪২ সালের সূত্র ধরে আমরা ক্রমে এসে পৌঁছালাম ১৯৪৬ সালে। এবার ১৯৪৬ সাল। স্থান নোয়াখালির প্রান্তর। এটি পূর্বপাকিস্থানের তথা অধুনা বাংলাদেশের একটি জেলার নাম। বৃটিশের দান দ্বিজাতি তত্ত্বের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের আনুকূল্যে তৎকালে ভারত বিভাজনের যে ক্ষেত্রটা বৃটিশ তৈরী করেছিল আসুন তা একটু পরখ করে দেখি। এইমাত্র নোয়াখালির কথা হচ্ছিল। সেই নোয়াখালিতে দেশভাগের প্রাক্কালে যে ভ্রাতৃঘাতি নরমেধ যজ্ঞ বৃটিশের আশীর্বাদে মুসলিম লীগ শুরু করেছিল তা বন্ধ করার সঙ্কল্প নিয়ে মহাত্মাজী তথায় গিয়েছিলেন

দিল্লী থেকে। সেখানে যা ঘটেছিল তা বোধহয় বিশ্বের ইতিহাসে বর্ণিত সকল ঘটনাকেই ম্লান করবে। এমনকি ইতিহাসখ্যাত রোমান বর্বরতাও এ ঘটনার কাছে বোধহয় অতি সামান্য। এমন একটি অবস্থাকে যখন গান্ধীজী বন্ধ করতে তথায় গিয়েছিলেন তখন সেখানকার ঐ মর্মন্তুদ রোমহর্ষক ঘটনায় বেদনাহত মর্মে একটি ছায়া সুশীতল গাছের নীচে বসে তিনি কাঁদছিলেন। এই ক্রন্দনরত বাপুজীকে দেখে তাঁর নিরাপত্তা অফিসার প্রশ্ন করেছিলেন, "বাপুজী আপ রোরহা হ্যাঁয় কিউ?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "ম্যারা বেটা রহেনেসে হিন্দুস্থান কা হাওলাত এ্যাসা নাহি হোতা"। এখানে বেটা অর্থে সুভাষচন্দ্র। নিরাপত্তা অফিসারের আবার প্রশ্ন, কিউ, জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এ্যাসা তো বহুৎ হ্যাঁয়। এ প্রশ্নের জবাবে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে বলেছিলেন, "ওঁরা সব বেইমান"।

(নেতাজীর সঙ্গ-প্রসঙ্গ-নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী)

স্মরণীয় এমন সময়ই গান্ধীজীর সঙ্গে নেহেরু, প্যাটেল ও আজাদদের মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছিল। তাই গান্ধীজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে বলেছিলেন— "To day my son Subhas is not here, if he were with me I would not have needed any of you." (৩রা এপ্রিল ১৯৯৬। আনন্দবাজার পত্রিকা।)

এই চিত্রপট থেকে একটা ব্যাপার এখানে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে জওহরলাল ও তার অনুগামীরা আর গান্ধীজীর ছত্রছায়ায় নেই। কার্যত গান্ধীজিও জাতীয় কংগ্রেসে আজ মূল্যহীন। একটু অনুশীলনে যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে বলতেই হচ্ছে আজ জওহরলালের এই বাড়বাড়ন্ত কোন মুরুব্বির জোরে? এরপরও কি বুঝতে অসুবিধা আছে নেহেরুরা এখন কার বলে বলীয়ান এবং কোন্ ছাতার তলে তারা আশ্রয় নিয়েছেন? অভিভাবক হিসাবে শুরুতে পিতা তারপর বাপুজী। এবার তিনি যে খাস বৃটিশ ছাওনিতে আশ্রয় নিয়েছেন বা সেখানকার অত্যন্ত এক সম্মানীয় সদস্য তা বলাই বাহুল্য। তিনি এখন গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীর মাননীয় সেনাপতি। ভুলে যাবেন না জওহরলাল সহসা এই বৃটিশ শিবির ভুক্ত হয়নি। তিনি ১৯৪৫ সালে সিঙ্গাপুরে লর্ড ওয়াভেল ও লর্ড মাউন্টব্যাটেনের দ্বারা মন্ত্রে মন্ত্রসিদ্ধ। এবং তাই তাঁর এই বৈপ্লবীক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন তাঁর না এলে ইহজীবনে তিনি যে ভারতের কর্তাবাবু বা দিল্লীশ্বর হতে পারতেন না সে হিসাব নিকেশ করেই বাপুজী নামক সুরক্ষিত দুর্গ ছেড়ে তিনি এখন বৃটিশ দুর্গের আশ্রয়ে আশ্রিত। এবং এটাও স্মরণীয় যে তখনও বৃটিশরাই আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তখনও ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনটা ছিল বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে। এবং আন্দোলনের নায়ক বা উপনায়কদের মধ্যে জওহরলালের অবস্থান তখন গান্ধীজীর পরেই। তখন ভারতবর্ষের নেতাদের মধ্যে গান্ধী ও জওহরলালই উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব। গান্ধীজী তো অপ্রতিদ্বন্দ্বী বহুকাল যাবৎ। তার মধ্যে সুভাষচন্দ্র মাথা তুলতে গিয়ে বা স্বকীয়তা প্রমাণ করতে গিয়ে একেবারেই দেশছাড়া হতে বাধ্য হলেন। এবার শীর্ষনেতা গান্ধীজী। শুধু

শীর্ষনেতাই নয়—আপামর ভারতবাসী গান্ধীমহারাজ বলতেই অজ্ঞান। অথচ এদিকে দিল্লীর সিংহাসন হাতের মুঠোয় আসল বলে। এমন একটা অবস্থায় শীর্ষনেতাই হবেন স্বাভাবিক সূত্র ও প্রথাগত সৌজন্যতা বশত তার মালিক। অথচ গান্ধীজী হচ্ছেন পিতৃতুল্য এবং জাতীরও পিতা। এমন একজনকে সরে যেতে বলা মানে অসম্মান করা। সেটাই বা করা যায় কেমন করে? সুতরাং রাজনীতির বাঁকা পথই শ্রেয়। লাঠিও ভাঙল না সাপও মরল। অন্তত এ বাসনাতো পোষণ করতে আপত্তি নেই। কি হবে বা কি হবে না তাতো পরের দৃশ্যের ব্যাপার। সুভাষহীন ভারতে গান্ধীজীকে একটু পিছনের দিকে পাঠিয়ে দিলেই তো কেল্লাফতে। আর যাঁরা আছেন তারা তো নেহেরুর স্তাবক। ভারতবর্ষের রাজনীতির ময়দানে শুরু হলো পশ্চিমী ও কমিউনিস্ট কায়দায় খেলা। এইসব ঘটনা বলে দিচ্ছে যে গান্ধীজী আর জাতীয় আন্দোলনের শীর্ষব্যক্তিত্ব নয়। এমনকি তিনি আর কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যও নন। তিনি এখন ৩৮ কোটি ভারতবাসী আমজনতার একজন তৃণমূলীমাত্র। অপরদিকে সুভাষচন্দ্র তো ১৯৪১ সাল থেকেই ভারতবর্ষের কেউ নন। স্মরণীয়, সুভাষচন্দ্র যে ভারতবর্ষ থেকে চলে গিয়েছিলেন তা আমরা পূর্বেই অবহিত হয়েছি। সেখানেও দেখা গেছে সুভাষচন্দ্রকে শুধু কংগ্রেস থেকে বিতাড়ন নয় ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়নের পশ্চাৎভূমি ঐ জওহরলাল এবং তাঁর সহযোগীরা। তৎসঙ্গে বৃটিশতো ছিলই নাটের গুরু। একই কায়দায় গান্ধীজীও আজ আর গান্ধীজী নেই। **তিনি আজ জাতীয় কংগ্রেসের কেউ নন শুধু সুরাটের করমচাঁদ। একথা ভুলে গেলে চলবে না।**

এইরূপ একটি অবস্থায় খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন, এখন কে হবেন নেতা, জাতীয় আন্দোলনের কর্ণধার? সেই দায়িত্ব যে এখন স্বাভাবিকভাবেই জওহরলালের কাঁধে পড়বে তা সহজেই অনুমেয়। হ্যাঁ, জওহরলাল অবশ্যই সে দায় নেবেন বা নিয়েছেনও। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে জওহরলাল যেহেতু ক্রাচ্‌নির্ভরশীল তখন একটা ক্রাচ্ যেনতেন প্রকারেণ ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে তিনি সেই ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করেই রেখেছেন। তিনি গান্ধীজী নামক ছত্রছায়া ত্যাগ করে বৃটিশ ছাওনিতে আত্মসমর্পণ করেছেন। অপরদিকে কিন্তু তিনিই ৩৮ কোটি ভারতবাসীর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সর্বময় কর্তা বা সমস্ত কিছুর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ওদিকে গান্ধী-সুভাষের প্রতিপক্ষীয়ও বটে তিনি। অন্যদিকে বৃটিশ চাইছে গান্ধী-সুভাষকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। তাহলে সমগ্র নাটকটাই এখানে এসে বেশ জমজমাট হয়ে পরিপূর্ণ ক্লাইমেক্সে পৌঁচেছে। তাতে যে দর্শকরা বেশ রসনা উপভোগ করতে করতে তাদের ভাবিকালের কথা ভেবে বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হবেন তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। কারণ ভবিষ্যৎ ভেবে তারা ভীষণ শঙ্কিত, যেহেতু দেশের পরম প্রার্থিত দুই মহান নেতাকে বৃটিশ ও তার সহযোগীরা বক্ষচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছে। অতএব এখন তাদের কাণ্ডারী কোথায়? কারণ জওহরলাল এখন এপক্ষেরও নেতা, ওপক্ষের সেনাপতি। এই তত্ত্ব আর কল্পনা নয়,

একটি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। তাই যদি অবস্থা হলো তখন কার বিরুদ্ধে কে লড়াই বা যুদ্ধ করবে? এখানে এসে আমরা কি দেখছি? দেখছি ১৭৫৭ সালের মুর্শিদাবাদের পলাশীর নাটকের প্রহসনের নায়ক এসে বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত ও রাজনৈতিক নেতা জওহরলালের সাথে করমর্দন করছেন। তারপরের দৃশ্যেই সে নিজ হাতে জওহরলালের কণ্ঠে জয়মাল্য পরিয়ে তাঁর জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। তখন আরও উষ্ণ অভ্যর্থনাসহ বলছেন, ধন্য হে জওহরলাল ধন্য। তুমি শুধু ধন্য নও নমস্যও বটে। কারণ তুমি কূটনীতির ময়দানে যা খেল দেখালে তা বোধহয় পৃথিবীতেই বিরল এবং অবিস্মরণীয়। পলাশীতে একটা নাটকীয় প্রহসন যুদ্ধ হলেও হয়েছিল। কিন্তু এখানে তাও করতে হলো না। এখানেই শেষ নয় বন্ধুবর। পলাশীর যাত্রা ছিল আংশিক থেকে পূর্ণাঙ্গের লক্ষ্যে, কিন্তু ১৯৪৭ কিন্তু এর যাত্রা ঠিক তার বিপরীত। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ থেকে আংশিকে। এর যে রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি তার মাহাত্ম্য তো অনেক অনেক বেশী ও অনেক মর্য্যাদা সম্পন্ন। এবার যে ইংল্যাণ্ডেশ্বরী রিমোর্ট কন্ট্রোলের সাহায্যে ভারত সাম্রাজ্যের প্রশাসন চালাবেন তাতে তো অসুবিধা হবেই না পরন্তু খুচখাচ যুদ্ধবিগ্রহেও ব্যতিব্যস্ত হতে হবেনা। তাই বন্ধু কাব্যি করে বললে বলতেই হয়—

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিকানো চক্রের চক্রী যদি
মিরজাফর, তবে তার পুনর্নবীকরণের আদি
যে নব্য নন্দলালের দল তাতে কি সন্দেহ আছে?
তবু কি বলবে বন্ধুহে ওইসব সংলাপ মিছে?

উপরের ঘটনাবলী থেকে আমরা যা পাচ্ছি তাতে বলতে হয় নেহেরু কোনদিনই পরনির্ভরশীল না হয়ে চলতে পারেননি। চিরদিনই পরাশ্রয় নির্ভর জীবন তথা রাজনৈতিক বিচরণ। সেই পিতৃদেবের সময় থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তো বটেই। এমনকি পরবর্তীকালেও। কাজেই দৃঢ়চেতা পুরুষ বলে যা বোঝায় তা তিনি কোন কালেই নয়। সেই কারণে স্বাধীনোত্তর নবীন ভারত রাষ্ট্রের লৌহদৃঢ় বলে বলীয়ান কোন প্রশাসন যন্ত্র সেদিনও ছিল না, আজও নেই। রাষ্ট্রনায়কের চারিত্রিক দৃঢ়তা না থাকলে রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় তা আসবে কোথা থেকে? যদি প্রশ্ন করেন জওহরলাল যদি চিরদিনই কোন আশ্রয়ে আশ্রিত, তবে স্বাধীনতার পরেও কি তিনি কারো আশ্রয়ে ছিলেন? যদি তাই হয় তবে কার আশ্রয়ে ছিলেন? তার প্রমাণই বা কি? উত্তর— অবশ্যই তিনি আশ্রয়ে ছিলেন। এবং তা হচ্ছে বৃটিশের আশ্রয়ে। প্রমাণ এই স্বাধীনতা তো প্রিভিকাউন্সিলের বা লর্ডসভার অন্ধগর্ভ গৃহেজাত গোপন শলাকলা দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তরের নামান্তর তথা পোষাকি এক নাম। সুতরাং উত্তরটা যে এখানেই লুক্কায়িত তা কি আর বলে দিতে হবে? আশা করি সে ব্যাপারে না যাওয়াই শ্রেয়। তাছাড়া এই সমগ্র প্রবন্ধের মাঝেমাঝেই তো ঐ উত্তরের খণ্ডখণ্ড চিত্র মাথা উঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবু কিছু না বলে পারছি না। কৌতুহল দূর হচ্ছে না। যদি তাই না হবে

তবে কি আজও ভারতীয় প্রশাসনিক পরিকাঠামো বিভাগ সুভাষ বৈরিতায় পৃথিবীতে এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অদ্বিতীয় হয়? না সুপ্রিমকোর্টের ঐতিহাসিক ভার্ডিক্টের পরও সেই অবস্থানে অক্টোপাশের মত আঁকড়িয়ে থাকে! জওহরলাল চরিত্রের একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি নাকি খুব রাগি ছিলেন। এবং কখনও কখনও অতিমাত্রায় কথা বলতেন। যার কোন যুক্তি থাকতো না। সময়ে সময়ে এমন এমন কাজ করতেন এবং বক্তব্য রাখতেন তাতে হিতে বিপরীত ঘটত। এমন দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে কংগ্রেসী ইতিহাস বা কংগ্রেসী কর্মকাণ্ড থেকে। যথা, "....যুক্তপ্রদেশ মুসলিম লীগের সবচাইতে শক্ত কেন্দ্র ছিল। চুক্তি ছিল সরকারে কংগ্রেস দুজন লীগের সদস্য রাখবে। ভোটের পরে যখন দেখা গেল যে লীগ সমস্ত মুসলিম ভোটের মাত্র ১০ শতাংশ ভোট পেয়েছে তখন নেহেরু সেই চুক্তি ভঙ্গ করে কোন লীগসদস্যকে সরকারে নিতে অস্বীকার করেন। অনেক কংগ্রেস নেতা এমনকি মৌলানা আজাদও নেহেরুকে রাজী করাতে ব্যর্থ হন। এছাড়া আরও অনেক ঘটনার পর নেহেরুর সঙ্গে তীব্র ব্যক্তিত্বের সংঘাতের জন্য ভারতবর্ষ ছেড়ে লণ্ডনে আইন ব্যবসা শুরু করেন ১৯৩০ সালে মোহাম্মদ আলি জিন্না। এ ঘটনা ঘটেছিল ত্রিশের দশকে। এতদব্যতীত অনেক ঘটনাই আছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ওয়াভেল পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতকে তিনটি অংশে আলাদা করে একটি ফেডারেল ধাঁচের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে যখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সহমত স্থাপিত হলো তখন মন্ত্রীসভার সদস্য সংখ্যা নিয়ে নেহেরুর হঠকারী উক্তি, "শাসনতন্ত্র রচনায় আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবো এবং আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচনা করবো।"
(সাপ্তাহিক বর্তমান ৪ঠা মার্চ ২০০০ সাল, চিঠির কলম, পত্রকার প্রভাসচন্দ্র সেনগুপ্ত)

তখনই মোহাম্মদ আলি জিন্নাকে মুসলিম লীগের নেতারা লণ্ডন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এবং নেহেরুর এমন সব হঠকারী কর্মকাণ্ডের পরিণতিস্বরূপ এবং কংগ্রেসের আরও কিছু কাজের ফলে তিনি অর্থাৎ জিন্না ঘুরে দাঁড়ান। সেই সাথে বৃটিশের প্ররোচনাতো ছিলই। এভাবেই লীগকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে ১৯৪০ সালে লাহোরের সম্মেলনে লীগের পাকিস্থান প্রস্তাব। এই জওহরলালই একবার জাতীয় কংগ্রেসের এক অধিবেশনে বলেছিলেন,

"Under no circumstances we will recognise any part of India as Pakistan but to faciliate the withdrawal of the British forces from India, we will recognise it a temporary phase."

জওহরলাল এভাবেই এমন সব উক্তি করতেন যার পরিণতি কখনও শুভ হতোনা। এবং ঐসব উক্তির পরও তিনিই কিন্তু ভারত বিভাজনের অন্যতম নায়ক। ইতিহাস একথা বলছে। পণ্ডিত জওহরলাল হচ্ছেন এমনই এক ব্যক্তি। অথচ এই নেহেরুকে নিয়ে স্বাধীনোত্তর ভারত কি নাচানাচি না করেছে? নেহেরুর এইরূপ বাক্যনবীশতার জন্য তিনি তৎকালে রাজনৈতিক মহলে আন্তর্জাতিক চেটারিং বক্স নামে খ্যাত ছিলেন।

এই হচ্ছেন আমাদের খণ্ডিত স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া তিনি যে একজন আন্তর্জাতিক মানের পণ্ডিত ও তাত্ত্বিক ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। এমনও শোনা যায় যদি তিনি রাজনৈতিক জগতে না এসে সাহিত্য সেবক হতেন তবে হয়ত একজন বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক হতে পারতেন। তাতে বিচিত্র কিছু ছিল না। পরন্তু তিনি বিপরীত যানের সওয়ার হলেন। যার ফলে তিনি আজ শ্রদ্ধার পরিবর্তে অমর্যাদারই শিকার হতে চলেছেন। সময়ই যখন সবকিছুর নির্ণায়ক তখন নেহেরু চরিত্রের এসব তথ্যও চাপা থাকবে না। এখনই দেখুন না সুভাষচন্দ্রের নাম উজ্জ্বল, না কি জওহরলালের নাম উজ্জ্বল! বলতে নেই দিন সমাগত প্রায়। এখনও যে জওহরলাল বা অন্যান্য সকলের নাম আমরা উচ্চারণ করি, সে অবদানও সুভাষচন্দ্রের। বলা চলে সুভাষচন্দ্রের অসীম করুণার জন্যই ভারত ইতিহাসের বর্তমান কালের খলনায়করা আজও আস্তাকুড়ে চাপা পড়েনি। কারণ তিনি আত্মপ্রকাশ করলেই ভারতের তো বটেই পৃথিবীরও বহু কিছু বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। যা পৃথিবীর মানুষ কল্পনাও করতে পারছে না। পৃথিবীতে কৃষ্ণকথন যদি সত্য হয়, মহাকবি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ব্যাসদ্বৈপায়ন যদি সত্য হয় তবে আর একবার পৃথিবীতে মহর্ষি ব্যাসদ্বৈপায়নকে আসতে হবে। নেতাজী সুভাষকে নব মহাভারতের মহাকাব্যে চিত্রায়িত করার জন্য। তাই স্বামীজীর একটি বিখ্যাত বাণী দিয়েই এই অধ্যায় থেকে আমরা ছুটি নেবো। আসুন আমরা সেই বাণীটি শুনি। তিনি বলছেন, **"ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্ত গুণ বেশি শক্তিমান।" বলাবাহুল্য এই বাণীই আজ নেতাজী সুভাষের হাত ধরে প্রতিফলনের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।**

১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের পর গান্ধীজী থেকে কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্লেষোক্তি :

- **"পট্টভি সীতারামাইয়ার পরাজয়ই আমার পরাজয়।"—*গান্ধীজী***
- **"After all Subhas is not an enemy of his country"-*Gandhiji***
- **" সুভাষ মূর্খের স্বর্গে বাস করছে"—*আচার্য জে. বি. কৃপালনী***
- **"বসুর নির্বাচন দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে।"—*সরদার প্যাটেল***
- **"সাবধান নর্মদা নদীর জল খুব গভীর। ফুটো নৌকায় চড়ে নদী পার হতে গিয়ে কি শেষে ডুবে মরব না কি?"—*সি. রাজাগোপালাচারীয়া***

গান্ধীজীর এমন আচরণ এবং ভারতীয় নেতাদের এমন কদর্যতার পরও সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে 'জাতির জনক'—এই ভূষণে ভূষিত করেছিলেন এবং কংগ্রেস নেতাদের প্রতি কোন দৃষ্টিকটু আচরণ করেননি।

দশম অধ্যায়

বিশ্বরূপে নেতাজী সুভাষ

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" ৪।৮

"আমাদের সমগ্র জাতির কৃত পাপের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি"

—নেতাজী সুভাষ

আসুন এবার আমরা সেই মহাক্ষত্রিয় বিশ্বমানব মুক্তির রুদ্রতাপস নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। যিনি হচ্ছেন এই ঐতিহাসিক দলিলচিত্রের সকল কর্মকাণ্ডের অঘোষিত ও নেপথ্য নায়ক। বা অপ্রত্যক্ষ পথপ্রদর্শক। আজকের ভারতবর্ষের কাছে সুভাষচন্দ্র যতই অচ্ছুৎ হোন না কেন কিন্তু আপামর বিশ্বের কাছে তাঁর সমকক্ষ কোন দ্বিতীয় শ্রদ্ধার ও অতুলনীয় মর্যাদার পাত্র কি একজনও আছেন? পৃথিবীব্যাপী অসীম বীরত্বের কর্মকাণ্ডে যাঁরা নিজেদের সম্পৃক্ত করে অদ্বিতীয় সাক্ষ্য রেখেছেন তাঁদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে দেখা যাচ্ছে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তাঁর বিশ্বময় কর্মযজ্ঞের কিঞ্চিৎমাত্র অবহিত হলেও বলতে হবে তাঁকেই বিশ্বে একমেবদ্বিতীয়ম্। আসুন এই প্রেক্ষিতে বিশ্ব মানবজগত নামক গ্রন্থাগার থেকে কিছু উদ্ধার করা যায় কিনা দেখা যাক। বলাবাহুল্য বিশ্ববিপ্লবের বুনিয়াদ তৈরি আজকের ব্যাপার নয়। বিশেষ করে ভারতের স্বাধীনতার অঙ্কুর দেখা যায় প্যারিসের বিপ্লব সংগঠনে ১৮৮৫ সাল থেকেই। এই সংগঠনের সক্রিয় সদস্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভারতীয় বিপ্লবীরাই ব্যাপকভাবে সক্রিয় ছিলেন। তাঁরা সকলেই একসময়ের ভারতের প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী। তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে—ঋষি অরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ ভূপেন দত্ত, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, মহেন্দ্রনাথ সরকার, মৌলানা বরকতউল্লা, রাসবিহারী বসু, লালা হরদয়াল, মোহনসিং বাখনা প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত বিপ্লবীবৃন্দ। এই প্যারিস সংগঠনের সূত্র ধরে এগোলে আমরা যা পাই তাতে দেখা যাচ্ছে যে রাশিয়ার একসময়ের সেরা নায়ক লেনিনও ঐ প্যারিসের

বিশ্ববিপ্লব সংস্থার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯০৭ সালে ভি. আই. লেনিন প্যারিসে অবস্থান করছিলেন এবং সেই সময় বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী মাদাম কামার সঙ্গে লেনিনের পরিচিতি ঘটে। এবং তাঁদের মধ্যে বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় ঘটে। এ সব তথ্য আমরা পাই সত্যব্রত তপাদারের প্রবন্ধ 'এশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র' প্রবন্ধে। সেখানে আরও আছে, "পরবর্তীকালে International Centre for National Liberation Committee গঠিত হয়। প্যারিসের এই সংস্থার সঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, চৌ-এন-লাই, চেন-ই, হো-চি-মিন এবং মার্শাল চু-তে যোগ দেন। এরপর মার্শাল চু-তে সামরিক শিক্ষার জন্য কমিটির উদ্যোগে জার্মান যান। অন্যদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষালাভের জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেতে হয়। তারপর রাশিয়ায় লেনিন ক্ষমতায় এসে মাদাম কামাকে রাশিয়ায় সংস্থার পরিচালনার কথা বলেছিলেন। কিন্তু মাদাম কামা রাশিয়ায় যেতে পারেন নি। তখন সংস্থার দায়িত্ব নেতাজী সুভাষ গ্রহণ করেন"। (*নেতাজী জন্মশতবর্ষ উৎযাপন সমিতি কৃত জয়তু নেতাজী স্মারক গ্রন্থের সত্যব্রত তপাদার কৃত প্রবন্ধ থেকে সঙ্কলিত*) স্মরণীয়, সেই সময়ই তাঁদের যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই সম্মেলনেই মাদাম কামা ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন, এবং ভারতের ঐ ত্রিরঙা জাতীয় পতাকাকে সর্বপ্রথম যিনি অভিবাদন করে সম্মান প্রদর্শন করেন তিনি হচ্ছেন বিশ্বের মার্কসবাদের সেরা প্রবক্তা এবং রাশিয়ার মহান নেতা ভি. আই. লেনিন। অথচ আজ ভারতে লেনিনের উত্তরসূরী বলে যারা দাবীতে সোচ্চার তারা কিন্তু ভারতের জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করতে রাজি নয়। এমনকি তারা ভারতের অঙ্গরাজ্যের রাজপুরুষ বা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হলেও নয়। বলাবাহুল্য ঐ যে ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকাকে লেনিন অভিবাদন করলেন সেই পতাকায় কিন্তু তিনটি রং ছিল এবং তার মাঝখানে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রটিও যথাযথ লেখা ছিল। তাহলে কি বলতে হয় মহান নেতা মার্কসবাদের সেরা প্রবক্তা লেনিন বিপথগামী বা ভ্রষ্টাচারী ছিলেন? অন্তত ভারতীয় কমিউনিস্টবাদীদের দৃষ্টিতে তো তাই হওয়া উচিত, নয় কি? International Centre for National Liberation Committee-র যে দায়িত্বভার সুভাষচন্দ্রের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল মাদাম কামার স্থানে তাতে যে লেনিনের ইচ্ছা কাজ করেছে তাতে কি সন্দেহ আছে? পরবর্তীকালে দেখা গেছে স্তালিন ও সুভাষচন্দ্রের সখ্যতার ব্যাপারটা। তাহলে দেখা যাচ্ছে লেনিন, স্তালিন, মাও-সে-তুং, চৌ-এন-লাই, তাঁরা সকলেই সুভাষচন্দ্রের একসময়কার সহকর্মী, সাথী এবং বন্ধু তথা সহমর্মী এর বিস্তারিত তথ্য আমরা পরে পাবো। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওহে ভারতীয় কমিউনিস্ট ভাইরা, তোমরা কথায় কথায় আন্তর্জাতিকতাবাদের কাহিনী প্রচার কর অথচ দেখা যাচ্ছে তোমরা আসল ইতিহাস থেকে সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করছ। তা কি সত্য নয়? তোমরা দিনরাত যাঁকে অমর্যাদা করে চলেছো

সেই সুভাষচন্দ্রই ছিলেন তোমাদের বীজমন্ত্র দাতাদের একসময়ের সঙ্গীসাথী বা সহকর্মী উপদেষ্টা ইত্যাদি। এসব বাদ দিয়ে আসুন আমরা আসল প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

সুভাষচন্দ্র সেইদিন থেকে আজও আন্তর্জাতিক মানবগোষ্ঠীর মুক্তির কাণ্ডারী বা পথের দিশারী। তাঁর কর্মকাণ্ড সেইদিন থেকেই নয় শুধু ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী নিয়ে, সমগ্র বিশ্বমানব মুক্তি ও কল্যাণ যজ্ঞে পরিব্যাপ্ত, যদি তাঁকে এতটুকু বোঝার চেষ্টা করা হয় তবে তা স্বামীজীর আলোকেই চেষ্টা করা উচিৎ। আমরা ভারতবাসীরা সুভাষচন্দ্র বসুকে একটু আধটুকু জানলেও বা বুঝলেও নেতাজীর স্বরূপকে আদৌ জানিনা চিনিনা। একথা শুধু কথার কথা নয়। তা একেবারে একটি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব। বলতে নেই আমরা তৎকালীন ভারতবাসীরা কেউ-ই নেতাজীকে দেখিনি এবং নেতাজী এই অভিধায়ও তাঁকে আমরা অভিহিত করিনি। এই ভূষণে বিভূষিত করার গর্বে যাঁরা গর্বিত ও দাবী করতে পারেন তাঁরা সকলেই ছিলেন জার্মান প্রবাসী ভারতীয় এবং পূর্ব-এশিয়া প্রবাসী আপামর জনগণ এবং সেখানকার ভারতীয়রা। তাঁরাই তাঁর তৎকালীন সত্তার সাথে পরিচিত। এবং তারাই তাদের সমুদয় সম্পদ দিয়ে কপর্দক শূন্য হয়েও সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে চলেছেন এবং সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন সেইভাবে। আমরা ভারতবাসীরা তো শুধু তাঁর সাথে প্রতি পদে পদেই বৈরিতা সুলভ আচরণ করেছি এবং আজও তার কোন ব্যতিক্রম নেই। কাজেই সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে কিছু বলার এক্তিয়ার কি আমাদের আদৌ আছে? একথা ভাববার খুবই প্রয়োজন। তিনি যে সে সময় পূর্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়দের দ্বারা এমনকি সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ দ্বারা কিভাবে কতখানি সমর্থিত হয়েছিলেন তার হাজার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে শুধু একটি উদাহরণ এখানে উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। তাতেই অনুমান করা যাবে তিনি পূর্ব-এশিয়াস্থিত লোকেদের বা সেখানকার ভারতীয়দের কতখানি ব্যাপক প্রভাবিত করেছিলেন। এমনটি পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ উদাহরণ দিতে পারবেন না। এ ব্যাপারে সুভাষ গবেষক শ্রী অলোককৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী কৃত 'শৌলমারীর সাধুই কী নেতাজী' পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে তা উপস্থাপন করেছেন। আসুন, তাঁর বর্ণনা থেকেই ব্যাপারটা আমরা কি পাই দেখি। শ্রী চক্রবর্ত্তীর ভাষায় :

"একদিন এক সভায় বক্তৃতার শেষে গলার মালাটা নিলাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন নেতাজী। সভার উদ্দেশ্যে বললেন, বলুন আপনারা কি দাম দিতে চান এই মালাটির? সে কি প্রতিযোগিতা! প্রথম ডাক আসে এক ধনী পাঞ্জাবী যুবকের কাছ থেকে। —এক লাখ টাকা। চারিদিকে ধ্বনিত হয় নেতাজী জিন্দাবাদ। এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে সেই যুবকটি ডায়াসের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান ব্রিজলাল জয়সওয়াল। হাঁক ছাড়েন—দু' লাখ টাকা। বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ায় যুবকটি। বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই দেখে আর একপাশ থেকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন আর এক ভদ্রলোক। শোনা যায় তাঁর মুখে আড়াই লাখ। —তিন লাখ, ডাক দেন ব্রিজলাল জয়সওয়াল। তিন

লাখ দশ হাজার, সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন ভদ্রলোক। কেউ কারো থেকে কম নয়। কেউ সরতে রাজী নয়। সরে আসার প্রশ্নও আসে না। সবাইতো এখানে উপস্থিত তাদের যথাসর্বস্ব নেতাজীর হাতে তুলে দেবার জন্য। —সওয়া তিন লাখ, শোনা যায় ব্রিজলালের কণ্ঠস্বরে। —সাড়ে তিন। তিন লাখ ষাট হাজার। তিন লাখ সত্তর। পাল্লা দিয়ে চলেছেন ভদ্রলোক ব্রিজলালের সঙ্গে। —চার লাখ ব্রিজলালও ছাড়ার পাত্র নয়। সওয়া চার। —পাঁচ লাখ। হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে পাঞ্জাবী যুবকটি। যুবকটির দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন ব্রিজলাল জয়সওয়াল। তারপরই হাঁক ছাড়েন—পাঁচ লাখ এক হাজার। সরলেন না ব্যাঙ্ককবাসী ঐ ভদ্রলোক। —সাড়ে পাঁচ, ব্রিজলালের আবার ডাক। এমনি করে দ্বৈরথ সমরে দরটা যখন সাত লাখে এসে পৌছায়—পরাজয় স্বীকার করেন ভদ্রলোক। ব্রিজলাল জয়সওয়ালের মুখেচোখে তখন গর্বের স্বর্গীয় প্রশান্তির হাসি। জয়ের আনন্দ! সাত লাখের উপর আর সেদিন দর উঠল না। এগিয়ে এলোনা কেউ। এমন যখন ঘটনাটি পরিসমাপ্তির পথে তখনই উন্মত্ত ব্যাঘ্রের মত লাফিয়ে উঠে পাঞ্জাবী যুবকটি। আমিই নেবো। যুবকটি থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আহত সিংহের মত চিৎকার করে ওঠে। —নেতাজী! —অন্যপ্রান্ত থেকে আওয়াজ—নেতাজী পুকারণে সে ক্যা ফয়দা সরদারজী? অগর ভাও বাঢ়ানে কা হিম্মৎ হোতো বঢ়তে চলো। বাঢ়গে ঔর? ব্রিজলাল জয়সওয়ালের বক্র উক্তি। —'আপকো সাথ কুছ সওয়াল নেহি'।

নেতাজী বুঝলেন মালাটা নেবার জন্য পাঞ্জাবী যুবকটি বদ্ধপরিকর। কিন্তু ব্রিজলালও ছাড়তে রাজি নয়। তাই নেতাজী এগিয়ে এলেন দুইজনের মাঝখানে। থামিয়ে দিলেন তাদের বচসা। —বল, সর্দারজী তোমার কি বক্তব্য। সর্দারজীর উত্তর, আমার বক্তব্য একটাই। ঐ মালাটি আমায় দিন নেতাজী। শুধু মালাটি ছাড়া আমি আর কিছুই চাইনা। আমি আপনার কৃপাপ্রার্থী। ওটা থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না। এই নিলামে আমার শেষ ডাক—আমার বাড়ি, গাড়ি, গ্যারেজ, ব্যাঙ্কের সব টাকা, যেখানে যা কিছু আছে সব। সবকিছুর বিনিময়ে দয়া করে শুধু ঐ মালাটি আমায় দিন নেতাজী। —এবার শেষ বিচার। সুপ্রিম জজের রায়—মালাটি তুমিই পাবে সর্দারজী। এটা তোমারই। তোমার মত দেশ প্রেমিক সত্যিই দেশের গৌরব।

এখানে স্মরণীয় সুভাষচন্দ্র বসুর কণ্ঠের ঐ মালার জন্য যে নিলাম ডাকা হয়েছিল এমনটি কখনও কখনও প্রায়শই ঘটত। কারণ পূর্ব-এশিয়ায় নেতাজী ছিলেন কপর্দক শূন্য অথচ একটি সরকার চালাতে হতো তাঁকে তাই অর্থের যোগান অবশ্যই প্রয়োজন। যদিও তাঁর সিংহভাগ অর্থ আসতো জনগণের সহযোগিতায়। ঐ মালাটির মত আরও ঘটনা পূর্ব-এশিয়ার বুকে অনেক ঘটেছে। সুভাষচন্দ্র বসু বা নেতাজীর গলার মালার সর্বোচ্চ দাম কত উঠেছিল তার তথ্য পাওয়া যায়—সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় রচিত "সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র" পুস্তকের ১৪২ পৃষ্ঠায়, সেখানে দেখা যাচ্ছে এমনি

একটি নিলাম করা মালার নিলাম মূল্য উঠেছিল ১২ লক্ষ টাকা।

পূর্ব-এশিয়ার বুকে দাঁড়িয়ে সেদিনের নেতাজীর এই রূপ যে কত কর্মকাণ্ড বা তাঁর নামের যাদুর যে কত অবিস্মরণীয় ঘটনা আছে তা এক কথায় বর্ণনার অতীত। অনেক ঘটনা মহামানবদের জীবনে ঘটে। একথা সত্য। কিন্তু নেতাজী সুভাষের মহাজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর একটিরও সাথে কি কারো কোন ঘটনার অর্থাৎ অন্য কোন মহাজীবনের কোন ঘটনার উপমা কেউ দিতে পারবেন, না পাওয়া যায়? সুভাষচন্দ্র ও নেতাজীকে আমরা জানিও না চিনিও না। এ তত্ত্ব সম্পর্কে ইতিপূর্বে এক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র হলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের প্রবাহিত ভাবধারা স্রোতের অপর নাম। এই প্রবাহিত স্রোতের অনুধ্যানেই তিনি আজ মহামহিম শ্রীমদ্ সারদানন্দজী নামে নামী ও খ্যাত। এবং বিশ্ববন্দিত। আমরা ভারতবাসীরাই যখন সুভাষচন্দ্র বসুকে সম্যকভাবে চিনতে জানতে বা উপলব্ধি করে উঠতে পারিনি তখন নেতাজী বা শ্রীমদ্ সারদানন্দজী নামক ত্রিকালদ্রষ্টা মহর্ষিকে চিনতে পারবো জানতে পারবো কোন মহিমায়? উপলব্ধিতো বহুদূরের কথা। নেতাজী ও শ্রীমদ্ সারদানন্দজী রূপটি তো তাঁর আরও লক্ষযোজন দূরের জ্যোতিষ্ক ও নক্ষত্র। তাঁদের চেনার দুর্লভ স্পর্ধা হবে কোন যাদুবলে?

স্বামীজী চেয়েছিলেন বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হোক এক স্বর্গীয় সুষমা মণ্ডিত মানবিক যুগ। কিন্তু তিনি তাঁর সেই মহান কর্ম সমাপন করে যেতে পারেননি। তিনি শুধু তাঁর স্বপ্নের ও কল্পনার শিলান্যাস করেছিলেন। তিনি তাঁর সাধনাকল্পের মন্ত্র উদ্‌গাতা ঋষিমাত্র। শুধু বীজমন্ত্র দাতা তিনি। এমন সময়ই তাঁকে তাঁর অনিবার্য ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যেতে হলো। অতি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর আরব্ধ কার্যের দায় এসে পড়ল অন্যের কাঁধে। শুধু অন্যের উপর পড়লেই তো হবে না। স্বামীজীর অসমাপ্ত কাজ করতে হলে তো চাই আর একজন স্বামীজী, আর একজন বিবেকানন্দ। আর একজন স্বামীজী না হোক অন্তত তাঁর উত্তরসূরি তো বটেই। নতুবা তার রূপ দেবার সাধ্য বা শক্তি কার? সেই উত্তরসাধক বা উত্তরসূরি হিসেবে আমরা অতি স্বাভাবিক ভাবেই পৃথিবী ব্যাপী যাঁদের পাই তাঁদের মধ্যে যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রই সেরাতম জ্যোতিষ্ক তাতে আজকের পৃথিবীতে কারোই সন্দেহ নেই।

সুভাষচন্দ্রের নবলব্ধ রূপ যে নেতাজী তা আমরা বিশ্বের দিকে দিকে তাকালে প্রমাণ পাই, ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জাপান কর্তৃক মিত্রশক্তি জোটের হাতে আত্মসমর্পণের পর যখন নেতাজী তাঁর ব্রহ্মারণাঙ্গন থেকে সরে দাঁড়ালেন পরিস্থিতির চাপে, বা প্রকারান্তরে বলা যায় ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখে I.N.A. অর্থাৎ নেতাজী যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন কিন্তু আত্মসমর্পণ নয় কোন অবস্থাতেই। যুদ্ধবিরতি আর আত্মসমর্পণ এক কথা নয়। এই দুইয়ের পার্থক্য আমাদের কঠোরভাবে স্মরণ রাখতে হবে। ঠিক তার পনের দিন পরই ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সালে এশিয়ান মুক্তি

বাহিনী নিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র মিত্রশক্তির অর্থাৎ বৃটিশ-আমেরিকান শক্তিজোটের বিরুদ্ধে ভিয়েৎনাম মুক্তির নামে এশিয়ান মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন। এশিয়ান মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে তখন ১৯৪৬ সালে সুভাষচন্দ্রের মেজদা শরৎচন্দ্র বসু ভারতবর্ষে শ্রমিক ফ্রন্টে হরতাল ঘোষণা করেন এবং তা সার্থকভাবে পালন করেন। সেই থেকেই আজও চলছে নেতাজীর বিশ্বমুক্তি যজ্ঞ।

জাপানের পতন বা আত্মসমর্পণের তারিখটা ছিল ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগষ্ট। ঠিক তার পক্ষকাল পরেই বৃটিশ-আমেরিকার বিরুদ্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়ক হিসাবে যুদ্ধঘোষণা। বিশেষভাবে স্মরণীয় তখন সুভাষচন্দ্র নিজের একক শক্তি বলে এই দুই মহাশক্তিধরের সঙ্গে challange ঘোষণা করেন। সমগ্রবিশ্ব এই ঘোষণায় চমকে উঠেছিল কি করে তা সম্ভব? এর শক্তির উৎসের কি কোন ব্যাখ্যা মনুষ্য মস্তিষ্কের দ্বারা সম্ভব? একটি সরকার বা একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রথম ও সর্বপ্রধান শর্ত হচ্ছে একটি স্থায়ী ভূ-খণ্ড থাকতে হবে। সুভাষচন্দ্র তাঁর সরকারের নামকরণ করেছেন স্বাধীন ভারত সরকার বা আই. এন. এ. সরকার। কিন্তু বিশাল ভারত ভূমিটাইতো সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের কবজায়। তবে সেই সরকারের দাঁড়াবার জমি কোথায় শক্তির উৎসই বা কোথায়? কিন্তু নেতাজী তাই করে বিশ্বের সম্মিলিত বৃহত্তম শক্তির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এতেই কি প্রমাণ করেননি তিনি জাপান কেন পৃথিবীর যেকোন শক্তিধর রাষ্ট্রের মর্যাদার চেয়ে তাঁর সরকারের মর্যাদা কোন দিক থেকেই কম নয়। একটি শক্তিধর সরকারের যা যা ক্ষমতা ও করণীয় তার সবই আজাদ হিন্দ সরকার তথা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ছিল। এ শুধু কথার কথা নয়। এরও প্রমাণ তিনি সকল ব্যাপারেই রেখেছেন। অর্থনৈতিক ব্যাপারে I N.A. সরকার ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। তারও সাক্ষ্য আছে। যথা I N.A. সরকার জার্মান থেকে পাঁচ লক্ষ ইয়েন ঋণস্বরূপ নিয়েছিল তা যথাসময়ে শর্ত অনুসারে ফেরৎ দিয়েছিল ঐ যুদ্ধকালীন অবস্থানে থেকেই। ঐ যুদ্ধকালীন সময়ে ১৯৪৪ সালে তৎকালীন ভারতের বৃটিশ সরকারকে বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় লক্ষ টন চাউল দিয়ে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাছাড়া জাপানের সঙ্গে ও অর্থনৈতিক বিনিময় ছাড়া কোন সাহায্যই নেতাজী গ্রহণ করেননি। এই সবই I N.A. সরকারের অর্থনৈতিক ইতিহাস বলছে। বলছে তৎকালীন পত্রপত্রিকা।

যাইহোক ১৯৪৫ সালে জাপানের আত্মসমর্পণের পর বস্তুত পক্ষে যা হওয়া উচিত ছিল তা হচ্ছে নেতাজীকে গ্রেপ্তার করে বৃটেন-আমেরিকার হাতে অর্পণ। কিন্তু শক্তি সাম্যের বিচারে জাপানের সে ক্ষমতা ছিল না। এ থেকেই নেতাজীর অবস্থান সার্বিকভাবে অনুমেয়। এতেই এটাও প্রমাণিত I.N.A. সরকার বা নেতাজীর অবস্থান জাপানের সমতুল্য এক সমান্তরাল শক্তিতে শক্তিমান। অথচ এহেন আজাদ হিন্দ সরকার বা নেতাজীকে কত ঘৃণ্যভাবেই না কমিউনিস্টরা কটাক্ষ করেছে। তাঁকে বলেছে পাপেট, কুইসলিঙ, তোজোর কুত্তা আরও কত কি। পক্ষান্তরে বলতে হয় এই অভিধাগুলি

কি তাদেরই অঙ্গের সত্যিকারের ভূষণ নয়? শুধু সেদিনই নয় আজও ঐ ভূষণগুলি তাদের গায়ে জগদ্দলের মত এঁটে আছে। সুভাষচন্দ্রের বীরত্বব্যাঞ্জক কর্মের পরিসীমা কোন ঐতিহাসিক নির্ণয় করতে পারবে বলে বিশ্বাস করি না।

কারণ যে জার্মানি নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে সাবমেরিনে দূরপ্রাচ্য জাপানে যাবার ব্যাপারে প্রচুর সহযোগিতা করেছিল বলে সমগ্র বিশ্ববাসী জানে, সেই জার্মানই কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে রাশিয়ার গুপ্তচর সন্দেহে একবার বন্দী করেছিল। যে জার্মান তাঁকে বন্দী করেছিল তারাই ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তাঁকে মুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। না, কোন অভিভাবক রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপ্রধান সুভাষচন্দ্রের হয়ে মুচলেকা দিয়ে মুক্ত করেনি। সুভাষচন্দ্র নিজ প্রতাপেই মুক্ত হয়েছিলেন। বিশ্বত্রাসি হিটলারের নামে তখন বিশ্ব কাঁপছে। এমন জবরদস্ত হিটলারের হাতে বন্দী এবং কারো মুচলেকা তো নয়ই এমন কি নিজের মুচলেকা ছাড়াই নিঃশর্ত স্বসম্মানে মুক্ত হয়েছিলেন। একথা কি বিশ্বাস করতে হবে! ভাবা যায়! শুধু তাই নয়, আরও আশ্চর্য যখন নেতাজীর দূরপ্রাচ্যে যাবার পরিকল্পনার প্রস্তাব হিটলারকে দেওয়া হলো তাতে তিনি রাজি ছিলেন না এই সাহায্যে। সেই হিটলারই বাধ্য হলো নেতাজীর প্রস্তাব মত ব্যবস্থা করতে। তাঁরই নাম নেতাজী সুভাষ। তাঁরই নাম বিশ্বের বিস্ময়, বিশ্বের সেরাতম আশ্চর্য।

হিটলারের প্রদত্ত বাধাই শুধু অতিক্রম নয়, যে হিটলার সুভাষচন্দ্রকে বন্দী করেছিল, যে হিটলার সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব নাকচ করেছিল দূরপ্রাচ্যে যাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে, সেই হিটলারই জাপান কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরোপিত সকল প্রতিবন্ধকতাই নাকচ করে সুভাষচন্দ্রের দূরপ্রাচ্যে যাবার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। স্মরণীয়, জাপানও কিন্তু সুভাষচন্দ্র দূরপ্রাচ্যে বা জাপানে আসুক তা চায়নি। এর জন্য নানা অজুহাত দেখিয়েছিল। জাপান সুভাষচন্দ্রের দূরপ্রাচ্য বা জাপানে আগমনকে সহজভাবে ভালো চোখে দেখেনি। তাই তাঁরা হিটলারকে জানিয়েছিল জাপানী মৌলিক অধিকার অনুসারে বিদেশাগত যেকোন ব্যক্তি যদি মিলিটারী বা রাষ্ট্রপ্রধান না হন তবে সেই ব্যক্তি জাপানী সাবমেরিন পেতে পারেন না বা ব্যবহার করতে পারেন না। তার উত্তরে হিটলার জাপানকে পরিষ্কার জানিয়েছিল সুভাষচন্দ্র হচ্ছেন একজন রাষ্ট্রপ্রধান। অতএব এক্ষেত্রে জাপানের আইনগত কোন আপত্তি বা বাধা থাকতে পারেনা।

স্মরণীয় যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র জার্মান পৌঁচেছিলেন রাশিয়ার তাসখন্দ ও মস্কো হয়ে। তখনই তিনি রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলটোভের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। সুভাষচন্দ্র যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মাথায় রেখেই রাশিয়ান নেতাদের সঙ্গে আলোচনা সম্পাদন করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তী ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

উপরের তথ্যচিত্র থেকে আমরা কি কি পেতে পারি তার একটু পর্যালোচনা করা যাক। সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগ ১৯৪১ সালের ১৬ই বা ১৭ই জানুয়ারী। ঐ তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা আজও বিভ্রান্তিতে আছে। যাইহোক সেই জানুয়ারী থেকে ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত অর্থাৎ জাপানের আত্মসমর্পণের তারিখ পর্যন্ত যে ফিচার চিত্র আমরা পাচ্ছি তাতে দৃষ্টি রাখলে যা পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে এক কথায় শুধু

বৃটিশ-আমেরিকাই সুভাষচন্দ্রের শত্রু ছিল না। অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও জার্মান ও জাপান সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সন্দেহজনক ও বৈরিতা মূলক আচরণ করেছে। তার যে সাক্ষ্য তা আমরা ইতিহাস থেকে পাই যা উপরে এইমাত্র আলোচিত হলো। আর যাত্রাপথে রাস্তাঘাটের বিপদ সঙ্কুলতার তো কোন মাত্রা ছিলই না। এসব তো ছিল নিত্যসঙ্গী। আর আহার নিদ্রার তো প্রশ্নই আসে না। এসব প্রশ্ন উঠানোই মূর্খতা।

এবার চিন্তা করুন যে জার্মানী বা জাপানীর চোখে সুভাষচন্দ্র আদৌ সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিলেন না শুধু তাই নয় জার্মানরা তাঁকে হাতেকলমে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করেছিল, সেই সুভাষচন্দ্র বীরদর্পে তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে তাদের পরাভূত করেছিলেন এবং তাঁদেরই সাহায্য আদায় করে ছেড়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র যে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পৃথিবীর যেকোন রাষ্ট্রনায়কের চেয়ে কম মর্যাদাশীল ছিলেন না এমনকি হিটলার তোজোর চেয়ে বরং সেরা ছিলেন বা সমান ছিলেন তা তাঁর বীরত্বব্যাঞ্জক প্রতিটি কর্মকাণ্ডই বারবার প্রমাণ করেছে। তিনি তাঁদের কাছ থেকে যেটুকু সাহায্য পেয়েছেন তা যে তোয়াজ করে আদায় করেননি তার সাক্ষ্য সর্বত্র। কোন এক প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলতে বাধ্য হয়েছিলেন হিটলার সম্পর্কে যে, "Hitler is at liberty to lick British boots." অর্থাৎ হিটলার বৃটিশ বুট চাটতে পারেন। অন্য এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন—হিটলারের দো ভাষীকে— "Tell His Excellency that I have been in politics all my life and that I don't need advice from any side." একথা শুনে সেদিন সমগ্র বিশ্ব আঁতকে উঠেছিল। এই বুঝি সুভাষচন্দ্রের গর্দান গেল, হিটলারের কালো হাতে। কিন্তু না, কিছুই হলো না। পরন্তু জাপান সরকারের কাছে হিটলার সুভাষচন্দ্রের হয়ে ওকালতি করল। বিশ্ববাসী সেদিন শুধু দেখতে থাকল সুভাষচন্দ্রের নিকট থেকে চমকের পর চমক। মনে রাখতে হবে যে, অবশ্যই এসব লোক দেখানো বা লোক ঠকানো চমক নয় আজকের তথাকথিত ভারতীয় নেতাদের মত। আর জাপান? তার কথাতো এই অধ্যায়েই রয়েছে। কিভাবে এবং কেন দশ হাজার জাপানী সৈন্যকে পূর্ব-এশিয়ার বুকে তিনি হত্যা করিয়েছিলেন। এযে দেখছি যার খাব তাকেই চোখ রাঙ্গাবো সেইরকম ব্যাপার। অন্যায়ভাবে বা বেআইনী ভাবে তিনি তা করেননি। সিংহ বিক্রমে সদর্পে তিনি ঐসব করেছেন অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত কারণে। —যার ফলে পূর্ব-এশিয়ার ত্রাস জাপান এ-ব্যাপারে স্পিক টি নট। এই হচ্ছেন নেতাজী সুভাষ। এমনি করে বিশ্বের অলিতে গলিতে কত যে তথ্যাতথ্য সুভাষচন্দ্রের রচিত মহাভারতে ছড়িয়ে আছে তার কি কোন সীমাসংখ্যা আছে? তাই বলছিলাম, কোন ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব নয় সমস্ত উদ্ধার করা। এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যেতে পারে।

এমন যে সুভাষচন্দ্র তাঁর সম্পর্কে যারা সেই সময় নানা অশালীন কুৎসা ও বিশেষণে আক্রমণ করতেন তারা যে শুধু সেইদিনই বৃটিশ-আমেরিকার তল্পিবাহক ছিল তাই নয়। তারা আজও বৃটিশ-আমেরিকার তল্পিবাহক ও চাটুকার সেজে প্রজন্মান্তরের জন্য

বিদেশী প্রভুদের কাছে দাসখত দিয়ে রেখেছেন তা তো আজ আর ঘোমটার আড়ালে নেই। তা আজ দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীর কাছে চন্দ্র-সূর্যবৎ সত্য এবং জলবৎ স্বচ্ছ। তারা কি সুভাষচন্দ্রকে ঐসব অভিধায় আক্রমণ করতে গিয়ে নিজেদের চরিত্রহীন চরিত্রটাই দেশবাসী ও জগৎবাসীর কাছে আরও সুস্পষ্ট করে তোলেননি? তারাতো তাদের ন্যক্কারজনক চরিত্রটাকে অধুনা আরও পরিষ্কার করে দিয়েছেন তাদের সুভাষ নাম জপমালা ধ্যান ও সুভাষ নামের মানব শৃঙ্খল বন্ধনের মাধ্যমে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন পূর্ব-এশিয়ায় অবস্থান করছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তখন বলতে গেলে মহাশূন্যেই অবস্থান করছিলেন। কারণ তিনি তো তখন I.N.A.-এর সর্বাধিনায়ক অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু কার্যত ভারত ভূখণ্ড থেকে সহস্র সহস্র যোজন দূরে তো বটেই এমনকি আমরা ভারতবাসীরা পর্যন্ত তাঁকে নৈতিক সমর্থন করেও তাঁর প্রতি ন্যূনতম সহমর্মিতা জানাইনি। পরন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অন্তহীন প্রোপাগাণ্ডাই করেছি বৃটিশের তল্পিবাহক সেজে দিনের পর দিন মাসের পর মাস। এখানেই শেষ নয়—বেয়নেট নিয়ে কেউবা বুলেটের মালা নিয়ে অপেক্ষা করেছি কখন তাঁকে বাগে পাই। তিনি সসৈন্যে ভারতে প্রবেশ করলে ভারতের সর্বনাশ ঘটবে। এমন প্রচার শুধু ভারতীয় কমিউনিস্টদেরই ছিল না। জাতীয় কংগ্রেসও বেয়নেট হাতে প্রস্তুত তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য। এসবই ইতিহাস বলছে। এসব আজকের প্রজন্ম শুনে কি বিশ্বাস করবেন? হয়ত অবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কেউ প্রতিবেদকের প্রতি রুষ্ট হয়ে প্রতিকার করতে চাইবেন। কিন্তু বন্ধু, বিশ্ব ইতিহাস নামক যে এক জীবন্ত প্রাণপুরুষ এসব ঘটনার সাক্ষী দেবার জন্য অমর ফল খেয়ে চিরদিনের জন্য জ্বলজ্বল করছে বিশ্বগ্রন্থশালায়, তার গায়ে হাত দেবার ক্ষমতা কি কারো আছে? সে যত বড় ক্ষমতার অধীশ্বরই হোক না কেন?

যাই হোক, ঐরূপ একটা পরিস্থিতিতে যখন সুভাষচন্দ্র প্রায় শূন্যে ভাসমান তখন পূর্ব-এশিয়ার বুকে কি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটছে এবং সুভাষচন্দ্র সেই ঘটনাবলী কিভাবে মোকাবিলা করছেন আসুন তা একটু দেখা যাক। ইতিহাস বলছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ যখন একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে তখনই ঐসব ঘটনা একের পর এক ঘটছে এবং নেতাজী তার প্রতিবিধানে ব্যস্ত। এ সম্পর্কে সত্যব্রত তপাদার কৃত 'এশিয়ার জাতীয় মুক্তিআন্দোলনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র'—নামক প্রবন্ধে আমরা যা পাচ্ছি সেই বর্ণনা পাঠ করলে পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের যেকোন ব্যক্তি স্তম্ভিত হবেন, হতবাক হবেন। আসুন সেই প্রবন্ধের ভাষায়ই ব্যাপারটা জানার চেষ্টা করি। সেখানে যাবার আগে আমরা যাত্রাবিরতি করে আসুন একটু অন্যত্র ঘুরে আসি। যদিও এ ব্যাপারটা কয়েক বৎসর পরের ঘটনা।

এখানে যে ঘটনাকে আমরা এক ঝলক দেখতে চাইছি তা হচ্ছে আমাদের অর্থাৎ ভারতের মহান পড়শি চীন সংক্রান্ত ব্যাপার। এ-ঘটনা অবশ্যই ৪৫/৪৬ সালের নয়। এ-ঘটনা ১৯৪৮-১৯৪৯ সালের চীন ভূখণ্ডের এবং চীনা নেতাদের এক মহান কৃতিত্বের

অধ্যায়। লক্ষ্য করুন বিশ্বত্রাসি শক্তিগুলো যখন সুভাষচন্দ্রের কাছে নাস্তানাবুদ তখন বৃটিশের ভারতীয় তাঁবেদারদের দুই শক্তি কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা যখন পৃথিবীব্যাপী সুভাষচন্দ্রের কুৎসায় মাতোয়ারা এবং তাদের একজন বেয়নেট হাতে আর একজন বুলেটের মালায় অভ্যর্থনা জানাতে নিশপিশ করছে তখন অর্থাৎ তার কিছুকাল পর সুভাষচন্দ্রের বিশ্বময় কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ হয়ে মহা চীনের মহান নেতা স্বয়ং মাও-সে-তুং, চৌ-এন-লাইরা নেতাজীকে সাদরে গ্রহণ করেন, এবং তাঁর সাহায্যে বিপ্লবকর্ম সুসম্পন্ন করেন। সেটা হচ্ছে ১৯৪৯ সালের ঘটনা। তাতে দেখছি সুভাষচন্দ্রের সত্যিকারের পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়ে তাঁর সাহায্য নিচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। আর পক্ষান্তরে অপরদিকে ভারতবর্ষের ভূমি-পুত্র হয়ে তিনি অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র তাঁরই দেশবাসী তথা তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মী জওহরলালের কাছে পাবার প্রতীক্ষায় আছেন কখনও তরবারীর চুম্বন কখনও বেয়নেটের হুঙ্কার ধ্বনি। আর কমিউনিস্টরা বলেছেন তারা সুভাষচন্দ্রকে ফুলের মালায় নয় বুলেটের মালায় সাদর সম্বর্ধনা জানাবেন। এ তথ্যও আমরা আগে পেয়েছি। এই হচ্ছে ভারতীয় জনগণের প্রতিভূ এবং মহান চীনের মহান জনগণের প্রতিভূদের কর্মের পরিচয়। এবার ভাবুন চীন কেন দারিদ্র মুক্তির পথে আর ভারত কেন অর্থনৈতিকভাবে বৃটিশ-আমেরিকার এমনকি অনেক ব্যাপারে রাজনৈতিকভাবেও তাদের গোলাম। যদি তাই না হবে তবে ভারত কেন এবং কি কারণে কমনওয়েলথের সদস্য হবে বা 'গ্যাট'—চুক্তির দাসত্ব করবে? যে গ্যাটচুক্তি নাকি ১৯৪৮ সাল থেকেই সাম্রাজ্যবাদীদের একটি অর্থনৈতিক আক্রমণের হাতিয়ার। এখানেই চীন ও ভারতের মৌলিক ব্যবধান। কেন চীন সিংহবিক্রমে চলবে না? কেন চীন বিশ্বনিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হবে না? তাতে সুভাষচন্দ্রের বিন্দুবিসর্গ কিছু যায় আসেনি। কিন্তু এই বেইমানী বেসাতির ফল আজ ভারতবাসী হাতেহাতেই পাচ্ছে। তথাকথিত স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর যেতে না যেতেই ভারতীয় নেতাদের শাসন রজ্জু আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে একবার ভাবুন। কেন্দ্র তার নিয়ন্ত্রাধীন রাজ্য সরকারের প্রতি কোন অন্যায়েরও ন্যূনতম প্রতিবাদ করতে পারছে না। কিন্তু কেন? ঔপনিবেশিক শাসনে এর বেশী প্রত্যাশা করা মূর্খতা। আজ ভারতের যেপ্রান্তে তাকানো যায় সেখানেই দেখা যাচ্ছে তাদের অর্থাৎ কেন্দ্রের কোন 'say'—নেই। নেই কোন এক্তিয়ার? এই কি স্বাধীন ভারতের স্বাধীন চেহারা? এই স্বাধীন ভারত সম্পর্কে তৎকালীন সোভিয়েত নেতা মলটোভের প্রতিক্রিয়া শুনুন।

স্মরণীয় যে, "রাষ্ট্রসংঘের নতুন সদস্য পদের জন্য যখন সোভিয়েতের সঙ্গে বৃটেন-আমেরিকার কেচাল চলছে এবং বৃটেন বলছে নতুন পোল সরকার পোল্যাণ্ডের বৈধ সরকার নয় তখন সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলটোভ ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে বলছেন, ভারতীয় কলোনী থেকে একটা মাইনে করা লোক এনে রাষ্ট্রসঙ্ঘে বসিয়ে তোমরা বলছ উনি ভারত সরকারের বৈধ প্রতিনিধি। আর যে পোলরা নাৎসীদের বিরুদ্ধে লড়ছে এবং

তাদের তাড়িয়ে মুক্ত পোল্যাণ্ড সরকার দাবী করছে তারা বৈধ নয়। কিন্তু এমন দিন আসবে যখন তোমাদের ঐ মাইনে করা লোকের আসনে এসে বসবে স্বাধীন ভারতের বৈধ প্রতিনিধি"।

(নবভারত কো. বি., পৃষ্ঠা—২৪, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

আসুন, আমরা আবার ফিরে যাই আমাদের মূল অধ্যায়ে এবং মূল প্রতিপাদ্যে। আমরা পূর্ব-এশিয়ার কর্মকেন্দ্র থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছিলাম অনিবার্য কারণে। আবার সেখানেই চলুন। সেখানে ফিরে সত্যব্রত তপাদারের প্রবন্ধের ভাষায় যা পাচ্ছি তা তাঁর ভাষায়ই আসুন শুনি—

"....জাপান তখন সিঙ্গাপুর দখল করেই চীনদেশীয় পাঁচ হাজার যুবক যারা বিভিন্ন ব্যবসা ও সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিল, তাদের রাস্তায় এনে অকারণে কোন বিচার ব্যবস্থা না করেই হত্যা করে বৃটিশ-ভারতের পরাজিত সৈন্য দিয়ে মরদেহগুলি নিয়ে যাবার হুকুম দেয়।"

রাশিয়ার মহাফেজখানার কয়েকটি বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হল।

(1) The capture of Singapore was followed by mass shooting of the City Chinese population. The Chinese area were blocked off by light tank, men of Chinese nationality were separated from women and children, divided into hundreds and machine-gunned. On the beach near the posse camp at Chanchi, the British prisoners of war were ordered to bury the dead Chinese. Shortly after the occupation of Singapore the number of executed Chinese reached 5,000

(The Far East in the second world war, Page—170)

(2) The invaders zealously stressed that the Yomato race—the Japanese was the top race and was followed by the Indonesians, the privileged indigenous, other Asian people coming third people born in Indonesia from mix marriages of Europeans and Indonesians forth and 'full-blooded' European who were to be 'banished' from Asia-coast.

(The Far East in the second world war, Page—222)

(3) Many families, including some in the top brackets lost their daughter-girls were being sent to Japan allegedly for training in barracks, or to the front, where they were made to satisfy the animal instincts of soldiers and officers. Many of them lost their lives.

"এরই প্রতিবাদে নেতাজী প্রথমে মালয়ে চীনদেশীয়, মালয় অধিবাসী এবং ভারতীয়দের নিয়ে 'Three stars', United Army গঠন করে ১৯৪৫-এর জুন মাসের

মধ্যে দশ হাজার অত্যাচারী জাপানের সৈন্যকে খতম করেন। যুদ্ধ শেষ হলে, জাপানের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্য মূল এশিয়া ভূখণ্ডে থেকে যায়। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সালের আগে কোন জায়গায় U.N.O. কর্তৃপক্ষ 'disarm' অনুষ্ঠানে আসেনি। নেতাজী এদের নিয়েই United Democratic Army গঠন করেন।" (নেতাজী জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ। পৃষ্ঠা ৭১)

এই হচ্ছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এবার অনায়াসেই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র কি শুধু ভারতীয় জাতীয় নেতা? তিনি তো তখনই এশিয়ান জাতীয় নেতা তথা বিশ্বনেতা হয়ে বসে আছেন। যেখানেই মানবতার নিপীড়ন তিনিতো সেখানেই পরিত্রাতা তাঁকে ঠেকায় কোন শক্তি? কাজেই তিনি তো সেদিন থেকেই বিশ্বমানব মুক্তির রুদ্রতাপস। তিনি কি শুধুই ভারতীয় নাগরিক? কিংবা শুধুই ভারতের জাতীয় নেতা? তিনি তো বিশ্বনাগরিক, বিশ্বনেতা। জন্ম থেকেই তো তাঁর এই আরব্ধ কাজের সূচনা। তিনি পৃথিবীতে এসেছেন তো সেই জন্য। এমন যে নেতাজী সুভাষ তাঁকে কিনা বঞ্চিত করবে মর্ত্তবাসী জীবগণ? তাঁকে certificate দেবে কিনা মর্তবাসী জীবনগণ? আশ্চর্য! আরও আশ্চর্য তাঁকে প্রবঞ্চনা করবে কিনা জওহরলাল ও তার সহযোগী খলচক্রীরা? তাঁকে বন্দী করবে বিচার করবে বৃটিশ দুরাচারীরা? এতো দেখি কংস সেজে কৃষ্ণের সাথে খেলতে চাওয়া।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সেই যে মহাঅভিযান মহাযাত্রা মানব মুক্তির যজ্ঞ তার আজও না আছে ছেদ! নেতাজীর চূড়ান্ত উত্তরণের মধ্য দিয়েই পাই আজকের শ্রীমদ্ সারদানন্দজীকে। বিশ্ব যদি শ্রীমদ্ সারদানন্দজীকে না পেতো তবে বহু আগেই পৃথিবী দানবীয় তাণ্ডবে বিগত দুটি মহাযুদ্ধের থেকেও ভয়ঙ্কর বিগ্রহে বিদীর্ণ হয়ে গুঁড়িয়ে যেতো। এমন অবস্থা ইতিপূর্বে একাধিকবার পৃথিবীকে গ্রাস করতে করতে কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে বিলীন হয়ে গেছে। পৃথিবী তার ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে ফিরে এসেছে। এ তথ্য ওয়াকিবহাল পৃথিবীর সকলে জানেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত শৌলমারী আশ্রমে ভারতঋষি অরিন্দম রূপে প্রথম পদার্পণ করেন তখনই তিনি পৃথিবীকে জানান দিয়েছিলেন যে তিনি আর পূর্বাশ্রমের সুভাষচন্দ্র বসু তো নয়ই এমনকি পূর্বাশ্রমের বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় নেতা নেতাজীও নন। তিনি এখন শ্রীমদ্ সারদানন্দজী নামক এক মহর্ষি বই অপর কেউ নন। বা অন্য কোন নামেও পরিচিত নন। এই 'হ্যাঁ ও না'—দুইয়ের গোলক ধাঁধায় পড়ে শুধু গোটা পৃথিবীটাই নয়, তাঁর একান্ত অনুগামী বিখ্যাত বিপ্লবীরা পর্যন্ত একসময়ে হাবুডুবু খেয়েছেন এবং চূড়ান্ত বিভ্রান্তিতে নাকাল হয়েছেন। যদিও কিছু কিছু সহযোগী বিপ্লবী ব্যাপারটা উপলব্ধি করেছেন পরে। এমনকি অনেকে করতেও পারেননি। আর এই 'হ্যাঁ ও না'-এর ফাঁদ থেকে বেরুতে বিশ্বের তাবড় তাবড় নেতা ও কূটনীতিবিদরা চূড়ান্ত বিভ্রান্ত ও নাজেহাল হয়েছেন। দেখতে হবে এ কূটনীতি কার, যাঁর কূটনীতির

ফাঁদে পড়ে আজও বিশ্ব পরিত্রাহি করছে। সেই ১৯৪১ সালের ১৬ই জানুয়ারী কি ১৭ই জানুয়ারীর মধ্যরাত্রির নাটক থেকে সেই মহামান্যকে ভারতীয় কেতাদস্তুর ভেকধারীরা চালাতে চাইছিলেন এক নগণ্য মামুলী সাধু বলে। ভারতীয় নেতারা বাহাদুর বটে! বলাবাহুল্য ঐ সাধুজীর স্বর্গীয় রূপ, রস, গন্ধ, উপলব্ধি করা কি সাধারণ জৈবিক সত্তায় কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব? তিনি দেহধারণ করেছেন বলে কি আপনি আমিও সেই মার্গীয় বা সেই পরিমণ্ডলের একজন হয়ে গেলাম?

ইতিপূর্বে একস্থানে উল্লেখ আছে তেমন বিশাল মাপের আধার বা পাত্র না হলে বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উত্তরসূরি না হলে কি স্বামীজীর স্বপ্নের কেউ রূপকার হতে পারেন, না ভাবা যায়! না ভাবা সম্ভব? কাজেই সেই সত্তায় উপনীত হলে তবেই কেউ বিশ্বব্যাপী এক মানবিক তথা আধ্যাত্মিক যুগের কথা ভাবতে পারেন। সেই সত্তায় সত্তাবান হবার জন্য আমরা যাঁদের সাধন ব্রতে ব্রতী হতে দেখতে পাই তার মধ্যে একমাত্র সুভাষচন্দ্রকেই দেখছি তিনি সেই অসাধ্য সাধনার উত্তুঙ্গ শিখরে বিরাজমান। তাঁর এই অসাধ্য সাধনারই পরিণতিতে আজ আমরা সুভাষচন্দ্রের উত্তরণের পর উত্তরণের মধ্যে পাচ্ছি শ্রীমদ্ সারদানন্দজীকে বা সারদানন্দজী নামক এক বিশ্বপুরুষ তথা বিশ্বযজ্ঞের মহাঋত্বিককে। স্বামীজী কল্পিত মানবিক ও আধ্যাত্মিক যুগ শুধু এমন একজন সার্থক ও ব্যতিক্রমী যুগত্রাতা নীলকণ্ঠের পক্ষেই সম্ভব রূপায়িত করা বা স্বপ্নে দেখা। স্মরণীয়, যিনি জন্ম থেকেই এক অখণ্ড শক্তির আধার তাঁর কি কোন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে বিচরণ করে আজকের পর্যায়ে আসার প্রয়োজন ছিল? যিনি নিজেই এক অদ্বিতীয় পরমার্থিক শক্তি তাঁর এসবের মূল্য কি? অবশ্যই মূল্য আছে। আমরা যদি একটু গভীরে প্রবেশ করি তবে কি দেখি প্রত্যেক যুগপুরুষ এই মানব জগতে আসেন তাঁর সৃষ্টিকে শিক্ষা দিতে অর্থাৎ লোকশিক্ষার্থে তাঁদের এই পৃথিবীতে অবতরণ। প্রসঙ্গের প্রেক্ষাপটে বলা যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কি গুরুগৃহে শিক্ষা নেবার প্রয়োজন ছিল? ভারতীয় দর্শনের বিচারে অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। সেই লোকশিক্ষা। আমরা আরও দেখেছি মহাভারতের একটি দৃশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাসতী গান্ধারী কর্তৃক তিরস্কৃত হচ্ছেন। প্রশ্ন হচ্ছে এরও কি দরকার ছিল? এখানেও একই উত্তর। বরং আরও একটু পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় যখনই মানবদেহ ধারণ করেন তাঁরা তখনই পার্থিব বিধি বিধানের ব্যাপারটা এসে গেল। তিনি যে পরিধির হোন না কেন। কিন্তু এখানেও একটি কথা আছে বা ব্যতিক্রম আছে। যিনি পরমার্থিক লীলার অধীশ্বর তিনি যখন মর্তের কোন দেহধারীর রূপ ধারণ করেন তখন তিনি যা করবেন বা ঘটাবেন তার সবটাই সঠিক উপলব্ধি করতে পারলে বা বুঝতে পারলে দেখা যাবে তিনি যা করছেন হয় তা লোককল্যাণের জন্য বা জীবজগতকে আদর্শ পথে চলার শিক্ষা দেবার জন্য। আবহমান কাল যাবৎ যত মহান আত্মারা পৃথিবীতে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকের পার্থিব জীবনচর্চা করলে এ সত্যই প্রকটিত হয় বা হবে।

এখানে আলোচ্য প্রবন্ধের যিনি চালিকা শক্তি বা নায়ক তিনিও সেই জগতেরই এক সেরাতম রত্ন। তাঁদের সকল কর্মকেই তাই বলা হয় লীলা।

ভুললে চলবে না বিধাতার যেমন বিধান আছে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সকল ব্যবস্থাও তিনিই পাকা করে রাখেন। আমরা ব্যবহারিক জগতের সাধারণ জীব। তাই ঐসব ব্যাপারগুলো আমরা কখনও বুঝতে পারিনা। এমনকি তা কেউ বুঝিয়ে দিলেও গ্রহণ করতে পারিনা। কারণ আমাদের জ্ঞানের পরিধি সীমিত বলে তা গ্রহণ করতেও সক্ষম হই না। যা বলতে যাচ্ছিলাম। এই মহামহিম সারদানন্দজীকে জগত সমক্ষে চেনাবার বা পরিচিতি প্রকট করবার জন্য আয়োজন ও উপচারের যথাযথ ব্যবস্থাও ভগবান করেই রেখেছিলেন। সময়ই সব কিছুর নির্ঘন্টক। আমরা তা মানি, আর না-ই মানি, তাতে কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। পরন্তু বলতে পারি আমরা পরম ভাগ্যবান যে বিধাতার বিধান অনুসারেই পেয়েছিলাম ভারত বিখ্যাত মহান বিপ্লবী আরণ্যক মুনি কলির ভগীরথ মেজর সত্যভূষণ গুপ্তকে। যিনি পৃথিবীর সেরা ব্যক্তিত্বকে আবিষ্কার করে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে উদ্ভাসিত করেছেন এবং বিশ্বকে বাঁচার ও মুক্তির পরম আশ্বাসবাণী দিয়ে অমরলোকের অমরপথিক হয়েছেন। তিনি ছিলেন আজন্ম সুভাষ সাধক, সুভাষ নিবেদিত প্রাণ, ও সুভাষ ছায়াসঙ্গী। এমন সাত্ত্বিক সুভাষ নিবেদিত প্রাণসত্তা না হলে সেই স্বর্গীয়সত্তাকে চিনতাম আমরা কোন মন্ত্রবলে? আমরা সুভাষচন্দ্রকে ইতিহাসের আলোয় দেখলেও বা অংশত জানলেও নেতাজী ও শ্রীমদ্ সারদানন্দজীকে চিনতাম জানতাম কোন মাহাত্ম্যে? কারণ আমাদের সেই শক্তি কোথায়? আমরা তো ব্যবহারিক জগতের প্রাণী। কাজেই বলতেই হচ্ছে সবই সেই লীলাময় ঈশ্বরের খেলা।

এখানে বিশেষ উল্লেখ্য, এমন যে সুভাষ ব্রতে ব্রতচারী তাপস সত্যগুপ্ত তিনিও কিন্তু সহজ পথে অনায়াসে তাঁর উপাস্য দেবতা সুভাষচন্দ্র বা সারদানন্দজীকে প্রত্যক্ষ করতে পারেননি। শ্রীমদ্ সারদানন্দজীকে প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে বা তাঁকে আবিষ্কার করতে গিয়ে আরণ্যক মুনিকেও যথেষ্ট হোঁচট খেতে হয়েছিল। তবেই তাঁর পক্ষে ঐ দুঃসাধ্য কাজ করা সম্ভব হয়েছে। গুরু-শিষ্যের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণেই পরীক্ষা নিরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে তবেই তাঁরা একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে পেরেছেন। সে ঘটনাবলী বলতে গেলে সবারই অজ্ঞাত। কারণ যা ঘটনা ঘটেছে এতদ্ সংক্রান্ত তার সবই ঘটেছে শৌলমারী আশ্রম এক্তিয়ারের মাঝে এবং সাধারণ জনগণের কিছুটা আড়ালে। এসব ঘটনা সবসময় পত্রিকায়ও প্রকাশিত সম্ভব নয়। বা হয়নি। তবু আমাদের পরম সৌভাগ্য যে শেষ পর্যন্ত মেজর সত্যগুপ্তের শৌলমারী পর্বের মিশন পূর্ণ সাফল্যলাভ করেছে। এবং মানব জগৎ সেই আলোকবর্তীকায় আজ উদ্ভাসিত। এই সাফল্যের সোপান ধরে আমরা আজ মুক্তির আশায় মানব মুক্তির দ্বারদেশে উপস্থিত হতে পেরেছি। এবং অচিরেই সেই প্রত্যাশিত মুক্তির নবারুণ দেখতে পাবো। এটা কোন স্তোক নয়, বেমতলব হাসিল করার। এই ঘটনা যে ঘটতে চলছে তা চন্দ্র-সূর্যের মতই স্বাভাবিক সত্য।

আজ হোক কাল হোক তা ঘটবেই। উপলব্ধি জ্ঞানকে যথার্থ সঠিকভাবে প্রসারিত করতে পারলেই এই চরমসত্য আপনার আমার কাছে প্রতিভাত হবে। এ-প্রসঙ্গে এখানে একটি সুভাষচন্দ্রের রচিত কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে, যা বিশেষভাবে স্মরণীয় ও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করছি। এই কবিতাটি রচনা করেন যখন তিনি বেরিলিতে সুভাষ বালবাটি আশ্রম করে সেখানে অবস্থানরত ছিলেন তখন। তখন তিনি ড: যোগীন্দ্র সিং বা বাবা হনুমানগীর এই নামের ছদ্মবেশে ছিলেন। সম্ভবত সময়টা ছিল ১৯৫৯ সাল। আসুন কবিতাখানিতে তিনি কি বলতে চাইছেন তা আমরা দেখি। স্মরণীয়, কবিতাখানি ছিল উর্দু ভাষায় লিখিত। কবিতাখানি হচ্ছে :

পীকর গরীবোঁকে খুন জিসম্ জিস্নে বাঢ়ায়েঙ্গে
ওখুন ময়সিবখানেমে শিশিয়োমে হাম ভরওয়ায়েঙ্গে।
হ্যাঁয় দের আভি আন্ধের নেহী
হাঁকগে যিধর হাঁক যায়েঙ্গে
যিস্ বক্ত্ হামারী বন আয়ী
লোহেকে চানা চাবায়েঙ্গে
গুলে এক তরফ হো যায়েঙ্গে।
হাম নাঙ্গে উমার বিতায়েঙ্গে
ভাইয়ো পর বারে যায়েঙ্গে
হাম শুখা চানা চাবায়েঙ্গে
ভারতকো পার লাগায়েঙ্গে।

এই উর্দু কবিতাখানির ভাবানুবাদ করলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে নিম্নরূপ—

দরিদ্র বুভুক্ষু মানুষের রক্ত শুষে শুষে,—
যাঁরা ভুঁড়ি মোটা করছে,
অসম্ভব বেড়ে যাওয়া বুকের ছাতিটা যাদের
দানবীক ক্রুরতায় ব্যঙ্গ করছে অসহায় পঙ্গু মানুষকে,
কষাইখানায় নিয়ে নিয়ে—
তাদের পাপ দেহগুলো কেটে ছিঁড়ে সবটুকু রক্ত
আমি নিংড়ে নেবো, নিংড়ে নেবো বিলিয়ে দিতে—
নিরন্ন শীর্ণ মানুষের শিরায় শিরায়।
হয়ত বিলম্ব আছে (তবু বিলম্ব নয়)
আঁধারের বুক চিরে বুভুক্ষুর হাহাকার
দিগন্তে এঁকেছে দেখ সুবর্ণ বারতা।
যখন তোমাদের সকলের প্রতিনিধি রূপে প্রকাশ্যে
বল্লাটা ধরবো বজ্রমুষ্ঠিতে (এবং ধরবই)

শত্রুর বুলেট যদি আসে, আমার শক্ত দুপাটি দাঁত দিয়ে
ভেঙ্গে চুরে গুঁড়িয়ে দেবো ভাজা ছোলার মত।
এবং যেখানেই তোমরা ডাকবে
আমি ছুটে যাবো।
কারণ তোমাদের জন্যই আমার সাধনা।
নিজেকে ঘোষণা করে—
দক্ষ সাপুড়ের মত ঝাঁপির মুখটা যখন খুলে দেবো
পর্দাটা তুলে ধরবো তোমাদের সম্মুখে তখন—
দেখবে একে একে বেরিয়ে আসবে বিশ্বাসঘাতকের দল।
অত্যাচারী, শোষক ও বিশ্বাসঘাতকদের তোমরা অনায়াসে
চিনতে পারবে। চিনতে পারবে সেরা সেরা সত্যকার
সাচ্চা মানুষদের। —যারা আড়াল হয়ে আছে।
কারণ নিষ্ঠুর ধুনকরের মত ধুনে ধুনে ঝেঁটিয়ে ঝেঁটিয়ে—
বার করে ফেলবো, আমি মুখোসধারী, ভণ্ড হটকারী দেশদ্রোহীদের।
বার করে দণ্ড দেবো চরমতম
এবং নির্লিপ্ত নিরাসক্ত সন্ন্যাসী আমি এই
দুঃখী দীন ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবো অটল ধৈর্যে।
শুধু শুকনো দুমুঠো চানা চিবিয়ে—
সম্পদ ও সম্মানের চাবিকাঠি তুলে দেবো তোমাদের হাতে।
নিয়ে যাবো আমার ধ্যানের ভারতবর্ষকে
সার্থকতার চরম শীর্ষে।

বলাবাহুল্য এই কবিতাখানিতে যে ভাবার্থ পাওয়া গেল তা অবশ্যই কোন বর্তমান রাজনৈতিক নেতা বা রাষ্ট্রনায়কের স্বপ্ন প্রতিফলিত নয়। এমন স্বপ্ন হতেই হবে তেমন মহাজনের যিনি সত্যই দেশকে অন্তর থেকে ভালোবাসেন। গত অর্ধশতকের ভিতর ভারতবাসী যে, কোন দেশপ্রেমিক জননেতা বা রাষ্ট্রনেতা পায়নি তাতো চরম সত্য। কাজেই এমন স্বপ্ন সুভাষচন্দ্রের পক্ষেই শোভা পায় বা মানায়। তাই তিনি যথার্থই লিখেছেন তাঁর ছদ্মবেশের মাধ্যমে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত যখন নেতাজী সুভাষ তথা শ্রীমদ্ সারদানন্দজী নামক ভারত মহর্ষিকে উত্তরবঙ্গের শৌলমারী আশ্রমে তাঁর অবস্থানের কথা প্রথম আবিষ্কার করেন তখন স্বয়ং সাধুজীর ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্র বারবার বলেছেন মেজর গুপ্তকে যে, তোমরা যাঁকে নেতাজী সুভাষ বলছ, নেতাজী সুভাষ ভাবছ, তিনি কিন্তু কোন অবস্থাতেই তোমাদের সেই নেতাজী সুভাষ নন। তবে কি মেজর সত্যগুপ্তের যে এত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নেতাজী বলে সাধুর ছদ্মবেশকে কষ্টিপাথরে বিচার

করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল তা একেবারে ভেস্তে যাবে। শূন্যে মিলিয়ে যাবে? এত বড় ভুল? না, তা হতেই পারে না। কিন্তু এই জটিল সমস্যা সমাধানের উপায় কি? কিন্তু একটু গভীর অনুশীলন করলে বস্তুতপক্ষে দেখা যাবে ঐ সাধুজীর উক্তির মধ্যেই তিনি রেখে দিয়েছেন এই সমস্যা সমাধানের যথার্থ উত্তর। সাধুজীর ঐরূপ উক্তি কোন কল্পনাশ্রিত বা কল্পনা বিলাসিতা নয়। একটু বিশ্লেষণী অনুধাবন করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আসুন, আমরা সেই দৃষ্টি মেলে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করি। সুভাষচন্দ্রের কূটনৈতিক খেলার সঙ্গে বিশ্বে যাঁরা বিশেষভাবে পরিচিত তাঁদের মাঝে মেজর গুপ্ত ছিলেন অন্যতম। তাই তাঁর ঐ ধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসতেও খুব একটা কসরৎ করতে হয়নি। তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছেন যে,

"I am convinced, I met
Netaji in the guise of
Shrimat Saradanandaji
at Shaulmari Ashram."

—Major Satya Gupta
9th February 1962

এবং এই ঘোষণার ফলস্বরূপ আর এক ভারত বিখ্যাত বিপ্লবীও মেজর গুপ্তের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পেরেছিলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যে,

"Netaji is coming, follow his lead—for real independence. Azad Hind Government will again function in undivided India."

—Supati Roy, 1962

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে অবশ্যই যে, এ দুইজনই হচ্ছেন ভারতবর্ষের বিপ্লব ইতিহাসের দুই কালজয়ী দিকপাল তথা দুই উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। এঁরা দু'জনই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ব্রহ্ম রণাঙ্গনের সময়ের হোমফ্রন্টের ছিলেন দুই মহাস্তম্ভ। বেঙ্গল ভল্যান্টিয়ার্স যখন ভারতবর্ষে বিপ্লব কর্মকাণ্ডের মধ্যাহ্ন গগনে দেদীপ্যমান তখন ঐ দুইজনই ছিলেন সেই সংগঠনের দুই প্রবাদপুরুষ তথা বিপ্লব কর্মের অসীম শক্তিধর দুই স্তম্ভ! মেজর গুপ্তের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচিতি বা সম্পর্ক ছিল আশৈশবকালের অর্থাৎ দীর্ঘকালের। ১৯২৮ সালে যখন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের জাতীয় মহাসভার বা কলিকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত এ. আই. সি. সি. সম্মেলনে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতিকে (তখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রপতি বলা হত, যা আজকের প্রজন্ম আমরা জানি না।) গার্ড অব অনার দিয়ে রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন করেন তখন মেজর সত্যগুপ্ত ছিলেন সুভাষচন্দ্রের ডানহাত স্বরূপ। কাজেই মেজর গুপ্তের শৌলমারীতে, শ্রীমদ্ সারদানন্দজীর ছদ্মবেশে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আবিষ্কার কিছুতেই ভুল হতে পারে না। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আড়ালে শ্রীমদ্ সারদানন্দজীকে

চেনার জন্য যে ব্যক্তিটি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা সঠিক ও যথার্থ হবার কথা তিনিই হচ্ছেন এই মেজর সত্যগুপ্ত। যিনি তৎকালে কঠোর আশ্রম জীবন পালন করছিলেন। কাজেই দৃপ্তকণ্ঠেই বলতে হচ্ছে মেজর গুপ্তের শৌলমারী অধ্যায় আবিষ্কারে কোন তিল পরিমাণ ভুলের অবকাশও নেই।

অপরদিকে সাধুজীর ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্র যা বলেছেন তার একটু গুহ্যমানে অবশ্যই আছে। তার যথার্থ অর্থ খুঁজতে গেলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে অর্থাৎ সাধুজীরূপী সুভাষচন্দ্র বলতে চেয়েছেন যে,—তোমরা যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে চেন, জান বা তোমাদের সর্বজন বিদিত ও পরিচিত যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ প্রাঙ্গণে দেখা সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র আর এখানে শৌলমারীস্থিত সুভাষচন্দ্র কিন্তু এক নয়। এ-ব্যাপারটা তলিয়ে দেখলে অর্থাৎ আরও একটু গভীরভাবে অনুশীলন করলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে সাধনার দ্বারা উত্তরণের ভিতর দিয়ে এখনকার সুভাষচন্দ্র হচ্ছেন একজন কালজয়ী মহাযোগী। তিনিই আজ শ্রীমদ্ সারদানন্দজী বা বিশ্বপিতা। এই তথ্যের মূল্যায়নের বা বুঝবার সুবিধার্থে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করছি যোগীবর অঘোরিবাবার সেই বিখ্যাত উক্তি।

অঘোরিবাবা নিজে অবশ্যই একজন সিদ্ধপুরুষ সিদ্ধযোগী ছিলেন একথা সবারই জানা আছে। তিনি যা বলেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তা অত্যন্ত সচেতন ভাবেই বলে গেছেন। তিনি নেতাজীর ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেই বলেছেন। নতুবা এমন কথা বলা কখনও সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন, **"সুভাষচন্দ্র আজ একজন সিদ্ধযোগী। ভারতবর্ষের বহু মহান সিদ্ধ পুরুষদের আধ্যাত্মিক শক্তি নেতাজী সুভাষের মধ্যে সঞ্জীবিত।"** (মহাপীঠ তারাপীঠ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৫, বিপুলকুমার গাঙ্গুলী)। যোগীবর অঘোরিবাবা কোন অবস্থাতেই কিন্তু আপনার আমার পর্যায়ের কেউ নন। তাছাড়া মহাযোগী নেতাজী সুভাষের সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় সম্পর্ক না থাকলে এমন কথা কখনও তিনি বলতে পারেন না। এছাড়া আরও অনেক চমকপ্রদ কথা সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন যা আমরা পরে আলোচনা করবো। এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে বিপুলকুমার গাঙ্গুলীর ঐ তারাপীঠ মহাপীঠ পুস্তক কোন মামুলী পুস্তক নয়। এটি একটি গবেষণালব্ধ প্রামাণ্য ও বিখ্যাত গ্রন্থ। যা সকলের সমাদৃত দেশবিদেশে। কাজেই এখানে কথিত ঘটনার ব্যাপারে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই। বলাবাহুল্য যে এই দুই মহান যোগীর মাঝে যোগসূত্র ব্যতীত এমন তথ্য কেউ ব্যক্ত করতে পারেন না কোন অবস্থাতেই। যে প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা আসুন আমরা পুনরায় সেই চর্চায় মানোনিবেশ করি।

উল্লেখ্য যে, শ্রীমদ্ সারদানন্দজী যিনি ছিলেন শৌলমারী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ, তিনি মেজর গুপ্তকে বলেছিলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যে, 'তোমাদের নেতাজী সুভাষের মত আর দু' দশজন নেতাজী সুভাষ এই সাধু শ্রীমদ্ সারদানন্দজী প্রয়োজনে

সৃষ্টি করতে পারেন'। এই উক্তির যে ব্যাপকতা কী হতে পারে, তা কি আপনি আমি কদাপি ভেবে দেখেছি? শুধু তাই নয়। এর গভীর তাৎপর্য কি আমরা অনুধাবনে ক্ষমতা রাখি? বলতে নেই এই দুটির কোনটিই আমরা একবারও ভেবে দেখিনি। এই উক্তির তাৎপর্য বা অর্থ আমাদের নিকট জটিল বা বোধগম্য না হলেও যোগমার্গীয় মহাজনদের কাছে কিন্তু মোটেও কঠিন কিছু নয়। এবং তাঁদের কাছে কঠিন নয় বলেই ঐ যোগীবর অঘোরিবাবা ঐরূপ বলতে পেরেছেন। ঐ উক্তি যাঁদের কাছে বোধগম্য তাঁদের নিকট সহজেই অনুমেয় যে, শ্রীমদ্ সারদানন্দজী আজ কোন তথাকথিত সাধারণ যোগী নন। তিনি আজ যোগমার্গের কোন উত্তুঙ্গ শিখরে বিরাজমান তা আধ্যাত্মিক পুরুষদের কাছে পরিষ্কার। আধ্যাত্মিক পুরুষদের কাছে সাধুজীর বক্তব্যে এটাও পরিষ্কার তিনি অর্থাৎ শ্রীমদ্ সারদানন্দজী শুধু মনুষ্যজগৎ নিয়েই খেলছেন না। জন্ম-মৃত্যুর বা জড়া-ব্যাধিরও উর্দ্ধে আজ তিনি। মহাভারতের মহাবীর ভীষ্মের মতই সারদানন্দজীও ইচ্ছা-মৃত্যুর অধীন। শুধু তাই নয়, তিনি ষড়চক্রের শীর্ষে বসে আছেন। তাঁর পার্থিব ব্রত বা ইপ্সিত কর্ম সমাধা হলেই তিনি সপ্তচক্রের ভূমিতে আরোহণ করে জীবাত্মা বা দেহমার্গ ত্যাগ করে পরমাত্মায় বিলীন হবেন। এমন প্রক্রিয়ায় যিনি অধীশ্বর তিনি তো শুধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই তুল্য বা উপমেয়। এহেন যে সাধকশ্রেষ্ঠ মহর্ষি তাঁর কাছে কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনকিছু অসম্ভব না স্বপ্নের অতীত? তিনি সেই জগতের বিচরণশীল এক অতীন্দ্রিয় সম্রাট বলেই তো তার ইচ্ছার করুণা না হলে কেউ তাঁর হদিস ঘুণাক্ষরেও পাচ্ছেন না বা পান না। একথা যে কত বড় কঠিন ও বাস্তব সত্য তা তো ১৯৪১ সাল থেকে আজ ২০০০ সালের প্রারম্ভ পর্যন্ত ঘটনাবলী ও তাঁর অবস্থানই প্রমাণ করছে। পৃথিবীতে এরচেয়ে বড় সত্য আর কি হতে পারে? সাধুজীর আড়ালে অবস্থানরত শ্রীমদ্ সারদানন্দজীর ঐ উক্তির প্রেক্ষাপটে স্বামী বিবেকানন্দের একটি বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ছে। স্বামীজী কোন এক সময় তাঁর কোন ভক্তজনকে বলেছিলেন, 'তোমাদের স্বামী বিবেকানন্দের মত দশজন বিবেকানন্দ সৃষ্টি করা আমার পূজনীয় গুরুদেব পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট কিছুই নয়। কোন ব্যাপারই নয়।' এরপর বলুন আর কি বলার থাকতে পারে? এ-সব থেকেই বোঝা যাচ্ছে এ-সবই সেই লীলাময়ের খেলা, নয় কি? এবার বলুন এত যে কাণ্ডকারখানা তা আমাদের মত জীবজগতের নগণ্যরা কি শক্তি বলে বুঝতে পারবো? তাছাড়া এ-সত্য তো আমাদের প্রত্যেকের কাছে জ্ঞাত যে পৃথিবীতে এমন এমন সব ঘটনা ঘটে যার ব্যাখ্যা কোন কালেই মনুষ্য মস্তিষ্ক দ্বারা সম্ভব হয় না। এমনকি পরমার্থিক ব্যাপারে ব্যবহারিক বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানও তুচ্ছ। বলাবাহুল্য এর উত্তর পেতে হলে আমাদের আধ্যাত্মিক যোগীদের প্রতি স্মরণাপন্ন হতে হয়। এমন এক অভাবিত মার্গের যিনি রাজ চক্রবর্তী তাঁকে বলুন কি শক্তিতে আমরা ধরাছোঁয়ায় পেতে পারি? কাজেই আমাদের মত অতি সাধারণ জগতে বিচরণশীলদের সেই অতীন্দ্রিয় জগতের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনের পথ কোথা?

আসুন এ তথ্যটুকু ছাড়াও ভারতবর্ষের আরও যে আধ্যাত্মিক মার্গের মহাজনরা আছেন তাঁদের কোন বক্তব্য আছে কিনা নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তা একটু জানার চেষ্টা করা যাক। স্মরণীয় ভারতবর্ষের যে সকল সাধুসন্তরা নেতাজী সম্পর্কে বিশেষ ইঙ্গিতবহ তথ্য বা আশার বাণী পরিবেশন করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন অঘোরিবাবা ছাড়া শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা, শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী, স্বামী নিগূঢ়ানন্দ, জগৎগুরু স্বামী সত্যানন্দ পরমহংস পরিব্রাজক, অবধূত শ্রীশ্রী মাধব পাগলা, সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ঠাকুর এককড়ি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্রী পাগলাবাবা, স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী মহারাজ, স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী, স্বামী ভাস্বরানন্দ, স্বামী স্বরুপানন্দ, স্বামী বেদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ গিরি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক পুরুষগণ। এছাড়া আরও অনেকেই আছেন। তাঁদের কেউ কিন্তু আমাদের মত অযাচিত মতামত জাহির করেননি। তাঁরা সকলেই যা বলেছেন তার মর্মার্থ হচ্ছে সময়েই সব উদ্‌ঘাটিত হবে। সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ যা বলেছেন তা আমাদের গ্রহণ করার ক্ষমতা কোথায়? শুনলেই তো চমকে উঠতে হয়। তিনি বলেছেন, "নেতাজী সুভাষচন্দ্র হচ্ছেন একজন ভগবদংশ সম্ভূত মহামানব.....। তিনি উপস্থিত কিভাবে কোথায় আছেন তা একমাত্র শ্রীভগবানই বলতে পারেন।.....নেতাজীর শ্রীবিগ্রহটি যে শ্রীভগবানেরই শরীর। তিনি লীলা করার জন্য যে নেতাজী সেজেছেন এ-সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নেই"।

এসব ছাড়া ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ভৃগুসংহিতায় যা পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যাচ্ছে ভৃগুসংহিতা অনুসারে নেতাজীর কুষ্ঠীও দেখা গিয়েছে। সেখানে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে যে,

"কুড়ি লক্ষ বাইশ হাজার সাতশত তিন ধ্রুবাংক পাতায় ভৃগুসংহিতা সংস্কৃত অনুষ্টুপ ছন্দে। নেতাজীর সকল অতীত জীবনের ঘটনা এমনকি ভারতের বাইরে আজাদ হিন্দ গঠনের এবং তাঁর ফৌজ গঠনের কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।.....মহর্ষি ভৃগুর বচন—

"এ জাতক উৎকলদেশে 'ক'-কার নামক নগরে—'জ'-কার নামক পিতৃগৃহে ও 'প'-কার নামক মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করবে। এ নামের আদ্যাক্ষর হবে 'স'। এরা সর্বসমেত আট ভ্রাতা ও ছয় ভগিনী হবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার বাল্যকালে মৃত্যু হবে। এর প্রতিভা হবে সর্বোতোমুখী। এ জাতক এ জন্মে দেবাংশ সম্ভূত। জাতক হবে রক্তগৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি, সুন্দর মুখশ্রীযুক্ত বিশাল বক্ষ। এ জাতক মহাবীর। আটচল্লিশ বৎসর বয়সে সৈন্যসামন্ত নিয়ে আসবার চেষ্টা করবে। কিন্তু বিফল হবে। বিফল হলেও এর অত্যাশ্চর্য কার্যের ফলে দেশ স্বাধীন হবে। বিদেশীরাজ এঁর দেশ থেকে বিতাড়িত হবে। পরে বিমানে স্বদেশ ফিরবে। সে সময় পৃথিবীতে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হবে। এঁর আগমনের ফলে দেশের দুইটি রাজত্ব আবার মিলিত হবে। জাতকের বিবাহ হবে না। কারণ দেবাংশ হতে জন্ম বলে পৃথিবীতে জাত কোন নারীই এঁর স্ত্রী হবার যোগ্য নয়।"

(জ্যোতির্গময়, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮৮/১৯৭৭ ইং ৭ই জুলাই যুগান্তর পত্রিকায় মুদ্রিত)

এই উপরের চিত্রে যা পাচ্ছি তাতে দেখতে পাচ্ছি যে ভারতের নামীদামী যত আধ্যাত্মিক মার্গীয় মহাজনেরা আছেন তাদের অধিকাংশজনই নেতাজীর সম্পর্কে অতীব চমকপ্রদ সব তথ্য পরিবেশন করেছেন। শুধু তাই নয়। ছয় হাজার বছরের প্রাচীনতম হিন্দু বিজ্ঞান যুগের বিশ্বখ্যাত ভৃগুপুরাণ বা ভৃগুসংহিতায়ও নেতাজী সম্পর্কে রোমহর্ষক জনিত তথ্য রয়েছে, যা গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন। এই সবের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বর্তমান জীবনের বিশ্বব্যাপী কর্মযজ্ঞের দেখা যাচ্ছে অপূর্ব যোগসূত্র বা অভূতপূর্ব মিল সর্ব বিষয়ে।

সুতরাং এবার বলতে বাধা নেই যে সর্বাঙ্গীণ পারিপার্শ্বিক তথ্যচিত্রই বলছে আশ্রমপিতা সাধুজী যা বলছেন তা বলতেই পারেন। এবং বলাবাহুল্য নেতাজীর যে আধ্যাত্মিক পরিধির পরিচয় বিভিন্ন সাধু মহাত্মাদের বক্তব্যে ও বিভিন্ন দর্শনের ভিত্তিতে পাওয়া গেল তা এক কথায় মনুষ্য মস্তিষ্কের বিচারে কুলকিনারা পাবার কথাই নয়। এমন যে এক সাধুজী ঐ আশ্রমের আশ্রমপিতা, তিনি যা বলেছেন তাতে তিলার্দ্ধ ও অবিধেয় কিছু নেই বা থাকতে পারে না। আবার আরণ্যক মুনি মেজর সত্যগুপ্ত যা বলেছেন তাও যথার্থ সত্য। এসব সত্যাসত্য ও তথ্যাতথ্য বলছে আমরা যখন বিশ্বপিতা যুগত্রাতা শ্রীমদ্ সারদানন্দজীর ছদ্মবেশে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে পেয়েছি তখন আর ভাবনা কেন? বলার অপেক্ষা রাখেনা এই যে তাঁকে আশ্রমপিতা রূপে প্রাপ্তি বা শৌলমারী আশ্রমে এসে তাঁর অবস্থান তাও কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবেই তাঁর করুণার জন্য সম্ভব হয়েছে। নতুবা তাঁকে আজ পর্যন্ত কি কেউ ধরাছোঁয়ার নাগালে পেয়েছেন না পাচ্ছেন? সুভাষচন্দ্রের আধ্যাত্মিক রূপের সম্পর্কে স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর যে উপলব্ধি তা আমাদের ব্যাখ্যার অতীত। আসুন তাঁর ভাষায়ই ব্যাপারটা অনুধাবন করবার চেষ্টা করি। তিনি তাঁর উপলব্ধির কথা একটি শ্লোকমালার বা কবিতার মাধ্যমে সুভাষ বন্দনা দ্বারা অপূর্বভাবে ব্যক্ত করেছেন। যথা,

কংসাগারে ধরিত্রী পরিহিতনিগড়া দেবকীবাবরুদ্ধা
লোভদম্ভশ্চ মল্লৌ ভুবনবিজয়িনৌ দ্বারিকারাশ্মসারা।
হিংসা বিস্ফোরকৈর্য্যাহপ্যনিশমতিভিয়া দেবকী কম্পমানা
কংসক্ষিপ্তেব দেবী কিমু শময়তি তাং যন্ত্রদৈত্যান্ মহোল্কা।।
যোগোক্ষেমৌ ভবেতাং ন চিরকুশলদৌ শ্রেয়সাং প্রেয়সাং বা
নোচেজ্জাতোহত্র সোহজোহখিলদুরিতহরাচিন্ত্যশক্তিঃ পুমান্ যঃ।
ধর্ম্মক্ষেত্রে য আদৌ বিষমরিপুভয়ং চোত্তমৌজা নিরস্য
ধর্ম্ম সর্বাঙ্গভদ্রং ভুবি পরিকলয়েদ্ ভারতাত্ম প্রভুর্ধাৎ।।
পশ্চাত্তে বেণুগীতং ব্রজবিপিনবধূসঙ্গলীলা চ পশ্চাদাদৌ
কালীয়নাগং বিষমবিষফণং মর্দ্দয় স্বাঙ্ঘ্রিঘাতাৎ।

সংহর্ত্তুং তান্ প্রমত্তান্ কুরু কুরু কুলজান্ যে ভুবি স্ফীতদম্ভা।
উদ্যোগং তে সুভাষ! প্রভবসি সহসা সাম্প্রতং সঙ্কটে নঃ।।

(সঙ্কলন : "স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র")

এই উপরের চিত্রই বলে দিচ্ছে আজ সুভাষচন্দ্রের অবস্থান কোথায় আধ্যাত্মিকতার কোন উত্তুঙ্গ শিখরে। এতসব বিখ্যাত যোগীঋষিদের তথ্যাতথ্য উপলব্ধি বা বর্ণনা ছাড়াও পৃথিবীর বা বিভিন্ন দেশের বহু ব্যক্তিরও নানা খবরাখবর আমরা পর্যালোচনা বা চর্চা করতে গিয়ে ভূঁরি ভূঁরি তথ্য পাচ্ছি। আসুন সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে এ ব্যাপারে আর কতদূর আলোর সন্ধান পাই তা একটু দেখি।

এসব ছাড়াও পৃথিবী ব্যাপী অনেক ব্যক্তি বা মহাজনেরা পর্যন্ত কখনও কখনও বলছেন বা খবর দিচ্ছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে বিভিন্ন স্থানে দেখেছেন এমনকি কথাবার্তাও বিনিময় হয়েছে ইত্যাদি। তবে তাঁর কিনারা কেউ পাচ্ছেনা কেন? পাচ্ছেনা এই জন্যই যে তিনি করুণা না করলে তা সম্ভব নয় এ কথাটাই তিনি পরোক্ষে বলছেন এবং প্রমাণ করছেন। তাই বলছিলাম শৌলমারী পর্ব তিনি স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করেছিলেন আত্মপ্রকাশ করবার সঙ্কল্পে। তিনি চেয়েছিলেন তখন আত্মপ্রকাশ করে তিনি তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষের দুর্গতি মোচন করতে। তাই আত্মপ্রকাশের পূর্বে তিনি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন তাঁর দেশবাসী তথা সকল নেতৃবৃন্দকে। তাই নেতাজী তখন ভারত বিখ্যাত সকল জননেতা থেকে সমাজের অনেক মহাজনদের সাদরে আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন অবশ্যই নির্দ্দিষ্ট সময়সীমা প্রদান করে। তাতে দেখা গেল তাঁর সেই ঐতিহাসিক আহ্বানে ভারতবর্ষের নেতারা বা বিশিষ্ট ব্যক্তি কেউ সাড়া দেননি। তিনি দয়া প্রদর্শনপূর্বক যে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার কি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে? সুভাষচন্দ্র ভেবেছিলেন ভারতীয় নেতৃবর্গ তাঁর সাথে অতীতে যা ভুল করেছে তার বোধহয় এখন এতকাল পরে সংশোধন ঘটেছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, না, তা হয়নি। অর্থাৎ তারা ভাবতে কসুর করল না আজও করছে না যে, 'ম্যাঁয় কিসিসে কমতি হ্যাঁয়'। আর দেশবাসীও এমন একটা আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারেনি যাতে সব দুষ্টচক্র শাসকগোষ্ঠী বা জননেতারা শৌলমারী রহস্য উদ্‌ঘাটনে বাধ্য হয়। এভাবে পরীক্ষা করে যখন তিনি ব্যর্থ হলেন তখন তিনি তাঁর যে বিশ্বমানব নিয়ে স্বপ্ন ও সাধনা তাই নিয়ে ব্যাপৃত রয়ে গেলেন। স্মরণীয় যে, এই সময় তিনি যাঁদের আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁদের মাঝে ছিলেন তৎকালীন ভারতের প্রথম সারির সবাই। যেমন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, এইচ. ভি. কামাথ. ড: বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও অনেকে ছিলেন আমন্ত্রিতদের মাঝে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার একজনও সাড়া দেননি। তাঁর এই প্রক্রিয়াই বলছে তিনি আত্মপ্রকাশে খুবই উদগ্রীব ছিলেন তখন। কিন্তু দেশবাসী যদি তাঁর প্রয়োজন বোধ না করে তবে তাঁর কিসের ঠেকা পড়েছে যে তিনি আসবেন, এমন পাত্র আর যেই

হোন না কেন, সুভাষচন্দ্র নয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় বিশেষভাবে যে যখন সুভাষচন্দ্র বার্লিন বেতারে তিনি প্রথম তাঁর কথা ১৯৪২ সালে ঘোষণা করেন তখন এদেশের কমিউনিস্টরা প্রচার করেন যে, এই সুভাষ কোন নকল সুভাষ। এ সুভাষ আসল সুভাষ নয়। এসব তথ্য আমরা পাই সমকালীন পত্রপত্রিকা থেকে। এইভাবে বারবার জাতি তাঁর সাথে প্রতারণা করছে। শৌলমারী পর্বেও ভারতীয় নেতারা ও সরকার একই কাণ্ড করেছে। বলতে গেলে সেই ত্রিশের দশকের শেষপ্রান্ত থেকেই এসব চলছে। অথচ সুভাষচন্দ্র আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কারো সাথে বৈরিতা করেছেন প্রমাণ করতে পারবেন না। অপরদিকে তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছ থেকেই অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পাচ্ছেন এবং তাঁর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করছেন। এ ব্যাপারে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমানের বক্তব্য আমরা পূর্বেই অবগত হয়েছি। চল্লিশের দশকে জেনারেল তোজো কর্তৃক আহুত গ্রেটার এশিয়া সম্মেলনেও আমরা দেখেছি নেতাজী বলছেন, ভারতবাসী যাঁকে নেতা নির্বাচন করবেন তিনিই হবেন ভারতবর্ষের নেতা। এতে পরিষ্কার সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জগতের লোক। যাইহোক, তা বলে কি তিনি চুপচাপ বসে আছেন, অবশ্যই নয়। **তিনি চেয়েছিলেন মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে তাঁর সাধনার পীঠস্থান করে বিশ্বসাধনায় ব্যাপৃত হবেন। সুতরাং সেটা যখন হলোনা বা বলা যেতে পারে তাঁর ভাষায় যে তেমনটি যখন মায়ের ইচ্ছা নয় তখন তিনি অন্য উপায়েই বিশ্বসাধনায় আত্মনিবেদিত হতে বাধ্য হয়েছেন। বলাবাহুল্য বিশ্বসাধনায় যখন তিনি ব্যাপৃত তখন স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষও তার বাইরে নয়। আজ তাঁর বিশ্বসাধনা ও ভারতসাধনা একাকার।** এবার বলতে পারি শৌলমারীর সূত্র ধরে যখন আমরা বিশ্বপরিত্রাতা ও বিশ্বঋত্বিককে পেয়ে গেলাম তখন আর ভয় ভাবনা কিসের? তাই অধমের অন্তরাত্মার একান্ত দাবী ও বিশ্বাস এখন দ্ব্যর্থহীন ও দৃপ্তকণ্ঠেই বলার সময় এসেছে যে,

নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি ভয়রে আর
নাশিতে অসূর বাজিছে ওই কাল ভেরী ত্রাতার॥
কালিমা কল্মষ দূরিতে গ্লানি ধরণী মা'র
ভয়াল রুদ্র সেজেছে দয়াল মহাকাল রূপ ধরি তাঁর॥
বসনে ভূষণে নবরূপায়ণে সাজাতে জগৎ
আসিছে এবার রুদ্ররোষে বিধাতার জয়রথ।
ঘোচাতে অশনিপাত ঘোর সংঘাত এবার
শিবে-অশিবে হবে পরিচয় কালানল জ্বলিবে সংসার॥

এবার আমরা অক্লেশেই বলতে পারি যে এখানে এসে বিশ্ব পেয়ে গেল তার বিশ্ববিপ্লব যজ্ঞের রাজঋত্বিককে। তাই এই চিত্র থেকে আরও পরিষ্কার হলো মানবিক বা আধ্যাত্মিক যুগ সৃষ্টির জন্য যে মহাঋত্বিক প্রয়োজন তা বিধাতা নিজে সম্পূর্ণ করেই

রেখেছেন। ভারতীয় আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করলে এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আরও কোন সূত্র পাই কিনা আসুন সেই দিকটা একটু পর্যালোচনা করে দেখি। মহাসাধক পরমপুরুষ অবতার বরিষ্ঠায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি তিনি যখন মানবলীলা সংবরণ করার দ্বার দেশে উপনীত অর্থাৎ তিনি পরমাত্মায় বিলীন হবার মাত্র ক'দিন পূর্বে স্বামীজীকে তাঁর সমস্ত শক্তি প্রদান করেছিলেন। অর্থাৎ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর পরমার্থিক বা ঐশী শক্তি নিয়ে সূক্ষ্ম দেহে তিনিই যেন তখন স্বামী বিবেকানন্দ বা তাঁর আদরের নরেনের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন। এই মহাকাণ্ড বা ঐতিহাসিক বিবর্তনের পর স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যা বলেছিলেন তাঁর মর্মকথা হলো সেদিন থেকে রামকৃষ্ণদেব রিক্ত ফকির হলেন। এ জাতীয় ঘটনা অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহে দেহান্তরিত হবার ঘটনা ভারতীয় আধ্যাত্মিক পুরুষ বা মহাসাধকদের জীবনে যখন তখন ঘটতে পারে বা প্রয়োজনে তাঁরা ঘটানও বটে। এমন ঘটনার কথা বহু আছে। যেমন মহাত্মা তারা ক্ষ্যাপার জীবনে আছে। সাধক শ্যামাচরণ লাহিড়ি বা যুগাচার্য মহাসাধক শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষ ও যুগসাধকদের জীবনচর্চা করলে আমরা এ জিনিষ পাই। বলাবাহুল্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের এই মহাকাণ্ড ঘটার মাত্র কয়দিন পরই তিনি তাঁর স্থূল দেহলীলা সংবরণ করেন। কিন্তু বলা যেতে পারে তিনি তাঁর সূক্ষ্ম দেহলীলা সেদিনও সমাপ্ত করেননি এবং আজও করেননি। এখন থেকে যেন তিনি নরেন রূপী স্বামী বিবেকানন্দ হয়েই পৃথিবীতে বিরাজমান। তার পরের যে কর্মকাণ্ড বা স্বামীজীর বেশে শিকাগোর ঐতিহাসিক স্থলে এসে মিলন, বিশ্ব আলোড়নের ঘটনা. সেতো বিশ্বজনবিদিত। যদিও তখন তিনি আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নন, তখন তিনি বিশ্ববিবেক স্বামী বিবেকানন্দ। স্মরণীয় যে, স্বামীজী যখন তাঁর কর্মকাণ্ড বা বিশ্ববিপ্লবের মন্ত্র বিশ্বে প্রচার করে দেহলীলা সংবরণ করেন সেই পটভূমিকায়ই ১৯০২ সালে মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটে। স্বামীজী তাঁর পার্থিব লীলার সময় ভারতবর্ষের অবস্থা তথা পৃথিবীর অবস্থার বেদনায় বেদনাহত হয়ে বলেছিলেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, শক্তি চাই, নইলে সব বৃথা। আমি চাই এমন কয়েকটি যুবক—যাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্মিত, আর তার মধ্যে থাকবে এমন একটি মন, যা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই। পশু নয়। বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়। '.....একশত যুবক তিনি পেয়েছিলেন কিনা জানিনা তবে তাঁর মহাসমাধির দুই দশক পরে এমন একজন যুবককে ভারতবর্ষ পেয়েছিল যে একাই একশো।"

(রাখাল বেণু, পৃষ্ঠা—১৭, ২৩, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, শারদীয় সংখ্যা ১৪০৬। এতদ্‌ভিন্ন— সুভাষচন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সুন্দরানন্দজীকে লেখা একপত্রে বলেছেন— "আমি মনে করি যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের (স্বরূপের) দুই রূপ।" (৬.৩.১৯৩৬ সুভাষচন্দ্র বসু)

এই হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মাঝে যে যোগসূত্রের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তাতে এটাই প্রতীয়মান যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণই যেন বিবর্তিত রূপে নববিগ্রহে আজ স্বামী বিবেকানন্দ।

এতো গেল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের মহান রূপের এক অধ্যায় বা দিক। পরবর্তীকালে স্বামীজী ইপ্সিত যে যুবক তা আমরা পাচ্ছি সুভাষচন্দ্রের মাঝে। বলাবাহুল্য স্বামীজীর ইপ্সিত শত বা সহস্র যুবকেরই যেন সমন্বয় বা বিবর্তিত রূপ সুভাষচন্দ্র। স্বামীজী যেমন ছিলেন রামকৃষ্ণ নিবেদিত একপ্রাণ সত্তা ঠিক সুভাষচন্দ্রকে আমরা দেখি তিনি জন্মাবধিই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দে নিবেদিত একপ্রাণ সত্তা। সুভাষচন্দ্র যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের দ্বারা কতখানি প্রভাবিত বা উপজীব্য তা আমরা সুভাষচন্দ্রের বাল্য বা কিশোর জীবন থেকেই পেয়ে থাকি। সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন অর্থাৎ এ-পর্যন্ত শতবর্ষের জীবনী পর্যালোচনা করলে প্রতি পদক্ষেপেই যেন ফুটে উঠে স্বামীজীর প্রতিটি কর্ম প্রতিটি কথার প্রতিফলন। প্রকারান্তরে বলা যায় নেতাজী সুভাষ যেন স্বামীজীরই অন্য একটি রূপ বা স্বামীজীর প্রতিবিম্ব। "বিবেকানন্দের সর্বসত্ত্বই যেন সুভাষচন্দ্রের মধ্যে ছন্দিত লীলায়িত হয়ে উঠেছে। বিবেকানন্দ পুরোপুরি রাজনীতিক হলে যা হতেন তাই সুভাষচন্দ্র। .....কিন্তু তাঁর স্বপ্নবাঞ্ছিত রূপপরিগ্রহ করেছিল.....তাঁর মানসপুত্র সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ করে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ তার ইপ্সিত পরিণতি বা এফ্লোরেসেন্স হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের জীবনে।" (রাখাল বেণু, পৃষ্ঠা—২১, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ) এছাড়া সুভাষ জীবনের মাঝেই পাওয়া যায়—"নেতাজী বাল্য বয়সেই অনুভব করেছিলেন—উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং বলেছিলেন **'Vivekananda enters in me'**. অন্যত্র বলেছিলেন, **'Vivekananda enters into me'**—সুভাষ সত্তায় স্বামীজী প্রবেশ করে তাঁর সর্বস্ব দান করে দিয়েছিলেন, তাই সুভাষকে ঐ প্রেমভক্তির জন্য আর ততো সাধনা করতে হয়নি।"

(জয়তু নেতাজী স্মারকগ্রন্থ, পৃষ্ঠা—৭৬, প্রকাশক—নেতাজী জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি, শান্তিপুর)

এই চিত্রটি থেকে যা আমরা পাচ্ছি তাতে প্রথমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আসছেন তারপর স্বামী বিবেকানন্দ এবং সর্বশেষ পাচ্ছি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে। এই তিন মহাজীবন অনুধ্যান ও অনুশীলনে আমরা যা পাই তাতে দেখা যাচ্ছে যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণই বলছেন তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি বা পরমার্থিক ঐশী শক্তিটাই নরেনকে প্রদান করেছেন। তাতে

প্রতীয়মান হচ্ছে স্বামীজীই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পার্থিব সত্তা হয়ে অবস্থানরত। আবার স্বামীজীর পার্থিব লীলা সংবরণ হলেও তিনি যেন মনে হয় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মাঝে সর্ব কর্মে প্রতিফলিত। অর্থাৎ এই তিনটি মহাসত্তাই যেন একটি সত্তার তিনটি মহান্তর বা মহারূপ। তাঁদের কর্মপ্রণালী ও ধারা একই খাতে প্রবাহিত বা লীলায়িত। এবং প্রকৃত অর্থেও যে তাই তার জন্য কোন নতুন করে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। তবু এই তত্ত্ব চর্চা করতে গিয়ে যা পাই তা অবশ্যই অনুশীলন করা আমাদের প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে প্রথমেই যে প্রশ্ন আসে তা হচ্ছে সুভাষচন্দ্র বোসের ইংল্যাণ্ড থেকে পড়াশুনো সমাপ্ত করে আসার পর আজ পর্যন্ত যত কর্মকাণ্ড তিনি করেছেন তার সঙ্গে প্রবাহমান পৃথিবীর কোন কর্মধারার সঙ্গেই কেউ তাঁর কাজের উপমেয় কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পৃথিবীব্যাপী পেয়েছেন কি? বা দেখাতে পারবেন কি? অর্থাৎ প্রতিটি কর্মই তাঁর ব্যতিক্রমী। এবং আজকের কর্মপরিধির যা চেহারা ও বিশালত্ব তাঁর, এক কথায় তা মনুষ্য মস্তিষ্ক দ্বারা কোনভাবেই পরিমাপযোগ্য নয়। অথচ তিনি একটির পর একটি এমন এমন কাজ করে চলেছেন যার কোন ব্যাখ্যা মানুষের বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা সম্ভবপর হচ্ছে না। অথচ এমনটি কেন হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, কার দ্বারা হচ্ছে, তা কেন উদ্ধার করা যাচ্ছে না, এইসব প্রশ্নের উত্তর যাঁদের দেবার কথা তারা তখন লক্ষ্যহীন মাত্রাহীন এমন সব জবাব দিচ্ছেন তাতে ঘুরে ফিরে শেষকালে সুভাষচন্দ্রের ব্যাপারটাই হাজির হয়ে যাচ্ছে। আমরা স্বীকার করি আর না করি সঙ্গে সঙ্গে দুটি সত্য সমান্তরাল পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। যথা, তাঁর অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের যে মূল পরিকল্পনা তার বাস্তবায়ন। অর্থাৎ কাজের পর কাজ যা কোন অবস্থাতেই সাধারণ কাজ নয়। প্রত্যেকটি কাজই অপরিমাপযোগ্য এবং বিশ্ববিশ্রুত তো বটেই। তাঁর এই কাজ শুরু বহুপূর্ব থেকেই। তবে যদি নমুনা হাজির করার কথা বলেন তবে সেই গৃহত্যাগ থেকে শুরু করাই অপেক্ষাকৃত শ্রেয়। তাঁর গৃহত্যাগের যে রোমহর্ষকর ঘটনা তা পৃথিবীতেদ্বিতীয়টি কোথায়? তারপর এক ঝলকে যা পাই তা হচ্ছে—(১) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা (সে স্বাধীনতার যে রূপই হোক না কেন।) রাজনৈতিক স্বাধীনতা তো বলতে হবেই, (২) পূর্ব-এশিয়াস্থিত দেশসমূহের স্বাধীনতা, (৩) ভিয়েৎনাম মুক্তি, (৪) চীনের মুক্তি আন্দোলনের পরিসমাপ্তি, (৫) দুই ভিয়েৎনাম একীকরণ, (৬) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ও তার পূর্ণ স্বাধীনতা, (৭) জার্মান দুটি খণ্ডকে একীকরণ ইত্যাদি। এগুলির কোনটি বিশ্ববিশ্রুত নয়? এইসব কাজ ঘটছে পৃথিবীর পৃষ্ঠে একের পর এক একথা যতখানি সত্য ঠিক ততখানি সত্য লোকটির কোন হদিস নেই। কোথায় গেলেন তিনি তাঁর কোন চিহ্নও কেউ পাচ্ছে না আশ্চর্য্য। এমন যে বৃটিশ, আমেরিকান কিম্বা বিশ্ববিখ্যাত আরও যেসব গোয়েন্দারা আছে তাঁরাও কেউ তাঁকে সন্ধান করে খোঁজ পাচ্ছে না। বা তাঁকে ধরতে পারছে না, দেখতে পাচ্ছে না। বিশ্বের কোন প্রান্তেই নয়। যদিও বা কোন সূত্রে কোন খবর পেয়ে ছুটে যাচ্ছে তাঁকে ধরতে বা তাঁকে হদিস করতে বা খুন করাতে তবু তারা

ব্যর্থ হয়ে ফিরছেন। পুঞ্জীভূত আক্ষেপ ও বেদনার বোঝা বহন করে। প্রাপ্তিযোগের ভাণ্ডার শূন্যতার গ্লানিতে ক্লান্ত।

(উপরের ছয়টি ঘটনার তথ্যাতথ্য আমরা বিভিন্ন অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছি)

পরন্তু সুভাষচন্দ্র যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানেই প্রকট হচ্ছেন এবং তাঁর যা যা করণীয় তার সমস্ত কিছু করেই সে স্থান ত্যাগ করছেন। তাঁর যে এই স্থানে স্থানে উপস্থিতির কথা তা কোন কল্পনা বিলাসীর গালগপ্প নয়। সুভাষচন্দ্রের এই উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য ও সত্যাসত্য খবর পরিবেশন করছে কোন ধামাধরা মামুলী সংস্থা বা নগণ্য কোন যেমন তেমন আমলাতান্ত্রিক সেবাদাস প্রশাসন নয়। এই খবর যাঁরা রাখেন বা যাঁরা পরিবেশন করছেন বিশ্বে তাঁদের মাঝে আছেন আমেরিকার স্বনামধন্য প্রেসিডেন্ট জন. এফ. কেনেডির মত বিশ্বনিয়ন্তারা এবং তাঁদের পররাষ্ট্র বিভাগের বড় বড় কর্ত্তাব্যক্তিরা, যেমন পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজার্সের মত বিশ্ববিখ্যাত কূটনৈতিক দিকপালরা। এ-ব্যাপারে পূর্বেই আমরা যেসব সংবাদ এ পুস্তকের অন্য অধ্যায়ে দেখতে পেয়েছি, এর মধ্যে রয়েছেন মহাচীনের একচ্ছত্র নেতা মাও-সে-তুং, চৌ-এন-লাই-এর মত ব্যক্তিবর্গ। এবং সাথে সাথে তাঁদের গোয়েন্দাদপ্তর ও বলছে তাঁর বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তির ধারাবাহিকতা। এবং এসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে বিশ্বের সকল প্রভাবশালী দেশের মহাফেজখানাগুলিতে। বলাবাহুল্য এসব তথ্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের গোপন মহাফেজখানায়ও রয়েছে। কিন্তু তাঁরা অর্থাৎ ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তা ব্যক্ত করতে প্রস্তুত নয়। এসব তথ্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে বা মহাফেজখানায় যে আছে তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ স্বাধীন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের বিখ্যাত ঐতিহাসিক উক্তি। যথা, 'If Subhas comes I will resist him with sword'. তারপর জওহরলালের মৃত্যুর স্বল্পকাল পূর্বে সুরেশচন্দ্র বসুর একপত্রের উত্তরে বলেছেন, "I have no direct sufficient and precised evidence of Netaji's death (13.5.62)." ভারতীয় উপমহাদেশের কোন কোন রাষ্ট্রনায়করাও তাঁর অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ডের কথা বলতে গিয়ে অনেক সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। যেমন, ১৮ই নভেম্বর ১৯৬২ সালে একটি ইংরাজী লিডিং দৈনিকে পাচ্ছি তৎকালীন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের ঐতিহাসিক উক্তি যে, '...Field Marshal Ayub Khan when asked by students at Dacca said that he would be the first man to embrance Netaji if he entered Pakistan. This statement was greeted by the audience.....' আয়ুব খানের উক্তি ছিল যখন তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন। পক্ষান্তরে দেখুন কি আশ্চর্যের ব্যাপার নেতাজীর এক সময়কার অন্তরঙ্গ সহকর্মী সেই বিখ্যাত ক্লিনম্যান পণ্ডিত জওহরলাল কি বলছেন। 'In 1947-48 Nehru told Sardar Sardul Singh Cavesher that he would be the first person to oppose Subhas Bose

with open bayonet if he (Bose) comes with foreign aid.' (উল্লেখ্য দুটি সংবাদ একই ইংরেজী দৈনিকের 18.11.62) এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, ১৯৪৫ সালে তিনি অর্থাৎ সুভাষ বোস সিঙ্গাপুর থেকে একাধিক বক্তৃতা দেন তাঁর স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে। ঐসব বক্তৃতার খবর জওহরলাল না জেনেই কি তাঁর ঐ উক্তি? তা কি কোন অবস্থাতেই মানা যায়? জওহরলালের প্রতিক্রিয়া যে ঐসব বক্তৃতা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরন্তু তাঁর কাছে তো সুভাষচন্দ্রের প্রেরিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে ঐ জাতীয় খবর ছিলই। এছাড়াও বন্ধু মাউন্টব্যাটেনের সৌজন্যে বৃটিশ গোয়েন্দা কর্তৃক সংগৃহীত সব তথ্য তো জওহরলালের জানা ছিলই। নইলে কি ঐ জাতীয় প্রতিক্রিয়া ঘোষণা করতে পারেন। অথচ অপরদিকে ভারতবাসীকে দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধাপ্পা দিয়ে চলেছেন যে, নেতাজী তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। এমন একটি মিথ্যা জওহরলাল পরিবেশন করেন ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু সংবাদ প্রচারের পর। জওহরলাল সে সময় এবোটোবাদের এক জন-সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'সুভাষবাবুর মৃত্যু সংবাদ আমাকে মর্মাহত করেছে, কিন্তু এটি আমাকে স্বস্তিও দিয়েছে'।—অবশ্যই স্বস্তি তো পাবারই কথা, কেননা বৃটিশ কোলাবরেশনে তাঁর যে পরিকল্পনা তাকে কার্যকরী করতে হলে সুভাষের মৃত্যু জরুরী। জওহরলালের এই মিথ্যা পরিবেশন শুরু হয়েছিল দেশবাসীর প্রতি ১৯৪৫ সালের সেই তথাকথিত দুর্ঘটনার সময় থেকেই। দেশবাসীকে যে, এই শতাব্দীর সেরা মিথ্যার দ্বারা তিনি জয় করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর সজ্ঞানে মিথ্যার একটি জ্বলন্ত নমুনা এখানে তুলে ধরছি সাংবাদিক শ্রীযুক্ত জয়ন্ত চৌধুরীর লেখা—'নেতাজী গেলেন কোথায়' পুস্তক থেকে। ঐ পুস্তকে বর্ণিত ভাষায়ই আসুন আমরা শুনি। শ্রীচৌধুরী তাঁর পুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হচ্ছে—

১৯৪৫ সালের জুন মাসে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর বেতারে পরপর অনেকগুলি বাংলা বক্তৃতা করেন।.....ঐ বক্তৃতাগুলি লেখকের স্বকর্ণে শোনার সৌভাগ্য হয়। একটি বক্তৃতায় নেতাজী বলেন—"পণ্ডিত নেহেরু সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, আমি যদি বিদেশী সাহায্য নিয়ে ভারতে অভিযান করি, তাহলে তিনি আমাকে যথাশক্তি বাধা দেবেন। পণ্ডিত নেহেরু জেনে রাখুন, যতদিন আমার হাতে একটিও সেপাই বা একটিও বন্দুক থাকবে ততদিন আমি ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করায় বিরত হবো না।" তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক মিশ্রিত হাসির ধ্বনি বেতারেও শোনা গেল। পণ্ডিত নেহেরু যদি আমাকে ভারতীয় বাহিনী নিয়ে ভারতে প্রবেশে বাধা দেন, তাহলে আমি তাঁর সঙ্গেও যুদ্ধ করতে ইতস্তত করব না।"

বলাবাহুল্য পণ্ডিত জওহরলাল ক্রমান্বয়ে দুই দশক ব্যাপী ভারতবাসীকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে আসীন থেকেও দেশবাসীকে পৃথিবীর সেরা ধাপ্পাটি দিয়ে গেছেন। অথচ তাঁর নামেই আমরা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করে গেছি এমনকি আজও করতে কসুর করিনা।

এইসব সংবাদ কি ভারতের মহাফেজখানায় নেই বলছেন?

এইসব যাবতীয় সংবাদই কিন্তু বিশ্বের সকল স্থানে বা প্রভাবশালী প্রত্যেক দেশের সরকারী মহাফেজখানায় রয়েছে সংরক্ষিত। এতো গেলো অতি সামান্য দিক। আসুন, এ সম্পর্কে আরও কত বিস্ময়কর ব্যাপার বিশ্বে পরিব্যাপ্ত আছে, তা আমরা দেখার চেষ্টা করি। এ পর্যন্ত দেখা গেল সুভাষচন্দ্রকে বিশ্বের গোয়েন্দা প্রবররা কিছুতেই কূলকিনারা করতে পারছে না এবং হতাশ ও ভগ্ন মনোরথ হচ্ছে প্রতি পদে পদে।

পরন্তু দেখা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্র যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানেই হাজির হয়ে তাঁর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সবই করছেন এবং তাঁর মর্জিমতো তিনি সে স্থান ত্যাগ করছেন। আসুন, এমন কি কি তিনি ঘটাচ্ছেন বা এসব কথা কতদূর সত্য তা একটু যাচাই করি। ১৯৬৪ সালে সুভাষ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য-বিশিষ্ট আমেরিকার সরকার কর্ত্তৃক সি. আই.-এর ডি. ক্লাসিফাইড রিপোর্ট তার জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করছে বিশ্বনেতাদের বক্তব্যের সমর্থনে। এছাড়া আমরা দেখেছি ১৯৬৪ সালে ২৭শে মে তিনি ভারতের এবং বিশ্বের সকল বাঘা বাঘা গোয়েন্দাদের চোখের উপর পণ্ডিত জওহরলালজীর মরদেহের পাশে বিশ্ববরেণ্য নেতাদের মেলার মধ্যে তাঁদের সকলকে ভ্রূকুটি দিয়ে অতি নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে আছেন। এবং তাঁর যা করণীয় তা সমাপন করে তাঁর স্বাভাবিক গতিতেই ফিরে এসেছেন। আরও শোনা যায় তিনি যে ফুলের মালাখানি দিয়ে নেহেরুকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন তা ছিল সকলের প্রদত্ত মালার চেয়েও সেরা। এবং উক্ত মালা প্রদান করার পর তিনি একখানি চিরকূট শ্রীমতী ইন্দিরাকে প্রদান করে চলে আসেন। প্রত্যাশিত চিরকূটে নিশ্চয় নাম স্বাক্ষর করে থাকবেন। অথচ ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত নেহেরু, সুভাষচন্দ্রকে শুধু শত্রুরূপেই তীব্রভাবে দেখে এসেছেন। তার বহু প্রমাণ আমরা পেয়েছি ও ইতিপূর্বে তা নিয়ে যথাসম্ভব আলোচনা হয়েছে। এই যে কূটনৈতিক সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশ্বনেতাদের মেলা বসেছিল দিল্লীর সেই দরবারে নেহেরুর মরদেহের পাশে, বৃটিশ কর্তা লর্ড মাউন্টব্যাটেন থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের কোন্ নেতারা ছিলেন না? বৃটিশ, আমেরিকা, কে. জি. বি. কোন্ বিশ্বখ্যাত গোয়েন্দারা ছিল না সেই দিন? তাদের ক্ষমতা হলো কি সুভাষচন্দ্রের কেশ স্পর্শের? এখানেই শেষ নয়।

১৯৬৪ সালে ২৯শে নভেম্বর কলিকাতায় এসে তিনি (সুভাষচন্দ্র) মঙ্গোলীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করে গেছেন। তাঁকে হাওড়া স্টেশনে স্বাগত জানাতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কলিকাতার স্বনামধন্য প্রাক্তন মেয়র স্বয়ং কেশব বসু এবং আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। এ তথ্যচিত্র দিচ্ছে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা। আঁতকে উঠবেন না বন্ধু। এখনও কিছুই হয়নি। অপেক্ষা করুন আরও গুরুগম্ভীর চমকের জন্য। আরও বিস্ময়কর চমক হচ্ছে সুভাষচন্দ্র অবস্থান করছেন মাও-সে-তুং এবং চৌ-এন-লাই-এর ঠিক মাঝ বরাবর। এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে চীনের পিপল লিবারেশন সেনানী মণ্ডলীর মাঝে। এটি ১৯৪৯-এর অক্টোবরের চিত্র। সম্প্রতি একদল গবেষক এটাও প্রমাণ করেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রই ছিলেন ঐ অভিযানের নেতৃত্বে। অবশ্যই এর জন্য গবেষণার প্রয়োজন ছিল বলে

মনে হয় না। তার কারণ দুটি। প্রথমত: ছবিতে দেখুন (পৃ:.......) দেখা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্র সেনানী মণ্ডলীর নয় শুধু মহাচীনের মহান নেতা মাও-সে-তুং এবং চৌ-এন-লাই উভয়ের মাঝে, তাতে কি প্রমাণ হচ্ছে? প্রমাণ হচ্ছে তিনি সেখানে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন। এ সম্মান দিচ্ছেন তাঁকে কে, স্বয়ং বিশ্বের সেরা নেতা মাও-সে-তুং নয় কি? এর দ্বারা এটাই ধ্রুব সত্য ঘোষিত হচ্ছে যে সুভাষচন্দ্র আজ বিশ্বের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দেরও নেতা। তবে তিনি আত্মগোপন করে আছেন বললে তা কি কোন যুক্তিতে টেকে? কথাটা কি অবান্তর নয়? তাছাড়া তিনি যে মাও-সে-তুং-কে, তাঁর বিপদ থেকে পরিত্রাণ করেছিলেন সে সম্পর্কে মাও-সে-তুং-এর স্বীয় কৃত বক্তব্যে আমরা পরের অধ্যায়ে অনেক কিছু জানতে পারব। এই তথ্যচিত্র ও ছবি হচ্ছে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত। এটি বসুমতী পুনঃপ্রচার করে, বসুমতীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। তারপর ১৯৫৬ সালে চীনা প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বার্মার আউইগেট শহরের সম্মেলনে। ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এটি প্রকাশিত হয় Statesman পত্রিকায়। ১৯৫২ সালে মঙ্গোলীয় ও অস্ট্রেলীয় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে দেখা যাচ্ছে পিকিং শহরে। এসব ঘটনাই কি যথেষ্ট নয় সাক্ষ্যপ্রমাণের জন্য। না, এখানেই যদি শেষ হতো তাহলে না কথা ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়। অপর একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্যারিস শহরে শান্তি আলোচনায় ভিয়েৎনামি প্রতিনিধি দলে ১৯৭১ সালে। ঘটনাটি কোথায় লক্ষ্য করুন। যে ভিয়েৎনাম নিয়ে তিনি পাঞ্জা কষা শুরু করেছিলেন ফ্রান্সের সাথে তাদেরই খাস রাজধানীতে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীর খাসভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি বিতর্কে নেমেছেন। অথচ তাঁকেই ঐ সাম্রাজ্যবাদীরা হন্যে হয়ে খুঁজছে আর সারা বিশ্বকে চষে ফেলছে। এর চেয়ে বড় বিস্ময় পৃথিবীতে আর কি হতে পারে? এই অবস্থাকে আত্মগোপন বললে, আত্মপ্রকাশ কাকে বলবেন? বলাবাহুল্য এরই নাম হচ্ছে নেতাজী সুভাষ। ঐসব ছাড়া ১৯৭৫ সালে বিহারের চাষনালা নামক কলিয়ারীতে যে শতশত মানুষ কলিয়ারী ডুবে যাওয়াতে জলমগ্ন হয়ে মহাবিপর্যয় ঘটেছিল সেই বিপর্যয়ে তিনি স্বয়ং লোহার খাচায় করে খনিগর্ভে অবতরণ করে উদ্ধারকার্য করেন। সেই ছবিও এই বইয়ে প্রদর্শিত। (বলা নিস্প্রয়োজন এ ছবি পেয়েছি বি. ভি.-র বর্তমান শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সৌজন্যে স্বর্গীয়া কমলাদাশ গুপ্তার নিকট থেকে।) আপনি কি বলতে চান এসবই গালগপ্প। তাহলে আমরা একদিকে দেখছি তিনি তাঁর ইচ্ছামতই যেস্থানে যা প্রয়োজন বা যা তিনি প্রয়োজন মনে করছেন তাই করে চলেছেন, আপন মনে অত্যন্ত সাবলীল এবং ক্ষিপ্রগতিতে। এই যাবতীয় সংবাদই দিচ্ছেন বিশ্বনেতৃবৃন্দ থেকে বিপ্লবী সংগঠনের কর্মকর্তারা। কার্যত তাঁরাই এ সকল সংবাদ ও তথ্যের পরিবেশকও বটে। কিন্তু আশ্চর্য, পক্ষান্তরে তাঁর প্রতিপক্ষীয়রা বিশ্বের আনাচে কানাচে অনুসন্ধান চালাচ্ছে ঈগলের ন্যায় শ্যেনদৃষ্টিতে অথচ নাগালে পাচ্ছে না। তাদের সঙ্গে বসে কথা বলছেন তথাপি তাঁর সন্ধান পাচ্ছে না। নাগালে না পেয়ে হতাশার হুতাশনে আত্মদংশনে মরছে ধিকিধিকি করে। এই হচ্ছে নেতাজী সুভাষ, বিশ্বত্রাতা শ্রীমদ্ সারদানন্দজী। বাছাধনরা এবার টের পাচ্ছ কার সাথে খেলতে নেমেছ? ১৯৪১ সাল থেকে আজ ২০০০ সাল। লোকটির পাত্তাই নেই অথচ তাঁরই

দাবার এক এক চালে সবাই প্রাণান্ত হচ্ছে। এসব তথ্য কে মানল, কে মানল না তাতে কিছুই যায় আসে না। ঐ সমস্ত ছবি এ বইয়ে প্রদর্শিত হয়েছে।

আর ভারত সরকার যারা নাকি আজও সাম্রাজ্যবাদীর স্পিকার তারা দিনরাত্রি ডঙ্কা বাজাচ্ছে জাপান থেকে তথাকথিত ছাই এনে জাতীয় কর্তব্য করতে তথা গয়ায় পিণ্ড দান করতে হবে বলে। বলতে নেই ভারতের যে সরকার যখনই গদীয়ান হয়েছে তখনই তারা পিণ্ড দান করতে যাচ্ছেন। এরূপ যখনই ঘটাতে যাচ্ছে তখনই ব্যুমেরাং হয়ে তাদের দিল্লীর যমুনাঘাটে সপিণ্ডিকরণের মাধ্যমে সব সত্যনাশ হয়ে যাচ্ছে। আর তাই গোটা ভারতবাসীকে গেলাবার চেষ্টায় কোটি কোটি ডলারের শ্রাদ্ধ করছে জনগণের পকেট লুণ্ঠন করে। তবু এই হটকারী বিদেশী শক্তির পদলেহীদের চৈতন্য কোথায়? ১৯৪৭ সালের সেই ঘরভাঙ্গার চক্রান্ত থেকে ভারতবর্ষের আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি সরকারের এক চরিত্র এক ট্র্যাডিশন। এস. ওয়াজেদ আলির ভাষায় বলতেই হয় 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে'। এখানে স্মরণীয় রেণকোজি মন্দির অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়েছে ১৯৮৯ সালে। অথচ সেই রেণকোজি নিয়ে আজও টানাহেচড়া চলছে। আর কত চক্রান্ত চলবে? সবই তো ভস্মে ঘি-ঢালা হচ্ছে।

বলতে নেই এই সামগ্রিক চিত্র সংবাদ যুগপত বলে দিচ্ছে তিনি এক অতীন্দ্রিয় অদৃশ্য শক্তি হয়ে যেথা সেথায় যখন তখন সশরীরে উপস্থিত। এই হচ্ছেন জগৎদিশারী নেতাজী। যদি হিম্মৎ থাকে তো কিছু কর, কোন আপত্তি নেই। অর্থাৎ ব্যাপারটা যেন এই রূপ, যথা, 'আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকবো'—তাই আমরা দেখতে পাই, শৌলমারী আশ্রমের উপর দিয়ে অর্থাৎ আকাশপথে ভারত সরকারের কোন এরোপ্লেন চক্কর কাটলে আশ্রমপিতার ভ্রূ-কূটিতে এমন শক্তিধর ভারত সরকারেরও ক্ষমাপ্রার্থী হতে হয়। এই হচ্ছেন আজকের সুভাষচন্দ্রের রূপ ও তাঁর কর্মপরিধি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যে বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ড তার সংক্ষিপ্ত পরিধির সম্পর্কে অবগত হতে হলে আমাদের অবশ্যই তাঁর এশিয়া মহাদেশের মাঝে যেসব ঐতিহাসিক এবং অবিস্মরণীয় কর্মকাণ্ড করছেন তার একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। তা জানতে হলে আমাদের আরও একটু অনুশীলন দরকার। তা না হলে নেতাজী সুভাষের দেবমানবত্বের যে অনন্ত রূপ তা অনুধাবন পরিপূর্ণ হবে না। আমরা এবার সেই আলোকে কিছু তথ্য পাই কিনা তা দেখতে চেষ্টা করবো।

পূর্বেই বলা হয়েছে জাপান আত্মসমর্পণ করেছিল ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৫ সালে। ঠিক তার ১৫ দিন পর ২রা সেপ্টেম্বরে তিনি ভিয়েৎনামের মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন। বস্তুতপক্ষে তখনই তিনি বিশ্ব সাম্রাজ্যগ্রাসী বৃটেন, আমেরিকার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধেরই প্রলম্বিত রূপ হচ্ছে এশিয়. মুক্তিযুদ্ধ। এর পরবর্তী স্তরই হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ইত্যাদির মুক্তিসংগ্রাম। বলাবাহুল্য এসবের বিবর্তিত রূপই হচ্ছে বিশ্বমানব মুক্তির লড়াই। একথা সকলেরই জানা আছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী রূপ বা ভয়ালতায়, জাপানের পতন হলেও আজাদ হিন্দ সরকারের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। সেদিন তো নয়ই এমনকি আজও তা ঘটেনি। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ সালেই আজাদ হিন্দ সরকারের বৃটেন ও

আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। এই সূত্র ধরেই আমরা পাই একের পর এক বৃটেন-আমেরিকার পশ্চাৎ ধাবনের ধারাবাহিক ইতিহাস। এই ইতিহাসের সত্যতার স্বীকৃতি যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হচ্ছে মালয়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান। তিনি বলেছেন—সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণীয়, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস ইত্যাদি দেশগুলোকে নেতাজীই সাম্রাজ্যবাদীর কবল থেকে মুক্ত করেন ও স্বাধীনতা দান করেন। ইতিহাস থেকে আরও পাওয়া যায় যে ঐসব দেশের তৎকালীন নেতৃবৃন্দরা সকলেই ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একান্ত অনুরাগী। এ ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ বলেছেন, জওহরলাল নয় নেতাজীকেই তাঁরা অর্থাৎ ঐ সকল রাষ্ট্র ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা বলে মানেন ও শ্রদ্ধা করেন। উল্লেখ্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে জয়ী হলেও তারা কিন্তু পূর্ব-এশিয়ার ঐসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহকে পুর্নদখল করতে পারেনি। এটা সম্ভব হয়নি নেতাজী এবং তাঁর অবিস্মরণীয় এশিয় মুক্তি ফৌজ তথা আজাদ হিন্দ বাহিনীর শৌর্য্যের ফলে।

এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিতে যে শ্রেষ্ঠ ফলটি বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছিল সেটিই হচ্ছে ভারতবর্ষের বুক থেকে বৃটিশের পলায়ন। যদিও খলচক্রের জন্য অর্থাৎ ভারতীয় লোভী নেতাদের জন্য ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা পায়নি, না, সেদিন তো নয়ই এমনকি আজও নয়। তথাপি তথাকথিত স্বাধীনতা বা ডোমিনিয়ান পর্যায় তাও যে আজাদ হিন্দের দান তা ভারতীয় খলনায়করা স্বীকার না করলেও কিছু আসে যায় না। কারণ আসল সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন স্বয়ং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিম্যান্ট এ্যাটলী। এই স্বীকৃতির কথা স্বীকার করেছেন তিনি ১৯৫৫-৫৬ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত ফনীভূষণ চক্রবর্তীর কাছে। তাই ভারতীয় নেতাদের এই ঘৃণ্য ও বজ্জাতি চালকে চূর্ণ করতেই সুভাষচন্দ্র আজও মহাসংগ্রামে রত। এই সংগ্রাম যেদিন পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে সেদিনই দেখা যাবে এশিয়ার মুক্তিসংগ্রাম সার্থকভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

বলাবাহুল্য যে, এশিয়ার মুক্তির মন্ত্রগুরু হচ্ছেন ভারতবর্ষের তৎকালীন সেরা নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক মন্ত্রগুরুর নিকট থেকে যেদিন দীক্ষাপ্রাপ্ত হন সেই সময় থেকেই সুভাষচন্দ্রের সেই স্বপ্ন। এবং সেদিন থেকেই সুভাষচন্দ্র এই মহাসাধনা শুরু করেন। তাঁর মনে যে এই বীজ উপ্ত ছিল তা তখন কেউ জানতে না পারলেও আজ তা না বোঝার কোন কারণ নেই। সেই জন্যই সে সময় চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছিলেন দেশবাসীকে—"I have given you best of my jewels—I have given you Subhas, wait and see. You will find everything in him."—1924. বলতে নেই আজ ২০০২ সালের প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে দেশবাসী তথা বিশ্ববাসী কি দেখছেন তা আপনারাই বলুন। এবার বিচার করুন চিত্তরঞ্জন দাশকে। বিচার করুন চিত্তরঞ্জন দাশ কোন জগতের লোক ছিলেন। এবং পৃথিবীকে কী দিয়ে গেছেন? এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনার অবকাশ রেখে আমরা মূল আলোচ্যেই ফিরে যাবো।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯৪৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর টৌকিও বেতারে যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন "নতুন এশিয়া চীনকে বাদ দিয়ে কল্পনারও অতীত।

চীনের অখণ্ডতা ও পুনর্গঠন পূর্ব-এশিয়ার মানুষদের সাধারণ জাতীয় স্বার্থে জড়িত।" কাজেই চীনকে বাদ দেওয়া যায়না। এমন সার্থক চিন্তার যদি পথদ্রষ্টা বা নায়ক না হতেন তবে কি তিনি চীনের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নেতা মাও-সে-তুং-এর পরিত্রাতা বা উপদেষ্টা হতে পারতেন? তৎসত্ত্বেও বলতে হয় অতি দুঃখের, ক্ষোভের ও পরিতাপের কথা তবু নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের কেউ নন। এমনকি তাঁর নাম উচ্চারণ করাও যেন ভারতবাসীর অপরাধ! উল্লেখ্য চীন নিয়ে আলোচনা অবশ্যই হবে এবং মাও-সে-তুং-এর যে উদ্ধারকর্ত্তা ও উপদেষ্টা তা আমরা আলোচনা করবো এর পরবর্তী পরিচ্ছদে। তাই চীন নিয়ে এখানে চর্চা না করে অন্য চর্চা করবো। ইতিপূর্বে আমরা নেতাজীর বিশ্ববিজয় পরিক্রমার পর্যালোচনা করতে গিয়ে কোরিয়া যুদ্ধের ঘটনা আলোচনা করেছি। ইতিপূর্বে ভিয়েৎনাম নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। এবার আমরা তিব্বত নিয়ে সংক্ষেপে চর্চা করবো। সেখানকার নায়ক ধর্মীয় নেতা দালাই লামা স্বাভাবিক ভাবেই হবে এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

চীন ও ভারতের মধ্যবর্তী বাফারস্টেট তিব্বত। ভারতের সঙ্গে চীনা নেতাদের ভারতের উত্তর সীমান্তের ম্যাকমোহন লাইন ও তিব্বত নিয়ে যখন ক্রমান্বয়ে জল ঘোলা হতে শুরু হয়, তখন পণ্ডিত নেহেরুর বদান্যতায়? অক্ষমতায় চীন ভারতের উত্তর সীমান্তের বিস্তৃত ভূখণ্ড, কথিত আছে ৫০ হাজার বর্গ মাইল জমি নাক ১৯৬২ সালে চীন যুদ্ধের দ্বারা কবজা করে। তার পূর্বে তিব্বত কব্জা করে চীন। তখন তিব্বতের ধর্মীয় নেতা ছিলেন দালাই লামা। তিব্বতে ধর্মীয় নেতারাই দেশের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। ভারত, চীন ও তিব্বতের ডামাঢোলের পটভূমিকায় দালাই লামা চীনের হাতে অন্তরীণ হন। যখন তিব্বত চীনের কব্জায় চলে যায় সেই সময় ১৯৫৯ সালে দালাই লামা এক অদ্বিতীয় জ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক পুরুষের সাহায্যে চীনের কবল থেকে মুক্ত হন। দালাই লামার আত্মজীবনী—'Freedom-in-exile' গ্রন্থে (যা ১৯৯০ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত) তিনি বলেছেন ওরাকেলের সাহায্যে চীনের লৌহশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। দালই লামার আত্মজীবনীতেই তিনি তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। দালাই লামা যাঁর নির্দ্দেশে চলেন তিনি এক অদ্বিতীয় জ্ঞানী পুরুষ ও পৌরুষ। তিনি অর্থাৎ ঐ জ্ঞানী পুরুষ 'ওরাকেল' বলে বিশেষ খ্যাত। যদিও তিনি প্রকাশ্যেই চলাফেরা করেন তবু তাঁকে পৃথিবীর কেউই চিনতে বা ধরতে পারেন না। এ এক পরমাশ্চর্য কিন্তু পরম সত্য। কথিত আছে এই বিশ্বের অদ্বিতীয় জ্ঞানী পুরুষ যিনি তিনিই হচ্ছেন মহামান্য দালাই লামার চালিকাশক্তি। ঐ 'ওরাকেল' বা সর্বজ্ঞানী পুরুষকে নিয়ে নানা গুঞ্জন আছে। বলাবাহুল্য তিনিই নাকি স্বয়ং নেতাজী। এই জনশ্রুতিও বিশ্বের সর্বত্র। কিন্তু কারো সাধ্য নেই তাঁকে ধরাছোঁয়ায় পায়। তিনি এমনি এক ব্যক্তিত্ব। বলতে নেই বিশ্ববাসীর কাছে যিনি নেতাজী নামে খ্যাত তাঁর বৈশিষ্ট্যও তো সেই ওরাকেলরই নামান্তর। দালাই লামা তাঁর আত্মজীবনীতে ১৯৫৬ সালের গোড়ায় বলেছিলেন ওরাকেল নাকি ভবিষ্যতে পাশ্চাত্য দেশে উদয় হবেন। "Light of the wish fulfiling jewel (one of the names by which the

Dalai Lama is known to Tibetans) will shine in west." (Page—115)

দালাই লামা তাঁর আত্মজীবনীতে আরও বলেছেন,

"I did not begin preparation for my escape immediately. However, first I wanted to confirm the oracle's decision which I did by performing more (another form of divination) once more. The answer agreed with the oracle." (Page—149)

....."The following day I again sought the counsel of the oracle. To my astonishment, he shouted go! go! tonight." (Page—149)

"রাত্রি শুরু হলে আমি শেষবারের মত 'মহাকালের' জন্য উৎসর্গীকৃত পবিত্র স্থানে যাই। মহাকাল আমার ব্যক্তিগত ঐশ্বরিক রক্ষক।" "At nightfall I went for the Mahakal, my personal protector divinity." (Page—150)

(নেতাজীর অজ্ঞাত অধ্যায়, ড : সুশান্ত মিত্র)

এইসব তথ্যাতথ্যই বলছে যে মহামান্য দালাই লামার ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করার প্রাক্‌লগ্ন থেকেই তিনি মহাজ্ঞানী মহাজন ওরাকেলের স্নেহধন্য এবং ওরাকেলের ছত্রছায়ায় সুরক্ষিত। দালাই লামার তিব্বত থেকে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে আসার পথে তিনি যদি 'ওরাকেলের' সাহায্যপুষ্ট না হতেন তবে তাঁর যে ১৯৫৯ সালে ভারতে আসার পথেই জীবন অবসান হতো তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এ সম্পর্কে যেসব তথ্য বিশ্বের নানাস্থানে প্রচলিত আছে বা শোনা যায় তা যেমন চমকপ্রদ তেমনি অবিস্মরণীয়ও বটে। এমন যে ঘটনাটি ঘটেছিল দালাই লামার ভারতে আগমনকালে তার একটি রোমহর্ষক বর্ণনা পাই আমরা নেতাজীর অজ্ঞাত অধ্যায় পুস্তকে বর্ণিত তথ্যে।

....."দিগন্তে চীনা বোমারু বিমানকে আসতে দেখে সকলে যখন মৃত্যুর প্রমাদ গুনছিলেন, ঠিক তখন 'আউট অব নো হোয়ার'—ঘন কালো মেঘ তাঁদের মাথার উপর অতর্কিতে ছেয়ে গেল। তাই চীনা বোমারু বিমান খুব নীচু দিয়ে মাথার ওপর উড়ে গেলেও আশিজনের অস্তিত্বের সন্ধান চীনারা পেলেন না। এঁরাও বিমান বা বিমানের মার্কা দেখতে পেলেন না। চীনা বিমান চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কালো মেঘও অদৃশ্য হয়ে গেলো। চীনা আক্রমণ পরিত্যক্ত হলো। (বরং বলা শ্রেয় যে চীন প্রায় এক অদ্বিতীয় শক্তি এশিয়ার বুকে—সেও চূড়ান্ত ব্যর্থ হলো।) দালাই লামা ভারতে পৌঁছবার সাত/আট দিন আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। ঘটনাটি বাসুকির ফণায় নবজাতক শ্রীকৃষ্ণকে আড়াল করার কথা স্মরণ করায়।" (নেতাজীর অজ্ঞাত অধ্যায় ড: সুশান্ত মিত্র, পৃষ্ঠা—৩০৯।) তার থেকেও এখানে মহাভারতের জরাসন্ধ বধের কথাই অধিকতর প্রযোজ্য। কথিত আছে ঐ অলৌকিক ঘটনার মূলে ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এ সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে যারা চর্চা করছেন তাদের দাবী ওসব অলৌকিক বলে যা বলা হচ্ছে তা নিতান্তই অবান্তর ও বুজরুকি ব্যাপার। বলাবাহুল্য আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বের ঘটনাকে যিনি যে আলোকেই ব্যাখ্যা করুন না কেন

কিন্তু আজকের বিংশ শতাব্দীর ঐরূপ ঘটনাকে কি বলবেন? এর কি কোন ব্যাখ্যা আছে? প্রতি উত্তরে বলা যায় অবশ্যই আছে তবে তা আমাদের মত পার্থিব ও জৈবিক সত্তায় উপলব্ধির কর্ম নয়। তার একমাত্র ব্যাখ্যা দিতে পারেন আধ্যাত্মিক জগতের মহাজনরা। এ ব্যাপারে মহামান্য দালাই লামা তাঁর Freedom-in-exile আত্মজীবনীতে যা বলেছেন তাতে তিনি কিন্তু রূপান্তরিত করে তা ব্যক্ত করেছেন। তারও যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ তিনি কোন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হতে চাননি। এমন যে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটল তার পশ্চাৎভূমি যে ঐ মহামান্য ওরাকেল রয়েছেন তা বলার প্রতীক্ষা রাখে না। এ ব্যাপারে দালাই লামা শুধু সচেতন নয় শত সহস্র ভাগ সুনিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু তিনি এড়িয়ে না গেলে তাঁরও অকালেই পৃথিবী থেকে চলে যেতে হতো অনিবার্য ভাবেই। এ খবর তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। কেননা সাম্প্রতিককালের বিশ্বের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ঐ ওরাকেলের নামান্তরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যাঁরা বা যিনি প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন তাঁর বা তাঁদেরই জীবন ডালি দিতে হয়েছে। যে কারণে দালাই লামা অন্তত এই ভুলটি করেন নি। ঐ ওরাকেল নামের অন্তরালে যিনি অবস্থান করছেন তিনি পৃথিবীতে বহু নামে পরিচিত। বিশেষ করে তিনি তিব্বত, চীন বা ভারতের উত্তর সীমান্তেও সীমান্তবর্তী দেশগুলোতে কখনও শিব, কখনও ওরাকেল আবার কখনও জেনারেল ডেথ ইত্যাদি নামে পরিচিত।

ঐ 'ওরাকেল'-ই যে বিশ্ববাসীর পরমপ্রিয় নেতাজী সুভাষ বা বৃটিশ-আমেরিকার কাছে 'চন্দ্র বোস' তা নানাভাবে নানা আকার ইঙ্গিতে প্রকাশিত। এমন ইঙ্গিতপূর্ণ তথ্য পৃথিবীর সর্বত্রই আমরা দেখছি ছড়িয়ে আছে। তিব্বত ও দালাই লামা সংশ্লিষ্ট এ জাতীয় ইঙ্গিত বহু তথ্য যারা পরিবেশন করেছেন এমন একজন হচ্ছেন মার্কিন সাংবাদিক লাওয়েল টমাস দি জুনিয়ার। তাঁর গ্রন্থ দি দালাই লামাতে তিনি যা বলেছেন আসুন আমরা তা একটু দেখার চেষ্টা করি।

মার্কিন সাংবাদিক লাওয়েল টমাস (জুনিয়ার) তিব্বতে গিয়ে দালাই লামার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন ১৯৫৯ সালে। কিন্তু সেই ক্রুশিয়েল সময়ে যেহেতু ধর্মীয় নেতা দালাই লামা ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন তাই সেই সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। সে কারণে মি: লাওয়েল টমাস পরে ভারতে এসে ঐ সাক্ষাৎকারটি সম্পূর্ণ করেন। ঐ মার্কিন সাংবাদিক তার গ্রন্থে বলেছেন, যিনি দালাই লামাকে আপন ছত্রছায়ায় ভারতবর্ষে পৌঁছে দেন তাঁর পরিচয় তখনতো প্রকাশিত হয়নি এমনকি আজও নয়। যিনি এই মহাকাণ্ডের নায়ক তিনি নিজেকে 'জেনারেল শিব' বলে পরিচয় দেন।

"His identity has never been revealed. He called himself General Siva, a threatening title, for Siva is the God of destruction in the Hindu religion." (Page—83) (নেতাজীর অজ্ঞাত অধ্যায়, পৃষ্ঠা—৩০৯ ড: সুশান্ত মিত্র)

সাংবাদিক লাওয়েল আরও যা জানিয়েছেন তার গ্রন্থে তা হচ্ছে—জেনারেল শিবই

আবার জেনারেল 'ডেথ'—বলেও খ্যাত। এই জেনারেল ডেথ হচ্ছেন একজন সমরনায়ক। "He was professional military man of the group." (Page—৪৪) ১৭ই মার্চ ১৯৫৯ তারিখে ঐ কথিত জেনারেল শিব বা জেনারেল ডেথই চীনা লৌহশৃঙ্খলের প্রাচীর ভেদ করে গোপনে দালাই লামাকে উদ্ধার করে ভারতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

সর্বাপেক্ষা মজার ব্যাপার যে, দালাই লামা বা ঐ মার্কিন সাংবাদিক কেউই কিন্তু ওরাকেল, জেনারেল শিব বা জেনারেল ডেথের তথ্য প্রকাশ করেনি। অথচ ইঙ্গিতে বলেছেন ঐ তিনজন একই ব্যক্তির নামান্তর মাত্র। এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে আমরা এ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীব্যাপী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যে কর্মকাণ্ডের ইতিহাস পেয়েছি বিশ্বের সেরা নেতাদের বক্তব্যে সেখানেও 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র'—এই নাম ব্যক্ত করেনি। এইরূপ অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ কথা যাঁরা বলেছেন তাঁরা এক ডাকে বিশ্বে পরিচিত ও স্বনামধন্য। তাঁদের কথা আমরা অবশ্যই আলোচনা করেছি এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে। প্রসঙ্গের সৌজন্যে এখানেও স্মরণ করছি, যাতে ব্যাপারগুলো বুঝতে আমাদের সুবিধা হয়। তেমন নামগুলো হচ্ছে, চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই, মাও-সে-তুং, জন. এফ. কেনেডি, রবার্ট কেনেডি, এবং আমেরিকান পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজার্স, ক্লিফোর্ড প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিবর্গ। এর সঙ্গে আছেন কম্বোডিয়ান নেতা নরোদম সিহানোক। তাঁরা সকলেই এমন ইঙ্গিত করেছেন যা নাকি নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছাড়া কাউকেই বোঝায় না। এছাড়া বৃটিশকর্তা মাউন্ট ব্যাটেন ও জেনারেল ম্যাক আর্থারের তো পরিষ্কার বক্তব্যই আছে চন্দ্র-বোস একবারটি আত্মপ্রকাশ করলে বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব বলতে আর কিছু থাকবে না। বলাবাহুল্য ধর্মীয় নেতা দালাই লামা বা ঐ মার্কিন সাংবাদিক যা বলতে চেয়েছেন তার সঙ্গে সকল বিশ্বনায়ক ও বিশ্বের সেরা কূটনৈতিক ও সমরকর্তাদের বক্তব্যের মাঝে কোন প্রকৃত তফাৎ দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ সারা পৃথিবী এক ওরাকেল ওরফে নেতাজী সুভাষকে নিয়েই দিকভ্রান্ত ও নাস্তানাবুদ।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় ঐসব বিশ্বখ্যাত নায়ক ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ নেতাজী সুভাষকে যে দৃষ্টিতেই দেখুক না কেন বা তাঁর বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডের মহিমার স্বীকৃতি যতই দিক না কেন তাতে একশ্রেণীর দুষ্ট ইতরজনের কাছে কোনই মূল্য নেই। বলতে নেই ঐ শ্রেণীর নগণ্য ও জঘন্যরা বেশীর ভাগই হচ্ছেন তথাকথিত ভারতীয়। তাদের মধ্যে বলতে গেলে সকল শ্রেণীর লোকই বিরাজমান। স্বয়ং রাষ্ট্রনায়ক রাজনীতিবিদ থেকে বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক কুলের তথাকথিত সুপার আঁতেল এবং সংবাদপত্র গোষ্ঠীও তা থেকে বাদ নেই। আর সাধারণ শহুরেজীবীদের তো কথাই নেই। যদিও তারা সাধারণ বলে দাবী করেন, তারা কিন্তু একশ্রেণীর নোটরিয়াস—Notorious ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই জ্ঞানী 'ওরাকেল'—বা ছদ্মনামধারী ব্যক্তিকে নেতাজী বলে চিহ্নিত করার কারণ স্বরূপ যে সকল কারণ—'নেতাজীর অজ্ঞাত অধ্যায়' গ্রন্থের লেখক উপস্থাপন করেছেন তা যে অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য তাতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। গ্রন্থকারের ঐ বিশ্লেষণীতে

যা আমরা পাই তা ঐ লেখকের ভাষায়ই আসুন শোনা যাক।

(এক) চীনের সৈন্য পরিবেষ্টিত অন্তরীণ ধর্মীয় নেতাকে উদ্ধার করার স্পর্ধা ও দুঃসাহস আর কোন এশিয় নেতার থাকতে পারে?

(দুই) মাও-সে-তুং-এর নীতির বিরুদ্ধাচরণ করার স্পর্ধা, সাহস ও শক্তি আর কার থাকতে পারে?

(তিন) যুদ্ধাপরাধী বলে মার্কিনীরা নেতাজীর নাম কখনো উচ্চারণ করেন না। এক্ষেত্রেও মার্কিন সাংবাদিক তাই করেছেন।

(চার) উপযুক্ত সময় না আসা পর্যন্ত চেষ্টা করলেও এঁর প্রকৃত পরিচয় জানা যাবে না।

ঐ পুস্তকের লেখক বলছেন যে, প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধুর কাছে শুনেছেন, "মহামান্য দালাই লামার ওপর ডক্টর হারারের লেখা গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ১৭ই মার্চ ১৯৫৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসু দালাই লামাকে উদ্ধার করেন চীনের কবল থেকে এবং ভারতে তাঁকে পৌঁছে দেন। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে কোন অনিবার্য কারণে তা আর প্রকাশ করা হয়নি"। অর্থাৎ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম গোপন করা হয়। অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের সকলের একই খেলা। আরও পরিষ্কার করে বললে বলতেই হয় আজ প্রায় শতবর্ষ ধরে পৃথিবীতে একটিই খেলা চলছে যার নাম— ন্যায়, নিষ্ঠা, মানবতা বনাম অমানবতা অথবা বলা যেতে পারে নেতাজী সুভাষ বনাম সমগ্র পৃথিবীর খেলা।

এই প্রেক্ষাপটে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠেই বলা যায় সময় হলেই দেখবে সমগ্র বিশ্ববাসী যে খলচক্রের বা বিশ্বের গোটা কূটনৈতিক চক্রেরই দুর্বার পরাজয়। তারা সকলে কালগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে কিন্তু সুভাষচন্দ্রই হবেন একমাত্র মহাকাল বিজয়ী অদ্বিতীয় পুরুষ ও পৌরুষ। সেদিন তিনি ভগবানের প্রতিভূ বলেই বিশ্বমানবের নিকট পূজিত হবেন। এই হচ্ছেন নেতাজী সুভাষ যিনি হচ্ছেন বিশ্বমানবের একমাত্র পরিত্রাতা দেবমানব।

এই নিয়ে আমরা আর চর্চা করবো না। এবার চলুন ফিরে যাই আমাদের মূল প্রসঙ্গে। আমাদের প্রসঙ্গ ছিল শৌলমারী অধ্যায়। আবার এখন সেখান থেকেই শুরু করা যাক। উপরের তথ্য ও সত্যাসত্যই বলছে আমরা অন্ধ না হলে শুধু ছাই ছাই করে কীর্তন করতুম না বা চিৎকার করতুম না। আমাদের জ্ঞানাঞ্জন যদি থাকতো বা চৈতন্য থাকতো আর তাঁকে দেখবার চেষ্টা করা হতো তবে অনায়াসেই দেখতে সক্ষম হতাম। সাধকের সামনে যেমন চতুর্ভুজ দর্শন দেন কিন্তু পাপিরা দেখেনা এ হচ্ছে তাই।

বলাবাহুল্য তিনি অতীন্দ্রিয় জগতের অদ্বিতীয় রাজ চক্রবর্তী হলেও ইন্দ্রিয় জগতের অর্থাৎ মাটির পৃথিবীর কঠিন বাস্তব জগতের লোককে কোন অবস্থাতেই উপেক্ষা করেন না। বরং উল্টো কথাই সত্য। তিনি আমাদের ভালোবাসেন। এবং সাধারণকে অনেক

বেশি ভালোবাসেন। তিনি তা করেন বলেই অর্থাৎ ভালোবাসেন বলেই দয়া করে তাঁর বিগলিত করুণা দ্বারা নিপীড়িত বিশ্ববাসীর যেখানে যখনই মানবতার শত্রুর হাত প্রসারিত সেখানেই উপস্থিত হয়ে তাদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন পৃথিবীর সর্বত্র। তাঁর দৃষ্টিতে যেকোন মানব গোষ্ঠীই সম মর্যাদার এবং সমান সমাদরের। উপরের ফিরিস্তিই তার জ্বলন্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ। ভারতবাসী সাম্প্রতিককালে প্রত্যক্ষভাবে পাচ্ছে না শুধু তাদের কর্মদোষে। নতুবা তিনি তাঁর করুণার ভাণ্ডটি নিয়ে ভারতবাসীর জন্য বসেই ছিলেন। এবং আছেনও তা ভারতবাসীকে দেবার জন্য, বিলাবার জন্য। কিন্তু আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে তাঁর দয়ার দানে কিছুটা স্বাধীনতা পেলেও তাঁকেই ঘুণাক্ষরেও স্বীকার করিনা। একটি বারের জন্য ভুলেও। তাই তার ফলও পেয়েছি হাতেনাতে ১৯৪৭ সালে গরমা গরম এবং আজও পাচ্ছি। তবে তাঁর দয়া থেকে যে জাতি বঞ্চিত হবেনা তাও যথার্থ সত্য। তবে নির্ণায়ক অবশ্যই সময়। নইলে তিনি বলতেন না,—

"আমাদের সমগ্র জাতির কৃতপাপের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি।" এই একটি বাণীতেই বলতে চাইছেন তিনি সমগ্র জাতিকে মাভৈঃ। এ জাতীয় আশ্বাস পৃথিবীর অন্য কোন জাতিকে তিনি দিয়েছেন বলে জানা নেই। বলাবাহুল্য প্রায়শ্চিত্ত না হলেও পৃথিবীর সকল জাতির জন্যই তিনি অশেষ কর্মকাণ্ড করে দুঃখকষ্টও করছেন কিন্তু তাদের জন্য এমন মানসিক যন্ত্রণায় নিশ্চয় ভুগছেন না। এবং ভুগছেন না বলেই তিনি তাঁর জননী জন্মভূমির প্রতি এতখানি সহমর্মিতা ও বেদনা প্রকাশ করছেন। শুধু প্রকাশ নয়, জন্মভূমির অধিবাসীর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছেন আজীবনব্যাপী। তাঁর কি প্রয়োজন ছিল এমন সহমর্মিতার বা প্রায়শ্চিত্তের, এহেন প্রত্যাখ্যাত হয়ে, প্রত্যাঘাত পেয়েও? এ থেকেই বুঝতে হবে স্বদেশবাসীর জন্য তাঁর ব্যথাবেদনার পরিধিটা। এই প্রসঙ্গকে রেখে চলুন আমরা আমাদের আদিকাণ্ড শৌলমারী পর্বে ফিরে যাই। সেখানে বিচরণ করে কিছু পাই কিনা দেখা যাক।

যখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র শ্রীমদ্ সরাদানন্দজীর ছদ্মবেশে শৌলমারী আশ্রমে অবস্থানরত, তখন একসময়ে বলেছিলেন যে, পৃথিবীটা একটা আধ্যাত্মিক যুগে প্রবেশ করতে চলেছে। পৃথিবীতে এই যুগটা নেমে আসারও একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। এই যুগের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, যে,

"A New Era has been slowly but surely dawning upon humanity—thc Era of spirituality." (তাইহোকু থেকে ভারতে, পৃষ্ঠা—৩৮৪, ২য় খণ্ড)।

অর্থাৎ মানব ইতিহাসে এতকাল যে যুগগুলো এসেছে সেগুলো ছিল, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগ নামে নামী ও খ্যাত। এবার যে যুগটি আসছে তার নাম হবে ধর্ম যুগ, মানবতার যুগ। তথা আধ্যাত্মিক যুগ। এবার স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন হচ্ছে যে, এহেন ঘোষণা ভাবুন কেমন ব্যক্তির বা কোন মার্গীয় ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব? তা থেকেই বোঝায় এমন ঘোষণায় যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিফলন

ঘটছে। এখানে স্মরণীয় যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন মানুষকে 'মানুষ' হতে হলে 'মান' সম্পর্কে হুঁশ থাকতে হবে অর্থাৎ চৈতন্যের দ্বারা চৈতন্যময় হতে হবে জগতের সকলকে। এই ছিল ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আদি বীজমন্ত্র। আর তারে প্রতিফলনের জন্য তাঁরই প্রধান প্রবক্তা বা পুরোহিত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন রামকৃষ্ণের মন্ত্রলব্ধ নরেন তথা স্বামী বিবেকানন্দ। এবং স্বামীজী এই বীজমন্ত্রকে রূপায়িত করতে বিশ্বমানব ভূমিতে আরও স্বর্গীয় রূপে নিজেকে প্রকাশ করলেন 'বিশ্ববিবেক'—রূপে। এই বিশ্ববিবেক রূপে আবার তাঁর প্রকাশ ঘটল ১৮৯৩ সালে ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগোর বিশ্বমানব মিলন মেলায়। সেখানে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রদত্ত বীজমন্ত্রের আসল স্বরূপটা বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরলেন এবং সেই মহান পথে বিশ্ববাসীর চলার নির্দেশিকা ঘোষণা করলেন। তাই তিনি প্রথমেই আমেরিকার সেই মানব মিলন মেলায় দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন—আমেরিকাবাসী 'আমার ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ' এই অভিধায় সম্বোধন করে। এই অভিধায়ই স্বামীজী বিশ্বের সামনে তুলে ধরলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সেই 'মানুষ' হওয়ার বাণী। বা চৈতন্য বোধ জাগ্রত হওয়ার মহাবাণী। এই চৈতন্য হওয়ার মাঝেই লুক্কায়িত রয়েছে ভেদা-ভেদহীন এক মানবিক বিশ্ব সমাজ সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ। এবং সেই পথ ধরে হাঁটলেই ক্রমে এসে যাবে পৃথিবীর যাবতীয় কিছুতেই সৌন্দর্যতা বা শালীনতা। এই শালীনতা দ্বারা যদি সমগ্র মানব সমাজ দীক্ষিত হয় তবেই জগতের যত হিংসা, দ্বেষ, হলাহল, লোলুপতা, ভাতৃদ্রোহীতা যতপ্রকার অমানবিক বৃত্তি সবই ক্রমে দূরীভূত হবে এবং পৃথিবীর মানব সমাজে দেখা দেবে এক মহিমাময় স্বর্গীয় অনাবিল শান্তি ও স্নিগ্ধতার এবং মহাসাম্যের পরিবেশ। তাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মানব সমাজকে বারবার বলেছেন এবং আশীর্ব্বাদ করেছেন চৈতন্যময় হবার জন্য, মান সম্পর্কে হুঁশিয়ার হবার জন্য। তাই আমার বিশ্বাস এই বীজমন্ত্রের জন্যই ভারতীয় বিপ্লবীরা বলেছেন তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী। অর্থাৎ একটি মন্ত্রকে যথার্থভাবে সক্রিয় করলেই তো সব সমস্যা মিটে যায়। তাই তিনি বিশ্বের বিপ্লব-'জনক'। আর এই পথ ধরেই স্বামীজীর, বিবেকানন্দ রূপে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ। এখান থেকে বিশ্ব পেলো বিশ্বের বীজমন্ত্রগুরুকে এবং তারে বিশ্বের কানে পৌঁছাতে বিশ্ব পেলো জগৎগুরু স্বামী বিবেকানন্দকে। এবার যাঁর প্রয়োজন তিনি হবেন এই মহাকাণ্ডের মহামন্ত্রের রূপকার। এর রূপকার না হলে তারে ক্ষেত্রায়িত করবে বা চাষ করবে কে? আবার এখানে এসেও বিশ্ব পেল তাদের মহারূপকারকে। এই রূপকারই হচ্ছেন আজকের বিশ্বের বিশ্বপিতা শ্রীমদ্ সারদানন্দজী। যিনি হচ্ছেন নেতাজী সুভাষেরই বিবর্তিত রূপ। নেতাজী সুভাষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের অভীপ্সিত সাধন পথের বলেই তাঁর পক্ষে তাঁদের অসমাপ্ত কাজ করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। বলাবাহুল্য তিনি আজ সার্থক ভাবেই সেই শীর্ষাসনে আসীন। এবং সেই ব্রতে এক মহান ব্রতচারী হয়ে বিশ্বকে পরিমার্জিত করে সেই পথে নিয়ে চলেছেন। এখানে এসে অক্লেশেই

বলা যায় শ্রীমদ্ সারদানন্দজী বা নেতাজী সুভাষই হচ্ছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও জগৎগুরু স্বামীজীরই যেন প্রতিরূপ বা প্রতিবিম্ব। সার্থক প্রতিভূ, সার্থক ব্রতচারী। এমন শীর্ষস্তরে আজ তাঁর অবস্থান বলেই তিনি বলতে পেরেছেন আগামী যুগের গতিপ্রকৃতি এবং তার চেহারা নামধাম ইত্যাদি। এই স্তরে পৌঁছাতে যে সাধনব্রত তাই এমন দীর্ঘায়িত। এই ব্রত ও সাধনা করতে গিয়েই সুভাষচন্দ্রকে হতে হয়েছে নেতাজী। আবার নেতাজী থেকে হতে হয়েছে বিশ্বপিতা শ্রীমদ্ সারদানন্দজী। এই এক একটি মহান্তর উত্তরণ হতে তাঁর পৃথিবীতে কোন কর্মযজ্ঞই বাদ রাখেন নি। তাঁর এক একটি স্তরই মহাভারত সমবিস্তীর্ণ পর্ব। অবশ্যই এখনও অনেক বাকী। তাই তাঁর আত্মপ্রকাশে এত সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা প্রয়োজন হচ্ছে। তাঁর গন্তব্যে পৌঁছাতে যা যা প্রয়োজন যত সুকঠিন বিপর্যয়ই অতিক্রম করতে হোকনা কেন তা তিনি যে করবেনই সেই ইঙ্গিততো পৃথিবীর সর্বত্র। নইলে কি মানবতার শত্রু বৃটিশ-আমেরিকা বলে, তাঁরা তোজো, হিটলার, স্তালিনদের ভয় পায় না। ভয় পায় সুভাষচন্দ্রকে। তাদের মূল্যায়ন যে সার্থক তারই প্রতিফলন ঘটছে আজ সর্বত্রই। সাধনা কঠিন বলেই সুভাষচন্দ্রের পথও অতি দীর্ঘ। তবে সেই পথেরও অবশ্যই প্রান্ত আছে। সেই জন্যই শ্রীমদ্ সারদানন্দজী বলেছেন, slowly but surely. একটি নুতন যুগ পৃথিবীর বুকে মানুষের মাঝে প্রতিফলিত হতে চলেছে।

উপরে বর্ণিত তথ্যই বলছে আজকের পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করলে এই মহাকাণ্ডের অবশ্যই উত্তরসাধক নেতাজী সুভাষরূপী শ্রীমদ্ সারদানন্দজী। বা নেতাজী সুভাষ নামের এক সিংহ পুরুষ। এই জাতীয় কোন তথ্য কি আমরা পৃথিবী জুড়ে আর দ্বিতীয়টি উদ্ধার করতে পারবো? অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র সংশ্লিষ্ট বিশ্বনেতাদের সঙ্গে যে চিত্র আমরা পেলাম বা আরও পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্বে ছড়িয়ে আছে তা কি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির চিত্র কেউ উপস্থাপনা করতে পারবেন? যদি তা সম্ভব না হয় তবে কি বলার অপেক্ষা রাখে যে সুভাষচন্দ্রই হচ্ছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরসাধক। তাই বলতেই হয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যেমন রামকৃষ্ণই, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দই এঁদের কোন বিকল্প হয় না ঠিক তেমনই নেতাজী সুভাষ ও নেতাজী সুভাষই এঁরও কোন বিকল্প হয় না হতে পারে না। তাই তো তিনি বলতে পারেন যে,

"I must be the prophet of the future. I must discover the laws of progress. The tendency both the civilization and there form to settle the future goal and progress of mankind. (31st August 1915)

এবার অতি স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় এমন কর্মকাণ্ডের ধারক ও বাহক হিসাবে যে আজকের নেতাজী সুভাষ তা কি আর গবেষণার প্রয়োজন আছে? তবু শৌলমারী অধ্যায়ের আলোয় আসুন তা নিয়ে কিঞ্চিৎ চর্চা করা যাক যদি আরও কোন অভাবনীয় কিছুর সন্ধান আমরা পাই। পৃথিবীতে একটি নতুন যুগ আসছে মানেই সমগ্র মানব

জগতের জন্য একটি সর্বাঙ্গীণ নতুন অনুশাসন প্রণালীর বিধিবিধান হতে যাচ্ছে। এইরূপ উক্তি কোন পার্থিব সাধারণ কারো হওয়া সম্ভব নয়। হতে পারে না। কারণ এই বিধিবিধান যাই হোক না কেন তা হবে গোটা পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণার্থে, মঙ্গলার্থে একটি পূর্ণাঙ্গ মৌলিক ব্যবস্থা। এর সাথে খণ্ডচিত্রের কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই এমন যিনি হবেন তিনি যে হবেন ত্রিকালজ্ঞ মহাযোগী তাতে কি সন্দেহ থাকতে পারে? তাই সাধারণ মানসিকতাই বলছে শৌলমারীর সাধুবাবা যদি সেই অদ্বিতীয় পুরুষ না হবেন তবে ঐরূপ ব্যাখ্যা বা মানব ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এবং তার দিক দর্শনের ঠিকানা কিভাবে তিনি দিতে পারেন বা দেবার জন্য এগিয়ে আসতে পারেন? তাই আবার বলতেই হয় সুভাষ যেমন সুভাষই, নেতাজী যেমন নেতাজীই তেমন শ্রীমদ্ সারদানন্দজীও সারদানন্দজীই। অর্থাৎ ব্যক্তি হিসাবে একজন হলেও তিনি যখন যে স্তরে অবস্থান করছেন সেই সেই স্তরেই তিনি এক জগৎ বিস্ময়। এক অবিস্মরণীয় রূপে রূপময়। এটাকে বিবর্তন বলুন, জন্মান্তর বলুন আর উত্তরণই বলুন মানব ইতিহাসে এঁর এক একটি পর্যায়ের দ্বিতীয় উপমা কোথায়! তাঁর এক একটি রূপই তো বিশ্বরূপের মত অনুপমেয় ও বিস্ময়কর। তা যেমন অবর্ণনীয় মনুষ্য মস্তিষ্কের ব্যাখ্যার অতীত তেমনি অভাবনীয়, অবিস্মরণীয়। এতো হুবহু সেইরূপ ঠিক কৌরব সভায় কৃষ্ণকে যেমন বন্দী করতে গিয়ে দুর্যোধন দেখলেন শ্রীকৃষ্ণ অদৃশ্য ও উধাও ঠিক তেমনটি। এখানেও সে কথাই প্রযোজ্য। এর কি ব্যাখ্যা আছে? এতো ঠিক সেই পর্যায়। অরূপ যেথায় স্বরূপে বাঁধা চেতন অবচেতনে, সেই স্বরূপ।

এবার একটু দৃষ্টি ফেরালে আমরা কি দেখছি, দেখছি কালচক্রের অবস্থান বলছে পৃথিবীতে একটি নূতন যুগ সমাগতের পথে বা একটি যুগ প্রায় আসন্ন। যদিও তা আসছে খুবই শ্লথ গতিতে, তবে তা যে আসছে তাও অবধারিত। কারণ এ-যুগের যে পথ দ্রষ্টা তাঁরই হচ্ছে এই বাণী। পূর্বেই আমরা দেখেছি এবারের যে যুগটা তা হবে বিশ্বের অদ্বিতীয় এক মহান সমন্বয় ধর্মের যুগ। এক ধর্মীয় যুগ। এই আদর্শকে সম্মুখে রেখে আসুন আমরা পৃথিবীর দিকে দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখি কি পাই বা কি দেখছি এবং কেমনেই বা এই মহাসমন্বয় সাধন ঘটতে যাচ্ছে, এর প্রকৃষ্ট কোন উদাহরণ আছে কিনা, পাই কিনা। এই পথ ধরে হাঁটলে দেখছি যে, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেন যখন শেষবারের মতন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের শক্তি দ্বারা আক্রান্ত, তখনই কিন্তু একটি মহাসমর গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করে নিচ্ছিল। কিন্তু এই বিশ্বমানবতা বিধ্বংসী চক্রান্ত বা চক্রবলয় থেকে কে রক্ষা করলেন মানব সভ্যতার লীলাভূমি পৃথিবীকে?—অবশ্যই ঐ মহামতি সারদানন্দজীর ছদ্মবেশে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

আসুন ব্যাপারটা একটু খোলা মনে খোলা চোখে দেখা যাক। ব্যাপারটা রাতের অন্ধকারে ঘটেনি। বা সাহারার বুক বা আফ্রিকার কঙ্গো উপত্যকার নিরবিচ্ছিন্ন

জঙ্গলেও ঘটেনি, যে দেশের জনগণ তা জানবেন কেমন করে? ব্যাপারটা সকলের চর্মচোখের উপরই ঘটেছিল। অতএব সকলের তা জানবার কথা, বুঝবার কথা। কিন্তু চোখ থাকতে যদি চোখ না দেখে, কান থাকতে যদি কান কালা হয় এবং মন থাকতে চেতনাবোধ না থাকে তবে তাদের কোন শিবস্য শিব জাগাতে পারে? তবু আসুন ব্যাপারটা একটু জানার চেষ্টা করি। চন্দ্রশেখরজীর যখন রাজত্বকাল চলছে ভারতে অর্থাৎ চন্দ্রশেখরের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালের সময় জর্ডন এয়ার লাইন্সের একখানি বিমান পিকিং থেকে উড়ে আসে ভারতের এক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দমদমে। তারিখটা ছিল সেদিন ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সাল। উক্ত বিমানে ছিলেন কয়েকজন বিশ্বসেরা ভি. ভি. আই. পি.। তাঁরা কেউ বিমান থেকে অবতরণ করেননি বা দমদম বিমান বন্দর থেকে কেউ বিমানে আরোহণ করেছেন বলেও খবর নেই। অথচ ভারতের এক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সেটি অবতরণ করল। তা সত্ত্বেও ভারত সরকার কোন উচ্চবাচ্য শব্দ করতে সাহস পর্যন্ত করতে পারল না বা করল না। শুধু তাই নয়। সেই বিমানখানিকে অত্যন্ত কঠোর নিরাপত্তা বলয় দ্বারা সুরক্ষিত করে পরিবেষ্টিত করা হলো। এক কথায় লোকচক্ষুর অন্তরালে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল সম্পূর্ণ ভারত সরকারের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে! ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে যদি এই ব্যবস্থা না হয়ে থাকে তবে ভারত সরকারের বিশেষ নিরাপত্তা বিভাগ কেমন করে ঐ দায়িত্বে নিয়োগ হলো। বা ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করল? পরন্তু যা কার্যত হওয়া উচিত ছিল তা তারা করাতো দূরের কথা একটি টু শব্দ করার ও বুকের পাটা হলো না। এমন এক শক্তিধর ভারত সরকারের। বিমানটি ছিল যখন বিদেশের তখন ঐ বিমান যাত্রীদের অবতরণ করিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করাই হতো সঠিক পদক্ষেপ। তারপর তাঁদের আন্তর্জাতিক আইনে বিচার করানোর ব্যবস্থা করা। এর উত্তর কি বলুন?

শুধু এখানেই অধ্যায় শেষ নয়। এঁদের নিরাপত্তার ভার ছিল ভারতীয় সামরিক বিভাগের বড় বড় কর্তাবাবুদের উপর। ব্যাপারটা কি? তবে কি অলৌকিক ঘটনা? তাও যে নয় তার কি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে? শুধু কি তাই? এই বিমান তার জ্বালানির জন্য ১৩ টন জ্বালানি তৈলও দমদম বিমান বন্দর থেকে সংগ্রহ করল। তারপর বিমানখানি উড়ে গেল তেহেরানে অর্থাৎ ইরানে। সেখান থেকে গেল ইরাকে। সেদিন তারিখটা ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সাল। এ ঘটনার পরই বিশ্বসংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো খবর যে ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সালে বিশ্বের কয়েকজন সন্ত মহাপুরুষ উক্ত উড়ানে করে এসেছেন ইরাকে। তাঁরা বিমান থেকে অবতরণ করে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের সঙ্গে দেখা করেন বা দেখা করার ব্যবস্থা করা হয় এবং গোপন আলোচনারও ও ব্যবস্থা হয়। তার পরদিন ২৫শে ফেব্রুয়ারী স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলো সাদ্দাম হুসেন রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীর সাথে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। অথচ এই যুদ্ধ বিরতির কোন এতটুকু সম্ভাবনাই ছিল না। একথা বলেছিলেন তৎকালীন

জাতিপুঞ্জের মহাসচিব প্রেজ্ দ্যা কুয়েলার। তিনি আরও বলেছিলেন, জানিনা এ যুদ্ধের পরিণতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে। ভগবানের করুণা না হলে এ যুদ্ধ মানুষের ঠেকানো সম্ভব নয়। তারপরই ঐ অজ্ঞাত নামা, অজ্ঞাত পরিচয় সন্ত মহাপুরুষদের সমাগম। এবং এত বড় একটি বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি।

আঁতকে উঠবেন না বন্ধু। এসব তথ্যের সবকিছুই সংবাদপত্রের খবর। এবার একবার ভাবুন তো এমন কর্মকাণ্ড কে বা কারা ঘটাতে পারেন? অন্তত ভারতবর্ষের মাটিতে এমন ঘটনা ঘটাবার বা ভারত সরকারকে পুতুলবৎস্থবির করে দেবার হিম্মৎ কার? এমন বুকের পাটা কার? কে সেই মহাজন? বৃটিশ-আমেরিকা হলে তবুও সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু তারাতো নয়। তবে কার এমন দাপট! আমাদের মনে রাখতে হবে আজকের ভারত কিন্তু পঞ্চাশের দশকের এক জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার ভারত নয়। আজকের ভারত প্রয়োজনে পৃথিবীর স্বঘোষিত সম্রাট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তর্জ্জনী তুলে কথা বলতে পারে। এমন ভারতের বুকে বিদেশী বিমান নিয়ে যখন ইচ্ছা অবতরণ করা হলো আবার তাঁর প্রয়োজন মিটিয়ে যথারীতি চলেও গেল আন্তর্জাতিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে। ব্যাপারটা কি? কথার কথা? এই ঘটনাতো সেই ষাটের দশকের শৌলমারীর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় বা দিচ্ছে। আশ্রমটি আশ্রম নয়। যেন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভারত সরকারের হিম্মৎ হলোনা সেই সাধুজীর আশ্রম নস্যাৎ করে দেয় বা যৎসামান্য একটি টোকা দেয়। শুধু তাই নয়। আশ্রম চত্ত্বরে শুধু প্রবেশাধিকারই ভারত সরকারের ছিল না। এমনকি আশ্রম এক্তিয়ারের উপর অর্থাৎ আকাশ পথে ভারত সরকার বা কোন সরকারেরই শূন্যযান অর্থাৎ এরোপ্লেন উঠা পর্যন্ত নিষিদ্ধ। কে এই সাধুজী, যাঁর এমন বুকের পাটা? কি অধিকার বলে এমন হিম্মৎ তাঁর? বলাবাহুল্য এই হচ্ছেন নেতাজী সুভাষ। ভাবখানা হচ্ছে এই রূপ। আমি ছিলাম, আমি আছি এবং আমি থাকবোও। এসেছিলাম, এসেছি, এবং যতবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন ততবার আসবো। শক্তি থাকেতো কিছু করে দেখাও। বলুন এ কেমন বাপের বেটা? না বন্ধু এখানে তত্ত্ব ফলিয়ে লাভ নেই। এখানে তত্ত্ব ফলাতে যাবেন না। এখানে নেই কোন একপেশে বায়াসনেসের প্রশ্ন। যা সত্য তা স্বীকার করাই হবে যথার্থ বুদ্ধিমানের কাজ। ওসব বিতর্ক বাদ দিন। সাধারণ বুদ্ধি কি বলে? আবার বলছি এই হচ্ছেন নেতাজী সুভাষ। যাঁর ভয়ে বৃটিশ-আমেরিকা এবং তাদের দোসর তথাকথিত ভারত সরকার আজও তটস্ত। কিছু করার থাকে তো—তবে সে হিম্মৎ অবশ্যই দেখাও। অবশ্যই একটা কথা বলার এখানে অপেক্ষা রাখে না যে কিছু করার বীরত্ব বা হিম্মৎ তাদের আসবে কোথা থেকে? বীরত্ব বা বাহাদুরী তো সেই দেখাতে পারে, যে ষোল আনা সাচ্চা যার পশ্চাৎভূমি কলঙ্কহীন। নতুবা বীরত্ব দেখাবার ক্ষমতা কার? ভারত সরকার তো তুচ্ছ পৃথিবীর সকল দেশের সরকাররাই আজ খুব ভালোভাবেই সচেতন আছে যে সুভাষচন্দ্রের মানবপ্রেম, মানব হিতৈষণার কাছে কেউই দাঁড়াতে পারবে না। কাজেই সেই ক্যাপিটেল বা মূলধন থাকলে তবে তো তারা বুক চিতিয়ে এসে

প্রশ্ন তুলবে বা অনধিকার বলে শোরগোল করবে। সত্যকে কে ভয় করে না বলুন? তাই তাঁর অর্থাৎ নেতাজী সুভাষের বিশ্বব্যাপী অবাধ বিচরণ। কোন সরকারের কিছু করার বা কোন অভিযোগ আনার ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না। তাঁর অবাধ গতি বিশ্বের সর্বত্র একতালে একলয়ে বাঁধা। তা যদি না হবে, তবে তিনি কি মূলধনের ভিত্তিতে জর্ডানীয় বিমানে উড়ে পিকিং হয়ে দমদম, দমদম থেকে তেহেরান এবং সেখান থেকে বাগদাদ যেতে পারেন? এই চিত্র কিসের সাক্ষ্য বহন করছে? এই তথ্যই কি দৃপ্তভাবে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিচ্ছে না যে নেতাজী সুভাষ আর শুধুমাত্র বাঙ্গালী নয়, শুধুমাত্র ভারতীয় নয়। তিনি হয়ত একসময়ে বাঙ্গালী বা ভারতীয় ছিলেন। সেসব বৃত্তান্ত অতীতের ঘটনা। এছাড়া একটা ব্যাপার মনে না থাকলে হবে কেন, তা হচ্ছে দেহকলেবর যখন ধারণ করে তাঁকে কাজ করতে হচ্ছে তখন তো গর্ভধারিণী জননী একজন পৃথিবীতে হবেনই বা থাকতেই হবে। সেই অর্থে সুভাষচন্দ্রের গর্ভধারিণী মাতাও অবশ্যই একজন ছিলেন বা আছেন। বলাবাহুল্য তিনি অবশ্যই যুগপত পরম পূজনীয়া প্রভাবতীদেবী তথা ভারতজননী। সুভাষচন্দ্রের জীবনীর প্রতিটি আনাচ কানাচে যদি হদিস করা সম্ভব হতো তবে এজাতীয় তথ্য আরও কত যে তাঁর জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তা কোন মানুষের পক্ষে হিসাব দেওয়া সম্ভব হতো না। **তাই আজকের সুভাষচন্দ্রের পরিচিতি বুঝতে হলে জানতে হলে আমাদের একটি সূত্র ধরেই সন্ধান করতে হবে। সেই সূত্র অনুসারে তিনি আজ সত্যেরই মাত্র নামান্তর। সত্য, সৎ, সততা, মানবতা, ন্যায়ধর্ম যেখানে, যেখানে কুরু-পাণ্ডবের খেলা সেখানে তিনি পাণ্ডব সারথি এই ঠিকানায় খুঁজলেই তাঁকে পাওয়া যাবে। আর যদি তাঁর গৃহের সন্ধান করা হয় তবে তাঁর সেই গৃহ হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝে এই বিশ্বনামক গ্রহখানি। এমন যাঁর বৃত্তান্ত তাঁর পেছনে কিনা যাবে ভারত সরকার হেয়ালী করতে, অঙ্গুলীবাজি করতে!**

কেউ কেউ ভাবতে পারেন কোন কল্পকাব্যের নায়ককে নিয়ে এই অভাজন কোন চিত্রনাট্য বর্ণনায় মশগুল। এর উত্তরে শুধু একটি কথাই বলার আছে তা হলো আপনাদের এমন ভাবনার উত্তর অবশ্যই পাবেন একদিন, তবে তা আমার লেখনীর কাছ থেকে নয়। তার উত্তর পাবেন সমাগত ভাবিকালের কাছ থেকে। এবং তখনই বুঝতে পারবেন এই বর্ণনা কোন চিত্রনাট্য নয় যথার্থই স্বতঃসিদ্ধ। তখন তার নাম দেওয়া যেতে পারে নতুন মহাভারতের বা নতুন বিশ্বের নবভীষ্মকাণ্ড বা ভীষ্মপর্ব।

কিছু পূর্বে আমরা দেখেছি যে, দুইটি সত্য পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে অপ্রতিহত গতিতে চলেছে পৃথিবীতে। একটি হচ্ছে প্রতি পক্ষীয়রা তাঁর অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের কোন সূত্র বা হদিস পাচ্ছে না। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তিনি ইচ্ছামত যেথায় যখন প্রয়োজন সেখানেই সশরীরে উপস্থিত হচ্ছেন। উপস্থিত তো বটেই পরন্তু তাঁর যা যা কর্মসূচী তাও নির্বিকার চিত্তে সম্পূর্ণ করে উধাও হয়ে যাচ্ছেন। আবার বলছি ক্ষমতা থাকে তো কিছু করো। এবার বলুন এরপরও কি তাত্ত্বিক প্রশ্ন আছে? তবু কেউ তাত্ত্বিক কচকচানি ছাড়তে না পারলে যত খুশী তা করুন। কারণ বলতে বাধা নেই যে, আমরা যথার্থ স্বাধীন কিনা সে প্রশ্নে না গিয়েও বলা যেতে পারে বৃটিশরা বা তাদের এদেশীয়

প্রতিভূরা অন্তত একটি ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্বের অধিকার দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লাগামহীন কুৎসা, যা ইচ্ছা তাই বলার এবং তাঁর বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার। অবশ্যই শর্তের মাঝে একটি শর্ত পালন করতে হবে, তা হচ্ছে—সুভাষ চর্চা করলে তা কোন অবস্থাতেই পজেটিভ হতে পারবে না। তাহলে কেউ বাধা তো দেবেই না, পরন্তু পুরস্কৃত হতে পারেন। এমন নজির পৃথিবীতে অবশ্যই আছে। কিন্তু সাবধান, ঋণাত্মক ছেড়ে ধনাত্মক যেন না হয়। অবশ্যই তাত্ত্বিক কচকচানি তারাই করবেন বা করেন যারা এখনও বিদেশীদের পৃষ্ঠপোষক পদলেহী। যারা চোখ থাকতে দৃষ্টিহীন, কান থাকতে বধির ও মন থাকতেও মননশীলতা নেই এবং কুম্ভকর্ণের ঘুমে অচৈতন্য ও আচ্ছন্ন তাদের কাছে কিবা দিন কিবা রাত!

বলাবাহুল্য আমরা বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশের গোটা জাতিটাই ঘুমে আচ্ছন্ন। যদি তা না হতো তবে আজও সুভাষচন্দ্র এই জাতির কাছে একটি ডেড্ সাবজেক্ট—মৃত বিষয় হয়ে আছে কেন? যদি ধরেও নেওয়া যায় মৃত বিষয়—তবুও কী তাঁর আদর্শকে আমরা অনুসরণ করতে পারি না? মার্কস, লেলিনের আদর্শ যদি অনুসরণ করা যায় তবে নেতাজীর আদর্শে চলতে গাত্রদাহ কেন? অন্তত এই দৃষ্টি কোন থেকে তো ভাবা যেতে পারে? তাই বা হচ্ছে না কোন অজুহাতে? হলই বা Dead Subject পরন্তু আমরা কি একটিবার ভুলেও এটা অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছি, এই মিথ্যার মহা উপাখ্যানটি কার পরিবেশিত? এবং তাদের সম্পর্কে সুভাষের মতামত কি? তাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক কি? এবং তাদের মনোনীত যে ভারতীয় ক্রীড়নক দল তাদের সঙ্গেই বা সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক কি? এ ব্যাপারে আমরা কোনই পর্যালোচনা করতে ইচ্ছুক নই অন্তত জাতিগতভাবে। ব্যক্তিগতভাবে হয়ত কেউ কেউ চর্চা বা পর্যালোচনা করেন তাতে জাতীয় চেতনার আর যাই হোক সম্বিৎ ফেরে না। পরন্তু বহির্ভারতে অন্যান্য দেশে পৃথিবীর জাতিগুলো এ ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন। তারও কারণ আছে সেইসব দেশে তাদের জাতীয় নেতারাই তো সুভাষচন্দ্রকে তাঁদের পথপ্রদর্শক, শিক্ষক, ফিলজফার বলে অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। আমরা জাতি হিসাবে শুধু ১৯৪৭ সালের আগেই পদানত ছিলাম না। আমরা আজও পদানত। তারও নজির নিশ্চয় আছে। নতুবা এমন কথা বলা সম্ভব নয়। আমরা শুধু নিদ্রাচ্ছন্ন একটি দিকে নয় সব দিক থেকেই। যদি বলেন প্রমাণ—প্রমাণ এই গোটা পুস্তকে দেওয়া আছে। তবু আমাদের তাৎক্ষণিক সুবিধার জন্য দু-একটি তথ্য এখানেও পরিবেশন করছি।

> National flag of India which will not be hoisted on the Rastrapati Bhavan. (But ammended was done, on—29.07.71)
> The terms of which cannot be disclosed upto 1999.

(বলাবহুল্য বৃটিশ সরকার ও ভারতসরকার সেই চুক্তিও ভঙ্গ করে চলেছে)

(Last days of British Raj by Leonard Mosley)

স্মরণীয় লীওনার্ড মোসলে—কোন ভারতীয় ঐতিহাসিক বা গল্পকারক নয়। তিনি স্বয়ং ইংরেজ লেখক এবং খাস ইংল্যাণ্ডের লোক। তার বিখ্যাত ঐতিহাসিক বই 'লাস্ট ডেজ অব ব্রিটিশ রাজ' পুস্তকে যে কয়টি শর্তে ব্রিটিশদের কাছে ভারতবর্ষকে মটগেজ (বন্ধক) রাখার গোপন তথ্য বর্ণিত আছে, তার মাঝ থেকে মাত্র দুটি এখানে তুলে ধরলাম। বাকীগুলোও এই পুস্তকে আছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে। (যা লাক্ষ্ণৌর বিশ্বনেতা পত্রিকায় প্রকাশিত।)

এবার আসুন আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। এই যে শর্তগুলো এগুলো করা হয়েছিল গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রকে আড়াল করে। তারপর আমাদের জাতীয় স্তরের নেতা যাঁরা ছিলেন তাঁরা কি স্বাধীন সার্বভৌম-সত্তার ভারত বিধায়ক ছিলেন? তাঁরা যে আদৌ ভারত বিধায়ক ছিলেন না সেই কথাই তো ঐ Transfer of Power-এর গোপন দলিল সাক্ষ্য দিচ্ছে। তারপর আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি নাকি অর্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবৎ। এবার প্রশ্ন জাতিটা যদি জাগ্রতই হবে, স্বাধীনই হবে, তবে ঐ জাতীয় সত্তার গোলাম আমরা কেমনে হই? সুতরাং আমরা শুধু সুভাষচন্দ্র সংশ্লিষ্ট ব্যাপারেই জাতি হিসাবে বৃটিশের গোলামের পরিচয় দিচ্ছি না। আমরা সর্বাঙ্গীণ ভাবেই বৃটিশ গোলাম আজও। আর সে সত্য ঘোষণা করছে স্বয়ং বৃটিশ আইন বাস্তবায়িত করার যে নিয়োজিত কর্তা সেই বৃটিশ আদালত। আসুন, তাও একঝলক দেখে নিই। ঐ বৃটিশ আইন প্রয়োগকর্তাদের কি অভিমত। আসুন বৃটিশ আইনে কি বলছে শোনা যাক। যথা,

"India is not sovereign republic."

—U. K. Court, Amrita Bazar & Sunday magazine, 15th August 1965.

এছাড়া রাষ্ট্রসংঙ্ঘের ফ্রিডম হাউস ভারতকে পূর্ণস্বাধীন বলে স্বীকার করেনা। এ সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে স্বতন্ত্র ভারত ও দি পাইওনিয়ার পত্রিকায়। ১৮-১২-৯৩

এসব বাদ দিয়ে এবার আমরা আমাদের মূল প্রসঙ্গের চর্চা করবো চলুন। সুভাষচন্দ্রের বর্তমান অবস্থানের প্রেক্ষাপটে এখানে তাঁর সেজ ভ্রাতা সুরেশ বসুর প্রদত্ত একটি তথ্য প্রদান করছি। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের এই প্রদত্ত বয়ানটি হচ্ছে ২০/১২/৭০ তারিখের। তাতে যা আছে তার অনুলিপি এখানে প্রদত্ত হলো। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে আজ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিরূহ—বিশ্বরূপে নেতাজী সুভাষ হয়ে বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান তা সুরেশচন্দ্র বসুর প্রদত্ত বয়ানে অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে। এই বয়ান থেকে বুঝতে অসুবিধা হবে না এই পুস্তকে চিত্রায়িত সুভাষচন্দ্রের আজ যে রূপ, সেই রূপটি। তিনি আজ সত্যই অরূপ যেথায় স্বরূপে বাঁধা তার মূর্ত প্রতীক।

(শ্রীযুক্ত সুরেশ বসু প্রদত্ত বয়ানের অনুলিপি ঃ)

"বিভিন্ন সাক্ষীর জবান বন্দীতে এত মৌলিক প্রভেদ যে আমার মনে হয়েছে সবটাই সাজান গল্প। আসলে এ দুর্ঘটনা আদৌ ঘটেনি।" (শাহনওয়াজ কমিটির সদস্য হিসাবে সুরেশ বসুর বক্তব্য এটি)

"এলগিন রোডের বাড়ী থেকে অন্তর্ধানের পূর্বে তিনি দক্ষিণেশ্বরের মা কালীর প্রত্যাদেশ পাওয়ার জন্য আমার কন্যাকে রাত্রি বারোটার সময় মন্দিরে পাঠান এবং তাঁর আদেশ পাওয়ার পর তিনি তাঁর যাত্রার কাজ আরম্ভ করেন।"

"আমি বলছি (আমি একজন রাজনীতিবিদ্ নই) তিনি (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু) আজও জীবিত আছেন। আগামী ২৫ বছরের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, এবং ল্যাটিন আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলির মধ্যে তিনি আধ্যাত্মিকভাবে আলোড়ন নিয়ে আসবেন।"

"অনিতা বসু জওহরলাল নেহরুর আর একটি মিথ্যা সৃষ্টি, দাবীটা কার বেশী, কন্যার না স্ত্রীর? এর আগে তাঁর পুত্রের কথা একটি ভারতীয় কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। চেহারায় না মেলার জন্য পুত্রের বদলে কন্যার সৃষ্টি হল।"

শ্রী সুরেশচন্দ্র বসু
২০/১২/৭০

গড়িয়া পূর্ণিমা সম্মিলনীর সভায় সুরেশচন্দ্র বসুর ভাষণের মূল বক্তব্য উদ্যোক্তারা লিপিবদ্ধ করে দিলে তিনি স্বাক্ষর করেন। (ধীরেন্দ্রনাথ দে ও দেবাশিস চক্রবর্তীর সৌজন্যে)। [সঙ্কলন : নেতাজী গেলেন কোথায়, পত্রাঙ্ক : ২৪, জয়ন্ত চৌধুরী]

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অবস্থানের ব্যাপারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যাহতির পরপরই আমরা বিশ্বপ্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে যে তথ্য পাই আসুন তা একটু পর্যালোচনা করা যাক। তাতে কি চিত্র পাই তা একটু দেখি। স্মরণীয় ও উল্লেখ্য যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র জাপানের আত্মসমর্পণের পর কম করেও তিনবার তিনি ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে এবং ভারতীয় নেতাদের কাছে বেতার মারফৎ আবেদন রেখেছেন যাতে তারা বৃটিশের পাতা ফাঁদে পা না দেন কেউ। মাঞ্চুরিয়া বেতার কেন্দ্র থেকে সুভাষচন্দ্র বসু প্রথম বক্তৃতা রাখেন ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৪৫ সালে। তারপর ১৯শে জানুয়ারী এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী পরপর দুটি বক্তৃতা দেন তিনি ১৯৪৬ সালে। ১৯৪৬ সালের দুটি বক্তৃতাই তৎকালীন বাংলার গভর্ণর কে. সি.'-র রেডিও মনিটারে ধরা হয়। লাট প্রাসাদের রেডিও মনিটার শ্রীযুক্ত পি. সি. কর ধরেন। পরবর্তীকালে ১৯৫৬/৫৭ সালে তিনি তা প্রকাশ করেন প্রবন্ধের মাঝে। যুগ্মসম্পাদক অমৃতবাজার ১৯৫৬ সালে ২৩শে জানুয়ারী অমৃতবাজারে তিনি লিখেছেন কমপক্ষে তিনবার সুভাষের বেতার ভাষণ ধরা পড়েছে কলিকাতায়। তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার কপি অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের রেকর্ড আজ দুষ্প্রাপ্য হলেও তা নিশ্চয় বৃটিশ মহাফেজখানায় সংরক্ষিত আছে তাতে সন্দেহ নেই। তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার রেকর্ডের কণ্ঠস্বর আমরা না পেলেও বয়ানগুলো পেতে অসুবিধা নেই। আসুন সে বয়ানে তাঁর কি আবেদন ছিল তা দেখা যাক। ১৯শে জানুয়ারী ১৯৪৬ সালে তিনি বেতার মারফৎ জাতিকে ও জাতীয় নেতাদের বলেছেন—

"I am going a very short speech about the Indian national week to India for my brothers and sisters in India."

We must get freedom within two years. The British imperialism is breaking down and it must concede independence to India. India will not be free by means of 'Non-violence'. But I am quite respectful to Mr. M. K. Gandhi.

The battle of freedom is not easy. But I can assure you that we will get freedom of India very soon. I know that many Indians are waiting for me. I am quite sure to be successful within two years.

I have been informed of the news of the police firing at Calcutta. Many students are dead. My eyes were full of tears when I heard it. I know that man is mortal and the most glorious death is one when a person dies to save his own country. The Indian who shed their blood for freedom could not die.

My first order to my revolutionary friends in India is they will hold a great meeting to commemorate the martyrs on 25th instant.

তারপর তাঁর তৃতীয় ভাষণে ১৯৪৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী বলেছেন—

"This is Subhas Chandra Bose speaking. Jai Hind. It is for the third time I am addressing my Indian brothers and sisters after Japan's surrender. The Prime Minister of England is going to send Mr. Pettick Lowrence and two other ministers from London with no object in view other than let the British imperialism have a permanent settlement for all means to suck the total blood of India. Now among these three Londoners, one had to go back from India with a battled heart only a few month ago.

It is a sort of precaution, I am advising Indian not to play any heed to these imposters. I am sure that Mr. Pettick Lowrence will have to submit an adequate explaination of this endeavour by the three is nothing but to set a new trap of independence in which India may fall very soon. So my earnest appeal to the Indians is that they shouid in no case hear them but continue revolution against what is contrary to achieve freedom. I think many other viceroys and ministers will embark on India with the same motto for keeping us in darkroom of independence. But my Indians should never hear them.

Again I am announcing that within a short period of two years India will have the dawn of independence. We will have complete freedom by that time and I will also come in the year 1947. Many of the Indians have declared me as the 'Netaji' of India. But

I am telling them that I am nothing but an humble son like others of "BHARAT MATA" and am not at all worthy of being same.

The British imperialism will have its utter destruction and it is now commanced. You see they have come down to utter shame they killing our children only having their imperialism still above.

উপরের প্রদত্ত দুটি বক্তৃতা ছাড়াও নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯৪৫ সালে ১৯শে ডিসেম্বর অপর একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি বারবার ভারতবাসী ও নেতাদের সতর্ক করেছিলেন ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা স্মরণ করে দিয়ে। তিনি একথাও জানিয়েছিলেন যে তিনি তৃতীয় মহাসমরের প্রাক্-কালে আসবেন। ১৯৯১ সালে যখন বিশ্বশক্তিজোট ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক সাদ্দাম হুশেনের ইরাক আক্রান্ত হলো এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব সমাধানের পথ না পেয়ে দিশেহারা অর্থাৎ তখন আর একটি বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন, বলা যেতে পারে তৃতীয় মহাসমর পৃথিবীকে গ্রাস করার পথে তখন তিনি ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে সেই অবস্থান থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন। তাই বলা যায় দৃপ্তকণ্ঠেই হ্যাঁ, তিনি তাঁর পূর্বের কথা মতই এসেছিলেন। অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর প্রয়োজন সাপেক্ষ বিশ্বরাষ্ট্র নায়কদের সাথে বৈঠক ইত্যাদি করেছেন। তিনি এসেছিলেন যে তাতো এক চূড়ান্ত ঘটনা। না, কোন রাজার রাজত্ব বা কারো সাম্রাজ্য কেড়ে তিনি সম্রাট হতে আসেননি। এমনকি তিনি অন্য কোন গ্রহ বা স্বর্গ থেকেও আসেননি। তিনি এই পৃথিবীরই একজন। সেদিনও ছিলেন আজও আছেন। তাৎক্ষণিকভাবে শুধু তিনি পৃথিবীর লোককে অনুধাবন করতে সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি যে বিশ্বকর্মযজ্ঞের কত বড় যাজ্ঞিক বা কত বড় নায়ক সেকথা তাই নতুন করে জানাতে এসেছিলেন মাত্র। তিনি কারো রাজত্ব তো নয়ই এমনকি তাঁর ভয়ে যাদের ঘুম হয়না সেই ভারতবর্ষকেও গ্রাস করতে আসেননি। যারা আত্মপ্রকাশের প্রশ্ন তোলেন তাদের কাছে প্রশ্ন এর চেয়ে মারাত্মক আত্মপ্রকাশ আর কী হতে পারে?

তিনি কেন উপস্থিত হয়েছিলেন? তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন দুটি কারণে। প্রথমত তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী ছিল তৃতীয় বিশ্বমহাসমরের সময় আসবেন। সেই কথা বা প্রতিশ্রুতি রাখতে এসেছিলেন। তবে নিছক শুধু কথা রক্ষাই ছিলনা তাঁর আসল উদ্দেশ্য। তৃতীয় সমর প্রকট হলে তারে ঠেকাতে সবাই যে হিমসিম খাবে তা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তাই তিনি ঐরূপ Prediction করেছিলেন বা করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন। এবং কার্যত ১৯৪৫ সালেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তৃতীয় মহাসমরে তাঁর প্রয়োজন হবে। কেন হবে তা তিনি খুব ভালো করেই জানতেন। বস্তুতপক্ষে ১৯৯১ সালে যা ঘটতে যাচ্ছিল তাতো আমরা স্বয়ং রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব প্রেজ্ দ্যা কুয়েলারের মূল্যবান বয়ানেই পেয়েছি। কাজেই ১৯৪৫ সালের ঐ কথা কি আজ সত্য প্রতিফলিত

হয়নি? হ্যাঁ, সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন বা প্রকটিত হয়েছিলেন কোন রাজাধীরাজ হবার লোভে নয়। কোন মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করার জন্য নয়। তিনি এসেছিলেন গোটা পৃথিবীকে তথা সমগ্র মানব সমাজকে মৃত্যুর মহাকালগর্ভ থেকে পরিত্রাণ করার জন্য। সেই কর্ম সমাধা করে তিনি তাঁর পূর্ব কর্মে ফিরে গিয়েছেন।

সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, I will go to India on the crest of third world war.....etc. এসব সংবাদ যেমন বৃটিশ-আমেরিকান কর্তারা জানতেন তেমনি জানতেন সদ্যসদ্য স্বায়ত্ব শাসনাধিকার বা ডোমিনিয়ান শাসন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভারত সরকার তথা তার রথী মহারথিরা অনেকেই। অথচ তথাকথিত ভারত সরকার সুভাষচন্দ্রকে করল তাদের মিথ্যা বেসাতির একমাত্র এবং পরম মূলধন। এখানে স্মরণ করুন মহাভারতের কংসরাও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এমন বেসাতি বা বদনাম শুরু করেছিল এবং কৃষ্ণকে বিনাশের কতই না পরিকল্পনা তারা একের পর এক করে চলেছিল। দুর্মতিদের এমনি ঘটে। এক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে না। তথাকথিত ভারতীয় নেতারা সেদিনও ভেবেছে আজও ভাবছে তারা সুভাষচন্দ্রকে কূটনীতিতে পরাজিত করেছে এবং তাঁরা অর্থাৎ ঐ তথাকথিত অধিশ্বররা জয়লাভ করেছে। তাঁরা একটিবারও ভাবল না যে সুভাষচন্দ্রের দাক্ষিণ্যের ফলে তাঁরা ঐ রাজদণ্ডের অধিকারী। এর অধিক কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। আগামীদিনের ইতিহাস এই তথ্যই সত্য প্রমাণ করবে। অতি স্থূল বুদ্ধিতেই দেখুন না আমরা কি দেখছি, দেখছি বৃটিশের সঙ্গে যখন সুভাষচন্দ্রের দ্বৈরথসমর বা খেলা শুরু হয়েছিল সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে তো বটেই এমনকি আমাদের দেশেও কয়টি পুরুষ বা জেনারেশন এলো আর চলে গেল দিল্লীর তখতে বসার জন্য, বলুনতো? আর সুভাষচন্দ্র আজও এক এবং অদ্বিতীয়। অথচ সংগ্রাম কিন্তু শেষ হয়নি। তিনি আজও একই লক্ষ্যে সংগ্রামের আজ শীর্ষাসনে বিরাজমান বাকীরা সবাই ধরাশায়ী। এমনকি কেউ কেউ ইতিহাস হয়েও নিশ্চিহ্ন। একে কি মহাভারতের পুনরাভ্যুত্থান বলা ভুল হবে? আসুন প্রসঙ্গেই ফিরে যাই। যে প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের চর্চা।

বলাবাহুল্য সুভাষচন্দ্র সুভাষচন্দ্রই। অথচ তাঁরা সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে এমন ন্যক্কারজনক কাণ্ড শুরু করল যার ফলে আজও আমরা তথাকথিত দেশবাসীরা কি বৈঠকী আসর, কি রকে বসে চরম ব্যঙ্গবিদ্রুপ ও হাস্যরসে মশগুল হচ্ছি। বলতে নেই বৃটিশ উত্তরাধিকার সূত্রে এবং সুভাষচন্দ্রের দয়া ও ত্যাগের দানে প্রাপ্ত বর্তমান সরকার চাইছে দেশের আপামর সকলের মাঝেতো বটেই বিশেষ করে যুবসম্প্রদায়ের ভিতর এটাই প্রচার হউক এবং আরও ব্যাপকভাবে ছড়াতে থাকুক। কিন্তু আর তাদের কথায় কাজ হচ্ছে না। এখন ব্যুমেরাং-এর পালা। একথা সত্য যে মিথ্যা বা অসততার প্রাথমিক জয় পৃথিবীর সর্বত্রই সবক্ষেত্রেই সর্বযুগেই ঘটে। এটাই প্রকৃতির ধারা। তাই এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। হয়ওনি। এবার কিন্তু উল্টোরথের পালা শুরুও হয়ে

গেছে। তা কেউ বুঝল কি না বুঝল তাতে কিছু যায় আসে না। আঁধারের পর আলোর সমাগম যেমন একটি শাশ্বত সত্য ঘটনা বা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার এক্ষেত্রেও তাই যথার্থ। দেখবার মত দৃষ্টি যার আছে সেই তা অনুধাবন করতে পারছে।

একথা যে কতখানি নির্মম সত্য তা বিগত ভারতীয় প্রত্যেকটি সরকার হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে সেই ১৯৪৬ সালের কংগ্রেস ও লীগ কোয়ালিশন সরকার থেকে প্রত্যেকটি সরকার। তাদের যথেষ্ট খেসারৎও পোহাতে হয়েছে। বর্তমান বি. জে. পি. নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারও যে ঐসব সরকারের তুল্যমূল্য বিচারে একই পথের পথিক তাতে সন্দেহ কিছুমাত্র নেই। তার সাক্ষ্য তারা ইতিমধ্যে রেখেছে। এই জোট সরকারের কর্তাবাবুরা গদীয়ান হয়েই এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছিল বলে দাবী আছে। সমকালীন পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে যথেষ্ট লেখা লেখিও হয়েছে। এসব তথ্য সকলেরই জানা। কলিকাতার প্রখ্যাত পত্রিকাগুলিতে এ নিয়ে যেমন আশা প্রত্যাশার ঢেউ দেখা গেছে আবার একশ্রেণীর আঁতেল বুদ্ধিজীবীদেরও এর উপর ব্যঙ্গবিদ্রুপও আছড়ে পড়তে দেখা গেছে। অতি স্থূল চোখেই দেখুন না। নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু ঘটেছিল ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট। তারপর আজ পর্যন্ত গঙ্গা-যমুনা দিয়ে কত জল প্রবাহিছে তার হিসেব কে রাখে। সেই ১৯৪৫ সাল থেকে কত প্রহসন চলছে তার কোন অন্ত নেই। এ পর্যন্ত নেতাজী সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনটি কমিশন গঠিত হয়েছে। এগুলো তো প্রহসনের সেরা প্রমাণ। তাদের দুইটি কমিশনের লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছিল ভারত সরকার নিজে। আর তৃতীয় কমিশনের লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছে কলিকাতা হাইকোর্ট। ব্যাপারটা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার জন্য কি বিশেষ বুদ্ধি খরচের প্রয়োজন আছে? একটির পর একটি কমিশন গঠন করা হচ্ছে আর তাঁদের প্রতি যেসব আদেশ বা নির্দেশিকা পাওয়া যাচ্ছে তাতে কখনও আদেশ হলো, মৃত্যু রহস্য, কখনও আদেশ হলো অন্তর্ধান রহস্য আবার কখনও বা শোনা যাচ্ছে ছাই ছাই রহস্য কভুবা ডি. এন. ফি. এন. ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব থেকে একটা জিনিষ পরিষ্কার যে তারা অর্থাৎ এই ভারতীয় বৃটিশলালিত সরকারগুলোর মধ্যে কেউই এই ব্যাপারে তাঁদের কি লক্ষ্য হওয়া উচিৎ তাই স্থির করতে পারছে না। কারণ তাদের যে বীজমন্ত্র বৃটিশরা দিয়ে গেছে অর্থাৎ সুভাষ তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন সেখান থেকে তো সরতে পারছে না কেউ, কারণ তাতে যে প্রভুরা গোঁস্‌সা করবে। কাজেই এখন পাগলেব প্রলাপ, আজ এটা কাল ওটা, এছাড়া গতি কি? এক কথায় বলতে গেলে মিথ্যার আশ্রয় পৃথিবীতে যে বা যারাই দিকনা বা নিকনা কেন তার পরিণতি শেষ পর্যন্ত যে একটি বিরাট মহাশূন্য তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? এতদ্ সংক্রান্ত ব্যাপারে তো স্বয়ং তাদের গুরুরা, প্রভুরাই বৃন্তচ্যুত। তবে চেলাদের বাঁচায় কোন ম্যাক আর্থার, ওয়াভেল আর মাউন্ট ব্যাটেন? তবু কি চৈতন্য হয়? না হবে?

বর্তমান তৃতীয় কমিশন গঠনের একটু ইতিহাস আছে যা এখানে জেনে নেওয়া

একান্ত প্রয়োজন। এক কথায় জানা থাকা ভালোও বটে। নেতাজীকে নিয়ে যখন ভারতের সরকারগুলি বেসাতির পর বেসাতি নিয়ে মশগুল ছিল তখন সহসা এই দুষ্ট সরকারের মাথায় ঘটল সর্পাঘাত। ব্যাপারটা কি? না, নেতাজীতো কবেই ভূত হয়ে তাইহোকু না কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার শান্তি স্বোয়াস্তির একটা ব্যাপার তো রয়েছে বিশেষ করে যখন ভূতটি আবার নেতাজীর ভূত। আবার সনাতন গোষ্ঠীভুক্ত বলে কথা। কমিউনিস্ট বা নাস্তিক হলে তবুও ভয়ের কিছু ছিল না। কিন্তু এযে একেবারে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ও সনাতনপন্থী। এর যদি শান্তি স্বোয়াস্তির ব্যবস্থা না করা হয় তবে যে গোটা ভারতীয় জাতিটাকে নিয়েই কবে আছড়ে পড়বে। সুভাষচন্দ্রকে মূলধন করে যখন এই সরকারগুলো একটা চূড়ান্ত নোংরামিতে নেমেছিল তখনই ভারতবর্ষের ন্যায়ালয়গুলি একটু নড়েচড়ে বসল। আর এমন একটি পরিস্থিতিতে পড়ে কলিকাতা হাইকোর্ট সরকারের উপর হুকুমনামা জারি করল যে, **'নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আর মৃত বলা যাবে না'**। একি বিপদ! এযে একেবারে লক্ষ্মীন্দরের শিরে সর্পাঘাত। কেননা নেতাজী সুভাষ মৃত নয় এ আবার কেমন কথা! একি কখনও হতে পারে! একথা তো আমরা প্রোপাগাণ্ডা করছি ১৯৪৫ সাল থেকে। এবার কি গতি হবে আমাদের? এই ফরমান শুধু তো কলিকাতা হাইকোর্টেরই নয়। এই ফরমান ভারতের সুপ্রিমকোর্টেরও ১৯৯৭ সালের। এই ছিল পূর্ববর্তী সরকারগুলির অবস্থা। সুপ্রিমকোর্ট ও কলিকাতা হাইকোর্টের রায়। যথাক্রমে ১৯৯৭ সালের ৪ঠা আগষ্ট এবং ১৯৯৮ সালের ৩০শে এপ্রিল ঘোষিত হয়।

এই কমিশন কমিশন করেই অর্দ্ধশতাব্দীগত হয়েছে। তথাপি ভারতের তথাকথিত সরকারগুলো এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে শান্তি ও স্বোয়াস্তিতে রাজ করার সুযোগ পাচ্ছে না। বর্তমান প্রতিবেদক বা এই গ্রন্থকার নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুর ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্যেই যাওয়া আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য মনে করছে না। তথাপি প্রসঙ্গের প্রেক্ষাপটে এসব খানিকটা আলোচনায় এসে গেছে। বলে রাখা শ্রেয় এই গ্রন্থকারের নিকট নেতাজীর মৃত্যুটা একটা অবান্তর বিষয়। সেই অধ্যায়ে যাবার এতটুকু যৌক্তিকতা সে স্বীকার করেনা। যদিও তাতে কারো কিছু যায় আসেনা। কারণ সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুটা তো মৃত্যু নয় বহুল প্রমাণিত একটি প্রহসনমাত্র। শতাব্দীর সেরা প্রহসন।

মহাদুর্ভাগ্য যে বর্তমান মহাজোট সরকারকে ও এই অপ্রার্থিত ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপায়েজির নেতৃত্বাধীন মহাজোট নাকি জাতীয়তাবাদী! তাই এই সরকারের সততার এবং আন্তরিকতার ব্যাপারে মানুষের যথেষ্ট আস্থা ছিল যে হয়ত এই সরকার নেতাজীর ব্যাপারে একটা সৎ ও সার্থক তথা যথার্থ কিছু করবে এবং নেতাজীর ব্যাপারটাই যাহোক কিছু একটা ফয়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু বলতে নেই সকল সুভাষবাদীর এই বিশ্বাস আদৌ ছিল না। বিশেষ করে এই প্রতিবেদকের একবিন্দুও তা ছিল না। এই জন্য তার অনেক ব্যঙ্গবিদ্রুপও সইতে হয়েছে।

হচ্ছেও। আজ কিন্তু এই প্রতিবেদকের ধারণাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে বা হতে চলেছে। আসুন সংক্ষেপে এই সরকারের চেহারা এই প্রেক্ষাপটে একটু প্রত্যক্ষ করে নিই।

গত ২৮শে এপ্রিল ১৯৯৯ সালে এই জোট সরকার নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তারপর এই সরকারেরই মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজ মুখেই স্বীকার করেন ১৯৯৯ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কমিশনকে তার অফিস ঘর (যা যেকোন কমিশনের জন্য প্রাথমিক ন্যূনতম প্রয়োজন) পর্যন্ত সংগ্রহ করে বা ব্যবস্থা করে দিতে পারেনি বা করেনি। অথচ কমিশন যখন বসানো হয় তখন সরকারী আদেশ ছিল ছয় মাসের মধ্যে তার তদন্তের রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এতো গেল ভিত্তিস্থাপনের পটভূমিকা। তারপর কি কি ঘটে চলেছে আসুন দেখি। এই সরকার তদন্ত কমিশন বসিয়ে অন্যান্য সরকারের চেয়ে এ ব্যাপারে আন্তরিক। তাই প্রমাণ করতে সরকারের শীর্ষনায়করা বলেছিলেন এবার এই জাতীয় বিভ্রান্তির পূর্ণচ্ছেদ আমরা করবই। অথচ আন্তরিকতার প্রথম সাক্ষ্যই হচ্ছে ছয় মাসে ভারত সরকারের মত এক শক্তিধর সরকার সারা ভারতে একটি অফিস ঘরের ব্যবস্থা করতে পারেনি বা provide করেনি। দ্বিতীয়ত: এই কমিশন বসানো হয়েছিল 'নেতাজীর অন্তর্ধান' রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য। কিন্তু এই সরকারের হাইকম্যাণ্ড দেখা যাচ্ছে আবোল তাবোল বকতে শুরু করেছেন। আজ নেগেটিভ তো কাল পজেটিভ অর্থাৎ কখনও বলছেন নেতাজীর ছাই আনা হবে কখনও বলছেন, না, ছাইটাই আমরা আনব না।

(১) "নেতাজীর চিতাভস্ম আনতে চায় ভারত সরকার"—প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী—২৪/০১/২০০০ বর্তমান পত্রিকা। (এর দ্বারা কি ১৯৯৭ সালের সুপ্রিম কোর্টের রায় অমান্য করা হচ্ছেনা?)

(২) "বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি"—মুখার্জী কমিশনে তথ্য দেবে বি. জে. পি.—২২/০১/২০০০ বর্তমান।

(৩) ডি. পি. এ. প্রেস রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত জাপানের রেণকোজী মন্দির এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত। বলাবাহুল্য এসব ঘটনা কি পরস্পর বিরোধী নয়? তবে কি ভারতের বর্তমান (১৯৯৯-২০০০) জোট সরকার ও আন্তর্জাতিক চক্রীদের একজন সদস্য নয়? এর বিচারের ভার পাঠকের দরবারেই রইল। এতকিছুর পরও N.D.A. জোট সরকার নিয়ে আমরা গদ্গদ!

অথচ তাদের প্রথম লক্ষ্য কী ছিল দেখুন। এসব সংবাদ বা তথ্য এখনও যেকোন পত্রপত্রিকা খুললেই দেখা যাবে জ্বলজ্বল করে চমকাচ্ছে। এছাড়া সম্প্রতি কমিশনের দুইটি সিটিং হয়ে গেল, তারিখ যথাক্রমে প্রথমবার মে মাসে এবং দ্বিতীয়টি ১৩ই জুন। উভয় সিটিংই হয়েছে ২০০০ সালে। এই দুটো সিটিং-এর একটিতেও সরকার কোনপ্রকার সহযোগিতা করেনি। তার সেরা প্রমাণ কোন সরকারী আমলা উপস্থিত

ছিল না। একথা বলেছেন কমিশন স্বয়ং। এসব সংবাদ প্রতিবেদনেই প্রকাশিত। এই হলো একটি জাতীয়তাবাদী সরকারের কমিশনকে আন্তরিকতার সহিত সহযোগিতার সাক্ষ্য। এখানেই শেষ নয়। ভারত সরকারের ঘরে নেতাজীকে নিয়ে কম করেও দশ হাজার নথিযুক্ত গোপন ফাইল আছে। তার মধ্যে এ-সরকার বলছে তাদের কাছে ৯৯০টি ফাইল আছে। এর আসল রহস্য অন্যত্র। পূর্ববর্তী সরকারের কাছে যে ১০.০০০ হাজার ফাইল ছিল তা তারা তখন অস্বীকার করেনি। শুধু তাই নয়। প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও-এর সময় ১০.০০০ হাজার ফাইলের মধ্যে থেকে বেছে বেছে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বলে ৯৯০টি ফাইল মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রককে দেওয়া হয়েছিল তৎকালীন বিভাগীয় মন্ত্রীর দপ্তরে। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক আবার ঐ ৯৯০টি ফাইল দিয়ে দেয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে। এসব সংবাদ দিনের পর দিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আর আজকের একটি জাতীয়তাবাদী সরকার বলছে তাদের কাছে মাত্র সর্বমোট ৯৯০ খানি ফাইল আছে। আর অন্যদিকে কমিশন মনোজকুমার মুখার্জী যিনি নেতাজী অন্তর্ধান কমিটির একমাত্র সদস্য তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামফ্রন্ট তথা জ্যোতি বসুর সরকার ন্যূনতম সহযোগিতাও করছে না। কমিশন সব ফাইল চেয়েছিল কিন্তু সরকার একটি ফাইলও কমিশনকে দেয়নি। (সংবাদ পত্রের প্রতিবেদন পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)। এই সরকারকে দেখা যাচ্ছে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর থেকে অনেক ডিগ্রী উপরে নষ্টামিতে। তাই বারবার বলতেই হয় ধন্য হে ধন্য বৃটিশ তোমার রোপিত বিষবৃক্ষের কি অপার মহিমা! সেই মহিমার ফলেফুলে ভারতবাসী আজ মোহিত।

বলাবাহুল্য এই নেতাজী চিত্রের আলোয় ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সরকারই বুঝতে পারছে তাদের দৌড় কতদূর আর ওজনই বা কতখানি। অবশ্য বুঝতে তো হবেই, কারণ তাদের চৈতন্য যে বৃটিশ-আমেরিকার আঁচলে বাঁধা। নইলে আজ একটা নয় দুটো নয় পরপর তিনটি কমিশন গড়তে হয় কেন? এখানেই যে কমিশন গড়ার ইতিহাস শেষ হবে তারই বা গ্যারান্টি কোথায়? ভারতীয় নেতাদের কাছে সুভাষচন্দ্র মৃত। সেতো আজ ৫৫ বৎসরের অধিককাল। তবে যে ব্যক্তিটি আজ তাইহোকু বা অন্য কোন অখ্যাত শ্মশানে ভূত হয়ে বিরাজমান ৫৫ বৎসর ধরে তার জন্য কেন পরপর তিনটি কমিশন গড়তে হলো? এর ব্যাখ্যা কি ভারত সরকারের কর্তাব্যক্তিরা দিতে পারবেন? Leonard A. Gordon কৃত 'Brothers against the Raj'—গ্রন্থে আছে সুভাষের ভূত এখনও বৃটিশরাজকে তাড়া করে ফিরছে। তদরূপ বলা যায় বর্তমান ভারত সরকারেরও কী একই ভয় নয়? যদি তাই না হবে তবে অর্ধশতকের মৃতকে নিয়ে কেন এই খেলা? তবে কি ধরে নিতে বাধা আছে এঁরা জওহরলাল, প্যাটেলদের বা বৃটিশ-আমেরিকারও পদলেহি, তল্পিবাহক? সম্প্রতি যে কলিকাতা হাইকোর্ট ও ভারতের সুপ্রিমকোর্ট ১৯৯৮, ১৯৯৭ সালে ফরমান জারি করেছে তারপর কী সাহসে

প্রলাপ বকতে সাহস পায়? যদি বৃটিশ-আমেরিকার মদত না থাকে তবে? একটি তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সরকারই বা কোন স্বর্গের বৈতরণী দিয়ে প্রবাহিত পবিত্র তুলসী পাতা?

বলতে নেই আমরা জনসাধারণ থেকে তথাকথিত সরকার বাহাদুর সবাই শুধু বেঁচে গেছি দেশটা নেহাৎ ভারতবর্ষ বলে। এই দেশটা নাকি পূণ্যভূমি মানবতীর্থ স্বর্গসম। মহাজনদের সেই কথা মেনে নিয়ে এবং তাঁদের চরণে অসীম শ্রদ্ধা জানিয়েও বলতে বাধ্য হচ্ছি এমন আজব দেশ পৃথিবীতে দুটি হয়না বা আর নেই। ঐ হাইকোর্ট এবং সুপ্রিমকোর্টের ঐতিহাসিক ভার্ডিক যদি ভারতবর্ষে না হয়ে চীন, রাশিয়া বা পৃথিবীর অন্য যেকোন দেশের তাদের ব্যাপার নিয়ে বা তাদের দেশের যেকোন মহাপুরুষ নিয়ে হতো তবে সঙ্গে সঙ্গে জনগণের তো বটেই এমনকি সরকারেরও এতদিন পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে যেতো। আজ পঞ্চান্ন বৎসর যাবৎ এদেশের সরকার মিথ্যার বেসাতি করে চলেছে আর তাই জনগণকে দিব্যি গেলাচ্ছে আর আমরা জনগণও তাদের ধ্বজা উড়িয়ে তাদেরই জয়গান করছি বৎসরের পর বৎসর নির্বিকার চিত্তে। অথচ দেখুন অতি সম্প্রতি ১৯৯৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধের ঘটনামাত্র একটি মিথ্যা কথার জন্য আমেরিকার স্বনামধন্য বিশ্ব কাঁপানো এবং বিশ্বের স্বঘোষিত সম্রাট একচ্ছত্র নায়ক বিল ক্লিন্টনের কী দশা আমেরিকান সেনেটাররা করেছিলেন। স্মরণীয় যে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তারই অফিসের এক নারীকর্মীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে তার এই দশা। তিনি অবৈধ ঘটনা ঘটিয়েছিলেন বলে তাঁর কোন অপরাধ ঘটেনি। ঘটেছিল যা, তা সত্য সেই সত্য ব্যাপারটা প্রেসিডেন্ট অস্বীকার করেছিলেন বলে অর্থাৎ মাত্র একটি কথার হেরফেরের পরিণতি। শুধু হ্যাঁ বা না এই টুকুর জন্য। পরন্তু এই ভারতীয় সরকারের ঘরে সমস্ত প্রকার তথ্য মজুদ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা মিথ্যার বেসাতি করতে মাঠে নেমে কোটি কোটি ডলার ঢেলে চলেছে। চরম সত্যকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য যা খুশী তাই করছে আজ অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবৎ। আর আমরা নামক আপামর দেশবাসী অম্লানে তা হজমও করছি। আর ঐ খলনায়কদের নামেই দিবারাত্রি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করছি।

দেশটা ভারতবর্ষ বলে আমরা শুধু ঐ ব্যাপারে টেবিল টকিং আর হাস্যরোলের কনফারেন্সেই ক্ষান্ত নই। আমরা তত্ত্বীর বলেও জাহির করতে কসুর করিনা। যাইহোক সর্বশেষে একটি কথা বলতেই হয় যে সব কথার এক কথা। আমরা জনগণ বা সরকার যে যাই করিনা কেন তাতে কিছুই এসে যায় না। কারণ নেতাজী সুভাষ নেতাজী সুভাষই। তাঁকে আঁচড় কাটার শক্তি কারো সেই যুগেই ছিলনা, যখন জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সবই ছিল বিশ্বত্রাসি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুঠোয়। আর আজতো কোন ছাড়?

নেতাজী সুভাষ যদি তথাকথিত কোন রাজনৈতিক জগতের পার্থিব ও পৃথিবীর এক বিচরণশীল ভোগী ও ধান্দাবাজ ব্যক্তি বা নেতা হতেন তবে বলতে নেই কবেই বৃটিশ-আমেরিকার খরচের খাতায় তাঁর নাম জমা পড়ে যেতো বা নাম উঠে যেতো। কিন্তু আমরা হাজার তথ্য প্রমাণের মাঝে দেখেছি তিনি সে জগতের কেউ নন। তিনি

আধ্যাত্মিক মার্গের শীর্ষসম্রাট বা রাজ চক্রবর্তী হয়ে আজ সৃষ্টির সেরা দেদীপ্যমান এক অনন্তের সাথী মহাজ্যোতিষ্ক। এবং সে কারণেই বলা সম্ভব হচ্ছে নেতাজী সুভাষ নেতাজী সুভাষই। নইলে কি বলতে পারতেন তিনি—

"I must be prophet of the future. I must discover the laws of progress. The tendency both the civilization and their form to settle the future goal and progress of mankind...etc."

বলাবাহুল্য এই বাণী ছিল সুভাষচন্দ্রের ১৯১৫ সালের ৩১শে অক্টোবরের। একথা কিন্তু বলছেন তরুণ সুভাষ। এই ভবিষ্যৎ বাণী তিনি যখন করেছেন তখনও কিন্তু দেশবাসীর নিকট তিনি পরিচিত বা পরিণত সুভাষচন্দ্র বসু হয়ে উঠেননি। নেতাজীর অধ্যায় তো আরও বহু পরের এবং তারও বহু বহু যোজন দূরের নক্ষত্রের নাম হচ্ছে শ্রীমদ্ সারদানন্দজী। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই মহান উক্তি করেছিলেন এক নাবালক সুভাষ। আর আজকের তাঁর বিবর্তিত রূপের যে পরিচিতি বিশ্বের কাছে সেই নামটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক জগতের শীর্ষাসনে অধিষ্ঠিত শ্রীমদ্ সারদানন্দজী নামে এক মহামহিমের। এবার বন্ধু মেলানতো বালসুভাষের উক্তিতে যা বলতে চেয়েছেন তার সঙ্গে বর্তমান শ্রীমদ্ সারদানন্দজী বেশের সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায় কিনা। এর চেয়ে বড় বিস্ময় স্রস্টার সৃষ্টি ব্যাপীয়া দেখানতো কোন নজির দেখাতে পারেন কিনা। ইতিপূর্বে এই অধ্যায়েরই একস্থানে সুভাষচন্দ্রের দাদা সুরেশ বসু মহাশয়ের একটি প্রদত্ত বয়ানে দেখছি তিনি বলছেন তাঁর এই ছোট ভাই সুভাষ এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকাতে আধ্যাত্মিক আলোয় এক নতুন পরিমণ্ডল গড়বেন। ইত্যাদি। এর থেকেই কি সুভাষচন্দ্রের উক্তির সার্থকতা কতখানি এবং কোথায় তা পরিষ্কার নয়? কেউ তা বুঝুক না বুঝুক তাতে সুভাষচন্দ্রের খড়কুঠো পরিমাণও কিছু এসে যায় না। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা অত্যন্ত যুক্তি গ্রাহ্য ও সুপ্রযোজ্য। কথাটি হচ্ছে তিনি যদি ঐ উক্তিরই সার্থক রূপকার আগামীদিনে না হবেন বা সেই প্রতিভূ না হবেন তবে বিশ্বশক্তিজোট বা যেকোন শক্তিগোষ্ঠীই কেন তাঁর নাগাল আজ প্রায় ষাট বৎসরেও করে উঠতে পারেনি? এর কি উত্তর? ঐ উক্তির প্রেক্ষাপটে তাঁর আর একটি বাণী বিশেষ তাৎপর্যময় ও অনুধাবনীয়। তিনি বলেছেন, আমি কোন রাজনৈতিক লোক নই। আমি আজন্ম মাতৃসাধক। আমি যা করি তা মায়ের সাধনা। বলুন এরপরও কি কিছু বলার থাকে? এসব থেকেই বুঝতে হবে ঐ মহাবাণীর গূঢ় মর্মার্থ। এর যথার্থ মর্মার্থ বুঝতে কি আমরা সক্ষম? আমরা তো ঐ উক্তির তিলার্দ্ধও বুঝতে সক্ষম নই। কাজেই সেই মহামহিম অনাগত প্রফেটকে কি মন্ত্র বলে বুঝব বলুন? এর অধিক গবেষণা করাই আমাদের মূর্খতার পরিচয় হবে।

এবাব হয়ত অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র যদি আধ্যাত্মিক মার্গ বা অতীন্দ্রিয় জগতের রাজ চক্রবর্তী, তবেতো তিনি যোগবলে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগেই সবকিছু করতে পারেন। এর উত্তরটা এক কথায় বললে বলতে হয় অবশ্যই করতে পারেন। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে এবং ব্যবহারিক জীবনে একটি কথা আছে কথাটা

প্রচলিত একটি আপ্তবাক্য যা সর্বজনবিদিত। সেটি হচ্ছে 'কষ্ট না করিলে কেষ্ট পাওয়া যায় না'। আসুন, এখন আপনার বক্তব্যের উত্তরটা আমরা কিভাবে পেতে পারি তার চেষ্টা করি এবং এই আপ্তবাক্যেরইবা কতখানি মূল্য বা তাৎপর্য আছে তা দেখার প্রচেষ্টা করি।

আপনি যে প্রশ্ন তুলেছেন সে কথা যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত। এতে দ্বিমত নেই। কিন্তু ভুলে যাবেন না যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ বা যোগীব্যক্তি তাঁরা কখনও প্রত্যক্ষভাবে কোন অবস্থাতেই ঐশীশক্তি প্রয়োগ করেন না। ঐশীশক্তি বলে যা করণীয় তা অবশ্য তিনি বা তাঁরা যথাসময়ে যথাস্থানে যথাকর্তব্য অবধারিত ভাবেই করেন বা ঘটান। কিন্তু ডঙ্কা বাজিয়ে তাঁরা তা কখনও আপনার আমার মত যথাতথা ব্যক্ত করেন না। আর সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রে তো তা প্রশ্নই আসে না। ঐশীশক্তির যাঁরা আধার বা পাত্র তাঁরা উপস্থিত থেকে তা কখনও প্রত্যক্ষভাবে প্রদান করেন না। তাঁর প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা দেখতে পাই ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা তাঁর জগৎময় বিশাল কর্মকাণ্ডে। দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা অর্জুনের মাধ্যমে যে বিশাল যুগান্তরকারী কাজ করিয়েছেন তার মাঝে। আর আজ দেখছি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও স্বপ্নকে শ্রীমদ্ সারদানন্দজী কেমনভাবে একে একে ধীরে অথচ অপ্রতিহত গতিতে দৃঢ় পদক্ষেপে কার্যে রূপায়িত করে চলেছেন বিশ্বকে নবরূপায়ণে গড়তে ও সাজাতে।

আমরা আগেই দেখেছি ও জেনেছি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হস্তক্ষেপে কেমন করে মহাচীনের মহান নেতা মাও-সে-তুং তাঁর বিপ্লব কার্য সমাধান করেছেন। অন্যদিকে দুই ভিয়েৎনামকে মুক্ত ও যুক্ত করেছেন সুভাষচন্দ্র। যে ঘটনার সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন. এফ. কেনেডির পরোক্ষ স্বীকৃতিই রয়েছে। এবং স্বীকৃতি রয়েছে কম্বোডিয়ার মুক্তি সম্পর্কে U. S. defence secretary Clerk Cliford-এর। এছাড়াও বিশ্বনেতাদের অনেক মূল্যবান তথ্য পৃথিবীর সর্বত্র আমরা পাই। এমন আরও দুই একটি স্বীকৃতি যথা মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, "দক্ষিণ বা পূর্ব-এশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলি আজ যে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত তার একমাত্র কারণ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি আমাদের মত শক্তিহীন দেশগুলোকে দাসত্ব শৃঙ্খলের হাত থেকে মুক্ত করে এই মর্যাদা বা এই সম্মানের আসনে ও বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নতুবা আমরা আজও সাম্রাজ্যবাদীর হাতের ক্রীড়নক হয়েই থাকতুম।" একথা বলেছেন মালয়েশিয়ার এক প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান তাঁর জীবনী গ্রন্থে। (বক্তৃতামালা—স্বামী আনন্দভারতী)। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদীদের একই খেলা একই দৃষ্টিভঙ্গি। এই মানবতা বিরোধী সাম্রাজ্যবাদীদের চিরন্তনী খেলার হাত থেকে সারা পৃথিবীর বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার পদদলিত এইসব দেশগুলোকে যে একমাত্র সুভাষচন্দ্র তাঁর এশিয়ান লিবারেশন ফৌজ দ্বারা স্থানে স্থানে মুক্ত করছেন তাতো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এবং তার স্বীকৃতিও চীনানেতাদের বয়ানের মাঝেই এবং বিশ্বের সংবাদ বা অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববাসী নিয়ত পাচ্ছেন।

এমন একটি স্বীকৃতিই বিশ্বনেতা চৌ-এন-লাই-এর ১৬ই জুলাই ১৯৭০ সালে প্যারিসে টি.ভি. সাক্ষাৎকারে আমরা পাই। আত্মগোপনকারী এই নেতার দাপটে সাম্রাজ্যবাদীরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সুভাষচন্দ্র কী জিনিষ। অথচ ভারতীয় নেতৃকুল সকলেই আত্মশ্লাঘায় ভাবছে, 'ম্যায় কিসিসে কমতি নাহি হুঁ'। এখানে একটা বড়ই মজার ব্যাপার যে বিশ্বব্যাপী সকলে এমনকি মাও-সে-তুং, চৌ-এন-লাই বা কেনেডির মত বিশ্বের প্রথমসারির নেতারা এই ঋষিপুরুষের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ নির্দেশে সব জটিল জটিল সমস্যা সমাধান করছেন। এবং নানা প্রেক্ষাপটে তাঁরা তাঁর সহচর্য্যও লাভ করে ধন্য হচ্ছেন এবং আনন্দ পাচ্ছেন কিন্তু ভুলেও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামটি উচ্চারণ করছেন না বা মুখে আনছেন না। কারণ সুভাষচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করলে বিশ্বশক্তিজোটের যে মর্যাদা বলতে কিছুই থাকবে না। তাই সব কিছু জেনেও স্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না বিশ্বনেতাদের। নেতাজীর বর্তমান অবস্থান স্বীকার করা মানে তাঁদের নৈতিক পরাজয় মেনে নেওয়া। তাই বড়জোর এইটুকু বলছেন যে, এক মহান আধ্যাত্মিক পুরুষ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক আত্মগোপনকারী জেনারেল এইসব ঘটনার পিছনে আছেন। তাঁর নাম উচ্চারণ করলেই যেন তাঁদের বিদ্যুৎ স্পৃষ্ঠ হয় বা হবে। নতুবা মহান সন্তপুরুষ বা আত্মগোপনকারী জেনারেল এমনটিই বা বলবেন কেন? হয়ত বা এর পিছনে কোন গূঢ় কারণ রয়েছে, যা আমাদের নাগালের বাইরে। নইলে এমনটি হবে কেন? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর যে প্রান্তেই কোন বৃহৎ রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটেছে বা ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপক কর্মকাণ্ড ঘটেছে তার প্রতিটি ঘটনা পর্যালোচনা করলে তার সাফল্যের পিছনে পাওয়া যাচ্ছে ঐ একমাত্র আধ্যত্মিক পুরুষকে। দেখা যাচ্ছে নীরবে নিভৃতে ঐ আধ্যাত্মিক মহাপুরুষই সকল চাবিকাঠির নায়ক।

এমনকি সম্প্রতিকালে যে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ বলে একটি দেশ আন্তর্জাতিক সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ও সংযোজন ঘটল, পূর্বপাকিস্থানের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটিয়ে তারও পশ্চাৎভূমিতে যে এই একই মহামানবের মস্তিষ্ক তাতো সাক্ষ্যপ্রমাণেই বলছে। আসুন এর আনুপার্বিক ঘটনায় কি তথ্য পাওয়া যায় তাঁর একটু পর্যালোচনা করে দেখি। বলা নিস্প্রয়োজন ভারতীয় গোপন বিপ্লবীরা ভালোভাবেই অবহিত আছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দ্বারা যে মুজিবর রহমান পরিচালিত হচ্ছিলেন। এখানে মুজিবর রহমান যে নেতাজী দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন তা স্বয়ং মুজিবরের একটি পরিবেশিত খবর বা তথ্যেই তা পরিষ্কার প্রমাণিত। সেই খবরটি ছিল নিম্নরূপ। যথা,

"নেতাজী যে অমর বাংলাদেশই তার নির্ভুল প্রমাণ"

—মুজিব

ঢাকা অফিস

১৭ই জানুয়ারী—"বাংলাদেশ যে বাস্তব হয়ে উঠেছে—এই তথ্য প্রমাণ করছে যে, নেতাজী সুভাষ বেঁচে আছেন"। আজ এক সাক্ষাৎকারে একথা বলেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান।

আনন্দবাজার পত্রিকা—১৮-০১-৭২

আনন্দবাজার পরিবেশিত এই সংবাদটিকে বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা করলে কি পাওয়া যেতে পারে তা একটু দেখা যাক। বিশ্বব্যাপী সুভাষচন্দ্রের আজকের যে গতায়াতের বাতাবরণ তাতে মুজিবর রহমানকৃত উক্তির যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার চেয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলা কারো সম্ভব নয়। তাছাড়া আরও একটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে বক্তা কে, সেটা দেখতে হবে। এবং তাঁর সেই সময়ের অবস্থান কি? এইসব বিচার বিবেচনা করলে দেখা যাবে এমন পরিস্থিতিতে এরচেয়ে স্পষ্ট করে বলার কিছু নেই। তবুও যদি আমরা তা অনুধাবন করতে না পারি তবে কোন চেষ্টা না করে আমরা যেখানে আছি যেমন আছি সেখানে তেমন থাকাই ভালো। নেতাজীকে বোঝার চেষ্টা না করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। বাহাদুরী না ফলানোই যুক্তিযুক্ত। আমরা প্রেক্ষাপটের খাতিরে একটু অন্য খাতে ধাবিত হচ্ছিলাম। আসুন আমরা আমাদের মূল আলোচনায় প্রত্যাগমন করি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঠিক পূর্বে তথ্যচিত্রটা কি ছিল? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নায়ক ছিলেন অবশ্যই বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান। কিন্তু পরিদৃশ্যমান চিত্রে আমরা পাই ভারত ছিল এই কর্মকাণ্ডের পিছনে। তখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন স্বনামধন্যা ইন্দিরা গান্ধী। সুতরাং সেই সুবাদে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীই ছিলেন আপাতদৃষ্টিতে নেপথ্য নায়িকা। এই নেপথ্য নায়িকার সাথে কি বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্বে নেতাজীর কোন সম্পর্ক ছিল? এ ব্যাপারে সমকালীন সংবাদ পত্র বা ইতিহাস কি বলছে? সেখানে চোখ বোলালে আমরা পাচ্ছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যে আমাদের দেশের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর রেঙ্গুণের অদূরে উভয় নেতার যুগ্ম বৈঠক ও শলা পরামর্শ হয় সেই সাক্ষাৎকারের ছবি প্রকাশিত হয়েছে তৎকালীন বসুমতী পত্রিকায়। তারিখটা ছিল সেদিন ২রা এপ্রিল ১৯৬৯ সাল। (বসুমতীর প্রদত্ত ছবি এই পুস্তকের প্রথমে সংযোজিত আছে।)

এতসব অকাট্য তথ্য প্রমাণের পরও আমরা তাত্ত্বিক বিতর্ক ছাড়তে প্রস্তুত নই। সুভাষচন্দ্রের মত বিশ্বসেরা ইস্পাত দৃঢ় বজ্রকঠিন পশ্চাৎভূমির উপর দাঁড়িয়েই যে একদিন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এশিয়ার মুক্তিসূর্য হয়েছিলেন এবং ভুবন জোড়া খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন তা কি আমরা আদৌ অবগত আছি? ভুল করলে চলবে না অর্থাৎ ইতিহাসই আমাদের ক্ষমা করবে না। যে ইন্দিরা, ইতিহাসের এমন কৃতিত্বের দাবীদার বা ভাগীদার যার পশ্চাৎভূমিতে দাঁড়িয়েছিলেন স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্র। সেই ইন্দিরাই সদ্যসদ্য সত্তরের দশকে সুভাষচন্দ্রকে টাটকা টাটকা মহান উপহার প্রদান করেছিলেন বিচারপতি খোসলা সাহেবের হাত দিয়ে। বিচারপতি খোসলা সাহেবকে দিয়ে নেতাজী এনকোয়ারী কমিশন সৃষ্টি করে নেতাজীকে জীবন্ত কবর দিতে ইন্দিরা গান্ধীর এতটুকু বিবেকে বাঁধেনি সেইদিন। এই তথ্যে কোন গোষ্ঠী চটে যাবেন কিনা জানিনা। কিন্তু আমার তাতে কিছু করার নেই। আমি ইতিহাসের ছাত্র। ইতিহাসই

এ সত্যাসত্যের সাক্ষীদাতা। বলা নিস্প্রয়োজন এ সংবাদে যদি কারো কিছু বিপরীত অভিযোগ থাকে তবে তা কিন্তু আপনাকে জানাতে হলে জানাতে হবে ভারতেরই আর এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে। তিনি অবশ্যই আমাদের সকলের পরম শ্রদ্ধেয় ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রণছোড়জী মোরারজী দেশাই সাহেব। কারণ তিনিই দয়া করে দেশবাসীকে পরোক্ষে বলে গেছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বেঁচে আছেন। অর্থাৎ পূর্বের দুইটি সরকারের দ্বারা চালিত ও প্রভাবিত কমিশন অর্থাৎ নেতাজী এনকোয়ারী কমিশনের প্রসবিত ফলকে মোরারজী দেশাই অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্বকই পরিত্যাক্ত বা rejected বলে ঘোষণা করে গেছেন। সুতরাং কোন অবস্থাতেই অভিযোগ এই প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে টেকে না।

এখানেই অধ্যায় শেষ নয়। তখন ইন্দিরার রাজত্বকালেই রাজধানী দিল্লীর ভূগর্ভ মধ্যে কয়েক হাজার মিটার মাটির নীচে গভীরে ঐতিহাসিক তথ্যসম্পন্ন কালাধার বা টাইম ক্যাপসুল প্রোথিত করা হয়। ঐ কালাধারে কি কি ঐতিহাসিক উপাদানের তথ্য তাতে সংরক্ষিত করা হয়েছে তা দেখার জন্য জনতা সরকারের আমলে (স্মরণীয় ৭৫ সালে ইন্দিরার জরুরী অবস্থার পর ৭৭ সালে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ইন্দিরা হেরে গিয়েছিলেন এবং মোরারজীর নেতৃত্বে নতুন জনতা সরকার দিল্লীর তখত দখল করে)। প্রধানমন্ত্রী রণছোড়জী মোরারজী দেশাই-এর সময় দিল্লীর ঐ কালাধার উত্তোলন করা হয়েছিল। যথারীতি আবার তা ঐস্থানে প্রোথিত করে রাখা হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে তৎকালে সারা ভারতে প্রচণ্ড বিতণ্ডার ঝড় বয়েছিল। গান্ধীজীর নামের স্পর্শ আছে যৎসামান্য। বাংলা, মহারাষ্ট্র বা পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের কোন নাম গন্ধও নাকি তেমন নেই। সুভাষচন্দ্র নামক কোন ব্যক্তির অবস্থাও তদ্রুপ। অর্থাৎ তাঁর নামটি নাকি মুছে দিতে পারলেই ভালো ইত্যাদি। অথচ বিশ্ব জানে, বৃটিশ জানে এমনকি জাতির জনক গান্ধীজীও জানেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য নেতাজী সুভাষের কী অবদান। এই হচ্ছেন বিশ্ববিখ্যাত নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্বচ্ছতার চেহারা। তাঁকে নিয়ে আমরা আজ কত গর্বে গর্বিত। কারণ স্বাধীন ভারতে নাকি এমন ব্যক্তিত্ব আর ছিল না। উপরের কাহিনী এমনটিই শোনা গেছে তখন।

এই কালাধার ব্যাপারটা কি? অতি সহজ উত্তর। কালাধার বা টাইম ক্যাপসুল মানেই হচ্ছে সময়পঞ্জীর সংরক্ষণ কোষ বা কোষাগার। এর পেছনে অর্থাৎ এই সংরক্ষণ কোষটি এভাবে প্রোথিত করার পেছনে যুক্তি কি? যুক্তি একটাই সেটা হলো ঐ তথ্যের দ্বারা তথাকথিত নেতানেত্রীরা যুগযুগান্ত পার হয়েও বেঁচে থাকতে চায়, খ্যাতি ও যশঃ লাভ করতে চায়। এতো এক অদ্ভুত কথা। এমনটি কি সম্ভব? উত্তর হচ্ছে সম্ভব। আর এই মতলবকে সম্ভব করার জন্যই এই পথে পদক্ষেপ। ব্যাপারটার উত্তর কিন্তু খুব সাদামাটা। ধরুন বর্তমান সভ্যতা প্রাকৃতিক কারণে বা কোন বিশাল যুদ্ধবিগ্রহে সব নষ্ট হয়ে গেল তখন ঐ কালাধার বলে দেবে অমুককালের অমুক সময়ে অমুক

দেশে এক পৃথিবী বিখ্যাত রাজা বা এক মহামানব ছিলেন তিনি তাঁর দেশকে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করে দেশের কোটি কোটি লোকের মঙ্গলসাধন করেছেন তাঁর মত দ্বিতীয় কীর্তিধ্বজ মানব ইতিহাসে কেউ আসেননি ইত্যাদি। এবার বুঝতে পারছেন ইন্দিরা গান্ধী তথা সেই পরিবারের কৃতিত্ব কতখানি। সারাদেশের লোকতো স্থূল চেহারা দেখেই ক্ষিপ্ত। তাদের সূক্ষ্মতত্ত্বটাও দেখুন। কথা হচ্ছে এমন একটি দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা সেতো প্রসংশনীয়। কিন্তু ইতিহাস বিকৃতি করা কেন? যাঁদের ক্ষুদ্র পরিসর মানসিকতা তাঁদের এমনটিই হয়। যাঁরা সত্যকারের মহৎ তাঁদের এমন ভাবনাই হবে না। এমন ভাবনা কেউ যোগান দিতে চাইলে বরং সেই হবে ঐ মহানের দৃষ্টিতে ত্যাজ্য ও ঘৃণ্য। এই করেই তো জাতীয় ইতিহাসকে ধ্বংস করা হয়। এমন কাজ কি কোন মহতের কাজ না সুলক্ষণ? মানুষ রাজনীতির দাস হলে কত নীচে নামতে পারে। জাতীয় ইতিহাসকে নিশ্চিহ্ন করতেও তাদের বিবেকে বাঁধে না। পক্ষান্তরে বা অপরদিকে দেখুন নেতাজী সুভাষ সেই শৈশবকাল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর একটি সুর একটি ধ্বনি একটি শপথ, মাতৃভূমি ভারতবর্ষের জন্য আমি শেষ রক্তবিন্দুটি দেবো। ইহজন্মে আমি ভারত জননীর স্বার্থের জন্য বন্ধক রইলাম। আমার একমাত্র সাধনা ভারত জননীর সাধনা। বলাবাহুল্য এমন বীরের এমন ত্যাগীর এমন ক্ষত্রিয়ের ইতিহাস কৃত্রিম কালাধারে ধরে রাখতে হয় না। তাঁকে ধরে রাখে তাঁর গুণগান করে স্বয়ং নিয়তি নিজে। এমন যে যুগস্রষ্টা নিজেই যুগাধার তাঁকে ভারতবর্ষের তথাকথিত নেতারা তথাকথিত কর্তারা চিরনিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর। আরে বাবা এমন যুগাধার যে স্বয়ং তাঁকে তোমরা ধ্বংস করার বা তোমরা স্বীকৃতি দেবার কে হে? কাজেই তোমরা যত খেলাই খেল, যতই ইতিহাস সৃষ্টি কর, সেই কৃত্রিম ইতিহাসের মূর্তি তো নুনের পুতুল।

মূল প্রসঙ্গ থেকে কিন্তু আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। আসুন সেখানে কি হচ্ছিল আবার ফিরে দেখি। আমাদের প্রসঙ্গ ছিল বাংলাদেশ এবং তার প্রেক্ষাপট। সেটাই হোক এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়। বাংলাদেশ কর্মকাণ্ডের পশ্চাৎভূমি পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা সেখান থেকে যেসব ঐতিহাসিক উপকরণ পেয়েছি তা হচ্ছে যথা —

তখন আমেরিকার মানবতা বিধ্বংসী সপ্তম নৌ-বহর ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হয়েছিল পাকিস্থানকে মদত করতে এবং ভারতবর্ষকে ধমকানোর মতলবে এবং প্রয়োজনে কাজেও হয়ত ব্যবহৃত হতো। কিন্তু তাদের চরম দুর্ভাগ্য যে সেই সময় পর্যন্ত তাদের প্রতীক্ষার প্রয়োজন হয়নি। তার অনেক আগেই ঐ নৌবহর তথা তার বিশারদ বাহিনীকে অপদস্ত হয়ে পালাতে হয়েছিল। একটু পরিষ্কার করেই ছবিটা মেলে দেখা যাক। বলতে গেলে তারা এসেছিল সাহায্য করতে একজনকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কারণ ঘটল সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ উল্টো। তখন

অবস্থা এমন একটা স্থানে উপস্থিত হলো যে সপ্তম নৌবহর কারো সাহায্য পেলেই যেন ভালো হতো। এটা আমরা মানি আর নাই মানি তাতে ইতিহাসের কিছুমাত্র যায় আসে না। সপ্তম নৌবহরের ফেরার কারণ, ভারতের কোন মহান গুপ্তবিপ্লবী সংস্থার হাতে সেটি রীতিমত ঘায়েল তথা নাস্তানাবুদ হয়ে ফিরতে বাধ্য হয়েছিল। যদিও এই গুপ্ত বিপ্লবী কে বা কারা তাঁর হদিস আজ পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ করতে পেরেছে না মিত্রপক্ষ করতে সক্ষম হয়েছে। শোনা যায় বিশ্ববিপ্লবের যিনি রাজগুরু তিনি এভাবে সারাবিশ্বে কাজ করেন বা কাজ করিয়ে ফিরছেন। হ্যাঁ, তখন তথাকথিত ভারত সরকারের চেহারাটা কি ছিল একটু স্মরণ করুন। সপ্তম নৌবহরকে ধমক দেবার শক্তি কতটুকু ছিল এই ভারত সরকারের তা আমরা সবাই ভালোভাবেই জানি। নাকি মেনে নিতে হবে, তৎকালীন ভারত সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের দ্বারা আমেরিকাকে চোখ রাঙ্গানো হয়েছিল?

বলতে নেই আজ যে ভারতের অবস্থান অর্থাৎ ২০০০ সালের প্রারম্ভে তাতেও আমেরিকাকে রীতিমত সমীহ করতে হচ্ছে। সুতরাং বলা নিস্প্রয়োজন প্রবাহমান গতানুগতিক ভারত সরকারের দ্বারা বা তথাকথিত নেতাদের দ্বারা এমন কাজ হয়েছে একথা ভাবাই বাতুলতা। এই অনুমান কতখানি সত্য তা ভারত সরকারের বড় কর্তারা প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও তাতে কথিত কর্মকর্তার বিন্দুবিসর্গও ক্ষতি নেই। তাঁরা এ সত্যের কথা স্বীকার করলে তো তাঁদের অস্তিত্বের প্রশ্নই তাঁদের তাড়া করবে। অতএব এসব কি তাঁরা ভুলেও স্বীকার করতে বা মেনে নিতে পারে? এটা যে ভারতবর্ষ! যদি বিদেশ হতো তবে অন্য কথা ছিল। বিদেশে যখন এ জাতীয় ঘটনা ঘটছে তখন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে সেখানকার রাষ্ট্রনায়ক বা সেই দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কূটনৈতিক কর্তারা তা স্বীকার করছেন। যদিও স্বীকার করার পদ্ধতিতে কায়দাকানুন আছে ভাববার মত। এমন ঘটনাতে আমরা পরে যাবো। তার আগে বাংলাদেশের পর্বটাই শেষ হোক।

বাংলাদেশের উত্থানের প্রাক্‌লগ্নের চিত্রে আমরা কি পাচ্ছি, পাচ্ছি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর তথা ইন্দিরা গান্ধীর মিটিং বা সাক্ষাৎকার ঘটেছিল। এ সংক্রান্ত ছবিতো এই কলিকাতার দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত এবং এখানকার প্রেসেরই এ কৃতিত্ব। (এ সম্পর্কে প্রদত্ত প্রদর্শিত চিত্র প্রথম পর্যায়ে দেওয়া আছে।) এই তথ্য অস্বীকার করার উপায় কোথায়? এসব ঘটনায় আরও একটি জিনিষ প্রমাণিত হয়েছে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে যে, শুধু আমাদের দেশের তথাকথিত খলনায়ক নায়িকারাই সব জ্ঞাত আছেন তা নয়। আমাদের দেশের প্রেসগুলো সমস্ত খবর রাখে এবং তারা খুব ভালোভাবেই এসব ব্যাপারে সচেতন। তথাপি মিডিয়ারা এইরূপ আন্তর্জাতিক মানের গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবরগুলো অবগুণ্ঠনের আড়ালে আবডালে রেখেই পরিবেশন করে। তাও আবার কখনও কখনও। সবসময় এটুকুও করে না। এই যদি অবস্থা তবে স্বাভাবিক প্রশ্ন,

তাদের স্বাধীন সত্তা কোথায়? এই কি স্বাধীনদেশের স্বাধীন সংবাদপত্রের পরিচয়? বাংলাদেশের উত্থানের প্রেক্ষাপটে আরও কথিত আছে যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এশিয়ান লিবারেশন বাহিনীর কিছু মঙ্গোলীয়ান সেনারাও এ-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। যা নাকি ওয়াকিবহাল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভালোভাবে অবগত আছেন। এমনটিই শোনা যায়। বলাবাহুল্য ভারতীয় গুপ্তবিপ্লবীদের হাতে সপ্তম নৌবহর ঘায়েল হবার পর তাদের কি আর হিম্মৎ হয়েছে পৃথিবীর কোথাও এ জাতীয় ভয় দেখানোর? তাতেই প্রমাণ করে সপ্তম নৌবহর কী ভয়ঙ্করভাবে ঐ বিপ্লবীদের হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছিল।

এখানেও ঐ প্রশ্ন যে, এই সত্য স্বীকার করা মানেই বর্তমান ভারত সরকারের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করা এবং সাথে সাথে তাদেরও অর্থাৎ নিজেদেরও অস্তিত্ব লোপ করা। এমন মহানতা থাকলে তো ইতিহাসের গতিমুখই অন্য খাতে প্রবাহিত হতো। সেই সৌভাগ্যই বা দেশবাসীর কোথায়?

এই চিত্র থেকে এটা পরিষ্কার যে চিরাচরিত প্রবাহমান স্রোতের তলায় অর্থাৎ আণ্ডারকারেন্টে যে কী ভয়ানক সব ব্যাপার ঘটছে তা কল্পনাতীত। এইরূপ প্রতিটি আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মের আণ্ডার সারফেসের এক চিত্র। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে চীনের নেতা চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর ১৯৭০ সালের ১৬ই জুলাইয়ের টি. ভি. সাক্ষাৎকারের দুর্লভ ঘোষণাই যথার্থ প্রমাণিত সত্য। বিশ্বরাষ্ট্রনায়কদের এমন বয়ান সারাবিশ্বেই সন্ধান করলে মাঝেমধ্যে পাওয়া যায় বিভিন্ন সময় নেতাজী সম্পর্কে। এমন আরও দুই একটি সংবাদ—

(1) **"Is Netaji Subhas Chandra Dead or Alive?"**
Evening post, 15th May 1970, London.

"The former U. S. Defence Secretary Clerk Cliford described that among the mighty armise of vietcong in Combodian border one complete division of Asian Liberation Army fighting there. Under the leadership of superman brain and some of the missing generals of world war II....."

এমনি একটি সংবাদ আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে পরিবেশন করেছি, যা বলেছেন তৎকালীন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কেনেডি। অনুরূপ আরও একটি সংবাদ আমরা পাই ১৯৬৮ সালের একটি বিখ্যাত বিদেশী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। এমন তথ্যের বা খবরের কোন সীমাসংখ্যা নেই। কিন্তু শুধু প্রেক্ষাপটের অবস্থান অনুসারে এখানে-ওখানে দুই একটি তুলে ধরলাম মাত্র। এমন একটি খবর যথা,

(2) **'Herald Tribune'**
11th February 1968

"Indian should welcome their most beloved leader who has been living elsewhere 'incognito' for nearly two decad."
—Robert Kennedy

(3) **Vietnum Couivier**

30th May 1970

.....Norodom Sihanok.....spoke for more than 30 minutes about his contact with Chinese leader that an "Elevated Brain of Asia whose listure of eyes can be compared with the rays of sun."

উপরের বাংলাদেশের পটভূমিকায় যেসব তথ্য ও সংবাদ চিত্র পাওয়া গেল তা থেকে একটি জিনিষ পরিষ্কার পাওয়া যাচ্ছে যে ভারতবর্ষ তথা ভারতবাসীর নিকট সুভাষচন্দ্র নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যাত হলেও সুভাষচন্দ্রের সকল করুণার দান আমরা ভিখারীর মত হাতে পেতে নিচ্ছি সর্বদা সর্বক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁর নামটি মুখে আনা চলবে না। মুখে উচ্চারণ করলেই পবিত্র মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই না? নেতাজী নামের ভৌতিক জ্বরে শুধু ভারতীয় নেতৃবর্গরা ও তাদের সাগরেদ প্রশাসনই ভুগছে না, যাবতীয় মিডিয়া এবং যাবতীয় সঙ্ঘশক্তিও একই ছুৎমার্গের আতঙ্কে ওষ্ঠাগত। সাথে সাথে সমগ্র ভারতবাসীকেও তারা একই রাস্তার পথিক করেছে আজ অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কালযাবৎ। এশিয়ার অন্য কোন দেশের ক্ষেত্রে এ-চিত্র প্রযোজ্য নয়। নেতারা তো নয়ই এবং জনগণও এমন হীনমন্যতার পথের পথিক নয়। মনে হয় যেন আরব্য উপন্যাসের জিন এসে সবাইকে গ্রাস করল বলে। এমন একটা উৎকট ভাবনায় আজ আমরা ভাবিত এবং সমগ্র জাতিটা একটা কল্পিত ছায়া যুদ্ধে জড়িত এবং বিপদগ্রস্ত। সুভাষচন্দ্র আমাদের আজাদী দান করে উদ্ধার করেছেন বলে আজ তিনি মহাপাতক। গোটাজাতির কাছেই মহা অপরাধে অপরাধী। যুদ্ধ অপরাধের চেয়েও যেন বড় অপরাধী, বড় ঘাতক! তাঁর নাম উচ্চারণ করলেই এবং সত্য উদ্‌ঘাটিত করলেই যেন সবাই রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অপরাধী। তাই আবার বলতেই হচ্ছে বিখ্যাত কবি ডি. এল. রায়ের ভাষায় প্রতিধ্বনি করে যে, "বাহবা বাহবা বাহবা বেশ ভ্যালারে ভারতবাসী ভ্যালারে ভারতীয় নেতৃকুল বেঁচে থাক চিরকাল''। সুভাষচন্দ্র সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দরা যা করছে তা এককথায় এক অদ্ভুৎ কাণ্ড। তাই ফিরে ফিরে বারবার একটি কথাই বলতে হয়—

'সত্য সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ'!

এই নিবন্ধে এ পর্যন্ত যতটুকু তথ্যাতথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা যে এই মহাজীবনের কর্মকাণ্ডের মাত্র কিঞ্চিৎ ছিটেফোঁটা তা না বলাই ভালো। তবু যতটা সম্ভব সংগৃহীত হয়েছে বা জানা গেছে তাই এখানে সাধ্যমত উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্রের অনন্ত কর্মযজ্ঞের আনাচে কানাচে প্রাপ্ত তথ্যাতথ্যই মাত্র পরিবেশিত হয়েছে। আর যে সীমাহীন ঘটনাবলী পৃথিবীময় প্রক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে তা তিনি নিজে দয়া করে প্রকাশ না করলে কোনকালেই কারো পক্ষে প্রকাশ করা বা জানা

সম্ভব হবে না। আর তিনি যে তা প্রকাশ করার লোক নন তাও হলফ করেই বলা যায়। তবু বলতে হয় সে কথা বলার অধিকারী একমাত্র ভাবিকাল। তবু ফাঁকফোকরে আরও দুই একটি ঘটনা উদাহরণ স্বরূপ এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যথা, কোরিয়া যুদ্ধের পর শান্তি চুক্তি সম্পাদনা হয়েছিল ১৯৫৩ সালে নেতাজীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে ও তাঁর প্রচেষ্টায়। কিন্তু তৎকালীন ভারতবাসী মাত্রই জানেন তার অর্থাৎ কোরিয়া যুদ্ধের সময় বিশ্বশান্তির দূত ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। অন্তত প্রচার তো তাই ছিল। তৎকালীন পত্রপত্রিকা ঘাটলে এই কথাই প্রমাণিত হবে। অথচ পর্দার আড়ালের তথ্য বলছে সম্পূর্ণ অন্য কথা। এটা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাঁর নিজস্ব প্রচার। কারণ সুভাষচন্দ্রতো তখনও সদ্য সদ্য মৃত। ১৯৪৫ এর ১৮ই আগষ্ট প্রায় ৪৬ সাল আর ১৯৫৩ কয় বৎসরের ব্যবধান। তখনকার নেহেরুর গ্ল্যামার যারা জানেন তারা স্মরণ করে দেখুন তখন তিনি প্রায় বিশ্বশান্তির দূত। পর্দার আড়ালের ঘটনা যদি সাম্রাজ্যবাদীরা না জানত তবে হয়ত তিনি বিশ্বশান্তির জন্য নোবেল বিজয়ীই হয়ে যেতেন। এমন একটা প্রোপাগাণ্ডা ছিল তাঁর নামে।

বলার অপেক্ষা রাখেনা নেতাজী যে সে সময় পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে কোরিয়া যুদ্ধের মীমাংসায় জড়িত ছিলেন তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ তৎকালীন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল থিমাইয়া। (জেনারেল থিমাইয়া ছাড়া আর একজন জেনারেল যাঁর নাম ম্যানেকশা। তিনি ছিলেন নেতাজীপন্থী। সে কারণে তাঁকে ফলও পেতে হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে ভারতের কুখ্যাত জরুরী অবস্থার সময় তাঁকে বিনা কারণে জেলে বন্দীদশায় কাটাতে হয়েছিল। তিনি তখন মুর্শিদাবাদের বহরমপুর জেলে আটক ছিলেন।) ১৯৫৩ সালের ঐ যে শান্তিচুক্তির সময় নেতাজীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি একথা কি নেহেরুর জানা ছিল না? জওহরলাল ১৯৪৫ সাল থেকেই সব খবর শুধু জানতেন তা নয়, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রতিপক্ষের মতই সব আটঘাট বেঁধেই চলতেনও। জওহরলাল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শুধু সুভাষচন্দ্রের মৌনতার জন্য সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পেলেন। এই সমগ্র দলিল চিত্রের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যত অসংখ্য সংবাদ ও কর্মকাণ্ডের ইতিহাস বিশ্বব্যাপী পাওয়া গেল তাতে এটাই প্রমাণিত যে বিশ্বযজ্ঞের প্রধান রাজপুরোহিত বা প্রাণপুরুষ হচ্ছেন এই আত্মগোপনকারী আধ্যাত্মিক পুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র নামের এক ব্রহ্মজ্ঞ অগ্নিহোত্রী। এই ভারতঋষি অরিন্দমের হস্তক্ষেপেই যে ভিয়েৎনাম মুক্ত ও যুক্ত হয়েছিল এ তথ্য আমরা পূর্বেই পেয়েছি এবং আমেরিকান কর্তাদের পরোক্ষ স্বীকার উক্তিও আমরা আগেই দেখেছি।

সাম্রাজ্যবাদীরা অবগত ছিল যে, সুভাষচন্দ্র মাত্র একটিবার যদি আত্মপ্রকাশ করেন তবে পৃথিবী থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চিরতরে বিলুপ্তি ঘটবে। এ ব্যাপারে জেনারেল ম্যাক আরথারের ঐতিহাসিক যে উক্তি আছে তাও আমরা পূর্বে অবগত হয়েছি। ম্যাক-আরথার সাহেব বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র আত্মপ্রকাশ করলে সাম্রাজ্যবাদ লুপ্ত হবে

পৃথিবী থেকেই। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্র আত্মপ্রকাশ না করেই কী করতে পারেন আর কী করতে পারেন না, সেটাই সুভাষচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদীদের দেখাচ্ছেন। তাতেই সাম্রাজ্যবাদীদের হাল আজ অত্যন্ত করুণ। কাজেই আত্মপ্রকাশ ঘটলে যা হবে তা পৃথিবীর কোন ভাষ্যকারেরই বলা সম্ভব নয়। এতদ্ সংক্রান্ত ব্যাপারে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর উক্তি বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। এমন ভাষ্য পৃথিবীতে আর কেউ আজ পর্যন্ত রাখেননি। চৌ-এন-লাই বা মাও-সে-তুং এই দুই চীনানেতার ভাষ্যের আগে আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন সুভাষচন্দ্রের সম্ভাব্য মাস্টার পরিকল্পনাগুলি কী এবং কেমন? যতদূর জানা যায় সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনাগুলি ছিল নিম্নরূপ :

যথা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্-কালে বিশ্বের যে প্রকৃত অবস্থান মোটামুটি তার উপরই সুভাষচন্দ্রের মাস্টার পরিকল্পনা রচিত হয়েছে যতদূর জানা যায়। আমরা এই আলোয় দেখলে যা পেতে পারি এবং জানা যায় তা হচ্ছে—

প্রথমত: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদীরা পৃথিবীতে যেসব দেশ বিভাজিত করেছিল সেইসব দেশকে পুনরায় একীকরণ।

দ্বিতীয়ত: পৃথিবী থেকে একটি নির্দিষ্ট মুদ্রার মনোপলি অর্থনীতি বিলোপ সাধন বা একচেটিয়া অধিকার দূরীকরণ।

তৃতীয়ত: এশিয়াটিক ফেডারেশন গঠন করা।

চতুর্থত: এফ্রোএশিয়ান দেশগুলি থেকে সাম্রাজ্যবাদীর অধিকার বিলোপ করা।

পঞ্চমত: বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের পুনর্গঠন ও 'ভেটো'-প্রথার সঠিক মূল্যায়ন বা বিলোপ সাধন।

ষষ্ঠত: সারাবিশ্বে কঠোর অনুশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন। অর্থাৎ মানবিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

এই প্রেক্ষাপটে বিচরণ করলে আমরা কি কি পেতে পারি তার একটু পর্যালোচনা করা যাক। এই আলোচনা করতে গেলে আমাদের স্বাভাবিক ভাবেই সামগ্রিক বিশ্বব্যবস্থার কথাই প্রথম স্মরণ রাখতে হবে এবং সেই স্মরণী ধরেই আমাদের এগোতে হবে। তাই অতি স্বাভাবিক ভাবেই জাতিপুঞ্জের ব্যাপারে তথা সামগ্রিক আর্ন্তজার্তিক বিষয়গুলি নিয়ে পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

এই আলোয় দেখতে গেলে জাতিপুঞ্জ, কমনওয়েলথ বা ঐ পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের এখনও যেটুকু অবস্থান প্রহেলিকাময় আচ্ছাদনে আবৃত আছে তাও একদিন পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে একান্ত বিশ্বাস করি। বলাবাহুল্য সহজ সরল পথে তা না হলে বাঁকাপথে হলেও হতেই হবে। A new order বা একটা নুতন বিশ্বব্যবস্থা কিভাবে দৃঢ় অথচ সুনিশ্চিতভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে পৃথিবীতে তা আমরা অচিরেই দেখতে পাবো। এই নতুন বিশ্বব্যবস্থাটা কী? আসুন তা একটু পর্যালোচনা করে দেখি সেটা কি হতে পারে। বিশ্বব্যবস্থার দু' একটি মৌলিক বিষয় নিয়েই তা আলোচনা করা যাক।

বর্তমান বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ হচ্ছে এমন একটি সংস্থা যারে আমরা বলতে পারি অনেকটা যেন ঐচ্ছিক একটি বিশ্বরাষ্ট্র সমূহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্বসরকার। এখানে বিশ্বের সকল স্বাধীন সরকার এসে যোগদান করতে পারেন বা বিশ্বের সকল স্বাধীন সরকার সমূহকে এই সংস্থার সদস্য হবার জন্য আবেদন করা যেতে পারে। এটি হচ্ছে তেমন একটি সংস্থা। তবে যাঁরা এখানকার সদস্য হবেন তাঁদের অবশ্যই রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক প্রণীত যে আন্তর্জাতিক সনদ বা সংবিধান আছে তা মেনে, তার শপথ নিতে হবে, এইমর্মে যে, সদস্যভুক্তির পর তারা কখনও সেই সনদ লঙ্ঘন করতে পারবে না। এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষের সামগ্রিক মঙ্গল সাধন। যেমন প্রত্যেক দেশের প্রতিটি সরকারের কর্তব্য ও ধর্ম। এক কথায় বলা যেতে পারে বিশ্বসরকার। এটি সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। তখন এটির নাম ছিল লীগ অব নেশন। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এর নামকরণ হয় বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ বা জাতিপুঞ্জ। বলতে নেই এই সংস্থা প্রথম তৈরী হয়েছিল পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগোষ্ঠী দ্বারা। তাঁরা তৈরী করেছিল তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণার্থেই। পৃথিবীতে যেন তাঁদের একক আধিপত্য চিরদিনের এমন একটি ব্যাপার। পরবর্তীকালে অবশ্যই অনেক ব্যাপারে এই সংস্থার উদারতা প্রসারিত হয়েছে। তথাপি সামগ্রিক মঙ্গল হউক পৃথিবীর সকলের এইরূপ অবস্থায় এখনও এই বিশ্বসরকার এসে পৌছায়নি। সেখানে পৌছানোটাই হবে যথার্থ মূল কথা। কিন্তু এই বিশ্বসংস্থায় যে কয়টি তার বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত শাখা-প্রশাখা আছে তার মাঝে সিকিউরিটি কাউন্সিল বা নিরাপত্তা পরিষদ হচ্ছে একটি মূখ্য সংস্থা বা শাখা। প্রকৃত অর্থে এই শাখাই বিশ্বকে দেখভাল বা নিয়ন্ত্রণ করে। এক কথায় বিশ্ব প্রহরী, এটি বলতে গেলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাবে পুষ্ট। এছাড়া আছে সাধারণ পরিষদ বা জেনারেল এ্যাসেমব্লি ইত্যাদি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের গঠনতন্ত্র অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে পাঁচজন অর্থাৎ পাঁচটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত রাষ্ট্র। সনদ অনুসারে তারা হবে স্থায়ী সদস্য। বলতে নেই এই বিশ্বসরকারের যত গলদ তার বোধহয় মূল গলদ সব এখানে ঢুকে বসে আছে। স্থূল চোখে দেখলে এই উপসমিতি বা নিরাপত্তা সংস্থার গঠন কাঠামোটায় প্রথম ত্রুটী হচ্ছে শুধু পাঁচজন সদস্য কেন হবে? আমরা জানি এই পাঁচজন স্থায়ী সদস্য হচ্ছে গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীন।

এবার আসুন এই সংস্থার ভালোমন্দ দিকগুলো একটু যাচাই করে দেখা যাক। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের 'ভেটো' বলে একটি বিশেষ অধিকার আছে। এই অধিকার বা পাওয়ার যাকে শক্তি বলা যায়, এটা যে একটা মারাত্মক অস্ত্র এই পাঁচ সদস্যদের হাতে তা কোনভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। বলতে গেলে এই 'ভেটো'—প্রথাটাই বিশ্বসরকারের মূল উদ্দেশ্যকে কুঠারাঘাত করে রেখেছে। আরও পরিষ্কার করে বললে, বলতে হয় এই 'ভেটো' প্রথাটাই পৃথিবীর সত্যনাশের

মূল মেরুদণ্ড। ওটি যতদিন থাকবে ততদিন পৃথিবীর সার্বিক মঙ্গল বা পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের বা পৃথিবীর প্রতিটি জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সম্ভব নয়। আসুন ব্যাপারটা একটু উদার দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করি। মোদ্দা কথা এই 'ভেটো' প্রথার ফলে পৃথিবীতে বিচার ব্যবস্থাটাই সুদূর অতীত গহ্বরে ঢুকে বসে আছে। অর্থাৎ বর্তমান পৃথিবীর অনুশাসন থেকে বিচার ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে রাখা হয়েছে এই 'ভেটো' নামক ঢাকটি পিটিয়ে। তাই আজকের পৃথিবীর যুগটা হচ্ছে চোখ রাঙ্গানোর যুগ। এই চোখ রাঙ্গানোর ব্যাপারটা বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌লগ্নে ছিল উলঙ্গভাবে। এখন তাতে একটু আব্রু বা অবগুণ্ঠনের আড়াল ঘটেছে মাত্র। এই ভেটো ব্যবস্থা বিলুপ না হলে, পৃথিবীতে নতুন কিছু কল্পনা করাই বৃথা। 'ভেটো' প্রথাটার সবকিছুই কিন্তু কুফল।

আসুন এই 'ভেটো'-র স্বরূপটা কী তা একটু পরখ করি। ধরুন কোন রাষ্ট্র অন্যকোন শক্তিশালী রাষ্ট্র দ্বারা অত্যাচারিত বা উৎপীড়িত হচ্ছে। তখন সে কার কাছে বিচার চাইবে? বা তার পরিত্রাণের পথ বা উপায় কি? পূর্বেই বলা হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সৃষ্টি হয়েছিল বা পরবর্তী পর্যায়ে তার লক্ষ্য ছিল যাতে এই জাতীয় অমানবিক আচরণের প্রতিবিধান হয়। দেখা গেল ঐ অত্যাচারিত রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে আবেদন রাখল তারে পরিত্রাণের জন্য। কিন্তু দেখা গেল নিরাপত্তা পরিষদ ঐ আবেদনে কোন সাড়াই দিল না। তার কারণ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের কারোরই ঐ আবেদনকারী রাষ্ট্রের ব্যাপারে উৎসাহ নেই। যেহেতু ঐ রাষ্ট্রের ক্ষতি বৃদ্ধিতে নিরাপত্তা পরিষদের কিছু আসে যায় না। এ গেল একদিক। অপরদিকে ভাবুন ঐ রাষ্ট্রের সঙ্গে এই নিরাপত্তা পরিষদের কোন সদস্যের বন্ধুত্ব সম্পর্ক থাকায় সে তার হয়ে সওয়াল করতে চাইল কিন্তু পক্ষান্তরে অন্য এক সদস্যের সাথে যে রাষ্ট্র দ্বারা এই রাষ্ট্রটি অত্যাচারিত এবং আক্রান্ত তেমন একজন সদস্য দিল 'ভেটো' প্রয়োগ করে, ফলে সে আলোচনারই সুযোগ পেলো না। অর্থাৎ একজন নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরাষ্ট্রের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর বিশ্বসরকারও বোবা সেজে চুপ করে থাকতে হলো। তাহলে ভেটো ব্যবস্থার কু-ফলের জন্য পৃথিবীতে একটি দুর্বল জনগোষ্ঠীর সরকার বিচার পেলো না। মোদ্দাকথা আদিম অবস্থার মত সবল দুর্বলকে অত্যাচার করেই চলল। এমনটি কি কোন সভ্য ব্যবস্থার অঙ্গ বা বিধিবিধান হওয়া কাম্য বা বাঞ্ছনীয়? কাজেই এই ব্যবস্থা কি বিলোপনই কাম্য নয়? এই ছবি থেকে আর একটি জিনিষও পাচ্ছি যে ঐ নিরাপত্তা পরিষদের যেকোন এক সদস্যের ইচ্ছা অনিচ্ছায় মানবগোষ্ঠীর উপর স্ট্রীমরোলারের শকটও চালানো যেতে পারে। এবার বলুন এমন রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা বিশ্বের কি উপকারটা সাধিত হতে পারে? এতে প্রমাণিত হচ্ছে ঐ পাঁচ সদস্যের যে কেউ যা খুশী মানবগোষ্ঠীর উপর চাপাবার মৌরসী পাট্টার সনদ নিয়ে যেন বসে আছে? এটা কি সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের ব্যাপার নয়? তবে আর মানবাধিকার মানবাধিকার বলে ডঙ্কা বাজিয়ে লাভ কি? আজকের পৃথিবীতে সভ্যতা ভব্যতা নামক একটি অবগুন্ঠন বা আব্রূ কাজ করছে।

এছাড়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের সঙ্গে কোথায় ব্যবধান আছে বলুন? এতদ ব্যতিরেকে শুধু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত পাঁচজন স্থায়ী সদস্যই পৃথিবীতে ছড়ি চালাবে এও তো সভ্যতার কলঙ্ক। এ বিধানও মেনে নেওয়া যায় না। বলাবাহুল্য এই সকল ব্যবস্থাই ঘটা করে করা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থে। আজও সেই পথ ধরেই এইসব বিধিবিধান বহাল তবিয়তে আছে। এছাড়া অর্থনৈতিক বিশ্বেরও একই চেহারা। পৃথিবীতে একটি বিশেষ মুদ্রারই আধিপত্য। সেটাও কোনভাবেই কাম্য নয়। এভাবেই মানবগোষ্ঠীর পুষ্টিসাধনের সকল পথেই কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে সাম্রাজ্যবাদী চক্র। সুতরাং সামগ্রিকভাবেই এই সকল ব্যবস্থার পরিবর্তন কাম্য। এইরূপ জমিদারী চলতে পারে না। এরপর আছে আণবিক শক্তির মনোপলি বা একচেটিয়া অধিকার। এই শক্তির মনোপলিতেও ঐ পাঁচ সদস্য ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। এই সমগ্র চিত্রপটের পরিবর্তনই হচ্ছে নতুন বিশ্বব্যবস্থা। এই বিশ্বব্যবস্থার আগে ঐসব বড় বড় ক্রটী যদি দূরীকরণ না হয় তবে বিশ্বসাম্য তো একটা কথার কথা। শূন্য গর্ভসার। কাজেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থই যদি বহাল থাকে তবে আর স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের মানবিক বিশ্ব কি সৃষ্টি হতে পারে, না সম্ভব?

তাই বলা যায় অসম্ভবের মহানায়ক নেতাজী সুভাষের হস্তপ্রলেপে এই সবই নিশ্চিতভাবে পরিবর্তন ঘটবে, ঘটতে চলেছে নিয়তির ঘড়ির কাঁটা ধরেই। যদি তা না হতো তবে নেতাজী সুভাষ বলতেন না ..... I must discover the laws of progress. The tendency both the civilisation and there form to settle the future goal and progress of mankind. এ, সত্য না হলে পৃথিবীতে মানব সমাজের জন্য একটা নতুন অনুশাসনেরই বা মানেটা কী? বলা নিস্প্রয়োজন এসব ব্যবস্থাই ঘটাবেন সেই মহামানব। যাঁর কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি আমরা এই আলোচ্য দলিলচিত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে এ-যাবৎকাল দেখলাম। বিশ্বে একটি নতুন ব্যবস্থার কথা যা বলা হলো তা ঐ মহান যুগপুরুষ ছাড়া কারো পক্ষে ভাবাটাও তো মূর্খতা। এই প্রসঙ্গে আবার যে কথাটা বলতে হচ্ছে তা হলো যুগসারথি বা যুগস্রষ্টাকে আমরা পৃথিবীর সাধারণরা কি কোন কালে কোন যুগেই চিনতে, জানতে বা উপলব্ধি করতে পেরেছি? পারিনি এবং পারার কথাও নয়। উদাহরণ দিতে গেলে এখানেও পূর্বের দৃষ্টান্তগুলোকে নিয়েই টানাটানি করা ছাড়া উপায় নেই। যথা বলুন তো, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান যিশু, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ভগবান বুদ্ধ বা পয়গাম্বর হজরত মোহম্মদকে কে চিনেছিল তখনকার তাঁদের সমকালীন জগতে? এতদূর যাবার কি দরকার? সেদিনের কথা, স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কয়জন চিনেছিল তাঁর সময়ে? শুধু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তন্ত্রগুরু ভৈরবী মাতা ছাড়া? যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আজ বিশ্বে মহামানব থেকে অতি সাধারণ পর্যন্ত সকলের কাছে অবতার বরিষ্ঠায় বলে পূজিত, তাঁকে আমরা পাগল বলতেও কসুর করিনি।

এই সুভাষ বোস বা সুভাষচন্দ্র বসুর তৎকালের পরিদৃশ্যমান চিত্রের দিকে তাকালে

তখন আমরা যাঁকে দেখব তিনি হচ্ছেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ১৯৩৮/৩৯ সালের এক লড়াকু প্রেসিডেন্ট। তাঁর পরিকল্পনা বা সংগ্রাম ছিল শুধু ভারতবর্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশকে বিতাড়ন করা। সেই সূচনা পর্বে যদি তিনি ছিলেন বাংলার নেতা বা ভারতবর্ষের নেতা তবে আজও কি তিনি সেখানে অবস্থান করছেন? নিশ্চয় নয়। তারপর তাঁর জীবনের উপর দিয়ে হাজার ঝড় বয়ে গিয়েছে এবং নানা পর্যায়ের ভেতর দিয়ে তাঁর বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। ইতিমধ্যে সমগ্র বিশ্বের যেমন পরিবর্তন ঘটেছে তেমন সুভাষচন্দ্রেরও আমুল পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতবর্ষের নেতা সুভাষচন্দ্র থেকে তিনি মহাপারাবার অতিক্রম করে হয়েছেন নেতাজী, হয়েছেন এশিয়ার নেতা। সেখান থেকে তিনি মহাকাশসম যোজন অতিক্রম করে আজ তিনি হচ্ছেন শ্রীমদ্ সারদানন্দজী। তথা অদ্বিতীয় বিশ্বপিতা। এভাবে তিনি স্থূলত্ব থেকে সূক্ষ্মত্ব এবং সেখান থেকে মহাসূক্ষ্মত্ব পর্যায়ে এসে আজ তিনি বিশ্বনায়ক বিশ্বপিতারূপে আত্মস্থ হয়েছেন। এখন তাঁর কাছে পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। এভাবেই তিনি তাঁর জীবনকে পার্থিব এবং পরমার্থিক উভয় দিক থেকেই এমন একটি উত্তুঙ্গ শিখরে নিয়ে পৌঁচেছেন তা কখনও মানব প্রকৃতির পরিধিতে যে ক্ষমতা আছে তা দ্বারা পরিমাপ কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। তাই আমরা সুভাষচন্দ্রকে বুঝতে গিয়ে প্রতি পদে পদে হেরে যাচ্ছি। তাঁকে বিচার করতে চাইছি একজন মানব দেহধারীরূপে, আর সেখানে গিয়েই আমরা যাবতীয় ব্যাপারে তালগোল পাকিয়ে ফেলছি। তাই আমাদের অবস্থা হচ্ছে অন্ধের হস্তীদর্শনবৎ একটি পর্যায়, অন্তত সুভাষচন্দ্রের বা আজকের শ্রীমদ্ সারদানন্দজী বা বিশ্বপিতারূপী নেতাজী সুভাষের প্রেক্ষাপটে। বলাবাহুল্য তাঁর এই পর্যায় বা উত্তরণ শুধু ব্যক্তিজীবনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁর এই স্তরও স্বদেশ ভাবনা বা ভারত ভাবনা, এশিয়ার ভাবনা আজ বিশ্বভাবনা একই ধারাবাহিকতা বা মহাউত্তরণের ফল। সেই কারণেই বিশ্বকে নিয়ে তিনি যেসব পরিকল্পনার কথা ভাবছেন সেগুলো কোন অবস্থাতেই মনুষ্য মস্তিষ্কে মনুষ্য পরিকল্পনায় ভাবা, বিচার করা সম্ভব নয়। এমন একটা উত্তরণ কি মহিমায় সম্ভব হলো? এর উত্তর মনে হয় একটাই। সেটা হলো ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাবাদ। যারা এই আধ্যাত্মিকতাবাদকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চান বা বুজরুকি বলেন, তাদের প্রতি অনুরোধ তারা ব্যাপারটাকে হাস্যরসের উপকরণ না ভেবে একটু গভীরভাবে ভাবুন। তাতে আপনার লাভ বই কোন ক্ষতিসাধন হবে না।

এবার আসুন সুভাষচন্দ্রের ঐ মাস্টার পরিকল্পনা নিয়ে একটু আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। ভাবুন, সুভাষচন্দ্র বসু আজ যে-জগতের, তিনি ছাড়া কে হতে পারেন এমন পরিকল্পনার স্থপতিকার? বা এমন পরিকল্পনার উদ্ভাবক? সুভাষচন্দ্র হচ্ছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উত্তরসাধক তাই তিনি আজ ঐ স্তরে উন্নীত হয়ে যোগমার্গের শীর্ষে বিচরণশীল এক মহামহিম ঋষি। এমন ব্যক্তি ছাড়া কখনও কি ঐ জাতীয় পরিকল্পনা কারো মাথায় আসতে পারে? এমন ভাবনা ভাবা পার্থিবচারীদের কোন অর্থও হতে পারে না। কারণ পার্থিবচারী সাধারণ যারা তারাতো প্রতিবেশীর প্রতিবেশী হয়েও

পরস্পরের বৈরিতা দূর করতে পারে না। যদিও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রত্যেকটি পরিকল্পনাই পার্থিব কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে মানব জগতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও উন্নতিকল্পে তবু বলা যায় এমন ভাবনার জগতে কোন পরমার্থিক ব্যক্তিত্ব ছাড়া বিচরণ করা সম্ভব নয়। এইসব পরিকল্পনার দুই একটি প্রথম যাঁর মাথায় এসেছিল তিনি হলেন ভারত বিখ্যাত ও ভারত বন্দিত পুরুষ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তাঁর মাথায় যে পরিকল্পনা অঙ্কুরিত হয়েছিল তা হচ্ছে এশিয়া শুধু এশিয়ান জনগণের জন্য। বা অনুরূপ একটা চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণা। তিনিই প্রথম উচ্চারণ করেন এশিয়ান ফেডারেশনের কথা। এই হলো সূত্রপাত। স্মরণীয় এই চিত্তরঞ্জন দাশই হচ্ছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক গুরু এবং ছিলেন তিনি পরম ধার্মিক। সেইজন্য তাঁর দূরদৃষ্টিও ছিল সমকালীন ভারতীয় নেতাদের মধ্যে অন্যতম। স্বাভাবিক ভাবেই ঐ এশিয়ান ফেডারেশনের সূত্র ধরেই আসছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনারও কথা। কারণ সাম্রাজ্যবাদীর হাত থেকে পরিত্রাণের ওটাই হচ্ছে প্রথম ধাপ বা প্রথম সোপান।

দেশবন্ধুর এই সূত্র ধরে তারে ইতিহাসের পটচিত্রে ভাষার পরিমণ্ডলে তুলে ধরেন বাংলার তৎকালীন অদ্বিতীয় পণ্ডিত প্রবর এবং স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্র দত্ত। তিনি তাঁর ফেডারেটেড এশিয়া বই-এর মাধ্যমে ১৯১০ সালে ব্যাখ্যা করেন এর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা এবং তাঁর ঐ বিখ্যাত বইয়ের মাধ্যমেই তা এশিয়ার অন্যান্য দেশের লিডারদের মাঝে প্রচার করেন। এটিকে একটি তত্ত্ব হিসাবেই মহেন্দ্র দত্ত প্রথম বইয়ে তুলে ধরেন। এভাবেই এই আদর্শটি প্রথম প্রচার ও রূপ পায় কাগজ কলমে। এর মূল উৎস সন্ধানে গিয়ে যা পাওয়া গেল তাতে দেখা যাচ্ছে এর বীজ বপিত হয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হাতে। তারপর তারে ভাষাদান করে স্বীকৃত তত্ত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন মহেন্দ্র দত্ত। সেই তত্ত্বই আজ ফুলেফলে বিকশিত হয়ে শ্রীমদ্ সারদানন্দজীর ছদ্মবেশে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হাতে সার্থকভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। বলার অপেক্ষা রাখেনা এরই নাম জাতীয়তাবাদ বা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। যাঁর জনক হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি শুধু ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরই জনক নয়। তাঁর এই জাতীয়তাবাদেরই উন্নততর পর্যায় হচ্ছে বিশ্বসমন্বয়বাদ। যা স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালের ১১ই, ১২ই, ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রভৃতি তারিখে বিশ্বমানব মিলন কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসীর জন্য ঘোষণা করেছিলেন তাঁর ঐতিহাসিক বিখ্যাত বাণী সম্বলিত বক্তৃতা। বিশ্বমানব সমাজের শ্রেষ্ঠ সনদ হিসাবে। স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে বা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই শ্রীমদ্ সারদানন্দজীর তথা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঐ নতুন বিশ্বব্যবস্থার মাস্টার পরিকল্পনা। এমন যে একটি পরিকল্পনা পরমার্থিক ভূমিতে সঞ্জাত ও সঞ্চারিত তা আমরা পার্থিবচারীরা ভাবতে যাব কোন যাদুবলে? এমন ভাবাইতো মূর্খতা। কারণ এর রূপায়ণ কি মনুষ্য ধর্মীয়দের পক্ষে সম্ভব? বলাবাহুল্য এরই নাম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবাহ। এক কদম এগিয়ে বলা যেতে পারে এরই নাম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সারদানন্দ প্রবাহ। এই মননশীলতার জনক বাঙ্গালী বলে আপাত গর্ববোধ হলেও তাঁরা সকলেই ছিলেন এক একটি বিশ্বরত্ন। এমন যে এক নিখুঁত সর্বাঙ্গীণ

বিশ্বমানব কল্যাণ পরিকল্পনার এক সার্থক উদ্ভাবক তেমন স্বর্গীয় আধ্যাত্মিক পরমপুরুষই বলতে পারেন—

"A new era has been slowly but surely dawning upon humanity —the era of spirituality."

তাই অম্লানেই বলা চলে এমন ত্রিকালদর্শী না হলে কি আর নতুন পৃথিবীর নতুন মানব ধর্ম যুগের স্বপ্ন কেউ দেখেন বা বাস্তবায়নের কঠিন সত্যের সাধনা করতে পারেন? এমন ব্যক্তির পক্ষেই নতুন পৃথিবীর পথদ্রষ্টা ও পথস্রষ্টা হওয়া সম্ভব। তাইতো তিনিই পৃথিবীতে একমাত্র অসম্ভবের স্বর্গীয় মহাপুরুষ, মহানায়ক। তাই বলতে হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর দিব্যদর্শনে যথার্থই বলেছিলেন,

"I have given you best of my jewels. I have given you Subhas. Wait and see. You will find everything in him."—1924

দেশবন্ধুর এই শ্রেষ্ঠতম রত্নের ভাণ্ডার বা আধারটি শুধু ভারতবাসীর কাছেই সেরা উপহার নয়। এ-রত্ন আজ বিশ্ববাসীর কাছেও সেরাতম সম্পদ। বলাবাহুল্য মানব জগতের ঊষা থেকে আজ পর্যন্ত এমন রত্ন এই প্রথমবার। এর আগে এমন রত্নের সন্ধান পৃথিবী কখনও পায়নি। এ রত্নই আজ পৃথিবীর মানব সত্তার রক্ষাকর্তা। নতুবা পৃথিবী ইতিমধ্যেই কতবার বিদীর্ণ হতো তা কেউ জানে না। এ রত্ন শুধু দেশবন্ধুর সেরা উপহার নয়। এ রত্ন বিশ্ববাসী জীবকুলের জন্য সৃষ্টিতে স্রষ্টারও শ্রেষ্ঠতম উপহার।

উপরের চিত্র থেকে যা পাচ্ছি তা থেকে বলা যায় সবকিছুর নির্ণায়কই সময়। সময় না হলে বা তার পরিমণ্ডল গড়ে না উঠলে কোন কিছুই সম্ভব নয়। উদাহরণ হচ্ছে, চিত্তরঞ্জন যে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে মূল্যায়ন তখন করেছিলেন সেটা কি দেশবাসী বা অন্যান্য সমকালীন কোন নেতাই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন? হয়নি। যেকোন ব্যাপারেই অনুশীলন করলে তাই প্রমাণ পাবো বা পাই। আজকের ভূমিতে দাঁড়িয়ে দেশবন্ধুর বাণীকে কি বলবেন? বেদবাণী, দৈববাণী বললে কি বেশি বলা হবে? তখনকার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কি দৈববাণী প্রমাণ করা যেতো? চিত্তরঞ্জনের যে দৈবদূরদর্শিতা ছিল তার আর এক প্রমাণ হচ্ছে ঋষি অরবিন্দ। বারীন ঘোষ ও অরবিন্দের আলিপুর বোমার মামলায় সওয়াল করতে গিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশ অরবিন্দ সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। কালে তাই বেদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং সময় যে সবকিছুর নির্ণায়ক এতে সন্দেহ আর রইল না। থাক এসব কথা, আসল দৃশ্যপটে যাওয়া যাক।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এই বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ড বুঝতে হলে চোখ কান খোলা থাকা তো চাই-ই। পরন্তু থাকতে হবে অনুধাবন ক্ষমতা ও যথার্থ অনুসরণ ক্ষমতা। সেই সাথে চাই সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করার ক্ষমতা ও দক্ষতা এবং সর্বোপরি থাকতেই হবে নিজস্ব উপলব্ধি জ্ঞান। নতুবা সবই আমরা গুলিয়ে দিতে পারি বা গুলিয়েও দিয়ে থাকি। অর্থাৎ এই গুণগুলি না থাকলে বা এই উপচারগুলির সমন্বয় সাধন না ঘটাতে পারলে কিছুই বুঝতে পারবো না। বরং বিপরীত পথের পথিক

হবো এবং নানা বিভ্রান্তিতে আমরা আক্রান্ত হবো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের এমনটাই ঘটে। এ সম্পর্কে আগামী যুগের যুগনায়ক তথা নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন শৌলমারী আশ্রমে তিনি শ্রীমদ্ সারদানন্দজী রূপে অবস্থান করছেন তখন বিশ্ববাসীকে একটি অপূর্ব বাণী দিয়েছিলেন যা এসব ক্ষেত্রে সঠিক পথ নির্দেশ করে। সে এক অমূল্য বাণী। যথা,

"The simplest thing is the most difficult to understand and the difficulties lie in man's perverted mode of thinking feeling and observation. The most cases at this juncture of human evolution or involution man is insincere about his thinking, feeling and observation.

He is wilful victim to his capricious mind and the vital. But even if a man is sincere. he is generally speaking in capable of thinking feeling and observation rightly. ....etc"

—Shrimat Saradanandaji

এভাবেই আমরা যাবতীয় ব্যাপারগুলিকেই ভণ্ডুল করে দিয়ে থাকি। সুভাষচন্দ্র তত্ত্বকে আমরা এভাবেই পৃথিবীর জটিলতম পর্যায়ে নিয়ে এসেছি। অথচ ব্যাপারটা আদৌ জটিল ছিল না। ১৯৪৫/৪৬ সালেই মাউন্টব্যাটেন, জওহরলালরাই সুভাষ ইস্যুকে এই পর্যায়ে ইচ্ছাকৃতভাবে সেই জটিল ভূমিতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছেন, যাতে ব্যাপারটা চিরদিনের মত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়। বলতে নেই দারুণ পরিকল্পনা এবং নিদারুণ সাফল্যও বটে। সুভাষচন্দ্রের বর্তমান অবস্থান ও কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে মেজর সত্য গুপ্তের একটি অতি মূল্যবান উক্তি আছে। যা বর্তমান আলোচনায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে তা প্রযোজ্য ও স্মরণীয়।

মেজর সত্য গুপ্ত বলেছিলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আন্দোলন এমন একটি আন্দোলন যা পৃথিবীতে কখনও ঘটেনি এবং আগামী যুগেও পৃথিবীতে ঘটবে কিনা তা ভবিতব্যই বলতে পারে। তাঁর মূল কথা ছিল সুভাষ আন্দোলন হচ্ছে একটি 'মনস্তাত্ত্বিক' আন্দোলন। এই আন্দোলন বা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিশ্বায়ন বুঝতে হলে অবশ্যই চাই উপরের বর্ণিত উপচারসমূহ বা গুণাবলী এবং সাথে সাথে ঐ তিনটি উপচারের সার্থক সমন্বয়। অর্থাৎ শ্রীমদ্ সারদানন্দজী কৃত ঐ মহাবাণীর যথার্থ মর্মে গিয়ে সে পথে সার্থকভাবে বিচরণ। নতুবা সবই বিভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়ে যেতে বাধ্য। সুভাষচন্দ্রের সমগ্র অধ্যায়টিকে আমরা আজ সেখানেই নিয়ে গিয়ে সব ভণ্ডুল করে ফেলেছি। ফলে বিষয়বস্তুটাই হয়ে উঠেছে সকলের নিকট একটি পরিত্যক্ত বস্তু। তাই যে বা যিনিই শুনেন তিনিই নাসিকা কুঞ্চন করতে ছাড়েন না। যেন ব্যাপারটা বোঝাতো দূর অস্ত, আলোচনা করাই অপরাধ। জেনারেল ম্যাক আরথার বলেছিলেন, সুভাষচন্দ্র একটিবার আত্মপ্রকাশ করলে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী শক্তি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এতে প্রমাণিত পৃথিবীতে দুইটি মহাশক্তি কাজ করছে একটি

শুভ শক্তি একটি অশুভ শক্তি। আরও পরিষ্কার করে যদি বলা যায় তবে বলতে হয় একটি মানবিক শক্তি যা সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে কল্যাণ বা মঙ্গল সাধনে পরিব্যাপ্ত আর অপরটি অমানবিক শক্তি, যে শক্তি ঐ সামগ্রিক মঙ্গল ক্রিয়াকে পর্যুদস্ত বা প্রতিহত করতে ব্যস্ত। এই মঙ্গলশক্তি বা শুভশক্তিটিই যে নেতাজী সুভাষ কর্তৃক পরিচালিত তা ম্যাক আরথারের উক্তিতেই বলে দিচ্ছে। এই শুভপ্রতীক সুভাষচন্দ্র মাথাচারা দিলেই তাঁরা অর্থাৎ বিপক্ষীয় সাম্রাজ্যবাদীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। একথা তো সাম্রাজ্যবাদীদের মুখপাত্র এক জেনারেলের কথা। এমন যে এক শক্তি বিশ্বকে, বিশ্বের অশুভকে পদানত করতে সক্ষম তাঁকে কিনা আমরা অনায়াসে অক্লেশে বুঝে ফেলতে চাই, ব্যাখ্যা করতে চাই। দু কথায় আমরা যারা তাঁকে ব্যাখ্যা করতে চাই, তারা একবারও ভাবিনা এই উভয় শক্তির তুলনায় আমরা তাদের কাছে কতখানি যোগ্য। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রকৃত ঐ মহাবাণী যে কী অপরিসীম মূল্য বহন করছে, তার যথার্থতা ভাবুন!

সমগ্র বিশ্বসত্ত্বাকে উজ্জীবিত করার যে রাজগুরু বা মহাশক্তি সুভাষচন্দ্র, তা পক্ষান্তরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই বলছে। যিনি হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দের মানসপুত্র বা উত্তরসূরী। ১৮৯৩ সালের শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলন যদিও অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমেরিকায় কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা ছিল একটি বিশ্বমানবের মিলনকেন্দ্র। সুতরাং স্বামীজীর ঐ বাণী যে ছিল বিশ্ববাসী সকল মানুষের জন্য তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এটাই ছিল বাণী প্রদানের লক্ষ্য। তাঁর বাণীর মূল কথা ছিল সমন্বয় ও মানুষে মানুষে সাম্যসাধনের কথা। স্বামীজী প্রদত্ত এই সমন্বয়ের রাজপথ ধরেই যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজ বিচরণ করছেন এবং তারে আরও মজবুত করে ও বিশ্বকে সেই পথে ও মতে উদ্বুদ্ধ করে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তার বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ আমরা নানাভাবে এ-যাবৎ পেয়েছি। সুতরাং আজ একথা পরিষ্কার পৃথিবীর অস্তিত্ত্ব রক্ষা করতে একমাত্র সক্ষম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্ম সমন্বয়। বা স্বামী বিবেকানন্দের মত ও পথ এবং তাঁর দর্শন। এবং তারে রূপায়িত করতে হলে চাই সেই রাজপুরোহিত নেতাজী নামক আর এক বিশ্ববন্দিত ও বিশ্বনিবেদিত মহামহিমকে। সুতরাং বিশ্ববাসীর আজ বিবেকানন্দ ছাড়া গতি নেই। তাঁর সূত্র ধরেই প্রত্যেকক্ষেত্রে এসে যাচ্ছেন যুগনির্মাতা ও যুগত্রাতা নেতাজী সুভাষ তথা শ্রীমদ্ সারদানন্দজী। এছাড়া নান্যপন্থা। স্বামীজী ছিলেন সমাজতান্ত্রিক। এবার ভাবুন তিনি কত বড় সমাজতান্ত্রিক। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিকরা কি স্বামীজির সমাজতন্ত্রের বা আন্তর্জাতিকতার ধূলিকণা পরিমাণও যোগ্য? এরই নাম প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। এরই নাম ভারতীয় সমাজতন্ত্র বা বৈদান্তিক সমাজতন্ত্র। এই সমাজতন্ত্রে মানুষের অনীহা হবে কেন?

যাক যা বলছিলাম, এই দুই মহান দিকদিশারী আলোক স্তম্ভকে বাদ দিয়ে আজ পৃথিবীর পরিত্রাণের কোনই যাদুদণ্ড পৃথিবীর কাছে নেই। এখানে দেখা যাচ্ছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধারার একটি নাম যদি নেতাজী সুভাষ নামক একটি স্বর্গীয় আধার হয়, তবে অনেক সমস্যাই মিটে যায় তাতে আজ কোন সন্দেহ নেই। তার প্রমাণও আমরা ইতিমধ্যে যথেষ্ট পেয়েছি। যদিও বলা, ভাবা আর কার্যে রূপায়িত করার মাঝে

শতযোজন ব্যবধান। বলতে গেলে এটা একটা নিত্যসত্য ব্যাপার। পৃথিবীতে কোন কিছুই সহজসাধ্য নয়, সহজলভ্য নয়। কিন্তু যিনি করাবেন এবং যিনি এই কর্মযজ্ঞ করছেন তিনি বা তাঁরা সেই মাপের সেই ওজনের আধার বলেই তো একের পর এক বিশাল বিশাল আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধান করে চলেছেন। আর এসব সমস্যা সহজসাধ্য নয় বলেই তো জগতের শীর্ষতম ব্যক্তি স্বামীজী ও নেতাজীর মত অসীম শক্তিধর পাত্রের বা ব্যক্তিত্বেরও কেটে যাচ্ছে শতাব্দীর মত দীর্ঘকাল। এ প্রসঙ্গে ভাবতে হবে ১৮৯৩ সালে যে যাত্রা শুরু তা আজ ১৯৯৯ সালের শেষলগ্নেও শেষ হলোনা কেন? এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা কেন? যদিও সুভাষ জীবনেরই কেটে গেল শতাব্দীর মত এক সুবিস্তীর্ণকাল বা অধ্যায় তবু বলা চলে মনুষ্য জীবনের নিরিখে এই কালকে বিশাল সময় মনে করলেও জাতীয় জীবনের বিচারে সময়টা কিছুই নয়। মহাকালের বিচারে সময়টাতো আরও তুচ্ছ। বিশ্বকবির ভাষায় বললে হয় জগতে সমস্ত কিছুই 'দুর্লভ'। তাই দুর্লভকে সুলভ করতে ও যুগোপযোগী করতেই যুগে যুগে পৃথিবীতে আসেন যুগস্রষ্টা বা যুগাবতার। তাঁরা ধরাধামে আসেন বলেই বলতে দৈত্যাচারিত পৃথিবীটা আজও বেঁচে আছে বেঁচে থাকবে এবং আজও নৈতিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। এখানেই ঐসব যুগপুরুষ যুগমানবদের মাহাত্ম্য। পৃথিবীর মানুষ তা বুঝতে পারুক বা না পারুক তাতে কিছুই এসে যায় না। এই তত্ত্বই এখানে বলে দিচ্ছে শ্রীমদ্ সারদানন্দজীর ছদ্মবেশে নেতাজী সুভাষ আজ কোন পর্যায়ে উপনীত ও আত্মস্থ হয়ে আছেন এবং তাঁর ব্যাপ্তিটা কতখানি। আগামী যুগে দেখা যাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সারদানন্দ ভাবধারায় বিশ্বপ্লাবিত ও পরিশ্রুত।

এই মহাপ্লাবনে বিশ্বপরিস্থিতির উত্তরণ যাতে আরও ত্বরান্বিত হয় তাই সেই যুগস্রষ্টা যুগত্রাতার শ্রীশ্রীপাদপদ্মে আসুন আমরা বিশ্ববাসী প্রার্থনা ও আকুতিতে তাঁর চরণ বন্দনা করি—

ওগো বিশ্ববিজয়ী বীর মহাক্ষত্রিয় জগত দিশারী অরিন্দম
কই তুমি কোথা বীর প্রতিজ্ঞায় প্রপিতামহ ভীষ্ম ধ্রুবম্।
ওগো হলাহল নিবারক নীলকণ্ঠ বিশ্বব্রতে ব্রতচারী
কই তুমি কোথা হে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তপে তপশ্চারী।।
হে অনাদি অনন্তম্ নবযুগ প্রণেতা জগত বিধায়ক—
অরূপের যে স্বরূপ তুমি জন্মজেয় হে জগত নির্ঘন্টক।
হে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ, নটরাজ বেশে বাজাও তব ডম্বুরু,
রুদ্র বীণার ঝঙ্কারে তব হোক শুরু দৈত্যকুলে দুরু দুরু।।
নাই বলে যারা তুমি, তারাই আজিকে দেবগুরু বৃহস্পতি
কেহ বা ইন্দ্রের ঐরাবৎ স্বঘোষিত কৃষ্ণ, চক্রধারী সারথি।
কংসাগার ধরিত্রী পরে এসো হে রুদ্রতাপস শিবম্‌সুন্দরম্
করি ত্রাণ ধর রূপ নটরাজ বেশে উদ্‌ঘাটিয়া সত্যম সুভাষম্।।

একাদশ অধ্যায়

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কী শুধু ভারতবর্ষের নেতাজী? বিশ্বরাষ্ট্র নেতাদের সঙ্গে তাঁর কিরূপ যোগসূত্র ছিল? সুভাষচন্দ্রের প্রভাব কতখানি ছিল তাঁদের উপর? ইংরেজরা কি সমগ্র ভারতবর্ষ করায়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছিল? বৃটিশের ১৭৭৬ সালের পরিকল্পনাই কি ভারত ও পাকিস্তান দুই ডোমিনিয়ান? ভারত ও পাকিস্তান কি দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র?

চলুন এবার আমরা ফিরে যাই সেই পাক-ভারত দৃশ্যপটে। যেস্থান থেকে এযাত্রা শুরু হয়েছিল আমাদের সেই বিন্দুতে। এখানে স্মরণীয় যে কাশ্মীরের কারগিল খণ্ডে যখন পাক-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ চলছে তখন যুদ্ধ চলাকালীন সময় আমরা দেখেছি সমগ্র পশ্চিমী জগতটাই একটু একটু করে ভারতের দিকে কিঞ্চিৎ পাল্লা ভারি করছে। যদিও তাদের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মুছে ফেলে এই ঝোঁকা নয়। সম্পূর্ণ প্রহেলিকার অবগুণ্ঠনে থেকেই তারা তা করেছে। (বর্তমান সময়টা হচ্ছে ১৯৯৯ সালের অগাষ্ট, সেপ্টেম্বর মাস)। সম্প্রতি খণ্ডযুদ্ধের পরই দেখা গেল পাকিস্তানের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আমূল পটপরিবর্তন। এই পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমী জগৎ আবার নড়েচড়ে বসল। তারা পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারী দিল যা গত ৫০/৫৫ বৎসরেও এমনটি তাদের ইতিহাসে ঘটেনি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন পাকিস্তানকে সতর্ক বার্তায় ভারতবৈরিতা ছাড়তে বললেন। ওদিকে বৃটেনেরও একই বক্তব্য। শুধু পশ্চিমী জগৎই নয়। এমনকি চীন, রাশিয়া প্রায় একই সুরের প্রতিধ্বনি করল। আমরা জানি, পৃথিবীবাসীও জানেন যে চীন দেশ পাকিস্তানকে আণবিক কৃতকৌশল দ্বারা সাহায্য করছে ভারতের বিরুদ্ধে। কিন্তু কারগিল যুদ্ধের সময় সেই চীন এমন একটা ভূমিকা নিল যাতে ভারতবৈরিতার জন্য তারে সরাসরি দোষী না হতে হয় ভারতের কাছে। তারপরই তার ঐ প্রহেলিকাময় ভূমিকা। কিন্তু একমাত্র রাশিয়াই ভারতের হয়ে পাকিস্তানকে যা বলার তা যথার্থ সত্যনিষ্ঠভাবে বলতে এগিয়ে এলো। চীনের যে এই দ্বৈত্তসত্তা বা কিছুটা দ্বিচারীতার ভূমিকা তার একমাত্র ঐতিহাসিক কারণ এই যে, সে কিছুতেই ভারত পৃথিবীর বুকে একটি শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করুক তা চায় না। কেননা এশিয়ার মাঝে চীনের অবস্থান তো কোনদিক থেকেই খাটো নয় বা নগণ্য

নয়। মানব সম্পদেই বলুন কি সামরিক ক্ষেত্রে বা প্রযুক্তি বিজ্ঞান কোনদিক থেকেই সে ছোট নয় বা নীচু নয়। অথচ ভারত তার পার্শ্ববর্তী একরাষ্ট্র সে পৃথিবীতে চীনের চেয়ে অধিকতর মর্যাদার বা সম্মানীয় হয়ে বিশ্বদরবারে স্থান পাক তা কোনভাবেই তার কাম্য হতে পারে না। অথচ তাদের দেশের পথদ্রষ্টা নেতা মাও-সে-তুং বা চৌ-এন-লাইদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে তাদের কোন অবস্থাতেই ভারতবৈরিতায় সহযোগিতা করা উচিৎ নয়। এই হচ্ছে চীনের অবস্থান।

আর আমেরিকা বা পশ্চিমী জগতেরও যে চিরকালীন প্রথা ভারতবৈরিতার তারও ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে। কিন্তু আপাতত তাদের ভারতকে চটানো চলবে না। কারণ ভারতবর্ষ আর যাইহোক কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীন দেশ তো বটেই। এমত অবস্থায় ভারত যদি পৃথিবীতে একটি শক্তি হয়ে আত্মপ্রকাশ করে তবে তা হবে আমেরিকার পক্ষে ভয়ানক দুঃশ্চিন্তার কারণ। তাই তারা এবং তাদের অনুগামীরা ভারতকে তাঁবে নয় অথচ হাতে রাখতে ঐ পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হলো। তাই দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীর অধিশ্বর আমেরিকা পৃথিবীর সেরা বাণিজ্যিক বাজার ভারতের পক্ষে কিছুটা গান গাইতে। এর পিছনে আরও জটিল কুটিল কারণ বিদ্যমান। যথা আমেরিকা খুব ভালোভাবেই আজ সচেতন যে কারগিল যুদ্ধ যদি একটি ঘোষিত স্বয়ং সম্পূর্ণ যুদ্ধে বা সার্বিক যুদ্ধে মোড় নেয় তবে সাম্রাজ্যবাদের চিরদিনের মৌরসীপাট্টা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে চলে যাবে। যদি পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি না থাকে তবে ভারতকে অচিরেই একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠিত শক্তি হিসেবে তাদেরও মেনে নিতে হবে। আর ভারতকে যদি সে সুযোগ দেওয়া হয়—ভারত সে সুযোগ পেলে, সে তার আপন সামর্থ্যেই পাকিস্তানকে কবজা করে অখণ্ড ভারত গড়তে সক্ষম। কাজেই কোন অবস্থাতেই ভারতকে বাড়তে দেওয়া যায় না। তাই বাধ্য হয়ে তারা ভারতীয় নেতাদের কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ লাইন পার না হওয়ার একাধারে অনুরোধ এবং একাধারে প্রশংসাপত্র ঢালাও ভাবে দিতে হল। অপরদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডেকে নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপার থেকে চলে আসতে বা ফিরে যেতে বাধ্য করল। ব্যাপারটা কিছুই নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীর সৃষ্ট কাশ্মীরের অবস্থান তথা ভারত-পাকিস্তানের স্থিতিশীল অবস্থাটাই তাদের মনেপ্রাণে কাম্য। বাবরি মসজিদ যারে বলা হচ্ছে তা যে বাবরি মসজিদ নয় একাদশ শতাব্দীর একটি প্রাচীন মন্দির তা প্রত্নতাত্ত্বিক রিপোর্টই বলছে। সাম্রাজ্যবাদীরা কাশ্মীরকে তাদের একটি আন্তর্জাতিক বাবরি মসজিদ রূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। বিশেষভাবে স্মরণীয় যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার পর বি. জে. পি. ঐ মসজিদ বলুন আর রামজন্মভূমি মন্দিরই বলুন তা ভাঙ্গতে চায়নি। কারণ ঐ মিনারের দিকে তারা তর্জ্জনী তুলে ভারতবর্ষে শুধু রাজনীতির খেলা খেলতে চেয়েছিলেন। ওটা ছিল বি. জে. পি.-ওয়ালাদের শুধুমাত্র রাজনৈতিক দাবার ঘুটি। অর্থাৎ জু জু দেখিয়ে ভয় দেখানো। তাই আদবানিজী অশ্রুপাত করেছিলেন।

সংবাদ পত্রে তা প্রকাশিত হয়েছিল।

ঠিক তেমনি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলোর কাছে কাশ্মীরটাও বাবরি মসজিদ। ঘটনার ধারাবাহিকতায় অদ্ভুৎ সাদৃশ্য। বাবরি মসজিদের প্রেক্ষাপটে দুইটি গোষ্ঠী একে অপরের দিকে তর্জ্জনী তুলে চোখ রাঙ্গাচ্ছে। গোষ্ঠী দুটি হিন্দু-মুসলিম। আর কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও এই একই চিত্র। কাশ্মীর নামক আন্তর্জাতিক বাবরি মসজিদটিরও দাবীদার ঐ দুই গোষ্ঠী। হিন্দু ও মুসলিম। এই দুইটি দাবির ক্ষেত্রেই তথ্যাতথ্যে সত্যাসত্যে সবই মৌলিকত্বের অধিকারী কিন্তু ভারতীয় হিন্দুরা। সে তত্ত্ব বিশেষজ্ঞমাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু সেই মৌলিক সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীরা আদৌ বিচার করতে প্রস্তুত নয়। তবে তো সমস্যাই মিটে যায়। তারা রাজনীতি করবে কোন ভূমির উপর দাঁড়িয়ে? এই হচ্ছে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাশ্মীরের অবস্থান। তাই কাশ্মীর প্রশ্নে আমেরিকা বা অন্যান্য পশ্চিমী গোষ্ঠীগুলোর ভারতের দিকে তাদের ইনক্লিনেশন বা ঝোঁক এবং তারে রক্ষাও করতে হবে তাদের সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে।

এবার আসুন আমরা দেখি আন্তর্জাতিক সামগ্রিক অবস্থানটা কী, এই উপমহাদেশের বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে। কারগিল খণ্ডযুদ্ধের পর এবং পাকিস্তানের নেতৃত্ব বদলের পর আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড ছাড়া রাষ্ট্রপুঞ্জও হুকুম জারি করল পাককর্তাদের প্রতি যে, পাকিস্তানে গণতন্ত্র ধ্বংস করা চলবে না। এবং সামরিক সরকারকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ মানবে না। এখানেই তার শেষ নয়। পুনরায় যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানে লোকায়ত সরকার প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন তার জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ খারিজ থাকবে। সেই সাথে জাতিপুঞ্জের সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা থেকে পাকিস্তান বঞ্চিত থাকবে। এতো গেলো জাতিপুঞ্জের হুকুমনামা। অন্যদিকে কমনওয়েলথ সংস্থারও একই প্রতিধ্বনি। এই বিশ্বসংস্থাও পাকিস্তানের সদস্যপদ বাতিল বলে ঘোষণা করল। এখন ১৯৯৯-এর নভেম্বর মাস চলছে। এখন পৃথিবীর সর্বত্র সর্বস্তরের মিডিয়াই গুরুত্ব সহকারেও ফলাও করে ঐ খবর প্রচার করছে। এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই সে কমনওয়েলথের সম্মানীয় সদস্য। জাতিপুঞ্জ ও কমনওয়েলথ এই দুই বিশ্বসংস্থাই পাককর্তাদের সঙ্গে ন্যূনতম সৌজন্যতামূলক প্রাথমিক আলোচনা পর্যন্ত করার প্রয়োজন বোধটুকু করল না। এইরূপ আচরণ তাদের বিগত অর্ধশতকের মাঝে এই প্রথম। এমনটা কি ভাবা যায়? কারণ পাকিস্তানের এরূপ ঘটনা এবারই প্রথম নয়। এর যে যথেষ্ট রাজনৈতিক তাৎপর্য বা গুরুত্ব রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যে বৃটেন এই পাকিস্তানের জনক সেও কিনা বেঁকে বসলো। এবং তারও একই সতর্ক বার্তা। বড়ই আজব কাণ্ড নয় কি?

এখানে স্মরণীয় যে বৃটেনের প্ররোচনায়ই একদিন ভারতবর্ষকে দ্বিজাতিতত্ত্বের চাতুরীর দ্বারা বিভাজিত করা হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাতে। এই বৃটেনই এশিয়ার বুকে পাকিস্তান নামক এক নবজাতক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। বৃটেনের

জাতীয় স্বার্থ বা সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থরক্ষার প্রয়াসে। এবং জন্মাবধি আজ ১৯৯৯ সালের শেষলগ্ন পর্যন্ত এই পাকিস্তান বৃটেন কর্তৃক ভারতবৈরিতায় প্ররোচিত হয়ে আসছে। অথচ এই বৃটেনও আজ ঘুরে দাঁড়াতে সচেষ্ট। এ তথ্য আজকের পৃথিবীতে সকলেই অবহিত আছেন। এতো গেল বৃটেন ও রাষ্ট্রপুঞ্জের কথা। রাষ্ট্রপুঞ্জের আরও যে কিছু করণীয় আছে আসুন সেই দিকটাও কি হচ্ছে আমরা তা একটু পর্যবেক্ষণ করি। তাতে কি পাই দেখা যাক। অপরদিকে ওসামা-বিন-লাদেনের ব্যাপারে তার বর্তমান আশ্রয়দাতা রাষ্ট্র আফগানিস্তান সরকার বা তালিবান গোষ্ঠীকে জাতিপুঞ্জ সময়সীমা বেঁধে নির্দেশনামা ঘোষণা করেছে যেন ওসামা-বিন-লাদেনকে অবিলম্বে রাষ্ট্রপুঞ্জের হাতে সমর্পণ করা হয়। উল্লেখ্য যে ওসামা-বিন-লাদেন হচ্ছে আজকের বিশ্বে মুসলিম কট্টর সন্ত্রাসবাদীদের দণ্ডমুণ্ডের মহামান্য কর্তা । এমন একটি লোকের বিরুদ্ধেই জাতিপুঞ্জের ঐ আদেশনামা আফগান সরকারের নিকট। এ সব চলতে চলতে অনেক আরও হয়ত ঘটনা ঘটবে যা কল্পনার বাইরে।

এসবই কি হচ্ছে পশ্চিমী গোষ্ঠীর একান্ত সদিচ্ছায়? লাদেনের ব্যাপারে তাদের সদিচ্ছা থাকতেই পারে বা থাকবেও। কারণ সে প্রত্যেকটি আমেরিকান নাগরিকের বিরুদ্ধে তথা মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে এক কথায় যুদ্ধঘোষণা করে রেখেছে। সে যুদ্ধঘোষণা করে রেখেছে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধেও। কিন্তু পাকিস্তানের ভারতবৈরিতা তো ঐ পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী দ্বারা লালিত পালিত এবং প্ররোচিত হয়ে এসেছে এতকাল। পাকিস্তান সৃষ্টির মূলেও তো তাদের একই মতলব কাজ করেছিল। এবং মৌনভাবে আজও তাদের একই মতলব কাজ করছে। এতদ্ সত্ত্বেও প্রশ্ন, তাদের পাকিস্তান নিয়ে যে বর্তমান অবস্থান অন্তত স্থূলদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে তা কি সত্যই তাদের আন্তরিক সদিচ্ছার প্রতিফলন বলা যায়? তাই জিজ্ঞাসা, এটাই কি যথার্থ সত্য? যাদের আসল পরিচয় বিশ্বগ্রাসী বিশ্বত্রাসি সাম্রাজ্যবাদী বলে, তবে তারা কি তাদের খোলসটা বা এতকালের তকমাটা এবার খুলে ফেলতে সত্যই উদ্যোগী হতে যাচ্ছেন? নাকি তাদের অর্থনৈতিক আগ্রাসন সাম্রাজ্য রক্ষার মতলবে একটি অভিনব নতুন চাল? নাকি এর পিছনে অন্য কোন গোপন ইঙ্গিত আছে? যাদের গোটা ইতিহাসে এ-জাতীয় সদিচ্ছার কোন নজির নেই, তারা কেন হঠাৎ সুবোধ বালকটি সেজে ভারতবন্ধু হয়ে উঠতে চাইছেন? এমনটা কি বিনাবাক্যে মানা যায়? তবু বলতে হয় পৃথিবীতে কোনকিছুই অসম্ভব নয়। তথাপি প্রশ্ন একথা কি আমাদের বা ঐ পশ্চিমী বিশ্বসাম্রাজ্যের স্বঘোষিত শ্বেতপ্রভুদের মুখে মানায় না শোভাবর্দ্ধন করে? এমনটি বলতে পারেন একমাত্র তিনি, যিনি আজ পৃথিবীতে একমাত্র অসম্ভবকে সম্ভব করার স্বর্গীয় মহাপুরুষ এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণব্রতে ব্রতী ও অধিশ্বর। অসম্ভবকে সম্ভব করার মহানায়ক ছাড়া কে হতে পারেন মাও-সে-তুং, চৌ-এন-লাই, স্তালিনদের দরবারের মধ্যমণি, উপদেষ্টা বা সাথী? কিম্বা বিশ্বত্রাসি ফুয়েরার দি গ্রেট হিটলার, মুসৌলীনি এবং জেনারেল তোজোর

দরবারে দাঁড়িয়ে তর্জ্জনী তুলে কথা বলার অধিকারী? বিশ্বমানব কল্যাণের অধিশ্বর মঙ্গলের দূত বলেই তিনি এমনটি করতে পেরেছেন বা পারেন। মাও-সে-তুং; চৌ এন-লাই বা স্তালিনদের সঙ্গে নেতাজীর এক সময়ে হৃদ্যতার যে বন্ধন কোন পর্যায়ে ছিল তা খোসলা কমিশনে সাক্ষ্য দেবার কালেই সাক্ষী S. M. Goswami র বয়ানেই পরিষ্কার। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এণ্টিকরাপসন বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ আমলা। আসুন খোসলা কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় তিনি কি বলেছেন তাঁর ভাষায়ই শুনি। তিনি খোসলা কমিশনকে বলেছিলেন—

"Mr. Goswami said that in a broadcast from Manchuria Netaji said that he would come to India by the end of 1947. Prof. Radhakrishnan had told the witness that he heard the radio broadcast of Netaji in 1946 in which he appealed to Jinnah not to divide India. In 1949 after a meetting between Stalin, Mao-Tes-Tung and Netaji at Deiran Netaji became Mao's adviser.—Hindusthan Standard).

হয়তো কারো প্রশ্ন থাকতে পারে এসব তথ্যের বা এসব কথার নিশ্চয়তা কোথায় বা কি? এর উত্তরে বলতেই হচ্ছে যে আপনাদের কারো কারো বিচারে সুভাষচন্দ্রের বর্তমান অবস্থান বা অস্তিত্বের কথাটাই তো একটা অলীক গালগপ্প ছাড়া কিছু নয়। আমরা যখন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠেই বারবার বলছি বলতে পারছি তাঁর অস্তিত্বের বর্তমান অবস্থান ও রূপরেখাটা চন্দ্র-সূর্যের মতই সুকঠিন বাস্তব তখন ঐসব প্রশ্নও সুভাষবাদীর কাছে অবান্তর। আরও অবাক বা চমকিত হবেন যখন শুনবেন যে সুভাষবাদী শুধু আমাদের মত কিছু মুষ্টিমেয় আমজনতাই নয়। ঐ বিশ্বখ্যাত বিশ্বনেতাদের মাঝেও অনেকেই সুভাষবাদী বা সুভাষপ্রেমিক। এমন দুই একটি নাম যথা, মাও-সে-তুং, চৌ-এন-লাই ইত্যাদি মহান পুরুষরা। তাঁর প্রমাণ স্বরূপ তাঁদের প্রদত্ত বয়ানেই খুব বেশী না হলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাবেন। হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে তাঁরা যে সুভাষ অনুরাগী তাঁর প্রমাণ এটা হতে পারে না বা যথেষ্ট নয়। তা সত্য, তাতে দ্বিমত নেই। কিন্তু এই মহান ব্যক্তিরা যে সুভাষচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা অবশ্যই সত্য। আর ভক্ত বলতে যা বোঝায় তা কি আমরাও ভক্ত? অথচ আমরা তো সকলেই সেই দাবীদার। তারই বা প্রমাণ কোথায়? যাইহোক এগুলো কখনও প্রমাণ করা যায় না বা সম্ভব নয়। এ জিনিষ মেনে নেওয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস সাপেক্ষমাত্র। এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ডই তা বলতে পারে।

সুভাষচন্দ্র যে একসময় ঐসব মহান নেতাদের বা বিশ্ববিখ্যাত মহারথিদের সঙ্গীসাথী বা উপদেষ্টা ছিলেন তার বহু তথ্যই এই নিবন্ধে আমরা দেখেছি। পরন্তু বলা যায় তিনি যে একদা স্তালিনের সোভিয়েত রাশিয়ায় ছিলেন এবং সেখানকার সরকারের সহযোগী হয়ে তিনি তাঁর আপনকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন তাতো বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলিকে লেখা জওহরলালের গোপন পত্রেই প্রমাণিত। যা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে

এই পুস্তকে পেয়েছি। এখানে প্রশ্ন, স্তালিন যদি সুভাষচন্দ্রের সহিত সহমত পোষণ না করতেন, তবে কি তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় বসে তাঁর পরিকল্পনা মাফিক সাইবেরিয়ার **'ওমাস্ক'** শহরে বসে আজাদ হিন্দ সরকারের অফিস চালাতে পারতেন? তিনিতো ১৯৪৫ সালে আত্মগোপন করে দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন। যা নাকি বর্তমান ভারত সরকারের প্রতিনিধি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। যদি স্তালিন তাঁকে সহযোগিতা না করতেন তবে বিশেষ করে তৎকালীন সোভিয়েত দেশে বসে কি এমন কিছু করা সম্ভব হতো? বিশেষ করে যে লৌহপিঞ্জরাবদ্ধ থাকার বাধ্যবাধকতা সে দেশে তখন ছিল সেই পরিমণ্ডলে? এ থেকেই যথেষ্ট প্রমাণিত ঐ দুই নেতার মাঝে পর্যাপ্ত পরিমাণে মত বিনিময় ও সাক্ষাৎকার ঘটতো। তা ছাড়া সুভাষচন্দ্র যে স্তালিনের সাহায্যে বার্লিন পৌছে ছিলেন তাও সত্য। এছাড়াও কথিত আছে যে, চীন, রাশিয়ার মধ্যে যখন তাদের উভয়দেশের সীমান্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে প্রায় যুদ্ধ বাঁধার মত উপক্রম হয়েছিল তখন সুভাষচন্দ্রের মধ্যস্থতায় উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষের মামলা মীমাংসিত হয়। এতো গেল সোভিয়েতের ব্যাপার। তারপর আসুন মাও-সে-তুং, চৌ-এন-লাইদের ছবিটা অর্থাৎ চীনের চিত্রপটটা একটু দেখা যাক। আসুন দেখি সেখানে কি হচ্ছে।

মাও-সে-তুং, চৌ-এন-লাইদের তো নিজ নিজ বক্তব্যই আছে সুভাষচন্দ্র সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে। ভারত-চীন সম্পর্কে মাও বা চৌ-এন-লাই কি বলেন আসুন তাদের মুখেই তাঁদের বক্তব্য শুনি। চৌ-এর উক্তি ছিল সুভাষচন্দ্র সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পর্কে ১৬ই জুলাই ১৯৭০ সালে প্যারিসে টি. ভি. সাক্ষাৎকারে,

"The Chinese Premier Mr. Chou-en-lai yesterday told French T. V.—viewers that the era when the American and Russian Supremacy could decide the fate of the world had ended for ever.....There is in the world to-day one super power who will force the Americans satellite armies to withdraw completely from the Asian countries. Mr. Chou said, around the world there is a fearless army whose strength no-one knows. They may be 60.00.000, or there may be 70.00.000 there may be millions who wear no common uniform speak no common tongue. But have common aim. There enemies are different, but their aim and mission are same. They are well trained, well organised and sheltered around the whole world. (Paris—16.07.70)

(জয়শ্রী পোষ সংখ্যা ১৩৮১, নেতাজী সংখ্যা বর্ষ ৩৯, সংখ্যা ৯, পৃষ্ঠা—৪৮৩)। ১৯৭০ সালের এই ফরাসী সাংবাদিক সম্মেলন সম্পর্কে স্বয়ং মহাকালের (নেতাজী তদন্তের খোসলা কমিশন যাঁর আসল পরিচয় জানতে 'জয়শ্রী' সম্পাদককে প্রশ্ন করেছিলেন) প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছিল চার বছর পরে 'জয়শ্রী' পত্রিকায়। সংখ্যা ৯, পৃষ্ঠা—৪৮২) মহাকাল (লেখকের ছদ্মনাম)। এঁদের অর্থাৎ এই সাংবাদিকদের

জিজ্ঞাসা করো। China-র Premier Paris-এ Press conference-এ বসে categorically বলেছিলেন নানা কথা—তাঁকে কেন এই উৎসাহী সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করছে না? China-র Premier কথায় কথায় বলেছিলেন, 'এই যে বিরাট organisation, এই যে বিরাট army, এতে ৬০ লক্ষ আছে, কি ৭০ লক্ষ আছে, সেটার প্রশ্ন হচ্ছে না, এই যে পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোক নিয়ে বিরাট কাজ চলছে, প্রত্যেক মেজর গভর্ণমেন্ট জানে এদের কাজ হল foreign domination থেকে মুক্তি দেওয়া। Foreign power-কে South-East-Asia থেকে হটে যেতে হবে। এই সংবাদ জেনেও ঐ সাংবাদিকরা চুপ করে আছেন কেন? কারণ জিজ্ঞাসা করো। Macnamara যতদিন পর্যন্ত Govt. of key position-এ ছিলেন ততদিন চুপ করেছিলেন। I. M. F. (International Monetary Fund)-এর চেয়ারম্যান হওয়ার পর বলেছিলেন so and so-র মৃত্যু সম্বন্ধে প্রচারিত সংবাদ সম্বন্ধে আমাদের Govt. categorically অন্য খবর জানে।

লণ্ডন ২৩শে মে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত আর একটি সংবাদের উদ্ধৃতি দিয়ে 'জয়শ্রীতে' (পূর্বোক্ত সংখ্যা, ৪৮৩ পাতায়) লেখা হয়েছে—

"In the Ninth Congress of the Chinese Communist Party. Mr. Mao-Tse-Tung declared that India is her ulterior brother.....This thorough change of Mao's mind is due to generous disposition of an "OUT LOOKER" who had been to China for a considerable period in exile". At the time of Chinese adversity when Mr. Mao-Tse-Tung became very bewildered "ON LOOKER" with his irresitable power helped him a lot to get main Chinaland freed from the clutches of imperialist block in a single play at dice."

"অর্থাৎ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেস অধিবেশনে শ্রী মাও সেতুং ঘোষণা করেন যে, ভারত তার অপ্রত্যক্ষ ভাই।.....মাও-এর মনের এই আমূল পরিবর্তনের মূলে আছেন একজন বহিরাগত দর্শকের উদার অবদান। যিনি বহুদিন ধরে চীনদেশে নির্বাসিত হয়ে আছেন। চীনদেশের গভীর সঙ্কটের দিনে যখন মাও-সে-তুং কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন, তখন এই দর্শক তাঁর অপ্রতিরোধ্য দুর্নিবার আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগে মাও-সে-তুংকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর করাল গ্রাস থেকে চীনের মূল ভূখণ্ডকে স্বাধীন করেছিলেন তাঁর পাশার একটি দানে।"

(যুগান্তর পত্রিকা : ১০.১২.৯০)

বলাবাহুল্য এসব ছাড়াও আমরা নেতাজীর সঙ্গে মাও-সে-তুং ও চৌ-এন-লাইদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন সম্মেলনেরও ছবি এই নিবন্ধে দেখেছি। এতদ্‌ ভিন্ন একথা কে না জানেন যে সুভাষচন্দ্র যখন হিটলারের দরবারে গিয়েছিলেন তখন তিনি হিটলারকে হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন যেন হিটলার সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ না করেন। এবং

একথাও সুভাষচন্দ্র স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর সোভিয়েত আক্রমণই হবে হিটলারের পতনের উদ্বোধন। ঘটেছিলও তাই। ইতিহাস একথা বলছে। ঐ ঘটনার জন্য অর্থাৎ তাদের ফুয়েরার দি গ্রেটকে তর্জ্জনী তুলে ঐরূপ সতর্ক বার্তা দেবার জন্য হিটলারের (অনুরাগীরা) বিশেষ একটি সেনাশাখা যারা 'গেস্টপা' নামে খ্যাত ছিল তারা সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু বলাবাহুল্য হিটলারের আদেশে সুভাষচন্দ্রকে ছাড়তে তো হলোই পরন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা ও দুঃখ প্রকাশ করতে হলো। এছাড়া আরও অনেক ঘটনা আছে। কিন্তু একটি ঘটনা না বললেই নয়। যথা, হিটলার একবার ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসকের শাসন প্রক্রিয়ার প্রশংসা করেছিলেন সে সময় হিটলারের সঙ্গীরা অর্থাৎ নাৎসী সংগঠন, সুভাষচন্দ্র বার্লিনে অবস্থানকালে তাঁকে একটি সম্বর্ধনা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তা গ্রহণ করতে রাজি হলো না। কারণ হিটলারের ঐ বৃটিশ ইণ্ডিয়ার প্রশাসকদের প্রশংসার জন্য। সুভাষচন্দ্র নিমরাজি হয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন নি। বরং তিনি সিংহবিক্রমেই তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন তাদের বিশ্বত্রাসি নেতা হিটলারকে যে, "Hitler is at liberty to lick British boots" হিটলার বৃটিশ জুতো চাটতে পারে, সুতরাং তাদের দেওয়া সম্বর্ধনা তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এমনি আর একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিটলার যে এক দোর্দণ্ড প্রতাপের বিশ্বত্রাসি ব্যক্তিত্ব তাতে সন্দেহ নেই এতটুকু। সেই হিটলার তাঁর জীবনীর একস্থানে বলছেন, "আমি জীবনে কোন অতিথিকে বা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কখনও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করিনি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু যেইমাত্র আমার কক্ষের দ্বারে পা রাখলেন তৎক্ষণাৎ আমি অবচেতনেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছি। এবং দরজার দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য করমর্দনার্থে হাত প্রসারিত করে দিয়েছি।" সুভাষচন্দ্র বসুর নাম মাহাত্ম্য যে-কোন জগতের, তা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্র কাউকে তোয়াজ করে চলেননি বা চলতে শেখেননি। তিনি কখনও সাহায্যপ্রার্থী হলেও, তিনি হচ্ছেন উন্নতশিরের বিশ্বের সেরা সিংহপুরুষ। কি শত্রু, কি মিত্র, কি বিশ্বত্রাসি প্রলয়ঙ্করী শক্তি, সকলেই তাঁর কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে বা হচ্ছে। এই হচ্ছেন সিংহপুরুষ সুভাষচন্দ্র। একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া তিনি যে কোন রথী-মহারথীর কাছে শির ঝোঁকাননি, এ তথ্য স্বতঃসিদ্ধ, এঁর কোন বিকল্প হয় না।

এমন ঘটনা আরও আছে। যেমন একটি ঘটনা টোকিওতে ঘটেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে টোকিওতে যখন বিশ্বযুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বিশ্বের মহামান্য বিচারপতিগণ সেই বিচারের কর্মে ব্যস্ত, তখন দেখা গেল যে মুহূর্তে বা যখনই নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রসঙ্গ এসেছে বা তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে তখনই ঐ সকল মহামান্য বিচারপতিরা তো বটেই এমনকি বৃটিশ-আমেরিকান বড় বড় গোয়েন্দা কর্তারা বা যে কেউ উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই নেতাজীর নাম উচ্চারিত হওয়ামাত্র 'হিজ এক্সেলেন্সি' বলে

মাথানত করেছেন বা বোডাউন হয়েছে। উল্লেখ্য এই বিচারপর্বের বিচারক সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ভারতখ্যাত কলিকাতার মহামান্য বিচারপতি ডঃ রাধাবিনোদ পাল। যিনি পরবর্তীকালে বিশ্বখ্যাত আন্তর্জাতিক বিচারপতিদের মাঝে অন্যতম একজন হয়েছিলেন। তিনিও ঐ আন্তর্জাতিক বিচারকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। ঐ তথ্য অবশ্যই আন্তর্জাতিক বিচারপতি ডঃ রাধাবিনোদ পালের। এইতো হচ্ছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আসল পরিচয়। যাঁর উপমা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আজও নেই।

তবু আমরা তাত্ত্বিক বিতর্ক ছাড়তে প্রস্তুত নয়। অবশ্যই যাচাই করা ভালো এবং প্রয়োজন। পরন্তু বাঞ্ছনীয় বটে। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা কে বা কারা এবং কাকে যাচাই করতে চাইছি। আদৌ আমাদের যাচাই করার যোগ্যতা আছে কিনা? কতটুকু যাচাই করার ক্ষমতা আছে? এসব প্রশ্ন কি আমরা এড়াতে পারবো? আর একটি জিনিষ আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তিনি হচ্ছেন যোগমার্গের শীর্ষে বিচরণশীল বিশ্বের এক অদ্বিতীয় মহামহিম। সুতরাং তাঁকে যাচাইয়ের পথ কিন্তু ঐটাই। অর্থাৎ আধ্যাত্মমার্গ। এবং তাঁর চলার বলার পথও ঐ অধ্যাত্মমার্গটাই। তিনি যখন যোগমার্গের উত্তুঙ্গ শিখরের একজন তখন তাঁর যাবতীয় ব্যাপারগুলোই যোগমার্গীয় পথের মাধ্যমেই প্রকাশিত হবে এবং পরিবেশিত হবে। এটাইতো স্বাভাবিক। তারচেয়েও বড় স্বাভাবিক হচ্ছে আমাদের গতিবিধির পরিধির মধ্যে ব্যাপারটা যদি না পড়ে বা না ঘটে তবে আমরা কি কোন অবস্থাতেই ঐসব কর্মকাণ্ড বুঝতে সক্ষম হবো? না মানতে প্রস্তুত? তা যখন নই। তখন অনেক কিছুই তো আপনার আমার দৃষ্টিভেদে আপেক্ষিক তত্ত্বের নামে উধাও হয়ে যাবে। এই যদি প্রকৃত অবস্থা, তবে এর সমাধান কি এবং কোথায়? তখন কিন্তু সমাধান একটাই। সেই সমাধান আপনি মানলে আমি মানবো না আবার আমি মানলে আপনি মানতে চাইবেন না। এতক্ষণ যাবৎ প্রতিবেদক অসংখ্য উদাহরণ দিয়েছেন প্রত্যেকটি ঘটনার প্রমাণ স্বরূপ। এবং ধন্যাত্মক ও ঋণাত্মক উভয়ভাবে বিচার করা হয়েছে। যাইহোক এবার আসুন আমাদের আলোচ্য বিষয়েই নজর দিই।

আজ প্রবাহমান বিশ্বরাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যা আপাত দৃশ্যমান তার পশ্চাৎভূমির দিকে তাকালে আমাদের শঙ্কাদ্বিধায় ভুগতেই হয়। যেহেতু আমরা ব্যবহারিক জগতের সাধারণ লোক। আমাদের অর্ন্তদৃষ্টি কোথায় যে আমরা প্রতিটি ঘটনার মূলে আধ্যাত্মিক ভাবনার কষ্টিপাথরের তুল্যমূল্য বিচারে সেখানে পৌঁছাব? কাজেই আমাদের সেখানে হাজির হতে গেলে ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমেই যেতে হবে। এটাই আমাদের নিকট স্বাভাবিক। তাই মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব। এক পা এগোলে তিন পা পিছোতে হয়। ঐ প্রবাহমান চালচিত্রের পিছনে যে অসম্ভবের কলাকার যাদুকর নেই একথা যেমন বলা যাচ্ছে না, আবার আছেন ঐকথাও দৃপ্তভাবে বলতে পারছি না। অন্তত আমাদের মানসিকতায়।

একথা সত্য। এই ব্যাপারটা গবেষণা সাপেক্ষ হলেও বোধহয় একটি কথা খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারা যায় যে, যারা ভেবেছিলেন পাকিস্তান কর্তা মোশারফ পারভেজ, আফগান কর্তা তালিবান প্রধান বলুন আর মানবতার শত্রু লাদেনই বলুন তারা অবাধে পৃথিবী নামক গ্রহের জনারণ্যে স্বর্ণমৃগয়া করে বেড়াবেন তারা একেবারেই ভুল করছেন। কারণ পাপের কলসী পূর্ণ না হলে বিধাতাপুরুষ ভুলেও কোনদিকে ফিরে দেখেন না কারো প্রতি। পুরাণ, মহাভারতে বা অন্য যেকোন ধর্মের ধর্মগ্রন্থে এর যথেষ্ট দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। কারণ বিধাতাপুরুষ কখনও কোন সাধারণ ব্যাপারে দৃষ্টি দেন না বা হস্তক্ষেপ করেন না। এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায় মহাভারতের শিশুপাল বধ। শিশুপালের একশত একটি অপরাধের পরই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করে অপরাধীর শাস্তির বিধান করেছিলেন। মাতুল কংসের বেলায়ও শ্রীকৃষ্ণ এমনটি করেছিলেন। এভাবেই তিনি সমাজ থেকে বিষবাষ্প নিষ্কাষণ করে নতুন মহাভারত সমাজ গড়ে দিয়েছিলেন। তাতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে সময়ই সর্বক্ষেত্রে সবকিছুর নির্ঘন্টক। নইলে সৎ বলেতো কোন কথাই আমরা অভিধানে পেতাম না। আর বিশ্বদর্শী জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা আপনার আমার মত পার্থিব স্বার্থের চুলচেরা বিচার করে তাৎক্ষণিক লাভালাভের অঙ্কের স্বার্থে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। কাজেই বিশ্বায়নের মত এক মহাকাণ্ডের পরিণাম ফল পেতে সময় দিতে হবে বই কি। আমরা বিচলিত হলেই তো মহাকালের নির্ধারিত সূচী পরিবর্তন হবে না। আমাদের মনোবাসনা পরিতৃপ্ত করার জন্য। মহাকালের ফলাফলতো আবহমানকালের বিশ্বপ্রবাহের জন্য। দু'দশজনের প্রত্যাশা বা আশা আকাঙ্খার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই বা থাকতে পারে না। এমনটি ভাবাই ভুল।

এই বিশ্বায়ন বিপ্লবের বিলম্বের কারণ সম্পর্কে যদি কেউ প্রশ্ন করেন আর কতকাল প্রতীক্ষারত থাকতে হবে? তবে উত্তরে আরও বলা যায় যুগাবতার বা যুগত্রাতারা অথবা যুগস্রস্টাদের কাছে বিশ, ত্রিশ বা পঞ্চাশ বছর কোন বিচার্য বিষয় নয়। এমনকি মহাকালের কাছে বা জাতীয় জীবনের নিরিখেও ওটা কোন ধর্তব্যের ব্যাপারই নয়। তাছাড়া চোখের দৃষ্টি বা জ্ঞানাঞ্জন যদি সঠিক ও স্বচ্ছ থাকে তবে বলা যায় বিশ্ববিপ্লব বা বিশ্বায়ন তো কোন কালেই শুরু হয়েছে। শুধু যথার্থ দৃষ্টি ও উপলব্ধি জ্ঞান থাকলে সমগ্র ছবিটাই আপনার আমার চোখের পর্দায় ভেসে উঠবে। আর তা না হলে কোনদিনই তা বুঝতে পারবো না আমরা। তবু এখানে একটি তথ্য উপস্থাপনা করলে বোধহয় তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এবার যে বিশ্বায়ন এটা কিন্তু শ্রীমদ্ সারদানন্দের বিশ্বায়ন বা নিয়তি নির্বন্ধের বিশ্বায়ন অর্থাৎ কালচক্রের খেলা। এবার যা হতে যাচ্ছে তা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের সেই মহান মানবিক তথা আধ্যাত্মিক যুগের রূপায়ণ বা প্রতিফলন। যার রাজপুরোহিত হলেন মহাঋত্বিক শ্রীমদ্ সারদানন্দজী মহারাজ। শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে ১৮৯৩ সালে স্বামীজী যে বীজটি বপন করেছিলেন তারই ফল এবার বিশ্ব পেতে চলেছে নেতাজী বা সারদানন্দজীর অসাধ্য সাধনায়। স্বামীজীর আর একটি ঐতিহাসিক বাণী আজ এখানে স্মরণ করার লগ্ন সমাগত। তিনি বলেছিলেন,

"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ"। অর্থাৎ এবার যে যুগ নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে তা হচ্ছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের যুগ বা বলা যেতে পারে আরও এককদম এগিয়ে তা হচ্ছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মহাপ্রবাহের যুগ। মানব ধর্মের সার্থক রূপায়ণের মহাযুগ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের স্বপ্নের যুগ আজ সাফল্যের দ্বারদেশে। তা অনুধাবন করতে হলে আমাদের বুঝতে ও জানতে হবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও সারদানন্দ প্রবাহটা কি, তবেই জ্ঞানাঞ্জনের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তা প্রতিভাত হবে। এবার যা ঘটতে যাচ্ছে তা ঘটবে ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে। তার লক্ষণ ও বিলক্ষণ চারিদিকে দেখা যাচ্ছে।

তবু যারা এটা বুঝবার জন্য মরিয়া অথচ সেই প্রজ্ঞাঞ্জনের দৃষ্টি মেলে ধরতে পারছি না কিন্তু মূল্যবোধের প্রতি আনুগত্যশীল তাঁদের স্থূল চর্মচোখে ও সাধারণ জ্ঞানে অনুভব করবার সুবিধার্থে এখানে একটি নৈয়ায়িক দৃষ্টান্ত নিবেদনের চেষ্টা করছি। আশা করি তাতে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত অনেকাংশে আপনার আমার কাছে পরিষ্কার হবে। এছাড়া বিশ্বকবির ভাষায় বলা যায়, 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে'। এমন আধার হলে তো কথাই নেই। সবসময় সবকিছু ইচ্ছা করলেই দেখা যায় না। তাই অর্ন্তদৃষ্টির একান্ত দরকার হয়। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির জন্য যে সাধনা, সে সাধনা কোথায় আপনার আমার মত সাধারণ দীনজনের? তাই বলতে হয়, আমাদের সাধ আছে বটে কিন্তু সাধ্য কোথায়? সে তো সুদূর পরাহত। যাক চলুন সেই দৃষ্টান্তটায়। ইঙ্গিত ব্যাপারে কোন উপকরণ পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক।

এবার আমাদের দৃশ্যান্তরে দূরদেশে সুদূর এক অতীত অধ্যায়ে যেতে হবে। ইংরেজ বণিকরা এদেশে ব্যবসা করার সনদ পেয়েছিল সেই ষোড়শ শতাব্দীতে মোঘল আমলে। আর ভারতবর্ষে ইংরেজরা রাজদণ্ড হাতে আবির্ভূত হয়েছিল ১৭৫৭ সালের পলাশীর প্রহসনের পর। ওই বৃটিশরা যে-ভারতবর্ষকে তাদের দখলে নিয়েছিল সেই ভারতবর্ষ কিন্তু তৎকালীন পূর্ণাঙ্গ ভারতবর্ষ নয়। এ সম্পর্কে পরবর্তীকালের এক **বৃটিশ সেনাপ্রধান অচিনলেকই স্বীকার করে বলেছেন, "সম্পূর্ণ ভারতবর্ষকে আমরা দখল করতে পারিনি। যতটুকু দখল করেছি তার প্রতি ইঞ্চে ইঞ্চে আমাদের কঠোর লড়াই করতে হয়েছে। তাই ছেড়ে যাবার আগে হিন্দু-মুসলমানের হিসেব নিকেশ করেই তবে যাব।" (যুগান্তর ৬/২/৯০)** তাই যাবার বেলায় সেই প্রশ্ন বৃটিশের কাছে চরম গুরুত্ব লাভ করল। এখানেই নিহিত আছে বৃটিশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চিরস্থায়ী ধর্মীয় গ্রেটবেরিয়ার রিফ তৈরীর ঘৃণ্য কুমতলবটা। বলাবাহুল্য ইংরেজরা ভারতে প্রবেশের সময় হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন ছিল না। তৎকালীন ভারতবর্ষের যে পরিব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি ছিল তার চৌহদ্দির সম্পূর্ণ অঞ্চল তারা রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত করায়ত্বে আনতে পারেনি। তাদের দখলিকৃত বৃটিশ শাসনাধীন অংশকে বলা হতো বৃটিশ ইণ্ডিয়া বা বৃটিশ ভারত। ইতিহাসের পাঠক ও ছাত্রমাত্রই তা জানেন। এই নামের কৃতিত্ব তাদেরই। এমন নামকরণের পিছনেও ইংরেজদের যথেষ্ট অপদৃষ্টি ছিল। তারা চেয়েছিল ভারতবাসীকে বৃটিশায়নে দীক্ষিত করা। কার্যত করেছিলও তাই। শুধু তাই নয়। ধূর্ত ইংরেজরা এও চেয়েছিল যাতে ভারতবাসী তাদের মাতৃভূমির পূর্ণাঙ্গ চেহারা বা

রূপরেখাটা চিরকালের মত ভুলে যায়। এভাবে কারসাজি করে স্তরে স্তরে যে তারা ভারতবাসীকে ক্রমে বৃটিশায়নে পর্যবসিত বা দাসত্বের মনোবৃত্তিতে বন্দী করেছিল গোটা জাতিকে তাতে সন্দেহ নেই। এভাবেই তারা আমাদের মন থেকে ভারতমাতার পূর্ণাঙ্গ অবয়বটা মুছে দিতে পেরেছিল। সেই কারণে আজও আমরা অনেকেই বা অধিকাংশই সেই আদি অকৃত্রিম ভারতবর্ষের সঠিক চেহারা বা পরিসীমা কি ছিল তা জানিনা বা বলতে পারবো না। তাদের সাফল্যের এটাই সেরা প্রমাণ। শুধু তাই নয়। এর পিছনেও ছিল সুদূরপ্রসারী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। এই দাসবৃত্তিতে বন্দী করার পরিকল্পনার আরও যে প্রমাণ তা হচ্ছে ভারতীয়দের মধ্যে তৎকালে ইয়ং ইণ্ডিয়ান আন্দোলনের প্রসার লাভ। এবং সেই সূত্র ধরেই ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন এবং স্বদেশীদের প্রতি ঘৃণা ও বৈরিতা। তারচেয়ে সার্থক প্রমাণ আমরা পেয়েছি স্বদেশী আন্দোলনের সময়। তাতেও সান্ত্বনা পাওয়া যেতো যদি ঐ দাসত্বসুলভ মানসিকতাটা স্বাধীনতার আন্দোলন পর্যন্তই সীমিত থাকতো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরও সেই গোলামীর উদগ্র বাসনায় আজও আমরা অনেকে উদ্‌গ্রীব। এই শ্রেণীর মাঝে শুধু সাধারণরাই আছেন তাই নয়। এদের ভিতর রাষ্ট্রীয় পুরুষ কর্মকর্তা থেকে অতি অসাধারণ এমনকি তথাকথিত অনেক মহাজনরাও আছেন, যারা অনেকেই আজও বৃটিশের চরবৃত্তিতে লিপ্ত।

স্মরণীয় যে, ইংরেজরা বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড করতলগত করেছিল ১৭৫৭ সালের পর। অথচ ১৭৫৭ সালের পর গঙ্গা, সিন্ধু, যমুনা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বৃটিশরা তাদের রাজত্বের প্রথম পর্যায়ে যেটুকু ভারতবর্ষ দখল করেছিল তা অখণ্ড ভারতবর্ষের বিশালত্বের তুলনায় মাত্র সামান্য অংশ। তথাপি দেখা গেল ১৭৭৬ সালের বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাটলাসের ২৬তম সংস্করণে ধুরন্ধর ইংরেজদের কী ভয়ঙ্কর বিপদজনক পরিকল্পনা। তখনই তারা পরিকল্পনা করেছিল যে, যখন যেদিন যে অবস্থাতেই তাদের ভারতবর্ষ ছাড়তে হোক না কেন তখনই তারা ভারত সাম্রাজ্যকে দ্বিধা বা ত্রিধা বিভাজনে ভাগ করে ভারতবাসীকে জাতিতত্ত্বের বৈরিতায় চিরদিনের মত পঙ্গু করে যাবে। এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের যাতে স্বার্থ কিছুতেই ক্ষুন্ন না হয় সেই ব্যবস্থাটিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ন্যায় পাকা করে যাবে। আজ ভারতবর্ষের অর্থাৎ সমগ্র উপমহাদেশের যে চিত্র তাতে বলা যায় ঐ বৃটিশ দর্শন বা ফিলজফি সম্পূর্ণ সাফল্য মণ্ডিত। এ সত্য শুধু সমগ্র উপমহাদেশেই নয় এমনকি প্রতিটি খণ্ডিত দেশের ভেতরকার চিত্রও তাই। ইংরেজদের আগমনে ভারতবাসী হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে কিন্তু তারা যে ভারতবর্ষের আবহমানকালের মূল মৌলিকত্বে চূড়ান্ত কুঠারাঘাত করে ভারতীয় জাতিটাকে চিরকালের মত পঙ্গু করতে সক্ষম হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তারই পরিণতিতে আজ আমরা ভ্রাতৃদাঙ্গায় লিপ্ত। ১৭৭৬ সালের তাদের পরিকল্পনার সূত্র ধরে বলা যায় বর্তমানে যে বিভাজিত রৈখিক চিত্র মানচিত্রে রয়েছে ঠিক তেমনটি সেই সুদূর অতীতে তারা স্থিরীকৃত করেই রেখেছিল। এ সম্পর্কে সম্প্রতিকালের বৃটিশ সেনাপ্রধান অচিনলেকের ০৬.০২.৯০ তারিখের যুগান্তরে প্রকাশিত

বক্তব্যেও এর সমর্থন পাচ্ছি আমরা। বলাবাহুল্য সেই মানচিত্র পাওয়া আজ দুষ্কর। তবু যদি কারো তা দেখবার সৌভাগ্য হয় তবে তিনি তো বটেই এমনকি যেকোন দেশবাসীই অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও স্তম্ভিত না হয়ে পারবেন না। না বন্ধু, এ কোন মনগড়া কথা নয়। সেই মানচিত্রে আজকের ভারতবর্ষের যে কয়টি খণ্ডচিত্রে বিভাজিত দেশের অবস্থান তার অবিকল রূপরেখা দেখানো রয়েছে ঐ বৃটিশকৃত ১৭৭৬ সালের মানচিত্রে। এই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের চেহারা বা তাদের প্রখর বাস্তববোধ ও দূরদৃষ্টির পরিচয়। এই পটচিত্র থেকে আমরা পর্যালোচনা দ্বারা দেখছি বৃটিশের ১৭৭৬ সালের তাদের মাস্টার পরিকল্পনার বা প্রস্তাবের রূপায়ণ ঘটেছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট।

এই বৃটিশরা নাকি একটি সুসভ্যজাতি। তাদের সুসভ্যতার নিদর্শনের তত্ত্ব হিসাবে এদেশে তারা যা বপন করে রেখে গেছে তার পরিণতি ফল তারা অবশ্যই সুদূর আটলান্টিকের বুকে বসেও নিশ্চয়ই উপভোগ করছে। কিন্তু ভারতবাসী হিসাবে আমরা কি তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবো? নাকি অতি তাচ্ছিল্লের দৃষ্টিতে তাদের দেখবো? এই কি সভ্যতা ভব্যতার মাপকাঠি? একেই বোধহয় বলে পাশ্চাত্য সভ্যতা? একটি সুসভ্যলোকের বা একটি সুসভ্যজাতির কি থাকা উচিত মূল উদ্দেশ্য? নিশ্চয়ই অপরকে সুসভ্য গড়ে তোলার জন্য সাহায্য করা। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা বা বৃটিশ সভ্যতা যদি তাই হয় তবে বলতেই হয় ধিক্ ধিক্ শতধিক্ ঐ সভ্যতাকে এবং ঐ সভ্যতার তকমাধারী সুসভ্য ইংরেজ জাতিকে। সুভাষচন্দ্র বসু যথার্থই বলেছিলেন মনুষ্য জাতির মাঝে ঐ বৃটিশরা হচ্ছে ধূর্তশ্রেষ্ঠ এবং খলশ্রেষ্ঠ। বলাবাহুল্য সুভাষচন্দ্র প্রদত্ত অভিধার চেয়ে সভ্যভাষায় তাদের আর কি উপমায় ভূষিত করা যায় বলুন?

আসুন, আমরা আবার আমাদের প্রতিপাদ্যে ফিরে যাই। আমাদের প্রসঙ্গ ছিল ১৭৭৬ সালের বৃটিশের পরিকল্পনা ও সেই প্রেক্ষাপট। ভাবুন এমন যে সুদূরপ্রসারী তাঁদের পরিকল্পনা তারে তাঁদের রূপ দিতে বা বাস্তবায়িত করতে কত সময় লেগেছিল! বৃটিশরা সেদিন প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বিশ্বের প্রবল প্রতাপান্বিত এক অপ্রতিহত অধীশ্বর। বলতে গেলে তাঁদের রাজত্বের প্রায় সিংহভাগ সময়টাই লেগেছিল ঐ রাজনৈতিক কু-মতলবকে কার্যে পরিণত করতে। এমন যে বিশাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি সেও পূর্ণাঙ্গ ভারত তাঁদের কবজায় আনয়ন করতে পারেনি। এত সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়াও। আর তাঁদের মাস্টার পরিকল্পনার কথাটাও ভাবুন। এই যদি হয় অবস্থা ঐ মহাশক্তিধর বৃটিশের, তবে এক নাঙ্গাযোগীর পক্ষে কপর্দকশূন্য অবস্থায় সমগ্র বিশ্বের সমস্ত মানবতা বিরোধী শক্তিকে বিনষ্ট করে এবং আপন কণ্ঠে সকল বিষবাষ্প ধারণ করে এবং বিশ্বমানবের জন্য একটি মৌলিক অনুশাসন ব্যবস্থার সার্থক রূপায়ণ করে এক ঐক্যবদ্ধ বিশ্বায়নে পৌঁছানো কি সামান্য মুখের কথা? না কোন যাদু করের যাদু? এইরূপ এক অভূতপূর্ব তথা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের বহির্ভূত কর্মসূচীকে কাজে পরিণত করার কথা বাদ দিন। এমন এক অসম্ভব ভাবনায় ভাবিত হওয়া বা কল্পনা করাও কি মাটির পৃথিবীর মানুষের

কাছে অলীক নয়? কাজেই বলতেই হয় রক্তমাংসের জৈবিক ভাবনার মানুষের কাছে এ যে ভ্রান্তিবিলাসেরও ভ্রান্তিবিলাস। তাও বোধহয় কম বলা হলো। এমন স্বপ্নবিলাসীকে কোন অবস্থাতেই স্বাভাবিক বলা যায় না নিশ্চয়ই। এমন স্বপ্নবিলাসী যে বা যিনিই হন না কেন তিনি কি মর্তবাসী? তিনি কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কেউ? এর উত্তরে বলা যায় যে, তিনি তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়ই পরন্তু বলা ভালো মর্তবাসী হয়েও তিনি অতীন্দ্রিয় জগতের এক রাজ চক্রবর্তী। সে কারণেই তিনি মানব অবয়বধারী হয়েও এমন স্বপ্নই শুধু দেখেন না, তিনি সেই সঙ্কল্প যেমন করেন বা করছেন তেমনি তারে দৃঢ় পদক্ষেপে এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন অপ্রতিহত গতিতে অথচ সুনিশ্চিত ভাবে। এরই নাম নেতাজী সুভাষ।

উল্লেখ্য এমন একটি স্বর্গীয় পবিত্র ভাবনায় ও স্বপ্নে একদিন বিভোর ছিলেন বিশ্বরাজগুরু স্বামী বিবেকানন্দ। এই ছিল স্বামীজীর মানবিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বের স্বপ্ন। তাই তিনি ১৮৯৩ সালে শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বিশ্ববাসীকে মহাসমন্বয়ের বাণী দিয়েছিলেন। **তাঁর বাণীর মূল সুর ছিল, তাঁরই ভাষায়, 'বিবাদ নয়, সহায়তা, বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ, মতবিরোধ নয় সমন্বয় ও শান্তি।'** এই অবিস্মরণীয় বাণী ও স্বামীজীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্র কঠোর সাধনব্রতে ব্রতী। এমন একটা কাণ্ড যা বিশ্বের মানব ইতিহাসে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ ছাড়া কেউ মানবিক সত্তায় ভাবতে সক্ষম নয় বা ভাবতে পারেনি। এমন যে একটা বলতে গেলে সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় ব্যাপার তা যেন আমরা অক্লেশে অবলীলায় হজম করে বসে আছি এমন একটা ভাব দেখাই। আর প্রশ্ন করি আর কতদিন ধৈর্য ধরতে হবে? তাই না বলে উপায় নেই যে, এহেন একটা ইন্দ্রায়াতীত যে ঘটনা ঘটতে চলেছে বা যিনি এমন কাণ্ড ঘটাচ্ছেন তাঁকে একটু সময় দেবেন না? তাও সান্ত্বনা পাওয়া যেতো, যদি এই পরিকল্পনার রূপকার ও রচয়িতা হতেন কোন সাম্রাজ্যের অধিশ্বর। হয়ত কেউ বলবেন যে তিনি অবশ্যই ইন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয় সকল সাম্রাজ্যেরই অধিশ্বর। কিন্তু মনে রাখতে হবে স্বর্গীয় উপলব্ধির রাজ্য আর রূঢ় বাস্তব মাটির পৃথিবীর অধীশ্বর আশমান জমিন ব্যবধান। দুটোকে এক সূত্রে গাঁথলে চলবে না।

যাক এসব বিতর্ক। আসুন, এবার দেখি এ ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের নিজস্ব কোন আলোচনার সূত্র পাওয়া যায় কিনা। সুভাষচন্দ্র যখন নেতাজী অধ্যায়ে অবস্থান করছেন তখনকার নথি ঘাটলে দেখা যায় তিনি বলেছেন, বিশ্বকে প্রত্যেক জাতির কিছু না কিছু দেবার থাকে। এই আলোয় সুভাষচন্দ্রের স্বীয় প্রদত্ত উক্তি নিয়ে চর্চা করলে আমরা যা পাই তা হচ্ছে—

অন্তর্ধানের পূর্বে নেতাজীর শেষ বক্তৃতা ১৯৪৪ সালে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে। নেতাজী তাঁর রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে বলেছেন, "আমি বলেছিলাম যে

ভারতবর্ষে আমাদের কাজ হবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত মতবাদগুলির একটি সমন্বয় গড়ে তোলা।.....কোন মতবাদ মানব প্রকৃতির চূড়ান্ত স্তর একথা বলাই মূর্খতা। দর্শন শাস্ত্রের যেকোন ছাত্রই স্বীকার করবেন যে মানব প্রগতি কখনও থেমে যেতে পারে না। বরং অতীতের জাগতিক অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের একটি নতুন মতবাদ সৃষ্টি করতে হবে। এই কারণে.....প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদগুলোর একটা সমন্বয় সাধন করবো। এবং সবার সব ভালো দিকগুলি নেবো"। (টোকিও বক্তৃতা ১৯৪৪)। নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই বক্তৃতায় যা বলেছেন সেটা যে স্বামীজীর শিকাগোতে প্রদত্ত বাণীরই রূপান্তরিত অনুরণন তা সহজেই অনুমেয় এবং পরিষ্কার। আজ যে তিনি অর্থাৎ নেতাজী সুভাষ তাঁর টোকিও বক্তৃতাকেই সার্থক রূপ দেবার ব্রতে ব্রতী তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বামীজীর যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী ও সুর, সে সুরকেই নেতাজী আজ সুরারোপিত করার মহান সাধনব্রতে নিমগ্ন।

১৯৩৩ সালে সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারত অত্যন্ত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে"। এর প্রেক্ষিতে বলা যায় সুভাষচন্দ্রই হচ্ছেন আজ এই নতুন সমন্বয়বাদ ও সমন্বয় বাণীর মহান রূপকার এবং গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ভূমিকা পালনকারী। আমরা জানি সেই জন্যই তিনি শ্রীমদ্ সারদানন্দজীর ছদ্মবেশে সেই কঠোর সাধনায় আজ নিমগ্ন। যথারূপে যথাসময়ে যথাস্থানে সেই নবারুণের আলো বিশ্ববাসী দেখতে পাবে এবং তাতে উদ্ভাসিত হবে। যদিও ..... যথাসময়ে সেই আলো দীর্ঘদিন যাবৎই তিনি বিচ্ছুরণ করে জগতবাসীর কল্যাণব্রতে ব্রতী রয়েছেন, তা অচিরেই বুঝতেও প্রত্যক্ষ করতে পারবো আমরা। সাধারণত আমরা সকলেই বলে থাকি দিতে হবে, করতে হবে ইত্যাদি। এই সবই কিন্তু আদেশসূচক উক্তি। এইরূপ আদেশসূচক উক্তির মধ্যেই কিন্তু আমাদের সব কর্তব্য শেষ। দায়িত্বও শেষ যেন মহান বাণীদাতা! কোন কিছু দিতে বা করতে হলে যে স্তরে যখন আমাদের পৌঁছানো দরকার, তার সাধনা কি আমরা কেউ করি? বা প্রচেষ্টিত হই? আপনার আমার দ্বারা কোন কিছু কাজ হবে কি না সে অধ্যায় তো পরের ব্যাপার। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবনের ইতিহাস বলছে, তিনি যেদিন যে কথা বলেছেন, সেদিন থেকেই সেই কথাকে বা সেই কার্যকে, ভাবনাকে রূপ দেবার জন্য কখনও অপরের দাক্ষিণ্যের অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করেন নি। নিজেই আপন সাধনবলে সেই স্তরে নিজেকে প্রয়োজনীয় ভাবে উত্তরণ ঘটিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়িত করেছেন। কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ সকল ক্ষেত্রেই তাঁর এই সাক্ষ্য। চর্মচোখে আমরা যা অনেকেই দেখেছি অথবা জেনেছি তদ্রুপ একটি উদাহরণ হচ্ছে ১৯২৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিকে গার্ড অব অনার দেবার জন্য যে বেঙ্গল ভল্যান্টিয়ার্স বাহিনী গঠন করেছিলেন কালে তাই হয়েছিল তাঁর হাতে আই. এন. এ. বাহিনীতে রূপান্তরিত। তা দ্বারা তিনি বিশ্বশক্তিজোটের সঙ্গে মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। যার ফলশ্রুতি ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতা অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের

১৫ই আগষ্ট বৃটিশের ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ। ঠিক তেমনি ১৯৪৪ সালের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে কথা বলেছিলেন তার রূপ দেবার জন্য এখন কঠোর তপস্যায় মগ্ন এবং সেই কর্মসূচীকেও সার্থক বাস্তবায়নে রত। এই হচ্ছেন বিশ্বশাস্ত্রের রাজপুরোহিত নেতাজী সুভাষ। আরও বলা যেতে পারে প্রচলিত ঘড়ানার বা ভাবধারার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ব্রতের যে বিশ্বায়ন বা নতুন প্রশাসনের ব্যবধান তা অনুধাবন করতে বা বুঝতে হলে স্বামীজীর ভাষায় বুঝতে চেষ্টা করাই হবে যথার্থ শ্রেয়। স্বামীজী বলেছেন,

"রাজনীতিক ও সামাজিক পরিবর্তন যতই হোক না কেন, মনুষ্য জীবনের দুঃখকষ্ট কিছুতেই দূর হইবে না। কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করিতে পারিলেই সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট ঘুচিবে। যতই শক্তি প্রয়োগ, যতই শাসন প্রণালীর পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি করনা কেন, কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই কেবল অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে।"

এমন একটি অনুশাসন তত্ত্ব দেবার জন্য সমগ্র পৃথিবীর মানব সমাজকে সুসংগঠিত করার কাজে সুভাষচন্দ্র যে আজ এক সুকঠিন তপব্রতে ব্রতী ও নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছেন সে তথ্যচিত্রই আমরা এই রচনার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত সর্বত্র দেখে এসেছি। তাই বলা যায়,

'মিথ্যার ধুম্রজালে অকালে
হারিয়ে বোধজ্ঞান সকলে
যতই করিনা সরবে গরব
নাহি ক্ষমা এই হীনতার।
আসিবে সে মহাকাল হাসিবে হাসে
ছিন্ন করি দুর্গম আঁধার।
মহাঋত্বিকের মহাপূজার
লগন সমাগত ঐ দ্বার।
ভেবে থাকো যে যতই তাঁরে
মন-মানসে গৈরিকে লীন,
তবু মাতৃ পূজার মহাশক্তির
সে-ই যে সত্তা ঋত্বিক স্বাধীন।
নবারুণ বেশে আসিবে সে
রূপ দিতে সুকঠিন প্রতিজ্ঞার।
ধ্বনিছে তাই ধ্বনি স্বাগত
তুরি ভেরী যত বিধাতার।'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলাই হবে শ্রেয়—"দিন আগত ঐ"।

দ্বাদশ অধ্যায়

নেতাজী সুভাষচন্দ্র হচ্ছেন প্রতিজ্ঞায় ভীষ্ম, লক্ষ্যভেদে মহাভারতের বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, এবং বিশ্ব-শকট নামক মহারথ চালনায় সারথি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বটাই যেন আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কাছে তাঁর বিচরণভূমি কৈলাসধাম হিমালয়। তিনিই আজ বিশ্বত্রাতা নীলকন্ঠ।

এ পর্যন্ত যত সুভাষ সংশ্লিষ্ট তথ্যাতথ্য আমরা দেখলাম বা পেলাম আসুন সেই আলোয় পৃথিবীটাকে একনজর পরখ করি। আজকের পৃথিবীর দিকে একনজর অবলোকন করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মহাকালচক্র আপন গতিতেই তার শূন্য ডিগ্রি অতিক্রান্ত প্রায়। তাই যদি হয়, তবে তার নতুন যাত্রা তো অবধারিত। বিশ্বপরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে সেই সুমহান কর্মে কোন যুগস্রষ্টা তাঁর সাধনায় মগ্ন আছেন। আজন্মকালের নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবাদ ও কর্মপরিধি লক্ষ্য করলে এটাই প্রতিভাত হয় যে তিনিই আজ ঐ মহাকালের দূত। আর মহাকালের দূত ছাড়া কি বিশ্ববিপ্লব, বিশ্বায়ন বা প্রচলিত ঘড়ানার পরিবর্তে মানব জাতিকে নতুন অনুশাসন দেবার কথা বা রূপ দেবার কথা কেউ ভাবতে পারেন না সম্ভব? না ভাববার কথা?

যাঁরা তাদের আপন জীবন চালাতেই শতচ্ছিন্ন হয় বা যে রাষ্ট্রনায়ক একটি রাষ্ট্র চালাতেই বা রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য পরিচালনা করতেই ত্রাহি ত্রাহি করেন এবং শ্রীমধুসূদনের স্মরণাপন্ন হন দিনে দশবার তাঁর কাছে ঐ জাতীয় স্বপ্ন তো কল্পলোকের গল্পের চেয়েও অলীক। কাজেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হলে কিম্বা কিছু পেতে হলে সামগ্রিকভাবে তবে ঐ মহাকালের যে দূত তাঁর স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি কি? সুতরাং সমগ্র চিত্রপটটাই ঐ মহান মহাকালের দূতের প্রক্ষিপ্ত আলোকে দেখতে হবে এবং বিচারও করতে হবে। তবে যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। আসুন আমরা সেই আলোর রশ্মিতেই আজকের বিশ্বসংসারের বা বিভিন্ন বিশ্বসংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ডের চিত্রপটটা পরিবীক্ষণ করি। তাই দৃঢ় বিশ্বাস, এখানেই নিহিত আছে সকল রহস্যের মূল ও তার যথার্থ উত্তর। তবে দীনের বিনম্র চিত্তের একটি প্রশ্ন আছে আপনার নিকট। আশা করি অপরাধ নেবেন না এই অভাজনের বেয়াদপির জন্য।

বলুনতো পৃথিবীতে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত মনুষ্য ইতিহাসে যখনই কোন সামাজিক বিপ্লব, সার্বিক বিবর্তন বা ব্যাপক ভাঙ্গাগড়ার প্রশ্ন এসেছে তখন কি আপনার

আমার মত কোন সাধারণ প্রাকৃতজন দ্বারা সেই কর্মযজ্ঞ সমাধা হয়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে, তবে তা যে অবশ্যই দেহধারী কোন মানুষে করলেও করেছেন কোন যুগমানব বা যুগদর্শী। একথা কি নতুন কিছুনা নতুন করে বলার প্রয়োজন আছে? যথা, শ্রীরামচন্দ্র থেকে শুরু করে মানুষ শ্রীকৃষ্ণ, যিশু, বুদ্ধ কিম্বা মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক পয়গম্বর বা নবী পর্যন্ত। এমনকি অবতার বরিষ্ঠায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর মানব সমাজ যখনই কোন মহাবিপর্যয় বা যুগান্তরের দিকে পা বাড়িয়েছে তখনই দরকার হয়েছে একজন যুগমানব বা দ্রষ্টাপুরুষের, তাই নয় কি? এ সত্য বা এই ধ্রুবতত্ত্ব কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন? এতো ইতিহাসের স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব। ইতিহাস বলছে। এসব যে কারো মনগড়া নয় তাতো সকলেই জানেন। আরও দেখা যাচ্ছে ঐসব ইতিহাস পুরুষদের নিজ নিজ বিশালত্বে ও মহিমার গুণে তাঁরা নিজেরাই আজ কেউ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান যিশু বা খ্রাইস্ট আবার কেউবা নবী বা পয়গম্বর হয়ে জগতে পূজিত হচ্ছেন। এতেই পরিষ্কার যে, সাধারণ মানুষ দ্বারা বা প্রাকৃতজন দ্বারা কখনও বিশ্বমানব সমাজের সার্বিক পটপরিবর্তন ঘটেনি বা ঘটতে পারে না কোন অবস্থাতেই। তেমনি আজকের বিশ্বসঙ্কটের প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে যে আজ মানব সভ্যতার একটি নতুন অনুশাসন অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর এই নব-অনুশাসন দিতে পারেন একমাত্র সেই মার্গীয় স্বর্গীয় যুগপুরুষ যিনি তেমন কোন মহাজন।

এই নিবন্ধে যেটুকু সুভাষতত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশিত হয়েছে বা আলোচিত হয়েছে তাতে কিন্তু সুভাষতত্ত্ব ছিটেফোঁটাই আলোকপাত সম্ভব হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ সুভাষতত্ত্ব ও তথ্য মানব সমাজ মহাকালের বিস্তীর্ণ পরিধিতে কখনও পরিজ্ঞাত হতে পারবে কিনা তা একমাত্র সুভাষচন্দ্রই বলার অধিকারী। আর বলতে পারেন যদি তিনি স্বয়ং সেই ব্যবস্থা করেন তবেই তা পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব পৃথিবীর পক্ষে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, তাতেও সুভাষ জীবনের পূর্ণাঙ্গ সচিত্র তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে কিনা। বোধহয় তা অজ্ঞাতই থেকে যাবে। কারণ তাঁর শতাধিক বর্ষের মহাজীবনপঞ্জির প্রতিটি পলের কথা যে, কেউ অনুসরণ ও অনুধাবন করতে পারবে না সেটাই স্বাভাবিক। এছাড়া সুভাষ জীবনের যে অবিস্মরণীয় গোপনীয়তা তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে পালন করেছেন বা করছেন তাতো বিশ্বমানব ইতিহাসে অদ্বিতীয়। সে কথা আজ সমগ্র পৃথিবীর কাছেই সুপরিবিদিত। কাজেই এহেন জীবনবাদের যে সুমহান মহাআধার, তাঁর তথ্য যে, কোনদিন তিনি আপন মুখে কাউকে প্রচার বা বর্ণনা করবেন না সে কথাই স্বতঃসিদ্ধ ধরে নেওয়া যেতে পারে অনায়াসে। এমন প্রত্যাশাই বোধহয় ঠিক হবে। কাজেই অনুমান সাপেক্ষ হলেও বলা যেতে পারে এই অন্তহীন মহাজীবনের জীবন আলেখ্য আমরা সহসাতো নয়ই এমনকি কোনদিনই কোনভাবেই পাচ্ছি না বা পাবো না ধরে নিতে পারি। এতদ্ সত্ত্বেও এর মাঝে একটি "কিন্তু" রেখে আসুন দেখি এই মহাজীবনের

পূর্ণাঙ্গ তথ্যপঞ্জি পাওয়া যেতে পারে কিনা কোন ভাবে।

ধরুন পৃথিবীর মানব সভ্যতা মহাভারত কথিত ও মহাভারত গ্রথিত ঐ বিশ্বসেরা ঋষি কবি ও সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ দার্শনিকবর ব্যসদ্বৈপায়নকে পৃথিবী পুনরায় লাভ করলো যেকোন কারণেই হোক, তবে পৃথিবী সুভাষ জীবন আলেখ্য যুগ-যুগান্তের সাধনায় পেলেও হয়তোবা পেতে পারে। অবশ্যই এসব কল্পনাশ্রিত কল্পনা। **এমন যে সুভাষচন্দ্র তিনি যে প্রতিজ্ঞায় ভীষ্মদেব, লক্ষ্যভেদে মহাভারতের বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, আবার বিশ্ব-শকট নামক মহারথ চালনায় স্বয়ং সারথি শ্রীকৃষ্ণ তাতে কি সন্দেহ আছে?**

এ পর্যন্ত যা কিছু সুভাষতত্ত্ব ও তথ্য এই সমগ্র রচনার মাধ্যমে পাঠ করে পাওয়া গেল তাঁর ঐ স্বর্গীয় শ্রীশ্রীচরণানুরাগী হতে গিয়ে তারই কিঞ্চিৎমাত্র এখানে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বরং বলতে পারি তাঁর অনন্ত কর্মকাণ্ডের সপ্তসিন্ধুর ছিটেফোঁটা বারিকণা যা সুভাষচরণ স্মরণমননের ফলে গোচরে এসেছে তাই ঐ স্বর্গীয় পরমপুরুষের শ্রীচরণ স্মরণ করে দীন অর্ঘ্যরূপে এখানে নিবেদন করতে চেষ্টা করেছি। অভাজনের এই অবদমিত কৌতূহলের জন্য অবশ্যই সেই স্বর্গীয় চরণে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে এই নিবেদন। এই নিবেদক একই কারণে সুধীবৃন্দের নিকটেও ক্ষমাপ্রার্থী। তার অবদমিত কৌতূহলের জন্য। এবং অনধিকার চর্চার জন্য। শুধু বলতে পারি নিবেদকের অখণ্ড বিশ্বাস ও ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধার ডালি ছাড়া এখানে অন্যকিছু তার কৃতিত্ব নেই। এ সবই সেই পরমপুরুষের অসীম করুণার ফল। বড়জোর বলতে পারি, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর'। এই আপ্তবাক্যের পথ ধরেই এখানে এই নিবেদন আমার এবং সেই কারণে এখানে আসা সম্ভব হয়েছে। অতএব এ পর্যন্ত এই রচনার মাধ্যমে যা নিবেদিত হলো তা এককথায় দীনের একান্ত বিশ্বাসের ও সেই পরমপুরুষের করুণার ফলশ্রুতি মাত্র।

এ ব্যাপারে যদি কেউ মনে করেন প্রতিবেদক কারো মনে কথিত বিষয়ে প্রতীত জন্মানোর অভিপ্রায়ে এহেন কাজ করেছে তবে তার কাছেও সে ক্ষমাপ্রার্থী। কারণ আগেই বলা হয়েছে কথিত ব্যাপারে এই নিবেদক একান্তই শূন্যগর্ভ পাত্র। শুধু একটি অনুরোধ, এই প্রবন্ধের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বরং যদি আপনি এ-বিষয়ে অনুধ্যান করেন তবেই নিবেদক আনন্দিত ও ধন্য হবে এবং কৃতার্থ হবে। তাহলে বিশ্বাস করবো আপনার আমার মধ্যে এ ব্যাপারে অন্তত কোন বিতর্কের বা ভুল ঠাওরাবার অবকাশ থাকবে না। এবং আপনার আমার মধ্যে কথিত ব্যাপারে নৈকট্যের ও দূরত্বের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। তবে একটা কথা বা অনুরোধ এ প্রসঙ্গে আপনার দৃষ্টির যে এতকাল একটা মানসিকতা গড়ে উঠেছে তারে একটু কষ্ট দিতেই হবে। এতদিনের ব্যবহৃত যে আপনার মানসিক লেন্সটি ছিল, চোখ থেকে সেটি বর্জন করে অন্য একটি নতুন লেন্সে চোখটাকে নতুনভাবে দেখবার অধিকার দিতে হবে তবেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন আর কোন বিতর্কের অবকাশ থাকবে না উভয়ের মাঝে।

কেউ কেউ বলতে পারেন সুভাষচন্দ্রকে এই উন্নাসিক কোন জগতে নির্বাসিত করতে

চাইছে? না বন্ধু যিনি আমাদের আপামর জনগণমনের রাজা আত্মার আত্মীয় এবং পরম আদরের ধন তাঁকে মহাজাগতিক মার্গে পাঠাবার এ অধম কে? আর সেই স্পর্ধাই বা হবে কোন শক্তি ও সাহস বলে? এখানে যা কিছু বলা হয়েছে বা হচ্ছে সবই ইতিহাস বলছে। বলছে তাঁর অন্তহীন মহাজীবনের কর্মকাণ্ড ও তাঁর কর্মপরিধি। সুভাষচন্দ্র হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিস্তৃত এক আধ্যাত্মিক ও মানবপ্রেমিক ব্যক্তিত্ব। তাঁকে বুঝতে, জানতে বা হৃদয়াঙ্গম করতে পারা তো আলোকবর্ষ দূরের ব্যাপার। কাজেই তাঁকে চিনে ফেলার চেষ্টা করাও তো বাতুলতা। এমন কথা বা এমন দাবি কে বা কারা করতে পারেন? ব্রহ্মজ্ঞ মহান পুরুষ ছাড়া এমন মহাজীবনের আঁচ কে করতে পারেন? তিনি যুগপত যেমন এক পরমার্থিক আধ্যাত্মিক জগতের অদ্বিতীয় তেমন যে তিনি বাস্তব রূঢ় কঠিন মাটির পৃথিবীরও এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব তা কি নতুন কিছু? সেইরূপ এক মহান পরমার্থিক ব্রহ্মালোকে বিরচণশীলকে এই নগণ্য চিনে ফেলেছে বা উপলব্ধি করতে পেরেছে একথা আপনি ভাবলেন কোন বিচারে? যাক এসব বিতণ্ডা। আসুন তাঁকে কিঞ্চিৎ আঁচ করার সুবিধার্থে আমরা এক আধ্যাত্মিক মার্গে বিচরণশীল যোগীর স্মরণাপন্ন হই। পূর্বেই বলা হয়েছে আমরা যতটুকু সুভাষতত্ত্ব নিয়ে এ-পর্যন্ত চর্চা করেছি তা নিতান্তই তাঁর পরিব্যাপ্তির অনুকণামাত্র। এই অধমের দাবি নয় এটা। তাঁকে যাঁরাই চর্চা করছেন তাঁরা সকলেই এই কথা স্বীকার করবেন। এতে কোন দ্বিধা নেই। তবু এইটুকু বোঝাতে বা সুভাষচন্দ্রের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে যদি হয়, তবে আসুন সিদ্ধযোগীবর অঘোরিবাবার প্রসাদপ্রার্থী হই। দেখা যাক তিনি কি বলেন।

আমরা সবাই বাংলার জীবন্ত শিব তারাপীঠের মহাসাধক বামাক্ষ্যাপার কথা জানি। তাঁরই যে পরম্পরা আছেন তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে তারাক্ষ্যাপা ও রামনাথ অঘোরিবাবা। স্মরণীয় এই তারাক্ষ্যাপা ছিলেন একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি শুধু পূর্বাশ্রম জীবনে নয় সন্ন্যাস জীবনেও ছিলেন স্বাধীনতা যোদ্ধা। একসময় তিনি ভিয়েনাতে অবস্থানরত সুভাষচন্দ্রকে তাঁর যোগবলে সহায়তা করেছিলেন। এ তথ্য আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনী থেকেই পাচ্ছি। তারপরের অর্থাৎ তারাক্ষ্যাপার পর যিনি তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত যোগীবর রামনাথ অঘোরিবাবা। তিনি ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা যোদ্ধা ও বিপ্লবী মহানায়ক সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কি বলেছেন আসুন তা শুনি।

তিনি বলেছেন, "ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এখনও জীবিত। ১৯৬০-৭০ সালের মাঝে অনেকবার নেপালে এবং কলিকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। অঘোরিবাবা আরও বলেন নেতাজী সুভাষ জীবনে নারী স্পর্শ করেননি, বিবাহ তো দূরের কথা। সুভাষ সম্পূর্ণ বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত। বর্তমানে অধ্যাত্ম সাধনায় রয়েছেন। বার্ধক্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর দেহ সম্পূর্ণ যোগসিদ্ধ। ভারতবর্ষের বহু মহাপুরুষ সিদ্ধসাধকদের অধ্যাত্মশক্তি সুভাষের মধ্যে

সঞ্চারিত ও সঞ্জীবিত। যথাসময়ে সুভাষ দেশ ও জগৎ কল্যাণে আত্মপ্রকাশ করবে।"

(মহাপীঠ তারাপীঠ, পৃষ্ঠা—৩৪, দ্বিতীয় খণ্ড, বিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায়)

যোগীবর রামনাথ অঘোরিবাবার প্রদত্ত সংবাদ ছাড়া আরও অনেক তথ্যই আছে, যা এই সীমিত চর্চার মাঝে পরিবেশন করা কষ্টকর। তবু একটি সংবাদ দিয়ে এই ব্যাপারে পূর্ণচ্ছেদ টানছি। কিছুকাল পূর্বে 'ও ক্যালকাটা' বলে একটি সংবাদপত্রে তৎকালে বেরিয়েছিল যে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলীপ কুমার রায়ের সাক্ষাৎকার ঘটে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার হয়েছিল ১৯৭৫ সালে ৭ই জুলাই কন্যাকুমারী বিবেকানন্দ শিলায়। সুভাষচন্দ্র সাবমেরিনে করে এসে উক্ত স্থানে সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন দুই বন্ধুর মাঝে দীর্ঘ আলোচনা হয়। উল্লেখ্য দিলীপ কুমার রায় ও সুভাষচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনোর সময় থেকে উভয়ে খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু। ঐ আলোচনার সময় সুভাষচন্দ্র দিলীপ রায়কে জানিয়েছিলেন তাঁর পরবর্তী পরিকল্পনার কথা। এখানে এই 'O Calcutta', সংবাদপত্র সম্পর্কে কেউ উষ্মা প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু একটি জিনিষ আমরা আজ অর্ধশতকের উপর লক্ষ্য করে আসছি যে সুভাষচন্দ্র সংক্রান্ত কোন খবর পরিবেশন করতে হলেই বৃহৎ সংবাদপত্রগুলোর দেখা যায় গাত্রদাহ্। অথচ অতি নগণ্য স্তরের সংবাদপত্রও কিন্তু অনেক সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরও পরিবেশন করে থাকে যা আমরা কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে পারি না। যাক যা চর্চা হচ্ছিল তারই সূত্র ধরে আসুন কি পাই , না-ই বা ঐ প্রতিবেদকের কথায় গুরুত্ব দিলেন বা তার কথায় কর্ণপাত করলেন। তার কথায় বা ঐ সংবাদে আপনার আমার প্রতীত হোক তাও বলছি না। কিন্তু যেসব তথ্যাতথ্য এই বিস্তৃত রচনায় আলোচিত বা সন্নিবেশিত হয়েছে তার সবকিছুই কি আপনি এক কথায় নস্যাৎ করতে পারছেন বা উড়িয়ে দিয়ে অস্বীকার করতে পারছেন? অস্বীকার করেও তো আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। কারণ আপনার কাছে, যে সংবাদের কানাকড়ি মূল্য নেই তার মূল্য যে ভারতীয় সুপ্রিমকোর্টের নিকট অসীম। যদি তাই না হয় তবে বলুন সুপ্রিম ন্যায়ালয়ের এক আদেশের তোড়ে কেন স্বয়ং ভারত সরকারের মত এক মহাবলী সরকারই আজ দিশেহারা এবং পথভ্রষ্ট। এসব যে গালগপ্প নয়, তা তো নানাভাবেই প্রমাণিত। আর তা যদি প্রমাণিত না-ই হয়ে থাকে তবে সুপ্রিমকোর্ট যে —আদেশ দিল তার উৎস কি, বা কোথায়? সুপ্রিমকোর্টের এই আদেশনামা, মহাবলী ভারত সরকারের উপর কী শক্তির বলে? না বন্ধু ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের উপর যত ইচ্ছা মনের উষ্মা প্রকাশ করতে পারেন, ব্যঙ্গ করতে পারেন কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের তর্জনীর ঘোষিত আদেশের উপর আপনি আমি তো সুদূর পরাহত। স্বয়ং ভারতের রাষ্ট্রপ্রধানই যে কত তুচ্ছ! এছাড়া ১৯৬৪ সালে পণ্ডিত জওহরলালজীর মরদেহের পার্শ্বে উপস্থিত সাধুজীর ছবিটি কার? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যে স্বয়ং ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মত লৌহমানব বাক্‌রহিত হয়েছিলেন। সে খবর কি রাখেন? এছাড়া উক্ত ছবিটির উৎসই তো স্বয়ং ভারত সরকার। পণ্ডিত জওহরলালের

মৃত্যুর পর যে ডকুমেন্টারী ছবি বা তথ্যচিত্র ভারত সরকার প্রদর্শন করেন তাতেই তো ঐ ছবি দেখানো হয়। ডকুমেন্টারী ছবির মধ্যে উক্ত অংশটির ক্রমিক সংখ্যা ছিল ৪১৬ বি। এই তথ্য ও কি তবে ভাঁওতা? এইভাবে অর্ধশতাব্দী কেটেছে ভাঁওতা ভাঁওতা করে কিন্তু আর যে কাটছে না। এবার যে অপরাধ বিজ্ঞানের প্রশ্ন আপনাকে আমাকে বা ভারত সরকারের পিছন ধাওয়া করছে? এবার গতি কি? সুতরাং পালাবার পথ আর নেই। এ তথ্য আজ সমগ্র পৃথিবীর কাছে পরিষ্কার।

যাক ঐসব বিতর্ক বাদ দিয়ে চলুন আমাদের চর্চিত চিত্রের দিকে আবার মনোনিবেশ করি। একটি কথা এখানে যে খুবই সুপ্রযোজ্য আশা করি আপনিও মানবেন। যেকোন স্তরের এক ব্যক্তিকে জানতে, বুঝতে ও অনুধাবন করতে হলে অবশ্যই তাঁকেও হতে হবে সেই পর্যায়ের। এখানে প্রসঙ্গ বোঝবার সুবিধার জন্য বলতে পারি স্বামী বিবেকানন্দ নাহলে কি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পৃথিবী এত সহজে পেতো? অর্থাৎ সহজে বুঝতে পারতো? অবশ্যই একদিন তো পৃথিবী অবহিত হতোই। কিন্তু কিভাবে হতো, কতখানি হতো, কি আলোকে হতো, এসব বলা আজ সত্যিই মুশকিল, গবেষণার বিষয়। তদ্রুপ মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত না হলে আজকের পৃথিবীতে শ্রীমদ্ সারদানন্দজীকে জানা বা বোঝার ক্ষেত্রটা কিভাবে তৈরী হতো তা বলাও খুবই কঠিন। অন্তত আমাদের মত সাধারণের কাছে তো বটেই। তাই বলতেই হয় মেজর সত্যভূষণ গুপ্তই পৃথিবীকে দিয়ে গেলেন বাঁচার আশ্বাস বাণী। আগত যে **ধর্মীয় তথা মানবিক যুগ তা প্রকট হবার সাথে সাথেই এ-সত্য. সত্য হয়ে প্রকাশিত হবেই। স্বামীজীর স্বপ্নকে সার্থক করতেই আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্র শ্রীমদ্ সারদানন্দজী রূপে রূপময় সেজে পৃথিবীর সমস্ত বিষ পান করে নবীন বিশ্বগড়ার সাধনার ব্রতে ব্রতী হয়ে কৈলাসপতি শিবের মত ভোলানাথ সেজে গোটা বিশ্বটাকেই করেছেন তাঁর বিচরণভূমি যেন কৈলাসধাম হিমালয়। তাঁর আরব্ধ সাধনা পূর্ণ হলেই বিশ্বরঙ্গমঞ্চের তথাকথিত ঢাকনাটা খসে পড়বে বা পর্দাটা উঠে যাবে। আর পর্দাটা উঠে গেলেই দেখা যাবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সেই মহান বাণী ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে এক নতুন বিশ্ব। এবং দেখা যাবে সার্থক হয়ে উঠেছে পুরাণ কথিত সেই মহাবাণী—'বসুধৈব কুটুম্বকম্'।**

তখন বোঝা যাবে সুভাষচন্দ্র কে, এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাণীর সার্থক রূপায়ন কত দূর সত্য, যে বাণীতে তিনি বলেছেন :

"ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নতুন জীবন নতুন আলোকে
জাগিবে নতুন দেশ।"

বলাবাহুল্য নতুন দেশ অর্থাৎ নবীন পৃথিবী এবং নবীন ভারতবর্ষ। বিশ্বকবি গ্রথিত এই বাণী ভীষণ যজ্ঞে পূর্ণ হলেই বিশ্ববাসী দেখতে পাবে এবং আপনি আমিও দেখতে পাবো ভারত-পাকিস্তানই বা কী, গোটা বিশ্বের চেহারাই বা কী, আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র

বসু বা শ্রীমদ্ সারদানন্দজীই বা কে বা কী!! তখন পৃথিবী দেখবে কাকে বলে সুভাষ বিজয়বৈজয়ন্তী। কাকে বলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রবাহ বা রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলন।

তখনই প্রমাণিবে শৌলমারী কাণ্ডের মহাধ্বনি, গুঞ্জন
সত্য কিনা, সত্য কিনা কলির ভগীরথ সত্যভূষণ।
আরো প্রমাণিবে এ গুঞ্জনই নটরাজের দৈববাণী
যে অমোঘ বাণীর বজ্রনির্ঘোষ বিশ্বও লয়েছে মানি।
আসছে সুভাষ হাসছে সুভাষ ঐ দিগন্তে মাভৈঃ
নয়কো কোন মনুষ্য বাণী পাঞ্চজন্য ধ্বনি সত্যই।

তাই—

বসুন্ধৈব কটুম্বকম্ পদাম্বুজ তীর্থে এ দীনজীবাত্মার
কোটি প্রণতির অর্ঘ্যাঞ্জলিঃ। —

লহো তুলি লহো বীর কোটি প্রণতির এই অর্ঘ্য।
ওই পুণ্য তীর্থ পদাম্বুজে তব দীন আর্তির এ ডালি।
ওগো গঙ্গা-হৃদি বঙ্গ-প্রাণ ভারত সত্তায় বিশ্বস্বামী,
ধ্যানে তোমার রূপ পূজিগো স্বপ্নে তোমার চরণ নমি
এসো হে এসো শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নবপ্রবাহ
এসো উদ্ধারিতে জীবকুল, বিতরিয়া তব কৃপা স্নেহ।
হে কৃপাসিন্ধু বিশ্বপথিক, এসো তুমি এসো দীননাথ
নটরাজ বেশে এসো হে দূরিতে জীবের কালপ্রভাত।
দিকে দিকে নাহি কিছু অনাচার জাত বই হাহাকার,
নেই সৎ কিছু সদাচার, পৃথ্বীজুড়ে হিংসা দুর্নিবার।
দ্বেষক্লিষ্ট দেশাচার শুধু তর্জনীর তর্জন গর্জন
ধান্দাবাজদের হট্টরাজ, নেই কোথাও শুভ লক্ষ্মণ!
চারিদিকে দক্ষযজ্ঞ, যক্ষ-তক্ষকের ঘনঘটা ফোঁস
আত্ম স্বার্থে বিবেক বর্জিত তবু দাবি মোরাই মানুষ!
হে রুদ্র তাপস কৃপা বর্ষি তব দাও চৈতন্য মোদের
তব রুদ্রাঘাত দাও চিতে, ফিরে লভি মনুষ্যত্ব ফের।
তাই বলি, হে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের তপশ্চারী
তুমি বিনে কই পরিত্রাতা ক্ষাত্রবীর জগৎ দিশারী?
আত্মপ্রকাশি দাও হে সকরুণে বিশ্বপ্রাণে নব আশা,
নান্যপন্থা নান্যদিশা তোমা বিনে দিশি দিশি অমানিশা

বজ্র নির্ঘোষে পুনঃ শুনাও তব আশ্বাসের বেদবানী
যে বানীতে মুক্ত হবে বিশ্বগ্লানি মুক্ত হবে দেশজননী
হে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ধূর্জ্জটি বেশে বাজাও তব ডম্বরু
কংসাগার ধরিত্রী' পরে হোক শুরু দৈত্যকুলে দুরুদুরু।
কোথা তুমি বিশ্বনবী মাতৃ-সাধক সত্যম সুভাষম্
হে কুলপ্লাবী জীব প্রেমিক হে বসুন্ধৈব কুটুম্বকম্।

জয়তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ,
জয়তু সারদানন্দজী, নেতাজীসুভাষ।
জয়হিন্দ

"সত্যের জন্য সব কিছুকেই ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোনো কিছুর জন্যই সত্যকে বর্জন করা চলেনা।"

—স্বামীবিবেকানন্দ

"What I am going to indroduce in Asia that will radiated throught the world."

—Mahakal

"It is tragedy in history that truth always with Minority"

—Raja Ram Moham

"যে ব্যক্তি অত্যাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপন্ন হয়, কারারুদ্ধ হয় অথবা লাঞ্ছিত হয়, সে সেই ত্যাগ ও লজ্জার ভিতর দিয়ে মনুষ্যত্বের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়।"

—নেতাজী সুভাষ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নেতাজী মহাজীবনের জীবনপঞ্জী

প্রথম পর্য্যায়

১৮৯৭ : ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী জন্ম।

১৯০২ : জানুয়ারী শিক্ষারম্ভ। প্রটেষ্টান্ট ইউরোপীয়ান স্কুলে প্রবেশ।

১৯০৯ : জানুয়ারী : র‍্যাভেনশ কলিজিয়েট স্কুলে প্রবেশ।

১৯১৩ : মার্চ : ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার। এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রবেশ লাভ। (ম্যাট্রিকুলেশনে ৭০০ নম্বরে ৬০৯ নম্বর প্রাপ্তি)

১৯১৪ : সদগুরুর সন্ধানে আধ্যাত্মিক পিপাসায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থে গমন এবং সদগুরুর সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন।

১৯১৫ : ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। (১০০০ নম্বরে ৬৩৭ নম্বর প্রাপ্তি)

১৯১৬ : অধ্যাপক এইচ. আর. জে. ওটেনের সহিত সংঘর্ষ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত। মার্চের শেষে কটকে গমন ও সমাজসেবায় মনোনিবেশ।

১৯১৭ : জুলাই : স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রবেশ। সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেনিং কোরে প্রবেশ।

১৯১৯ : দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সেপ্টেম্বর ১৫ই ইংল্যাণ্ডে যাত্রা। (বি.এ. পরীক্ষায় ১০০০ এর মধ্যে ৮২২ নম্বর প্রাপ্তি এবং ইংরেজীতে প্রথম স্থান লাভ)

১৯২০ : সেপ্টেম্বর : চতুর্থ স্থান লাভ করে আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৯২১ : ফেব্রুয়ারী ১৬ই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগের অভিপ্রায় জানাইয়া প্রথম পত্র প্রেরণ। মার্চ ২রা দ্বিতীয় পত্র প্রেরণ এবং সিভিল সার্ভিস হইতে পদত্যাগের সংকল্প জ্ঞাপন।

১৯২১ : ১৯২১-এর মে। সিভিল সার্ভিস হইতে পদত্যাগ।

১৯২১ : ১৬ই জুলাই : ভারতে প্রত্যাবর্তন। গান্ধীজীর সহিত ও দেশবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎকার ঘটনা। ১৯২১-এ জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। ডিসেম্বরে : খাদি আন্দোলনে নেতৃত্ব দান।

১৯২২ : আগষ্ট : কারামুক্তি।

১৯২২ : অক্টোবর : বঙ্গীয় রিলিফ কমিটির সম্পাদক রূপে উত্তরবঙ্গের অভূতপূর্ব বন্যায় সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ।

১৯২৩ : "বাংলার কথা", "ফরোয়ার্ড"-এর সম্পাদনা।

১৯২৪ : এপ্রিল : কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত।

১৯২৪ : অক্টোবর : ২৫ : বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন সংশোধন অডিনান্সে গ্রেপ্তার বরণ।

১৯২৫ : জানুয়ারী : ২৬ : মান্দালয় জেলে প্রেরিত।

১৯২৬ : ফেব্রুয়ারী : ২০ : জেলবন্দী সুভাষচন্দ্রের অনশন।

: মার্চ : ৪ঠা : অনশন প্রত্যাহার। কারারুদ্ধ থাকাকালীন প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যপদে নির্বাচিত।

১৯২৭ : মে ১৬ : ইন্‌সিন জেল হইতে মুক্তিলাভ।

: নভেম্বর : বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।

: ডিসেম্বর : মাদ্রাজ কংগ্রেসে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সম্পাদক নিযুক্ত।

১৯২৮ : সাইমন কমিশন বর্জন। উক্ত আন্দোলনে নেতৃত্বদান এবং বাংলার ছাত্রআন্দোলনের জন্মদান।

১৯২৮ : নভেম্বর : শ্রমিক আন্দোলনে প্রথম যোগদান এবং টাটা ধর্ম্মঘটে নেতৃত্ব।

১৯২৮ : ডিসেম্বর : Bengal Volunteers গঠন ও সর্ব্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ। কলিকাতা কংগ্রেসের জি. ও. সি. নির্বাচিত। কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল নেহেরুকে গার্ড অব অনার প্রদর্শন, কলিকাতা পার্কসার্কাস ময়দানে। লিবারেল নেতাদের সহিত মতানৈক্য ও কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন।

১৯২৯ : ফেব্রুয়ারী : পাটনায় যুবসম্মেলনের সভাপতিত্ব গ্রহণ এবং সভাপতির ভাষণে যুব সমাজের প্রতি দেশ গঠনের ডাক।

১৯২৯ : মার্চ : রংপুর প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে বাণী প্রেরণ।

১৯২৯ : মার্চ : বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে কংগ্রেসের কর্মসূচী ঘোষণা। ১৯২৯-এর ১৭ই মার্চের পর থেকে প্রতিমাসের প্রথম রবিবার বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী প্রচার কর্মে আত্মনিয়োগ-এর কথা ঘোষণা। ২৪শে মার্চের পর থেকে মদ্যপান বর্জন ও বিরুদ্ধে প্রচার সূচী গ্রহণের জন্য দেশ ব্যাপী আন্দোলনের আহ্বান।

১৯২৯ : জুন : ২২ : যশোহর-খুলনা জেলার যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব ও ভাষণ।

১৯২৯ : জুলাই : ২১ : হুগলী জেলার ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব ও ভাষণ দান।

১৯২৯ : আগষ্ট : ২০ : রাজশাহি জেলার ছাত্র সম্মেলনে ভাষণদান।

১৯২৯ : সেপ্টেম্বর : ১৫/১৬ : লাহের থেকে শহীদ যতিন দাশের মরদেহ আনয়নের ব্যবস্থা এবং কলিকাতায় শোভাযাত্রা ও পূর্ণাঙ্গ মর্য্যাদায় সৎকারের ব্যবস্থা সম্পন্ন করা।

১৯২৯ : অক্টোবর : ১৯ : পাঞ্জাবে ছাত্র সম্মেলনের সভাপতিত্ব ও ভাষণপ্রদান লাহোরে।

১৯২৯ : নভেম্বর : লর্ড আরুইন প্যাক্টের বিরোধিতা। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মতানৈক্য।

১৯২৯ : নভেম্বর ৫ : জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে বাসন্তীদেবীকে পত্র প্রেরণ।

১৯২৯ : ডিসেম্বর : ১লা : মধ্যপ্রদেশের বেরারের ছাত্রসম্মেলনে সভাপতিত্বও ভাষণদান।

১৯২৯ : ডিসেম্বর : ১লা : বড়লাটের ঘোষণার উপর গান্ধীজীর প্রস্তাবেতে সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন।

১৯৩০ : জানুয়ারী : ৯ মাসের জন্য কারাবরণ।

: এপ্রিল : আলিপুর জেলে লাঠি চার্জের জন্য আহত।

: আগষ্ট ২২ : বন্দী অবস্থাতেই কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত।

: সেপ্টেম্বর : মুক্তিলাভ।

১৯৩০ : সেপ্টেম্বর : ২৪ : কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত ও ঐ পদে শপথ গ্রহণ।

১৯৩১ : জানুয়ারী : ১১ : ৭ দিনের কারাদণ্ড ভোগের জন্য রাজশাহী সদর জেলে প্রেরিত।

১৯৩১ : জানুয়ারী : ২৬ : স্বাধীনতা দিবসে শোভাযাত্রায় নেতৃত্বদান এবং পুলিশ কর্তৃক প্রহিত।

১৯৩১ : ৬ মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

১৯৩১ : মার্চ : ৮ : গান্ধী আরুইন চুক্তির পর মুক্তি।

১৯৩১ : মার্চ : ২৭ : নওজোয়ান সভায় ভাষণ দান।

১৯৩১ : জুলাই : নিখিল ভারত ট্রেন ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলিকাতা সম্মেলনে সভাপতিত্ব ও ভাষণ দান।

১৯৩১ : সেপ্টেম্বর : ২৩ : রক্‌স্‌বার্গের বিচারে আলিপুর সদর জেল থেকে কারা মুক্তি।

১৯৩১ : অক্টোবর : ১১ : ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে কলিকাতার অদূরে শ্যামনগর স্টেশনে গ্রেপ্তর বরণ। পরে সরকারি আদেশে তাঁর পানীয় ও খাদ্য বন্ধ করা হয়।

১৯৩১ : নভেম্বর : ৩ : বাংলার বিপ্লবীদের প্রতি আহ্বান কংগ্রেস পতাকা তলে সমন্বয়ের জন্য।

১৯৩১ : ডিসেম্বর : ২৮ : গোলটেবিল ফেরৎ গান্ধীজীকে বোম্বেতে স্বাগত জানাতে গমন।

১৯৩১ : ডিসেম্বর : ২৯ : গান্ধী সুভাষের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বোম্বেতে।

১৯৩২ : জানুয়ারী : ২রা : বোম্বের পথে কল্যাণ স্টেশনে গ্রেপ্তার বরণ এবং অজ্ঞাতস্থানে নির্বাসন।

১৯৩৩ : ফেব্রুয়ারী : ২৩ : ইউরোপে নির্বাসিত।

১৯৩৩ : মার্চ : ৬ : ভিয়েনায় পৌঁছান।

১৯৩৩ : মার্চ : ১১ : ভিয়েনাতে ডাঃ ফার্মের সেনেটরিয়ামে ভর্তি।

১৯৩৩ : মে : ৯ : বোস-প্যাটেল (বিটল ভাই প্যাটেল) বিবৃতিতে স্বাক্ষর।

১৯৩৩ : জুন : ১০ : লণ্ডন ফ্রায়ার হলে ভাষণ।

১৯৩৩ : অক্টোবর : ২২ : বিটল ভাই প্যাটেলের মৃত্যুশয্যার পাশে সুভাষচন্দ্রের অবস্থান। সম্বরণীয় বিটল ভাই প্যাটেল যখন ভিয়েনাতে রোগ শয্যা শায়িত তখন সুভাষ চন্দ্রই তাঁকে সেবারত ছিলেন। সুভাষচন্দ্র ছিলেন বিটল ভাইয়ের অত্যন্ত স্নেহ ভাজন ব্যক্তিত্ব।

১৯৩৩ : ডিসেম্বর : সুভাষচন্দ্র ভিয়েনা অবস্থানকালীন বল্লভ ভাই প্যাটেলের দাদা বিটল ভাই প্যাটেল কর্তৃক প্রদত্ত এক লক্ষ টাকা যা সুভাষচন্দ্রকে উইলের মাধ্যমে দিয়ে ছিলেন স্বদেশ কর্মকাণ্ডে ব্যয় করার জন্য, সেই উইল মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য সর্দার বলভ ভাই পরে মামলা রুজু করেন এবং সুভাষ চন্দ্রকে অসম্মানিত করে ঐ উইল থেকে সুভাষচন্দ্রকে বঞ্চিত করেন অতিব জঘন্য ও ঘৃণ্য চক্রান্ত করে।

১৯৩০-৩৪ : : সমগ্র ইউরোপ পরিভ্রমণ এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে ইউরোপবাসীকে ওয়াকিবহাল করেন।

১৯৩৪ : : সুভাষচন্দ্রের তুরষ্কে গমন এবং সেখানে ভারত সম্পর্কে প্রচার।

১৯৩৪ : : ইটালির মিলান সহরে আগমন এবং ভারতীয় সম্প্রদায়কে বক্তৃতার মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন করেন।

১৯৩৪ : : মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত ১৯৩২ সালের ১৭ই আগষ্টের 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড-এর সমর্থক ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তথা বাংলার বিধানচন্দ্র রায় এর বিরুদ্ধে অভিমত স্তাপন করেন। (স্মরণীয় যে গান্ধীজী এই প্রস্তাবকে এক সময় সমর্থন করেন। পরবর্তীকালে তিনিই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করার জন্য জাতীয় কংগ্রেসকে কমিউনাল বলে অখ্যায়িত করেন বা দোষ রূপ করেন)।

১৯৩৪ : এপ্রিল : ৫ : নাৎসী জার্মানীর হের হিটলারের নিকট তাদের ভারত বিরোধীতার জন্য তীব্র প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ।

১৯৩৪ : নভেম্বর : : জেনেভায় The Indian Struggle গ্রন্থ প্রকাশ।

১৯৩৪ : ডিসেম্বর : : পিতার মৃত্যু সংবাদে বৃটিশ আদেশ অমান্য করে ইউরোপ ত্যাগ এবং করাচি বিমান বন্দরে অবতরণ মাত্র গ্রেপ্তার বরণ ফলে পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়েও পিতাকে শেষ দর্শনে বঞ্চিত।

১৯৩৫ : জানুয়ারী : ১০ : ইউরোপ গমন।

১৯৩৬ : মার্চ : ২৫ : হিটলারের জাতি বৈষম্যের প্রতিবাদ।

১৯৩৬ : মার্চ : ২৭ : বৃটিশ আদেশ অমান্য করে ভারতে যাত্রা।

১৯৩৬ : এপ্রিল : ৮ : আদেশ অমান্য করে ভারত প্রত্যাবর্তনের দায়ে বোম্বাই বন্দরে গ্রেপ্তার বরণ।

১৯৩৬ : ডিসেম্বর : ১৭ : ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য কার্সিয়াং থেকে কলিকাতায় আগমন ও মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা।

১৯৩৬ : মার্চ : ১৭ : কারামুক্তি। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য কিছুকাল ডালহৌসি বসবাস করেন।

১৯৩৭ : এপ্রিল : ৬ : কারামুক্তির পর বিপুল সম্বর্ধনা ও নিঃ বঃ সুভাষ দিবস পালন। উক্ত সুভাষ দিবসে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও সহমর্মিতা ঘোষণা।

১৯৩৭ : অক্টোবর : ২৭ : শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কৃষাণ সভায় ভাষণদান।

১৯৩৭ : নভেম্বর : অসুস্থ কবিগুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১৯৩৭ : নভেম্বর : ১৮ : স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইউরোপ গমন।

১৯৩৭ : ডিসেম্বর : অস্ট্রিয়ার গমন।

১৯৩৮ : জানুয়ারী : ১১ : লণ্ডনের প্যানক্রাস টাউন হলে ভারতীয়দের এক মহতি সভায় ভাষণদান।

১৯৩৮ : জানুয়ারী : ১২ : বৃটিশ কর্তৃক আনিত শাসন সংস্কার সম্পর্কে কংগ্রেসী চিন্তাধারার সমালোচনা।

১৯৩৮ : জানুয়ারী : ১৬ : আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবী সিনফিন নেতা ডি-ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও দীর্ঘ আলোচনা।

১৯৩৮ : জানুয়ারী : ১৭ : সেক্রেটারী অফ স্টেট লর্ডজেটল্যাণ্ডের সাথে সাক্ষাৎকারও আলোচনা।

১৯৩৮ : জানুয়ারী : ১৯ : সুভাষচন্দ্রের ক্রয়ডেনে গমন এবং চেক্ প্রেসিডেন্ট বেনেসের সাথে সাক্ষাৎকার এবং সেখান থেকে ইটালির পথে যাত্রা।

১৯৩৮ : জানুয়ারী : ২০/২১ : মুসোলীনির সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা (ফলপ্রসূ হয়েছিলেন কিনা সঠিক তথ্য নেই।)

১৯৩৮ : জানুয়ারী : ২৪ : ইউরোপ থেকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন।

১৯৩৮ : জানুয়ারী : ২৫ : এম. এন. রায়ের সাথে সাক্ষাৎকার।

১৯৩৮ : ফেব্রুয়ারী : ১১ : গুজরাটের হরিপুরা এ. আই. সি. সি. কংগ্রেসের উদ্দেশে যাত্রা।

১৯৩৮ : ফেব্রুয়ারী : ১৯-২১ : হরিপুরায় ৫২তম জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান, সভাপতি নির্বাচিত এবং সভাপতির ভাষণ দান।

১৯৩৮ : মার্চ : ১৯ : শান্তিনিকেতন আগমন এবং রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা'—'নৃত্যনাট্য দর্শন।

১৯৩৮ : : পণ্ডিত জওহরলালকে এক পত্রে আসন্নবিশ্ব যুদ্ধও ইউরোপের পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণে আহ্বান।

১৯৩৮ : এপ্রিল : ৮ : সুভাষচন্দ্রকে বোম্বাই পৌঁছানো মাত্র গ্রেপ্তার।

১৯৩৮ : এপ্রিল : ২৯ : কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সুভাষচন্দ্রের প্রতি অসহযোগিতার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ থেকে পদ ত্যাগ।

১৯৩৮ : প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র কর্তৃক সদ্য গঠিত জাতীয় প্ল্যানিং কমিশন সম্পর্কে বক্তব্য ও ব্যাখ্যা।

১৯৩৮ : জুন : ২ : চট্টগ্রামের এক জনসভায় তরুণ সমাজকে সম্বোধন করে বক্তৃতাদান।

১৯৩৮ : জুন : ২৩ : কলিকাতা কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল দলের নেতৃত্ব থেকে ইস্তফা।

১৯৩৮ : জুলাই : ১৯ : ১৬৬ নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুর জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে কলিকাতা করপোরেশনে ৯৯ বৎসরের জন্য লিজের আবেদন।

১৯৩৮ : আগষ্ট : ২ : ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে মোহাম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে পত্র বিনিময়।

১৯৩৮ : আগষ্ট : ২৭ : সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসদ্রোহী বলায় 'বিহার বাকীপুর একজন সভায় তিনি তার জবাব ও ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

১৯৩৮ : ডিসেম্বর : ১৭ : সুভাষচন্দ্র বোম্বাই এ জাতীয় প্ল্যানিং কমিশন গঠন করেন।

১৯৩৮ : ডিসেম্বর : ১৮ : বাংলায় কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্পর্কে সুভাষ-গান্ধীপত্র বিনিময়। (স্মরণীয় প্রথম সুভাষচন্দ্রের মতের বিরোধিতা করলেও পরবর্তিকালে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের মতই সমর্থন করেন অর্থাৎ কোয়ালিশনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।)

১৯৩৮ : ডিসেম্বর : ২২ : নাৎসী জার্মানীর অফিসার ডঃ ও. উরখ্-এর সাথে সুভাষচন্দ্রে সাক্ষাৎও আলোচনা।

১৯৩৯ : : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়কপদে ধরণ।

১৯৩৯ : জানুয়ারী : ২১ : সুভাষচন্দ্রের শান্তিনিকেতনে আগমন।

জানুয়ারী : ২৯ : ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত।

ফেব্রুয়ারী : ২ : শান্তিনিকেতনে জওহরলালের সহিত সুভাষ চন্দ্রের সাক্ষাৎকারও আলোচনা।

ফেব্রুয়ারী : ১৫ : গান্ধীজীর সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে মত পার্থক্য সত্ত্বেও সাক্ষাৎকার।

ফেব্রয়ারী : ২২ : শারীরিক অসুস্থতার জন্য ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক স্থগিত রাখার প্রস্তাব।

১৯৩৯ : মার্চ : ১০ : ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের ৫৩তম জাতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব ও ভাষণ। সেই ভাষণে আপোষ বিরোধী আন্দোলনের ডাক।

১৯৩৯ : মার্চ : ১৮ : জওহরলালের সঙ্গে পত্রর বিনিময়।

১৯৩৯ : এপ্রিল : ২৩ : জলপাইগুড়ি রাজনৈতিক সম্মেলনে বৃটিশ সরকারকে ৬ মাসের চরম পত্র দিবার আহ্বান।

১৯৩৯ : এপ্রিল : ২৭ : কলিকাতার অদূরে গান্ধী সুভাষ সাক্ষাৎকার ও আলোচনা।

১৯৩৯ : এপ্রিল : ২৯ : রাষ্ট্রপতিপদে সুভাষচন্দ্রের ইস্তফা।

১৯৩৯ : মে : ৩ : ফরয়ার্ডব্লক পার্টি গঠনের কথা ঘোষনা।

১৯৩৯ : জুন : ১৮ : পেশোয়ারে সুভাষচন্দ্রকে বিপুল সংবর্ধনা।

১৯৩৯ : জুন : ২১ : বোম্বাই জনসভায় ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা।

১৯৩৯ : জুন : ২১ : বোম্বাই জনসভায় সুভাষচন্দ্রের ভাষণ এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের ত্রিবিধ উদ্দেশ্যে সাধনের ব্যাখ্যা প্রদান। প্রথমতঃ কর্ম সংহতি, দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্যসাধন এবং তৃতীয় স্বরাজ অর্জনে ব্যাপক অভিযান।

১৯৩৯ : জুলাই : ফরওয়ার্ডব্লকের ওয়ার্কিং কমিটি বা কার্য্যনির্বাহ কমিটি গঠন।

জুলাই : ৯ : জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের নিষেধ আজ্ঞার প্রতিবাদ।

জুলাই : ১৭ : আমেদাবাদ জনসভায় ভাষণদান।

১৯৩৯ : আগষ্ট : ৫ : ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৯৩৯ : আগষ্ট : ১১ : জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্ধা অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ—সুভাষচন্দ্র যাতে বঙ্গীয় কংগ্রেসের কোন নির্বাচনে তিন বৎসর অংশগ্রহণ করতে না পারেন।

১৯৩৯ : আগষ্ট : ১৯ : 'মহাজাতি সদনের' ভিত্তি প্রস্তরানুষ্ঠান এবং কবি গুরুকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

১৯৩৯ : আগষ্ট : ৩০ : প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রতি পূর্ণ আস্থাপ্রকাশ।

১৯৩৯ : সেপ্টেম্বর : ৯ : আমন্ত্রিত অতিথি রূপে ওয়ার্ধ জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংএ উপস্থিতি।

১৯৩৯ : সেপ্টেম্বর : ৩রা : মাদ্রাজ সমুদ্রতীরে জনসভায় ভাষণ।

১৯৩৯ : অক্টোবর : ১০ : লর্ড লিনথগোর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকার।

১৯৪০ : জানুয়ারী : ৩০ : কলিকাতার এক মহতি জনসভায় সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের সমালোচনায় মুখর হন।

১৯৪০ : মার্চ : ১৭-১৯ : জাতীয় কংগ্রেসের মূল এই,আই,সি,সি সম্মেলনের পাশাপাশি সুভাষচন্দ্রের আপোশ বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রামগড়ে। এবং অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ।

১৯৪০ : জুন মাসে : গান্ধী-সুভাষ সাক্ষাৎকারও আলোচনা।

১৯৪০ : জুন : ১৮ : নাগপুরে সুভাষচন্দ্রের আপোশ বিরোধী সম্মেলন।

১৯৪০ : জুন : ২ : কলিকাতার হলওয়েলমনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলনও প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী।

১৯৪০ : জুলাই : ২৮ : বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত।

১৯৪০ : নভেম্বর : ২৬ : বৃটিশ সরকারকে অনশনের দ্বিতীয় নোটিশ।

১৯৪০ : নভেম্বর : ২৯ : প্রেসিডেন্সি জেলে অনশন শুরু। এবং বড়লাটকে দীর্ঘপত্র প্রদান।

১৯৪০ : ডিসেম্বর : গান্ধীজীকে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য আবেদন।

১৯৪০ : ডিসেম্বর : ৫ : অনশন ব্রতী সুভাষচন্দ্রকে বিনাশর্তে মুক্তি এবং স্বগৃহে নজরবন্দি।

১৯৪১ : জানুয়ারী ১৬/১৭ : গভীররাত্রে এলগিন রোডের বাড়ী থেকে রহস্য জনকভাবে অন্তর্দ্ধান।

১৯৪১ : জানুয়ারী : ১৮ : গেমোস্টেশনে ট্রেনে আরোহণ।

১৯৪১ : জানুয়ারী : ১৯ : পেশোয়ার ক্যানটনমেণ্ট স্টেশনে মহাম্মদ জিয়াউদ্দিন এই ছদ্মনামে হোটেলে অবস্থান।

১৯৪১ : জানুয়ারী : ২১ : সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ভগতরাম তলোয়ারের পরিচয় এবং ভারত সীমান্ত অতিক্রমের অভিযান।

১৯৪১ : জানুয়ারী : ২২ : সুভাষচন্দ্রের অন্তর্দ্ধান পর্য্যায়ে প্রথম আফগানিস্থানে পদার্পন-ভগতরামের সঙ্গে।

১৯৪১ : জানুয়ারী : জিয়াউদ্দীনের ছদ্মবেশে ভারতীয় ব্যবসায়ী উত্তমচাঁদ মালহোত্রার বাড়ীতে আশ্রয়।

১৯৪১ : জানুয়ারী : ২৬ : যুগপৎ সুভাষচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের খবর প্রকাশ হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড অফিসে রাত্রি ২ ঘটিকায় এবং ঐ তারিখেই তিনি বৃটিশ ভারত সীমা অতিক্রম করে কাবুলের মাটিতে পৌছান।

১৯৪১ : জানুয়ারী : ২৮ : কলিকাতার সংবাদপত্রে সুভাষ অন্তর্দ্ধানের সংবাদ প্রথম প্রকাশ পায়।

১৯৪১ : জানুয়ারী : ২৮ : সোভিয়েৎ সরকারের বিদেশ দপ্তরের মাধ্যমে সেদেশে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

১৯৪১ : ফেব্রুয়ারী : ৮ : জার্মান সহযোগিতা ইটালির উচ্চতম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং ইটালির সহযোগিতার আশ্বাস লাভ।

১৯৪১ : মার্চ : ৮ : বার্লিন গমনের ছাড়পত্র লাভ।

১৯৪১ : মার্চ : ১২ : সুভাষচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের পর ভারত রক্ষা আইন বলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষদ্বারা মহাজাতি সদন বাজেয়াপ্ত ঘোষণা।

১৯৪১ : মার্চ : ১৫ : রাশিয়ার তাসখন্দ হয়ে জার্মান যাবার জন্য সুভাষচন্দ্রের রুশ কর্তাদের অনুমোদন লাভ।

১৯৪১ : মার্চ : ১৮ : মস্কোর উদ্দেশে সুভাষচন্দ্রের রেলপথে যাত্রা শুরু।

১৯৪১ : মার্চ : ২৫ : আফগান সীমান্ত অতিক্রম।

১৯৪১ : মার্চ : ৩১ : মস্কোয় পৌছান।

১৯৪১ : এপ্রিল : ১লা : বিমানযোগে মস্কো ত্যাগ এবং বার্লিনে পৌছান।

১৯৪১ : এপ্রিল : ৯ : নাৎসী সরকারের নিকট সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা উপস্থাপনা।

১৯৪১ : জুন : ৬ : সুভাষচন্দ্রের রোমনগরীতে আগমন।

১৯৪১ : নভেম্বর : ২ : 'Free India Centre' এবং আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র স্থাপন জার্মানীতে। একই দিনে 'সুভাষচন্দ্র কর্তৃক জয়হিন্দ মন্ত্র উচ্চরণ এবং তা জাতীয় উদ্দেশে উৎসর্গ আর একই তারিখে সুভাষচন্দ্রকে জার্মান প্রবাসী ভারতীয়দের 'নেতাজী' আখ্যায় ভূষিত।

১৯৪১ : ডিসেম্বর : ৯ : সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে 'ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেনডেন্স লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪১ : ডিসেম্বর : ২৫ : ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের সুভাষচন্দ্র শুভেচ্ছাও আশিস জানালেন।

১৯৪২ : ফেব্রুয়ারী : ২৮ : জার্মানের বার্লিন বেতারকেন্দ্র থেকে সুভাষচন্দ্রের প্রথম ভাষণ প্রচার হয়।

১৯৪২ : মার্চ : ১৩ : জার্মানবেতার থেকে "ক্রিপস মিশন বয়কটের জন্য ভারতবাসীর ও ভারতীয় নেতাদের প্রতি বলিষ্ঠ আবেদন।

১৯৪২ : মে : ৫ : সুভাষচন্দ্রের ইটালীর রাষ্ট্রপ্রধান মুসৌলীনির সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

১৯৪২ : মে : ২৯ : সুভাষচন্দ্রের জার্মান নেতৃবৃন্দ—হেরাহিটলার, রিবেনট্রপ এবং কেপলারের সঙ্গে বৈঠক এবং হিটলারের নিকট দূরপ্রাচ্য আগমনের প্রস্তাব পেশ।

১৯৪২ : জুন : ১২ : জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের সাংবাদিক সম্মেলন এবং ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতিপূর্ণ আনুগত্যতা ঘোষণা।

১৯৪২ : আগষ্ট : ৩১ : বার্লিনবেতার কেন্দ্র থেকে বক্তৃতা প্রদান ভারতবাসীর উদ্দেশে।

১৯৪২ : আগষ্ট : ১১ : সুভাষচন্দ্রের হামবুর্গে আগমন।

১৯৪৩ : জানুয়ারী : ১০ : কমিউনিষ্ট মুখপত্র 'পিপলস্ ওয়ারে'-এ সুভাষচন্দ্রকে দেশদ্রোহী, কুইসালিঙ্ আখ্যায় আখ্যায়িত এবং সুভাষচন্দ্রের প্রতি হুঁশিয়ারী ঘোষণা।

১৯৪৩ : জানুয়ারী : ২৮ : বার্লিনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং জাপানী সামরিক জেনারেলের ভারতীয় সৈনিকদের কুচ্‌কাওয়াজ পরিদর্শন।

১৯৪৩ : ফেব্রুয়ারী : ৮ : জার্মানীর কিয়েলনেঠে বন্দর থেকে সুভাষচন্দ্র আবিদহাসানকে সঙ্গে নিয়ে ইউ ১৮০. সাবমেরিনে আরোহী করেন, দূরপ্রাচ্যের উদ্দেশ্যে। এবং সাবমেরিনের যাত্রা শুরু হয় পরদিন অর্থাৎ ৯ই ফেব্রুয়ারী। জাহাজের গতি ছিল জলের ওপরে ঘণ্টায় ১৮ নট এবং জলের তলদেশে ঘণ্টায় ৭.৫ নট্।

১৯৪৩ : ফেব্রুয়ারী : ২৩ : ঐ ডুবোজাহাজের গতিপথ ছিল ঃ ইংল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড হয়ে আটলান্টিকে তলদেশে দিয়ে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত। তারপর সেখান থেকে জাপানী সাবমেরিন আই-২৯ এসে 'সুভাষচন্দ্র ও আবিদহাসানকে নিয়ে পুনরায় যাত্রা করেন। তিনি ২৩শে ফেব্রুয়ারী উত্তমাশা অন্তরীপ এসে পৌঁচেছিলেন।

১৯৪৩ : ফেব্রুয়ারী : ২৮ : সুভাষচন্দ্র জার্মান কর্তৃপক্ষকে সাবমেরিন থাকাকালীনই এক বাতায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য।

১৯৪৩ মে : ৬ : পূর্ব-এশিয়াস্থিত সুমাত্রাদ্বীপের সাবাং নৌবন্দরে ৬ই মে সুভাষচন্দ্র এসে পৌঁছান।

১৯৪৩ মে : ১১ : সাবাং থেকে বিমানযোগে টোকিও যাত্রা করেন।

১৯৪৩ মে : ১৬ : টোকিও পৌঁছান। (প্রথমবার)

১৯৪৩ জুন : ৭ : পেনাং আগমন। জেঃ তোজোর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার।

১৯৪৩ জুন : ১৪ : টোকিও আগমন দ্বিতীয়বার। এবং তোজোর সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় সাক্ষাৎকার।

১৯৪৩ জুন : ১৬: জাপানী পার্লামেন্ট ডায়েটে সুভাষচন্দ্রকে বিপুলভাবে সংবধিত করা হয়।

১৯৪৩ : জুন : ১৯ : টোকিওতে সুভাষচন্দ্রের প্রেসকল্ কন্‌ফারেন্স।

১৯৪৩ : জুন : ২১ : বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সহিত সিঙ্গাপুরে আগমন।

১৯৪৩ : জুন : টোকিওবেতার থেকে সুভাষচন্দ্রের বেতার ভাষণ।

১৯৪৩ : জুলাই : ২রা : সিঙ্গাপুর বিমান বন্দরে পৌঁছান।

১৯৪৩ : জুলাই : ৪ : সিঙ্গাপুরে এক অনুষ্ঠানে I.I.L -এর সভাপতির দায়িত্বগ্রহণ রাসবিহারী বসুর নিকট থেকে।

১৯৪৩ : জুলাই : ৪ : আই. আই. এল. এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ, রাসবিহারী বসুর নিকট থেকে।

১৯৪৩ : জুলাই : ৪ : আই. এন. এর চূড়ান্ত দায়িত্ব গ্রহন।

১৯৪৩ : জুলাই : ৫ : আই. এন. এ সেনাবাহিনী গঠনের ঘোষণা। আই. এন. এ'র প্রথঢ় কুচকাওয়াজে—'দিল্লী চলো, চলো দিল্লী'—মন্ত্রধ্বনির মতন প্রথম উচ্চারণ।

১৯৪৩ : জুলাই : ৫ : ব্রহ্মের জাতীয়বাদী নেতা ডঃ বাম-এর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার।

১৯৪৩ : জুলাই : ৫ : আই এন. এ. সেনাবাহিনী গঠনের ঘোষণা। আই. এন. এর প্রথম কুচকাওয়াজে 'দিল্লী চলো, চলো দিল্লী'—মন্ত্র ধ্বনির প্রথম উচ্চারণ।

১৯৪৩ : জুলাই : ৬ : জেঃ তোজোকে আই. এন. এ বাহিনীর গার্ড অব অনার প্রদর্শন।

১৯৪৩ : জুলাই : ৯ : সিঙ্গাপুর সেনা-সমাবেশে ভাষণ দান। ঐ ভাষণেই ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ তিনি ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণাটি ছিল—এই ভাষণ হবে মানবইতিহাসে "টেস্টামেন্ট অব দি সুপ্রিম কমাণ্ডার" হিসাবে পরিগণিত। কী ভবিষ্যৎবাণী!!

১৯৪৩ : আগষ্ট : ১ : ব্রহ্মের রাষ্ট্রপ্রধানের (ডঃ বা.ম-এর) সাথে সুভাষচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘ আলোচনা।

১৯৪৩ : আগষ্ট : ৮ : আজাদহিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠা এবং সর্বাধিনায়করূপে সুভাষচন্দ্রের দায়িত্বভার গ্রহণ। এবং জনগণ ও সেনাবাহিনী দ্বারা সুভাষচন্দ্রকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রথম 'নেতাজী'-অভিধায় আখ্যায়িত।

১৯৪৩ : আগষ্ট : ২৫ : আই. এন. এ-এর এর নামের পরিবর্তে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' নামে সেনাবাহিনীকে অভিহিত এবং নেতৃত্ব গ্রহণ।

১৯৪৩ : আগষ্ট : ২৫ : বৃটিশ দ্বারা সৃষ্ট বাংলার যুগান্তকারী দুর্ভিক্ষে—এক লক্ষ টন খাদ্য শস্য দিয়ে সাহায্য করার প্রস্তাব বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট এবং (সেই প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করেন)

১৯৪৩ : সেপ্টেম্বর : ২৬ : শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুরশাহের সমাধি স্থল (ব্রহ্মের) আরাকানে—পুষ্পার্ঘ-প্রদান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

১৯৪৩ : অক্টোবর : ২রা : পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র গান্ধী জয়ন্তী পালনের নির্দ্দেশ প্রদান।

১৯৪৩ : অক্টোবর : ২০ : আজাদ হিন্দ্ সরকারের অঙ্গিকারপত্র রচনা।

১৯৪৩ : অক্টোবর : ২১ : সিঙ্গাপুরের ক্যাথে বিলডিং-এ ঐতিহাসিক আজাদহিন্দ

সরকার বা স্বাধীন ভারতসরকার প্রতিষ্ঠা ও গঠনের ঐতিহাসিক ঘোষণা। স্মরণীয় ঠিক একই দিনে 'ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নিকট থেকে তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ জওহরলাল, প্যাটেল প্রভৃতি ব্যক্তিরা (ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস'-এর শর্ত দাবী করেনও আদায় করেন।

১৯৪৩ : অক্টোবর : ২২ : আজাদ্ হিন্দ সরকারের বৃটিশ আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৯৪৩ : অক্টোবর : ২৩ : জাপান কর্তৃক আজাদ হিন্দ সরকারের স্বীকৃতি প্রদান। স্বল্পকাল পরে—সুভাষচন্দ্রের এই অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারকে যারা স্বীকৃতি প্রদান করেছিল তারা হচ্ছে—(১) জার্মান, (২) ইতালি, (৩) মাঞ্চুকো, (৪) নানকিং সরকার, (৫) ফিলিপিনি (৬) ব্রহ্ম, (৭) থাইল্যাণ্ড, (৮) ক্রোশিয়া এবং আয়ারল্যাণ্ডের মহানবিপ্লবী ড. ভ্যালেরা কর্তৃক সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন বার্তাপ্রেরণ।

১৯৪৩ : অক্টোবর : ২৪ : আজাদহিন্দ সরকার কর্তৃক ঈঙ্গ-মার্কিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

১৯৪৩ : নভেম্বর : ১লা : টোকিও হেডকোয়াটারে জাপানী প্রধান মন্ত্রী জে: তোজোর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

১৯৪৩ : নভেম্বর : ৫/৬ : গ্রেটার এশিয়ান সম্মেলনের তোজোর আমন্ত্রণ গ্রহণও টোকিও যাত্রা। তোজোর সঙ্গে পূর্বের আলোচনা অনুসারে আন্দামন নিকোবরের অস্থায়ী শাসন ভারগ্রহণ।
পূর্ব এশিয়ার সহযোগী দেশ সমূহের কর্তৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে জাপানী পার্লামেণ্ট হলে সাক্ষাৎকারও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বিনিময়।

১৯৪৩ : নভেম্বর : ৭ : আজাদ হিন্দ ফৌজের সুভাষ বিগ্রেহের বৃটিশ-আমেরিকান গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা শুরু।

১৯৪৩ : নভেম্বর : ৯ : আজাদ হিন্দ সরকারকে ইটালির স্বীকৃতি দান ঘোষণা।

১৯৪৩ : নভেম্বর : ১৯ : আজাদ হিন্দ সরকারকে থাইল্যাণ্ডের স্বীকৃতি ঘোষণা।

১৯৪৩ : নভেম্বর : ২৪ : জাপানী জেনারেল তেরাউচিতির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎকার ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

১৯৪৩ : ডিসেম্বর : ২৯ : আন্দামান নিকোবর পরিদর্শন এবং আজাদ হিন্দের জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

১৯৪৩ : ডিসেম্বর : ৩০ : আন্দামানের পরিত্যক্ত বৃটিশ চীফ কমিশনারের ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। এবং আন্দামান ও নিকোবর দুটি দ্বীপের নূতন নামকরণ 'শহীদ ও স্বরাজ'-এই দুই নামে।
এবং দ্বীপান্তর সেলুলার জেলে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দু রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে ঐতিহাসিক পরিদর্শন।

১৯৪৪ : জানুয়ারী : ৬ : মালয় থেকে রেঙ্গুনে আজাদহিন্দ সদর কার্যালয় স্থানান্তরিত করেন।

১৯৪৪ : জানুয়ারী : ৭ : যুদ্ধকালীন সময়ে প্রথম রেঙ্গুন পরিদর্শন।

১৯৪৪ : জানুয়ারী : ১২ : ব্রহ্ম পরিদর্শন।

১৯৪৪ : জানুয়ারী : ২৬ : রেঙ্গুন জনসমাবেশে ভাষণ ও সুভাষচন্দ্রের গলার মালা নীলামে বিক্রয়, যার তখনকার অর্থ মূল্য হয়েছিল ৭ লক্ষ টাকা।

১৯৪৪ : ফেব্রুয়ারী : ৩ : ফৌজি সমাবেশে ভাষণ। যে ভাষণ ছিল ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে।

"...ওই দূরে বহুদুরে নদীর ওপারে, পর্বত ও অরণ্য পেরিয়ে আমাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত দেশ। ওখানকার মাটিতে আমাদের জন্ম। ঐ দেশে আবার আমরা ফিরে যাবো। শোন, ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি, আমাদের ডাকছে। ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকছে। আত্মীয় ডাকছে আত্মীয়কে।"

"রক্তের ডাক এসেছে। ওঠো, জাগো। এক মুহূর্ত দেরী নয় আর। অস্ত্র হাতে নাও। তোমাদের সামনে আমাদের পথপ্রদর্শকদের গড়া রাস্তা। সেই পথ দিয়ে আমরা যাব। শত্রুর সারি ভেদ করে আমরা যাব। পথ করে নেবো। আর যদি ঈশ্বরের মনে এই থাকে যে, আমরা মৃত্যুর বরণ করে শহীদ হই, তবে সে পথ ধরে আমাদের বীর বাহিনী দিল্লী যাবে সেই পথের ধূলি চুম্বন করে আমরা চিরনিদ্রায় শায়িত হবো। দিল্লী পথ স্বাধীনতার পথ। দিল্লী চলো।"

১৯৪৪ : ফেব্রুয়ারী : ৪ : আরাকান ফ্রন্টে আক্রমণ শুরু।

১৯৪৪ : ফেব্রুয়ারী : ১৭ : আন্দামন ও নিকোবরের শাসন ভারগ্রহণ।

১৯৪৪ : ফেব্রুয়ারী : ২২ : কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদে সুভাষচন্দ্রের অশ্রুপাত এবং মর্মাহত।

এবং অজ্ঞাত আততায়ী সুভাষচন্দ্রের হাতে ধরা পড়ে ক্ষমালাভ। একই সপ্তাহে দ্বিতীয়বার সুভাষচন্দ্রকে হত্যার প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতা।

১৯৪৪ : মার্চ : ১৮/১৯ : আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক ভারতব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম।

১৯৪৪ : মার্চ : ২২ : আজাদ হিন্দ ফৌজের মণিপুরে প্রবেশ।

১৯৪৪ : এপ্রিল : ৫ : আজাদহিন্দ সরকারের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৪ : এপ্রিল : ৬ : কোহিমা দখল।

১৯৪৪ : এপ্রিল : ১৪ : মৈরাং (ইমফলের সন্নিকবর্তী) এ প্রথম স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডিন।

(সঙ্কলন : বিপ্লবী জগৎ, বিদ্যার্থী রঞ্জন প্রকাশনীর পুস্তিকা, নেতাজী নতুন করে দেখা, আজাদ হিন্দ ফৌজের ডাইরী ইত্যাদি। অনিচ্ছাকৃত ভুল ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থী—লেখক।)

আজাদ হিন্দ ফৌজের সংক্ষিপ্ত দিনপঞ্জী

মহাজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়

১৯৪১ : খৃ: অ: ৭ই ডিসেম্বর প্রাচ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধারম্ভ।

১৯৪২ : খৃ : অ: ১৫ই ফেব্রুয়ারী : সিঙ্গাপুরের পতন।

১৯৪২ : খৃ: অ: ২৪শে জুন : স্বাধীন ভারতসঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

১৯৪২ : খৃ: অ: নভেম্বর-ডিসেম্বর : পেনাং, স্বরাজ সংঘ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের বিশৃঙ্খলা।

১৯৪৩ : খৃ: অ: ১৬ই মে নেতাজী টোকিওতে পৌছান।

১৯৪৩ : ১৮ই এপ্রিল : স্বাধীন ভারত সংঘের যুদ্ধঘোষণা।

১৯৪৩ : ৫ই জুলাই : ভারতের নিকট আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার ও ঘোষণা।

১৯৪৩ : ২৫শে আগষ্ট : সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত।

১৯৪৩ : ২১শে অক্টোবর : অস্থায়ী স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত।

১৯৪৩ : ২২শে অক্টোবর : ঝাঁন্সীর রানী বাহিনী প্রতিষ্ঠিত।

১৯৪৩ : ২৪-২৫শে অক্টোবর : বৃটিশ সাম্রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা।

১৯৪৩ : ৮ই নভেম্বর : আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের হস্তে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সমর্পন।

১৯৪৩ : ৩০শে ডিসেম্বর : পোর্টব্লেয়ারে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

১৯৪৩ : ৮ই জানুয়ারী : রেঙ্গুনে অগ্রবর্তী কেন্দ্রীয় ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত। জেনারেল লোকনাথন শহীদ দ্বীপপুঞ্জের চীফ কমিশনার নির্বাচিত।

১৯৪৪ : ১৯ই মার্চ : আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত ভূমিতে প্রবেশ।

১৯৪৪ : ২২শে মার্চ : অধিকৃত অঞ্চলের প্রথম গভর্ণর।

১৯৪৪ : ১৭ই এপ্রিল : বালক সেনা গঠন।

১৯৪৪ : ৪ঠা জুলাই : নেতাজী সপ্তাহ আরম্ভ।

১৯৪৪ : ২১শে আগষ্ট : বর্ষার জন্য যুদ্ধ স্থগিত।

১৯৪৪ : ২৪শে আগষ্ট : বর্ষা শুরুর জন্য সামরিক অভিযান স্থগিত।

১৯৪৪ : ১৯শে অক্টোবর : আজাদ হিন্দ সামরিক কাউন্সিল গঠন।

১৯৪৫ : ২০শে জানুয়ারী : আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় অভিযান আরম্ভ।

১৯৪৫ : ২৫শে এপ্রিল : আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের রেঙ্গুন ত্যাগ করিয়া ব্যাঙ্ককে আশ্রয় গ্রহণ।

১৯৪৫ : ৩রা মে : আজাদ হিন্দ ফৌজের বৃটিশের হস্তে রেঙ্গুন সমর্পন।

১৯৪৫ : ২৫শে এপ্রিল : শোনান বেতারে যুদ্ধোত্তর বিপ্লব সাধনের জন্য নেতাজীর ভারতবাসীর প্রতি নির্দেশদান।

১৯৪৫ : ৪ঠা জুলাই : বেতার মারফত সিমলা সম্মেলনের বিরোধিতা জ্ঞাপন।

১৯৪৫ : ১৭ই অক্টোবর : ব্যাঙ্কক থেকে বিমানযোগে যাত্রা।

১৯৪৫ : ১৯শে ডিসেম্বর : মাঞ্চুরীয়া বেতারকেন্দ্র থেকে ভারতবাসী ও ভারতীয় নেতাদের প্রতি দেশভাগের প্রশ্নে বিরোধিতার আবেদন।

১৯৪৬ : ১৯শে জানুয়ারী : শুনান মাঞ্চুরীয়া বেতারকেন্দ্র থেকে ভারতবাসী ও নেতাদের প্রতি দেশভাগের প্রশ্নে বিরোধিতার ব্যাপার সতর্কিকরণ সহবক্তৃতাদান।

১৯৪৬ : ১৯শে ফেব্রুয়ারী : মাঞ্চুরীয়া বেতারকেন্দ্র থেকে ভারতবাসী ও ভারতীয় প্রত্যেক নেতার প্রতি দেশভাগের কু-ফল সম্পর্কে সতর্কিকরণ সহবক্তৃতাদান।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র মহাজীবনের ঠিকুজী
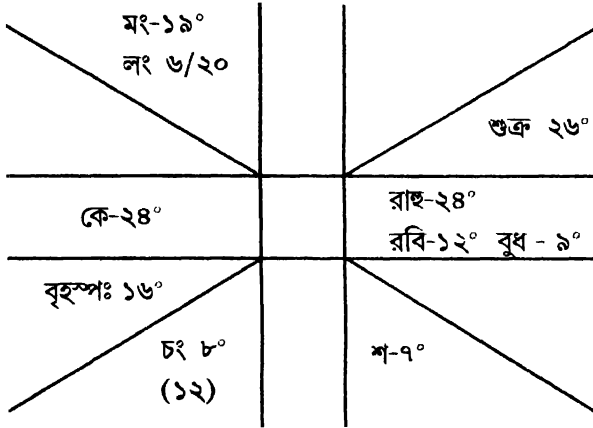
"বিধাতার সৃষ্টির রহস্য অজ্ঞাত সবার।"

"স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা না জানন্তি কুতঃ মনুষ্য।"

শকাব্দ ৮১৮/৯/৯/১৬/১৩/০ শনিবার, জন্মস্থান কটক।

সূর্যোদয় প্রাতঃ ঘ ৬/৪৫ মিনিট।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর কোষ্ঠী বিচার ও পরমায়ু বিশ্লেষণ বহু খ্যাতিমান জ্যোতিষীগণ ইতিমধ্যে করেছেন। কিন্তু খুব কম সংখ্যক জ্যোতিষীই এ পর্যন্ত তাঁর পরমায়ু সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন।

জন্মদিন : শনিবার, ২৩শে জানুয়ারী, ১৮৯৭ইং

বা ১৩০৩ সন, ১১ই মাঘ।

কন্য রাশি : বৃষ লগ্ন। উত্তর-ফাল্গুনী নক্ষত্র।

জন্মক্ষণ/লগ্ন : ১২-৪২-১২ সে : কটক/উড়িষ্যা।

'স্মরণে মননে' — পুস্তকে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন—

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আয়ু ১২০ বৎসরের অধিককাল।

" যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে 'পূণ্যভূমি'—নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তাহা আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যে একটি আপোষকামী সংগঠন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তার জন্ম থেকেই আমরা দেখছি এইরূপ কর্মধারা, ঐ আপোষের প্রবাহ্ ধারারই প্রতিফলন হয়েছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্থাৎ Transfer of Power এর চূড়ান্ত পরিণতিতে। আজ স্বাধীনতার অর্দ্ধ শতাব্দীপরও একই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। তা হবে নাই বা কেন? কারণ জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম দাতাও তো বৃটিশ অ্যানি বেসান্ত ছাড়া লক্ষ্ণৌর D.M. Alen Octovious Hum নামক এক ইংরেজ ছিলেন কংগ্রেসের জনক। এমন সংস্থা সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ড মেনে নেয় কেমন করে? তাই তো সুভাষ কংগ্রেসের চক্ষুশূল।

১৯৪৪ সালের ১৪ই এপ্রিল মণিপুরের মৈরাং-এ স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় পতাকা উঠিয়েছিল—আজাদ হিন্দ বাহিনী। তখন নেতাজীর আজাদ হিন্দ সরকার বৃটিশ ভারতের এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল আজাদহিন্দ সরকারের প্রশাসনভুক্ত করেছিল। সেটাই ছিল স্বাধীন ভারতের প্রথম অস্তিত্ব।—এই ঐতিহাসিক জয়ের ফলেই বৃটিশের ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ। একথা বলেছেন লর্ড এ্যাটলী। এর পরও বৃটিশ পদলেহিরা বলে—সুভাষচন্দ্র ব্যর্থ। তার চেয়ে দুর্ভাগ্য কী হতে পারে? জাতির কাছে জাতীয় ইতিহাসের কাছে!

সুভাষচন্দ্রের মাতুল বংশাবলী

হাটখোলার দত্ত বংশ

কাশীনাথ দত্ত নেতাজীর মাতামহ (গ্র্যাণ্ডফাদার) বীরনগর

- প্রথম কন্যা — রমেশ মিত্রের স্ত্রী
  - নরেন মিত্র
  - নিবারণ মিত্র
  - কন্যা : সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের স্ত্রী
  - শ্রীবিনোদ মিত্র
  - শ্রীপ্রভো মিত্র
- প্রথম পুত্র — গঙ্গানারায়ণ দত্ত সুভাষচন্দ্রের গ্র্যাণ্ডফাদার
  - সুরেন্দ্র
  - যতীন্দ্র
  - প্রভাবতী বোস, সুভাষচন্দ্রের মা রায়বাহাদুর জানকীনাথ বোসের স্ত্রী, কটকের
    - প্রমীলা — মুন্সেফ সুশীল কুমার মিত্রের স্ত্রী
    - সরলা — পাটনার এ্যাডভোকেট বিশ্বেশ্বর দে'র সহধর্মিণী
    - সতীশ
    - শরৎ
    - সুরেশ
    - সুধীর
    - সুনীল
    - তরুবালা — ডা: রাধাবিনোদ রায়ের/সহধর্মিণী
    - **নেতাজী সুভাষ**
    - মলিনা — সলিসিটর দত্তের স্ত্রী
    - প্রতিভা — এ্যাডভোকেট সরোজ কুমার মিত্রের স্ত্রী
    - কনকলতা — জমিনদার হেমেন্দ্র কুমার নলিনী নাথের স্ত্রী
    - শৈলেশ
    - সন্তোষ
  - সত্যবতী, বরদাচরণ মিত্রের স্ত্রী
  - রূপাবতী, বেনারসের উপেন্দ্রনাথ বসুর স্ত্রী/সহধর্মিণী
  - গুণবতী, সাব-জজ চন্দ্রনাথ ঘোষের স্ত্রী/সহধর্মিণী
  - ভূপেন্দ্র
  - যোগীন্দ্র
  - গিরীন্দ্র
  - বীরেন্দ্র
  - ঊষাবতী
  - নিশাবতী ডা: যতীন্দ্রনাথ বোসের স্ত্রী
  - ডা: সত্যেন্দ্র
  - বনেন্দ্র
- দ্বিতীয় কন্যা — হুগলীর সাব-জজ অটল বিহারী বোস,
- তৃতীয় কন্যা — রায়বাহাদুর হরিবল্লভের স্ত্রী কটকের
- দ্বিতীয় পুত্র — জ্ঞানেন্দ্র নাথ দত্ত
  - সুরবালা
  - মণীন্দ্র
  - বিভাবতী
  - রবি দত্ত — বিখ্যাত ভাষাবিদ কবি ও পণ্ডিত
- চতুর্থ কন্যা — ডা: মহেন্দ্রনাথ বোসের স্ত্রী খিদিরপুরের

অরুণেন্দ্র

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পিতৃ বংশাবলী

চতুর্দশ অধ্যায়

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল, প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-দের কথা সত্য, না লক্ষ্মী সেহগলের কথা সত্য? ভারতবাসী কার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবেন?

(১)

"বিমান-দুর্ঘটনাতেই মৃত্যু নেতাজীর" বলেন লক্ষ্মী সেহগল।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ঠা ডিসেম্বর ২০০০

আজকাল প্রায়শই শোনা যায় অমুকবাবু, আহা এমন মহান লোক জগতে বিরল। এমন লোক হয়না, তিনি হচ্ছেন স্বদেশী আমলের স্বদেশী। অর্থাৎ কিনা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সময় স্বদেশযজ্ঞে ছিলেন তিনি নিবেদিত প্রাণ। আবার আর একটি কথা আজকাল আমরা শুনতে পাই যে, অমুক নেতা হচ্ছেন নেতাজীর খুব নিকটের লোক এবং সহকর্মী।

প্রথমেই বলে রাখছি যে, যেকোন সত্যকারের স্বদেশীকে বা নেতাজীর সত্যকারের বা প্রকৃত সহকর্মী যিনি বা যাঁরা তাঁদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা রেখে যারা বাস্তবিক মেকি ও নিকেলে আবৃত, প্রতিবেদক তাদের সম্পর্কেই ঐরূপ বক্তব্য রাখছেন। বলতে নেই এমন এমন ব্যক্তির পরিচয় দুই একটি ঘটেছে বলেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এইরূপ কথা বলতে [illegible]। এমনি একজন স্বদেশী বলেছিলেন কোন এক প্রেক্ষাপটে যে, সুভাষচন্দ্রকে নাকি বৃটিশরাই কাবুলে পৌছে দিয়েছিলেন। ক্ষোভ রাখতে না পেরে প্রতিবেদক বলতে বাধ্য হয়েছিল—না না মশাই, কাবুল নয় ভুল বলছেন। সুভাষচন্দ্রকে বার্লিন তথা সিঙ্গাপুরে পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিলেন বৃটিশ সরকার। আজ পৃথিবীতে বিশেষ করে যখন ভারতবর্ষের যাবতীয় কিছুই পচেগলে পূঁতিগন্ধময় হয়ে গেছে বা হবার উপক্রম হয়েছে তখন ঐ দুইটি শাখাই বা আমরা বাকী রাখি কোন দুঃখে? যদিও ঐ দুইটি পর্যায় স্বর্গীয় সুষমায় ও আলোকে উদ্ভাসিত, তবু আমরা তাদের মহিমাকে আমাদের ঘৃণ্য কলুষতা দ্বারা নীচে নামাবার চেষ্টা করতে ক্ষতি কি, বাঁধাই বা কোথায়? বরং এই দুটির অঙ্গে কুৎসার কালিমা লেপন করতে পারলে হয়ত বা কোন সরকারী তকমা পেলেও পেয়ে যেতে পারি। সত্য যেমন সত্যই, তার বিকল্প নেই তেমন স্বাদেশীকতা, জাতীয়তাবাদ, এবং নেতাজী সুভাষ দর্শন বা আলো এগুলো তো সেই মার্গীয় বা সেই অনন্য স্তর ও পর্যায়ের এক একটি রূপ মাত্র। কাজেই এসব জিনিষকে আমাদের কোন কারসাজি ও কৃত্রিমতা দ্বারাই সম্পৃক্ত করা যাবে না। এটাই অনিবার্য সত্য।

এবার প্রশ্ন—যারা ঐরূপ দাবী করেন তাদের সকলের ঐ দাবী কি সত্য? নাকি তা আত্মপ্রচার ও আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করবার মিথ্যা প্রচেষ্টা? এর প্রমাণ কিন্তু একটি মামুলি প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। কথিত ব্যক্তির বয়সের পরিমাপটা জানতে পারলেই আসল সত্যটা পরিষ্কার হয়ে যায় কিন্তু। বলাবাহুল্য আজ একজন লোককে, স্বদেশী যুগের স্বদেশী এবং নেতাজীর সহকর্মী প্রমাণ করতে হলে কম করেও ঐ ব্যক্তির বয়েস হতে হবে পঁচাত্তর বা তদোর্ধ্বে। বক্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ঐ জাতীয় স্বঘোষিত তকমা যদি অঙ্গে ধারণ করা যায় তবে যে সমাজে তারা শ্রদ্ধার পাত্র হবেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এমনকি এই অবক্ষয়িত সমাজও কোন পরশমণি পেলে তাঁকে মাথায় স্থান দিতে কার্পণ্য করবে না, করে না। পরশমণি পরশমণিই। তবে হয়ত বলবেন এমন সৎ ও আদর্শবাদী কি কেউ নেই? অবশ্যই আছে, নইলে সমাজ চলছে কেমন করে? এ জাতীয় যাঁরা তাঁরা চিরকালই নমস্য। এবং যখনই তাঁরা ঐ জগতের হবেন তখনই দেখব তাঁরা শুধু নমস্য নয়, তাঁরা অনুকরণীয় গোটা সমাজের, গোটা দেশের। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি? ঐরূপ যারা দাবিদার তাদেরই তো দেখছি পথভ্রান্ত হয়ে বিভ্রান্তিতে নাস্তানাবুদ। যদি তাই হয়ে থাকে। তাদের দশা, তবে অন্যরা কতখানি ভ্রান্তপথের পথিক হবে, তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী হয়ে, স্বদেশী আদর্শে নিবেদিত হয়ে, তাঁদের পদস্খলন কি মেনে নেওয়া যায়? অথচ ঐরূপ যাঁরা দাবী করেন আজকাল প্রায়শঃ দেখা যায় তাঁরা আর তাঁদের পূর্বের ভাবাদর্শে এতটুকু শ্রদ্ধাশীল তো নয়ই পরন্তু বিপরীত মেরুর লোক।

স্বদেশ নিবেদিত প্রাণ, সুভাষ ভাবাদর্শে, সুভাষ সহচর্য্যে উজ্জীবিত অথবা সুভাষ সহকর্মী—এগুলো তো শাশ্বতের অপর নাম। আদর্শই যখন জলাঞ্জলি দেওয়া হলো তবে আর ঐসব মহান কর্মের মহান ঐতিহ্যের দোহাই কেন? তবে কি ধরে নিতে হবে যাঁরা ঐসব আদর্শের পেছনে তখন ধাবিত হয়েছিলেন তাঁরা ঐ সম্পদ দুইটিকে মূলধন রূপে দেখেছিলেন? এবং আপন আপন লালসা চরিতার্থ করতে সেখানে গিয়েছিলেন? সেই মূলধনও নাগালের বাইরে চলে গেলো আর তাদের নগ্ন রূপটিও প্রকাশিত হয়ে পড়ল। তাই যদি না হবে তবে এমন ঘৃণ্য পদস্খলন হবে কেন? আদর্শের প্রতি আনুগত্য থাকলে কি বিপরীত ধর্মী হয়? প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, বিভী'র প্রতিষ্ঠাতা সর্বাধিনায়ক বিপ্লবী বীরশ্রেষ্ঠ হেমচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন যে, যে হাত দুটি দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র চরণতীর্থের পদরজ মাথায় তুলে নিয়েছি সেই হাতে এমন কি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নিকটও মাথা নত করবো না বা রবীন্দ্রনাথের চরণ রজও স্পর্শ করবো না। একেই বলে আদর্শের পরাকাষ্ঠা। তা হলে বলতে বাধ্য, যাঁরা সুভাষ যাদুতে, আদর্শতে এবং স্বাদেশিকতার শাশ্বত কর্মের পরিণতির দিকে একদিন ছুটে গিয়েছিল তা শুধু ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াসে। তা ছাড়া তাঁদের কি যুক্তি থাকতে পারে?

যদিও একথা নিজমুখে তাঁরা কখনও স্বীকার করতে পারবে না বা পারে না। আসলে এ-কথাই হচ্ছে আসল সত্য।

আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল একদা আজাদ হিন্দের সামরিক কর্মী শ্রীযুক্তা লক্ষ্মী সেহগলের উক্তি দিয়ে। আসুন এবার আমরা লক্ষ্মী সেহগলের সেই আনন্দবাজারে প্রকাশিত উক্তিটির একটু তাৎপর্য অনুশীলন করতে চেষ্টা করি। তিনি বলেছেন বলে যে বয়ানটি প্রকাশিত তা হচ্ছে—

"বিমান দুর্ঘটনাতেই মৃত্যু নেতাজীর" বলেন লক্ষ্মী সেহগল।

—আনন্দবাজার, ৪ঠা ডিসেম্বর ২০০০ সাল

এই বয়ানই আনন্দবাজারে প্রকাশিত এবং সেই সাথে লক্ষ্মী সেহগলের আরও অনেক কিছু দৃপ্ত দাবী ও বক্তব্য রয়েছে। লক্ষ্মী সেহগল বলছেন—প্রথমে সুভাষচন্দ্রের বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংবাদটি বিশ্বাস করেননি। "প্রথমে যা ছিল তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য, সেটা যে সত্য দু-একদিনের মধ্যেই তা জানতে পারেন তিনি। ঘটনা প্রবাহ মেনে বিশ্বাসও করেন, ১৯৪৫-এর ১৮ই আগষ্ট তাইপেই বিমান বন্দরে বিমান দুর্ঘটনাতেই মারা গিয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।" ....
.... "নেতাজীর মৃত্যু নিয়ে যাঁরা গালগপ্প ফাঁদেন, আমার কাছে তাঁরা দেশদ্রোহী।"

—আনন্দবাজার, ৪ঠা ডিসেম্বর ২০০০ সাল

বলাবাহুল্য লক্ষ্মী সেহগল এইটুকু বয়ান ছাড়াও অনেক কিছু আরও বক্তব্য রেখেছেন, যা ঐ দিনকার প্রভাতী আনন্দবাজারে প্রকাশিত।

এবার প্রশ্ন, আমরা দেশের আপামর সাধারণরা কার কথা বিশ্বাস করবো? তা যদি লক্ষ্মী সেহগল ও তাঁর অনুরাগীরা বাতলে দেন তবে আমরা কৃতার্থ হই। আমরা কি মাননীয়া লক্ষ্মী সেহগলের কথাই স্বতঃসিদ্ধ মানবো, না কি নীচে উল্লেখিত বিশ্ববিখ্যাত মহামান্যদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবো?

প্রথমেই ধরা যাক স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মাননীয় পণ্ডিত জওহরলালজীর স্বীকারোক্তি। হয়ত অনেকেই আঁতকে উঠবেন নেহেরু সাহেবের কথা বলতেই। যা কোন হিসাব কিতাবেই মেলানো মুশকিল। আপনারা অনেকেই বলবেন, নেহেরু সাহেব তো সেই ১৯৪৫ সাল থেকে আজীবন বলেছেন নেতাজী সুভাষ যে 'মৃত'—তা একটি স্থায়ী ঘটনা। এ ঘোষণাতো তিনি ভারতীয় সর্বোচ্চ আমআদালত লোকসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন দৃপ্তকণ্ঠে। বলতে নেই এই প্রতিবেদকও আপনাদের সাথে এক মত। কিন্তু নেহেরু সাহেব যে মৃত্যুর কিছুদিন আগে সত্যের সঙ্গে আপোষ করে আত্মসমর্পণ করে গেছেন, তা কি সকল দেশবাসীর কাছে জানা? আর তা যদি জানাই থাকে তবে তা খণ্ডন করতে চাইলেও কি কেউ খণ্ডন করতে পারবেন? তিনি কি প্রেক্ষাপটে কি বলেছিলেন কাকে বলেছিলেন আসুন তা একটু পর্যালোচনা করি।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর বড় ভাই শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বসুর প্রেরিত ও জিজ্ঞাসিত পত্রের

ও প্রশ্নের উত্তরে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল যা উত্তর দিয়েছিলেন আসুন তাঁর উত্তর সম্বলিত পত্রখানিতে কি আছে দেখি। সুরেশ বসু নেহেরু সাহেবকে পত্রখানি লিখেছিলেন ১২ই মে ১৯৬২।

হুবহু নেহেরুর পত্রের xerox কপির নকল এখানে নীচে উদ্ধৃত করা হলো।

PRIME MINISTER HOUSE
NEW DELHI

প্রধান মন্ত্রী ভবন
PRIME MINISTER'S HOUSE
NEW DELHI

No. 704-PM/62

May 13, 1962.
MAY 13, 1962

Dear Shri Suresh Bose,

I have your letter of the 12th May. You ask me to send you proof of the death of Netaji Subhas Chandra Bose. I cannot send you any precise and direct proof. But all the circumstantial evidence that has been produced and which has been referred to in the Enquiry Committee's report has convinced us of the fact that Netaji has died. In addition to this, the lapse of time now and the extreme probability of his being alive and not showing himself when he would be welcomed in India with great joy and affection, adds to that circumstantial evidence.

Yours sincerely,

(পড়বার সুবিধার্থে পত্রটি নতুন করে মুদ্রণ করা হলো।)

No : 704–PMH/62,
16.05.1962

Prime Minister's House,
New Delhi
May 13, 1962

Dear Shri Suresh Bose,

I have your letter of the 12th May. You ask me to send you proof of the death of Netaji Subhas Chandra Bose. I cannot send you any precise and direct proof. But all the circumstantial evidence that has been produced and which has been referred to in the Enquiry

Committee's report has convinced us of the fact that Netaji has died. In addition to this lapse of time now and the extreme probability of his being alive secretly somewhere. When he would be welcomed in India with great joy and effection adds to that circumstantial evidence.

Yours sincerly,
Jawaharlal Nehru

উপরের পত্রখানি ছিল পণ্ডিত জওহরলালের লেখা সুরেশ বসুর পত্রের জবাব। আসুন এবার আমরা এই পত্রখানি নিয়ে একটু বিচার বিশ্লেষণ ও অনুশীলন করি। তাতে কি পাওয়া যায় দেখা যাক। যে পত্রটি সুরেশ বসু লিখেছিলেন তার তারিখ ছিল ১২ই মে ১৯৬২ সাল। স্মরণীয় সুরেশ বসু ছিলেন সুভাষচন্দ্রের বড় ভাই, এই পরিচিতিই যথেষ্টর চেয়ে বেশী। তবুও সুরেশচন্দ্রের আর একটু পরিচয় ছিল, তা হচ্ছে নেতাজী সংক্রান্ত শাহনওয়াজ কমিশনের অন্যতম সদস্য। সুভাষচন্দ্র বসুর তথাকথিত মৃত্যুকে নিয়ে যে কমিশন (প্রহসন কমিশন) পণ্ডিত জওহরলাল ঘোষণা করেছিলেন (করতে বাধ্য হয়েছিলেন) সেই কমিশনের যখন চূড়ান্ত রায় বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয় তখন কিন্তু সুরেশ বসু কমিশনের অপর দুই সদস্য শাহনওয়াজ খাঁন, এবং এস. এন. মৈত্র এই দুই সদস্যের সঙ্গে সহমত হতে পারেননি। অপর দুই সদস্য যদিও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিমান দুর্ঘটনায়ই মৃত্যু হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু তৃতীয় সদস্য সুরেশ বসু তাদের সিদ্ধান্ত মানতে না পেরে পরে তিনি ভিন্নমত পোষণ করেন এবং সেই অনুসারে একটি বেসরকারী রিপোর্টও প্রকাশ করেন। যে রিপোর্ট ভারত সরকার তথা পণ্ডিত জওহরলালজীর নিকট কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। এমন যে সুরেশচন্দ্র বসু, তাঁরই এক পত্রের জবাব কিন্তু জলহরলালজীর কোন অবস্থায়ই দেবার কথা নয়। কিম্বা তার উত্তর দিলেও সেই উত্তর অবশ্যই নেগেটিভ হবার কথা। কোন অবস্থাতেই Positive হবার কথা নয়। তাছাড়া এত তড়িৎগতিতেও দেবার কথা নয়। কারণ ইতিপূর্বে যে নেহেরু সাহেবের মতিগতি ছিল নেতাজী সুভাষ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাতে অন্তত সে কথাই প্রমাণিত। তা সত্বেও তিনি মারা যাবার মাত্র অল্পকাল পূর্বে এমন দৃষ্টির পরিবর্তন কোন যাদুতে? তবে কি তাঁর বিবেক দংশন শুরু হয়েছিল? Circumstantial evidence অনুসারে যদি সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুই একমাত্র লক্ষ্য বা প্রমাণ, তবে আবার In addition to this the lapse of time now and the extreme probability of his being alive secretly somewhere. এইরূপ সম্ভাবনার কথা স্বীকার করার অর্থই বা কি? এসব কথার মানে কি? এর মানে কি বিপরীত তাৎপর্যই স্বীকার করা নয়? এর যে গূঢ় অর্থ তা পণ্ডিত নেহেরু অতি উত্তমরূপেই জ্ঞাত ছিলেন। এক কথায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যে জীবিত তা তিনি ভালোভাবেই জানতেন। এবং জানতেন বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন—

"If Subhas comes I will resist him with sword".

এই ঐতিহাসিক উক্তি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর তথাকথিত মৃত্যুর পরের ঘটনা। শোনা যায় এই প্রেক্ষাপটে জাতির জনক গান্ধীজীর সাথেও নেহেরুর বাক্যবিনিময় ও বিতণ্ডা ঘটেছিল। এছাড়াও নেহেরুর আরও স্বীকার উক্তি আছে ভিন্নপন্থায়। আসুন সেই ব্যাপারটাও একটু দেখি।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু বা অন্তর্ধান সংক্রান্ত যে বিচারপতি খোসলাকে one man commission করে committee গড়েছিলেন তার একুশ নম্বর সাক্ষী ছিল শ্যামলাল জৈন। তিনি ছিলেন আই. এন.-এর ডিফেন্স কমিটির স্টেনোগ্রাফার। তিনি খোসলা কমিশনে সাক্ষ্য প্রদানের সময় বলেছেন, নেহেরু তাঁকে দিয়ে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি টাইপ করিয়েছিলেন। সেই চিঠিটি ছিল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিম্যান্ট এ্যাটলির নিকট নেহেরুর লেখা। সেই চিঠিতে নেহেরু সাহেব লিখেছিলেন,

Dear Mr. Atlee—

I understand from a reliable source that Subhas Chandra Bose your war-criminal, has been allowed to enter Russian territory by Stalin. This is a clear treachery and betrayal of faith by Russians. As Russia has been an alley of British-Americans, it should not have been done.

Yours sincerely,

Jawaharlal

এই চিঠিখানি নেহেরু লিখেছিলেন ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪৫ সাল। এইসব ছাড়াও নেহেরুর এতদ্ সম্পর্কে আরও নথিপত্র আছে যা এই স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। তবু এখানে একটি তথ্য না দিলেই নয়। তা হচ্ছে — ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে সর্বভারতীয় একটি বিপ্লবী সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলন চলাকালে শ্রীনেহেরুর আমন্ত্রণে কতিপয় প্রবীন বিপ্লবী নেতা নেতাজীর প্রসঙ্গ ওঠান ও প্রশ্ন রাখেন। উত্তরে নেহেরু বলেছিলেন—"My lips are scaled. I cannot go beyond Shanawaz Committee's report." *আনন্দবাজার, ৩০/১১/১৯৭০*

এতো গেল নেহেরু পর্ব।

দ্বিতীয়ত: এবার আসুন আমরা ভারতের আর এক প্রধানমন্ত্রী রণছোড়জী মোরারজী দেশাই যিনি ১৯৭৭ সালে জনতা সরকার গড়েছিলেন তাঁর সম্পর্কে ইতিহাস থেকে ঐ বিষয়ে কিছু পাই কিনা দেখি। স্মরণীয় মোরারজী দেশাই সাহেবের পূর্বে আর একজন ভারত কাঁপানো প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন ভারতবাসীর পরম প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি গড়েছিলেন জি. ডি. খোসলা কমিশন। সেই কমিশনের সিদ্ধান্তও ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে জ্যান্ত মারার জন্যই। কিন্তু সত্য তো সত্যই। সেই সত্যের গায়ে অন্তত পর্থিব কেউ স্পর্শ করার ক্ষমতা রাখেনা।

তা যে রাখেনা সেই সত্যের প্রমাণও আমরা ভারতের আর এক প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তেই পেয়ে যাবো। সেই প্রধানমন্ত্রী বেশী কিছু করতে না পারুক অন্তত পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের কর্মকাণ্ডকে অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র বসু সংক্রান্ত মিথ্যা সিদ্ধান্তকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে গেছেন। অন্তত এই একটি মহান কর্মের জন্য তিনি অপেক্ষাকৃত কম গ্ল্যামারের প্রধানমন্ত্রী হলেও ভারতবাসীর কাছে অমর হয়ে শ্রদ্ধা কুড়াবেন। আসুন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পর্কে ঐ বিতর্কিত বিষয়ে তিনি কতটুকু কি করেছেন তা আমরা একনজর দেখি। মোরারজী দেশাই-এর প্রধানমন্ত্রীত্ব কালের যে ঘোষণা তা হচ্ছে,—

Netaji probe reports rejected

(৩৫৮ পৃষ্ঠা—তাইহোকু থেকে ভারত)

New Delhi, August 28 (U.N.I.). The Prime Minister Morarji Desai, informed the Loksabha to-day that the government had rejected the findings of the two enquiry commissisons on the disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose.

Intervening in the discussion on a motion sponsored by Mr. Samar Guha (Janata) on the Khosla Commission of enquiry, Mr. Desai explained that two commissions one headed by Shah Nawaz Khan and the other by justice G. D. Khosla had in their report stated that Netaji had been killed at Taipei Airport on 18th August, 1945.

However, doubts were cast on the findings of the commission,. Subsequently some contraditions had been noticed following unearthing of some documents. The government finds it difficult to except the reports of two commissions, the Prime Minister added.

(Amrita Bazar Patrika)
Dated : 29.08.78

উপরের তথ্যাবলী বলছে ভারতের বিগত দুই প্রধানমন্ত্রী অন্তত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাইহোকু বিমান বন্দরে বিমান দুর্ঘটনায় ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট যে নিহত হন নি তা প্রত্যক্ষভাবে নাহলেও পরোক্ষভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। অথবা পরিস্থিতির কাছে তাঁরা মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছেন। অন্তর থেকে তাঁরা স্বীকার করতে চাননি বলে অতি বিলম্বে হলেও তা শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে উড়িয়ে দিতে পারেননি। পণ্ডিত জওহরলাল যে তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী নেতাজী সুভাষ বসু সম্পর্কে অনেকের চেয়ে অনেক বেশী খবর জানতেন এবং অনেক গূঢ় রহস্যও সুভাষচন্দ্রের গতিবিধি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন তাতে কোন বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এবং নেই বলেই মৃত্যুর পূর্বে জওহরলালজী প্রায়শ্চিত্ত করতে মনস্থির করেছিলেন। এ সম্পর্কে শোনা যায় তিনি নাকি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট আত্মসমর্পণ করতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু অনিবার্যকারণে তা করে

উঠতে পারেননি। সেই কাজটি করতে পারলে যে তিনি সমগ্র ভারতবাসীর নিকট অদ্বিতীয় নমস্য হতেন তাতে সন্দেহ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে একথাও শোনা যায় তাঁর মৃত্যু নাকি স্বাভাবিক নয়। ব্যাপারটা রহস্যাবৃতই রইল যা পৃথিবী আর কোনদিন জানতে পারবে না।

এইসব ঘটনাবর্তের বেড়াজালে যখন তিনি পরিবৃত তখন নাকি তাঁর পরিস্থিতি হয়েছিলেন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি এমন একটা অবস্থা। এই চূড়ান্ত একটা পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছেন বুঝতে পেরেই শেষ পর্যন্ত সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তাই সুরেশচন্দ্র বসুর কাছে ঐরূপ পরোক্ষ স্বীকারোক্তি। পণ্ডিত জওহরলাল সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যে বৈরিতার মনোভাব পোষণ করতেন তার চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হয়েছিল ১৯৪৫ সালে সিঙ্গাপুরে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ও লেডি মাউন্ট ব্যাটেনের সঙ্গে একান্ত রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর। কিন্তু সুভাষচন্দ্র কোনদিনই সেই মনোভাব পোষণ করেননি। তার দুইটি প্রমাণ আমরা জানি। যদিও প্রমাণ দুটিকেই আপনারা বিতর্কিত বলেই সাব্যস্ত করবেন। প্রমাণ দুটির একটি হচ্ছে শৌলমারীস্থিত শ্রীমদ্ সারদানন্দজীর সাথে যখন বিপ্লবীপ্রবর মেজর সত্যভূষণ গুপ্ত ও তাঁর একান্ত সহকর্মী সহকারী শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ দত্ত মহাশয় একান্ত সাক্ষাৎকারে আলোচনায় রত তখন নাকি কোন প্রসঙ্গ ক্রমে বিশ্বজিৎ দত্ত মহাশয়কে সারদানন্দজী প্রশ্ন করেছিলেন—"তোমাদের পণ্ডিত নেহেরুর উপর এত রাগ কিসের জন্য?" এ দ্বারা তিনি যে ব্যক্তিগতভাবে নেহেরুর প্রতি ক্ষুব্ধ নন তারই ইঙ্গিত দিচ্ছেন। আর দ্বিতীয়ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে ২৭শে মে যখন তিনমূর্তি ভবনে নেহেরুর শবাধারটি বিশ্বের রাষ্ট্রীয় অতিথিবৃন্দের প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছিল—তখন মুণ্ডিত মস্তকে যে একজন সাধুজী উপস্থিত হয়ে নেহেরুর শবাধারে লালগোলাপের মালাটি দিয়ে নেহেরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, সেই ব্যক্তিই যে স্বয়ং নেতাজী সুভাষ তাতে দ্বিমত নেই। এমনকি এই ছবি সম্পর্কে যখন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে লোকসভার ৮০ জন সদস্য ছবিটি তাঁকে দেখিয়ে জানতে চেয়েছিলেন,—এবং বলেছিলেন, ছবিটি সম্পর্কে আমাদের মত হচ্ছে ইনি হচ্ছেন আমাদের পরমপ্রিয় নেতাজী। আপনি কি বলেন? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ছবিটি দেখেই বলে দেবো ওটা কার ছবি। ছবিটি হাতে দেবার পর তিনি কিন্তু আর *কোন উত্তরতো দেনই নি, এমনকি এ ব্যাপারে আর কোন উচ্চ্যবাচ্যই করলেন না।* (বক্তৃতামালা-স্বামী আনন্দভারতী) ছবিটির Flim No. ছিল 816 B, এটি ভারত সরকারের প্রচার দপ্তরের প্রমাদবশত প্রচারিত। এর ফলে ভারত সরকার আজও বিব্রত। এসব ব্যাপারগুলোই প্রমাণ করছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জওহরলালকে কখনও অশ্রদ্ধা করতেন না। বৈরিতার তো প্রশ্নই নেই। বৈরী মনোভাব পোষণ করলে শ্রদ্ধার্ঘ্য *দেবার প্রশ্নই কি অবান্তর নয়? এ বিচার পাঠকের বিবেকের ন্যায়লয়েই রইল। এইসব তথ্যই বলছে জওহরলাল অনন্যো উপায় হয়ে আত্মদংশনে পরে সত্য স্বীকার করতে* বাধ্য হয়েছেন যাতে ইহকালের পরে তিনি কলঙ্ক মুক্ত হতে পারেন। অন্তত সুভাষচন্দ্র

তাঁকে ক্ষমাই করবেন তা তিনি ভালোভাবেই জানতেন।

তৃতীয়ত: এবার আমরা ভারতবাসীর বিচারে যিনি ভারতবর্ষের তথা শতাব্দীর শীর্ষ ও বরেণ্য ব্যক্তি, সেই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এ ব্যাপারে কি জানতেন ও কি চেয়েছিলেন তা নিয়ে একটু পর্যালোচনা করা যাক। সুভাষচন্দ্র যে গান্ধীজীকে সম্মানের চূড়ায় বসিয়েছিলেন, তা এক কথায় কালজয়ীতো বটেই। এমনকি অমর, অবিনশ্বর বললেও ভুল হবে না। কারণ ভারতবর্ষ পৃথিবীর বুকে যতকাল বেঁচে থাকবে অন্তত ততকাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের প্রদত্ত যে সম্মান ও মর্যাদা গান্ধীজীকে দিয়েছিলেন তাও বেঁচে থাকবে। সুভাষচন্দ্রই গান্ধীজীকে ভারতীয় জাতির 'জনক'—উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সেই গান্ধীজী যতই ভুল করে থাকুন না কেন—সেই ভুলেরও প্রায়শ্চিত্ত তিনি বিভিন্ন ভাবেই করেছেন এবং করবার চেষ্টা করেছেন। ১৯৪২ সালের পর থেকে অন্তত গান্ধীজীর সুভাষ সম্পর্কে কোন বিভ্রান্তি ছিল না। এর বহু প্রমাণ ইতিহাসে আছে। তাই গান্ধীজী বলতে পেরেছিলেন,

"Whatever you may tell me to the contrary still believe in my heart of hearts that Netaji Subhas Chandra Bose is alive. The information that the above positive statement was made by Mahatma Gandhi during his talk with Maj. Gen. Shahnawaz and Cor. Sehgal. (15 March 1946, H.Standard)

এই ছিল জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতিক্রিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিমান দুর্ঘটনায় তথাকথিত মৃত্যু সম্পর্কে। এছাড়া আরও তথ্য গান্ধীজীর জানা ছিল, তার কিছু কিছু আমরা এই পুস্তকের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটেও পর্যালোচনায় আলোচনা করেছি। বলাবাহুল্য গান্ধীজী যে সেহগলের সঙ্গে ১৫ই মার্চ, ১৯৪৫ বোম্বাই-এ কথা বলেছিলেন তিনিই হচ্ছেন এই লক্ষ্মী সেহগল।

চতুর্থত: এসব ছাড়া অর্থাৎ ভারতের ঐসব মহান শীর্ষতম ব্যক্তিরা ছাড়া সমকালীন ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে আরও যে সব ব্যক্তিদের এতদ্ সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু কিছু মূল্যবান নজির পাওয়া যায় তেমন আরও দুই-একটি নজির এখানে সন্নিবেশিত হতে পারে। এরূপ একটি ঘটনা হচ্ছে—"শ্রী সৌরেন্দ্রমোহন গোস্বামী বলেন যে ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে কলিকাতায় একবিশেষ সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড: রাধাকৃষ্ণাণ তাঁকে বলেন যে, ১৯৪৮ সালে রাশিয়া সফরকালে তাঁর সঙ্গে মস্কোয় নেতাজীর দেখা হয়েছিল। শ্রীগোস্বামী একজন অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপর্যায়ের সরকারী অফিসার। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী করেন যে ড: রাধাকৃষ্ণাণ যদি এই কথা অস্বীকার করেন তবে তিনি তাঁর সামনে আত্মহত্যা করবেন। .....একথাও সংবাদপত্র মারফত জনগোচরে আসে যে যখন মাদ্রাজে তদন্ত কমিশন বসবে তখন ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ড: রাধাকৃষ্ণাণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত তা করা হয়নি কোন অদৃশ্য কারণে।"

(সঙ্কলন : তাইহোকু থেকে ভারত। পৃষ্ঠা—৩৫৩, প্রথম খণ্ড)

পঞ্চমত: বলাবাহুল্য ঐ সকল ভারতবরেণ্য দেশনায়করা ছাড়া ভারত তথা পৃথিবীর আনাচে কানাচে অনুসন্ধান করলে এ ব্যাপারে আরও ভূঁরি-ভূঁরি সংবাদ এখানে পরিবেশন করা যেতে পারে। তবে আমরা আর বিস্তৃতি আলোচনায় না গিয়ে মাত্র দুই-একজন ব্যক্তির বক্তব্য ও মতামত পর্যালোচনা করে এ প্রসঙ্গের পূর্ণচ্ছেদ টানবো। "**খোসলা কমিশনের সামনে শ্রীজগদীশ কোড়েসিয়া জানান যে ১৯৬১ সালে দালাতের বিশপ তাঁকে বলেছেন যে, যেদিন বি. বি. সি. থেকে নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয় সেইদিন রাত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর সঙ্গে দালাতে ছিলেন।** শ্রীকোড়েসিয়া আরও জানান যে, তিনি তাঁর ডায়েরীতে দালাতের বিশপের নামও তাঁর সঙ্গে কথোপকথন লিখে রাখেন এবং স্বদেশে ফিরেই সেই ডায়েরী তিনি তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থকে পাঠিয়েছেন। মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হবার দিনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বয়ং সায়গনের এক গ্রীষ্মাবাসে দালাতে ছিলেন। একথা জানাতে প্রয়োজন হলে দালাতের বিশপ ভারতে আসতেও রাজী, এই তথ্য শ্রীকোড়েসিয়া কমিশনকে জানান।

খোসলা কমিশন-এর সামনে সাক্ষ্য দিতে এসে **আজাদ হিন্দ বাহিনীর কর্ণেল ঠাকুর সিং জানান যে ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে আম্বালায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর একজন অফিসারের বাড়ীতে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ পান। তখন নেতাজীর পরনে ছিল গৈরিক পোষাক। তিনি তিন ঘন্টা ধরে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন,"**.....।
(সঙ্কলন : তাইহোকু থেকে ভারতে : প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৫৬, শ্রীঅভিজিৎ সরকার)

এইসব ছাড়াও অনেক তথ্য আছে ও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গও জননেতার এ ব্যাপারে মূল্যবান বক্তব্য আছে যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আজও কর্মব্যাপদেশে ব্যাপৃত। এমন ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন স্বনামধন্য ৺শরৎচন্দ্র বসু, ৺মথুরা-লিঙ্গম থেবর প্রভৃতি। এছাড়া বহির্ভারতে যাঁরা আছেন, তাঁরা তো এশিয়া কাঁপানো এক একজন ব্যক্তিত্ব। তাদের মধ্যে আছেন—লর্ড মাউন্টব্যাটেন, জেনারেল ম্যাক আরথার, বর্তমান পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফিল্ডমার্শাল আয়ুব খান, নেতাজীর অন্তরঙ্গ সহকর্মী ও আই. এন. এ.-র কর্ণেল হবিবুর রহমান এবং অখণ্ড ভারতের পূজারী ও বর্তমান পাকিস্তানের নাগরিক ৺আবদুল গফর খাঁন বা সীমান্ত গান্ধী।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের যে লক্ষ্মী সেহগল ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের প্রতি, এইসব মহামান্য ব্যক্তিবর্গরা কি সবাই দেশদ্রোহী? একজন ঝানু পুলিশের বড়কর্তা একজন বিপ্লবীকে বলেছিলেন যে, আমরা যখন অপরের দোষ নির্ণয় করতে তর্জনী উঠিয়ে সেই ব্যক্তিকে দোষরোপ করি তখন আমাদের তর্জনী প্রদর্শিত হাতের মুষ্ঠিবদ্ধ অবস্থানেতে দেখা যায় একটি অঙ্গুলী দোষী ব্যক্তির দিকে উচিয়ে থাকে এবং বাকী সমস্ত অঙ্গুলীই থাকে নিজের দিকে ঘুরানো। এতে যা প্রকাশিত হচ্ছে সেটাই হচ্ছে আসল সত্য। বলাবাহুল্য লক্ষ্মী সেহগল প্রথম ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারেন নি কিন্তু দ্দিন যেতেই ঘটনা প্রবাহ তাঁকে বলে দিল বা বুঝিয়ে দিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের

বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল। অথচ উপরে উল্লেখিত রাষ্ট্রনায়ক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুদক্ষ ও পৃথিবী কাঁপানো সমরনায়করা হয়ে গেলেন মিথ্যা তথা বুরবাক। যে কারণে তাঁরা আজও সিদ্ধান্তে তো আসতেই পারেনি পরন্তু ঐ তথ্য উদ্ধার করতে গিয়ে তাঁদের প্রজন্মান্তরও আজ দিশেহারা পথভ্রান্ত!

এখানেই এ অধ্যায় শেষ নয়। এবার আসুন আমরা একটু লক্ষ্মী সেহগল, এই মহোদয়ার নামের কি তাৎপর্য, তা একটু অনুশীলন করি। দেখা যাক এই নামটির মাঝে কি মাহাত্ম্য লুকিয়ে আছে। যেহেতু তিনি একদা নেতাজীর সাহচর্যলাভ করেছিলেন এবং আই. এন. এ.-র একজন কর্ণেল পদাধিকারিণী ছিলেন সেইজন্য বড় বড় হরফে তাঁর বয়ান কাগজে ফলাও করে মুদ্রিত হলেই তা স্বতঃসিদ্ধ হবে এমনটি ভাববার কারণ কি? কারণ তো একটাই সুভাষ সহযোগী বা সহকর্মিণী। সুতরাং জনগণ তাঁর কথাই অম্লানে গিলে ফেলবে, এটাই প্রচারকদের ধারণা। বেশ যদি তাই মেনে নেওয়া যায় তর্কের খাতিরে, তবে এটাও তো সত্য যে সুভাষ আলোয় আলোকিত না হলে তাঁর বাজারে কানাকড়িও মূল্য নেই। তবে কি তিনি সুভাষ আলোর পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে? এ থেকে কি তবে ধরে নিতে পারি আমরা যে সুভাষ আলোয় অবগাহন করলে তিনি সারাদেশের শ্রদ্ধা অর্জন করবেন এটাই ছিল তাঁর গোপন সিদ্ধান্ত ও উদ্দেশ্য এবং তারপর তাই মূলধন বা পুঁজি করে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করবেন। 'লক্ষ্মী সেহগল' তো লক্ষ্মী সেহগল হয়েছেন সুভাষ মহিমায় ও করুণায়। নইলে এমন লক্ষ্মী সেহগল তো আই. এন. এ.-তে অনেক ছিল, তাদের কে চেনেন? আর কোন দেশবাসীই বা তাদের নাম করেন? তা হলে দেখা যাচ্ছে, তাঁর সুভাষ অনুসরণ শুধু করে-কম্মে খাবার প্রয়াসে। নইলে তাঁর কতটুকু মূল্য! আজ তিনি যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন সেটাতো সেই সুভাষ নাম মাহাত্ম্যের কৃপার দান। তাই শেষকালে অনুরোধ দোহাই লক্ষ্মী সেহগলজী সুভাষ নাম মাহাত্ম্যে নামী দামী হয়ে সেই নামের আর অমর্যাদা করবেন না। কারণ আপনি যেদিন থাকবেন না—অথচ আসল সত্যও একদিন প্রকাশ হবেই, সেদিন কিন্তু আপনার বা আপনার মত যাঁরা তাদের জন্য ইতিহাসে কলঙ্কের সীমা থাকবে না। তাই আবার অনুরোধ করছি সোনার গিলটি কখনও আসল স্বর্ণালঙ্কার হতে পারে না। পৃথিবীতে তা কোন কালেই হয়ওনি হবেও না। অনেক তো মর্যাদা লাভ করেছেন সুভাষ যাদুতে, আর মিথ্যা লালসার স্বীকার হয়ে আত্মগ্লানির পথ করবেন না! এবার যদি বলেন আপনিই সত্য আর ঐসব দেশবিদেশ খ্যাত এমনকি বিশ্বের বরেণ্যরাও মিথ্যা, দেশদ্রোহী তবে তথাস্তু। কোন প্ররোচনার স্বীকার না হয়ে নিজের বিচার বুদ্ধিতে চলাই মানুষের সঠিক পন্থা। ইংরেজীতে যাকে বলে self-judgement is the best judgment বলাবাহুল্য কানপুর গিয়েই লক্ষ্মী সেহগল বিপরীত বক্তব্য রেখেছেন। এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কি হতে পারে?

(২)

রহস্যের মাঝে রহস্য

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের পর বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের সামরিক শাখার একমাত্র ভারতীয় সদস্য শ্রী বি. সি. চক্রবর্তীর নিকট—'রহস্য পুরুষ নেতাজী' পুস্তকের লেখক অরুণ ঘোষ সুভাষচন্দ্র বসুর গৃহত্যাগ সম্পর্কে দুইটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এই ঘটনা দুইটির আনুপার্বিক চিত্র যা লেখক বর্ণনা দিয়েছেন সেই চিত্র দুইটি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে আমরা কি কি পেতে পারি আসুন তা একটু চর্চা করে দেখি।

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান কবে?

১৬ই জানুয়ারী ১৯৪১, না ১৭ই জানুয়ারী ১৯৪১ সাল?

'রহস্য পুরুষ নেতাজী' পুস্তকের বয়ান অনুসারে আমরা পাই— ....."সুভাষচন্দ্রের স্বদেশ থেকে অন্তর্ধানের বা চলে যাবার ব্যাপারে দুইটি চিত্র লেখক বর্ণনা করেছেন। কোন্‌টি আসল আর কোন্‌টি নকল তা তিনি স্বয়ং ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। একটি ঘটনা ১৬ই জানুয়ারী অপরটি ১৭ই জানুয়ারী। প্রথমটির নায়ক রতনপুরের নবাব স্বর্গীয় জে. পি. ফারুকী এবং দ্বিতীয়টির নায়ক শ্রী শিশির কুমার বসু। কাহিনী দুইটি নিম্নরূপ :—

১৯৪১ সালের ১২ই জানুয়ারী ৩৮/২, এলগিন রোড ভবনে সরকারীভাবে ঘোষিত অসুস্থ সুভাষচন্দ্রের সাথে জনৈক ইনসিওরেন্‌সের ডাঃ জিয়াউদ্দিন নামে পাঠান ভদ্রলোক জীবনবীমা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। প্রহরী ও পুলিশের সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। ডাঃ জিয়াউদ্দিন দেখা করলেন এবং কিছুক্ষণ বাদে যথা নিয়মে কাজ সেরে চলেও গেলেন। এই জিয়াসাহেব সোজা এসে উঠলেন ১০বি পদ্মপুকুর রোডে তিনকড়ি মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে। তারপর কখন তিনি প্রত্যাগমন করলেন সেই সময়টা সঠিক জানা যায়নি। ১৬ই জানুয়ারী রাত ১০ ঘটিকার কিছু আগে ঐ পদ্মপুকুরের বাড়ীতে রতনপুরের নবাব স্যার জে. পি. ফারুকী তাঁর রোলস রয়েস গাড়ীখানি করে উপস্থিত হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ কলিকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার শ্রীরসিক বসু এবং ভবানীপুর থানার বড় দারোগা আর এক রসিক বসু উপস্থিত হলেন। দুই রসিক বসুর মাঝে চরণ ও লালের ব্যবধান ছিল। ফারুকী সাহেবের গাড়ী যখন চলে যায় ফারুকী সাহেবকে নিয়ে তখন নবাবের গাড়ীতে আর একজন নবাবের বেগম রূপে বোরখা পরিহিতা জনৈকা বিশিষ্টা মুসলমান মহিলাকে চলে যেতে দেখা গেল গাড়ীর ভিতরে।

বৃটিশ আমলে নবাবের গাড়ীতে রাত-বেরাতে তল্লাসি করার অধিকার পুলিশের ছিল না। দেখা গেল গাড়ীটি ঊর্ধ্বশ্বাসে বাংলা ছেড়ে পশ্চিমদিকে রওয়ানা হয়ে গেল। ঐই ঘটনার দিনচারেক পরে বৃটিশ গোয়েন্দাদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। এবং ডেঃ কমিশনার শ্রী রসিক বসুর উপর সরকারের বিষনজর পড়ে। বিপদের আশঙ্কা করে

ডি. সি. সার্ভিস রিভলবারের গুলিতে নিজেই আত্মহত্যা করেন। তারপর ইংরেজের বিষনজর পড়ে জনাব ফজলুল হকের উপর। পরিণামে তাঁর বাংলার প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে পদচ্যুতি। এবং সংখ্যালঘু সত্ত্বেও জনাব নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ পুরস্কার লাভ করেন। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। ১২ই জানুয়ারী থেকে ১৬ই জানুয়ারী চারদিন ফজলুল হক সাহেবের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন স্বনামধন্য অধ্যাপক এবং পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ মহাশয়।

আর দ্বিতীয় কাহিনী সকলেই জানেন। ১৭ই জানুয়ারী ১৯৪১ সাল মধ্যরাতে দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণীর নির্মাল্য আনিয়ে আর একজন দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলেন। শ্রী শিশির বসুকে সঙ্গে নিয়ে বা চালক সাজিয়ে। বৃটিশ গোয়েন্দা আগেই টের পেয়েছিলেন। তাই তাঁরা ধরে নিয়েছিল রাসবিহারী বসুর কৌশলেই সুভাষচন্দ্র বসুও চলেছেন। তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমস্ত জাহাজ বন্দরে, জাহাজে এবং বিমান বন্দর তথা বিমানগুলোতে তন্ন তন্ন করে তল্লাসি চালানো হয়। চিটাগাঙ্‌, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, হংকং এবং সাংহাইতে তন্ন তন্ন করে তল্লাসি চালানো হয়। কেন্দ্রীয় মহাফেজখানায় এইসব তথ্য ও নথি সংরক্ষিত ও লিপিবদ্ধ আছে।"

(রহস্য পুরুষ নেতাজী—অরুণ ঘোষ)

'রহস্য পুরুষ নেতাজী'—গ্রন্থের গ্রন্থকার সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগের ঐ দুটি চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই দুইটি চিত্রের একটি কাহিনী সকলের মুখে মুখে ফিরলেও অপরটি প্রায় সকলের নাহলেও ৯৯%-এর অজ্ঞাত। অন্তত কখনও কারো নিকট শোনা যায় নাই। হয়ত এ-জগতে বিচরণশীলদের নিকট নতুন নয়।

যাইহোক—আসুন এবার আমরা উপরের দুইটি সংবাদকে একটু মননশীলতার গভীরে এনে অনুশীলন করি। এবং তাতে কোন রহস্যসূত্র পাওয়া যায় কিনা তা একটু পরখ করি। এখানে আমরা প্রথমে দ্বিতীয় কাহিনী চিত্রটিকেই প্রথম পর্যালোচনা করবো। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল মধ্যরাতে বলেই সকলে অবগত আছেন। ঐ রাতে যে গাড়ীতে করে সুভাষচন্দ্র অচিনপুরের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন সেই গাড়ীখানি নাকি আজও নেতাজী ভবনে সংরক্ষিত আছে। গাড়ীটি ছিল জার্মান—"ওয়ান্ডারার"। নম্বর ছিল বি. এল. এ. ৭১৬৮। তখন গাড়ীটির কি রং ছিল জানা নেই। বর্তমানে গাড়ীখানির রং হালকা ছাই ছাই রঙের প্রলেপ আছে। সুভাষচন্দ্র যখন গৃহত্যাগ তথা দেশত্যাগ করেন তারপর অন্তত: ১১টি দিন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল। এ ব্যাপারে কেউ কোন খবরই পায়নি। অর্থাৎ ১১ দিন পর তাঁর দেশত্যাগের ঘটনা প্রকাশ পায়। বর্তমানে গাড়ীখানি নেতাজী ভবনের নীচে একতলায় কাচের ঘরে সংরক্ষিত আছে।

এবার গাড়ীখানি সম্পর্কে অনুসন্ধানী দৃষ্টি প্রক্ষেপ করে দেখলে অনেক প্রশ্নই এসে যায়। আসুন এবার আমরা এই নিয়ে একটু চর্চা করি। এবার প্রশ্ন—এই গাড়ী করেই

কি সত্যই সুভাষচন্দ্র দেশমাতৃকার মুক্তির উৎস সন্ধানে যাত্রা শুরু করেছিলেন? এই প্রশ্নে হয়ত অনেকেই বলবেন এই উন্নাসিক এসব কথা আবার কি বলছে? প্রসঙ্গের খাতিরে এবং সুভাষচন্দ্র বসুর যে চলাচল বা কর্মকাণ্ডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তা বুঝতে গিয়ে এই জাতীয় নঞর্থক ও ধ্বন্যাত্মক প্রশ্নের উত্তর সন্ধান মাত্র। তার বেশী কিছু নয়। কাজেই এতে ভুল ঠাওরাবার অবকাশ নেই। বলাবাহুল্য ১৯৪১ সালেই যে গাড়ীটি ঐ বৈপ্লবিক কাজের জন্যই কেনা হয়েছিল তার কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। কাজেই গাড়ীখানি বসু পরিবারের ব্যবহারের জন্য আরও কিছুকাল আগেই কেনা হয়ে থাকবে। শুধু তাই নয়—গাড়ীখানি করে যখন মহানায়ক নিষ্ক্রান্ত হলেন ভারতবর্ষ থেকে তারপরেও নিশ্চয়ই গাড়ীখানি যতপরনাস্তি ব্যবহৃত হয়েছে। এটা আমরা ধরে নিতে পারি। গাড়ীখানি যদি তার আগে কেনা নাও হয়ে থাকে তবে তা যে অন্তত ১৯৪১ সালে কেনা হয়েছে তাও যদি হয়ে থাকে তবে আজ যা সেই গাড়ীর অবস্থা তাতে অন্তত সেই গাড়ী ঝকঝকে তকতকে থাকার কোনভাবেই কথা নয়। কিন্তু আজ গাড়ীর অন্তত বহিরাঙ্গের যা অবস্থা তাতে তা দেখলে প্রকৃত অবস্থাটা বোঝার উপায় নেই। তবে গাড়ীটি আজও কেমনে এমন মার্জিত ছিমছাম অবস্থায় আছে? এর বিচার পাঠকরাই করবেন? কাজেই এখানেও রহস্য রহস্য গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না কি? 'রহস্য পুরুষ নেতাজী'—গ্রন্থের গ্রন্থকার একটি সুন্দর কথা বলেছেন, তা হলো—আত্মপ্রচারের জন্য স্বঘোষিত ইতিহাস সৃষ্টি করা আর প্রকৃত সত্যকারের ইতিহাস দুটিই বাস্তব চিত্র অনুসারে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মীয় এবং বিপরীত মার্গীয় ব্যাপার। সম্প্রতি শিশির বসু গত হবার পর আনন্দবাজার বলেছে শিশির বসু ছিলেন সুভাষ বসুর যথার্থ উত্তরসাধক ও উত্তরসূরী। প্রশ্ন হচ্ছে সমগ্র মানব ইতিহাসেই যখন মহানায়কের উত্তরসূরীর কোন চিহ্নটি পাবার উপায় নেই তখন এ-জাতীয় প্রশংসা দ্বারা কি মানব সমাজকেই বিভ্রান্ত করার নামান্তর নয়? আর শিশির বসুর মধ্যে সুভাষচন্দ্রের উত্তরসূরীর কি কি উপাদান বর্তমান আছে, তা দেশবাসীই বিচার করবেন। এ-জাতীয় প্রশংসা দ্বারা কি সুভাষচন্দ্রকেই অমর্যাদা করা হয় না? নিকেলকে সোনা বললেই কি সোনা হয়ে যায়! এরূপ প্রচার হলে কি শিশির বসুর সম্পর্কেই মানুষের সংশয় বেড়ে যাবে না? আর এ-জাতীয় প্রচারে লাভই বা কী? উদ্দেশ্যই বা কী?

এবার আসুন, আমরা ১৬ই জানুয়ারীর ঘটনার ব্যাপারে একটু পর্যালোচনা করে দেখি তার মাঝে কোন গূঢ় রহস্যের সন্ধান সত্যই আছে কিনা। প্রথম ঘটনার মাঝে আমরা প্রত্যক্ষভাবেই কয়েকটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি।

প্রথম ঘটনা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই একটি অভিনব ঘটনা এখানে দেখতে পাচ্ছি। ১০ নং পদ্মপুকুর রোড থেকে যখন নবাব জে. পি. ফারুকীর গাড়ীখানি চলে গিয়েছিল সেই সময়টা সঠিকভাবে জানা না থাকলেও বা জানা না গেলেও দেখা

গেল গাড়ীতে বোরখা পরিহিতা একজন রমণী, যাঁকে অনুমান করা হচ্ছে ফারুকী সাহেবের বেগম সাহেবা বলে। কিন্তু যখন গাড়ীখানি ১০ নং পদ্মপুকুর রোডের বাড়ীতে এসে প্রবেশ করল তখন কিন্তু গাড়ীতে দ্বিতীয় যাত্রীর কথা কিছু বলা নেই। তাতে আমরা রীতিমত ধাঁধায় পড়ছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ধাঁধা থেকে বেরুনো সহজ ব্যাপার নয়, খুব কঠিন।

দ্বিতীয়ত: এখানে যে তাৎপর্যময় ঘটনা ঘটেছে তা তৎকালীন কলিকাতার সকলে তো জানেনই এমনকি সারা বৃটিশ ভারতেই নাড়া পড়ে গিয়েছিল। এটাই বাস্তব চিত্র। কারণ ঐ ঘটনার পর ডে: পুলিশ কমিশনার তাঁর সার্ভিস রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন? নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছিল? ডে: পুলিশ কমিশনার যে গুরুদায়িত্বে ছিলেন তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তিনি সেই দায়িত্বে ব্যর্থ হওয়ায় বৃটিশের বিষনজরে পড়েছিলেন। ডে: পুলিশ কমিশনার আত্মহত্যা করে ঐ দিনকার ঘটনাকে রাজশক্তির চোখে আরও বহুগুণ গুরুত্ব বাড়িয়ে দিলেন। এবং যাঁদের নজর এ ব্যাপারে পড়েনি তারাও সচেতন হয়ে উঠল। অবশ্য সুভাষচন্দ্রের ব্যাপারে বৃটিশের শ্যেনদৃষ্টি বরাবরই প্রখরতম ছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয় তাৎপর্যময় ঘটনা হচ্ছে ঐ সময় ১২ই থেকে ১৬ই জানুয়ারী ১৯৪১ সালে তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড: সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ কেন এবং কিসের জন্য বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব ফজলুল হকের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন? তারই বা ব্যাখ্যা ও অর্থ কি? বিশেষ করে ঐ সময়কার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বিচারে? বলতে নেই রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন ভারতের শিক্ষা জগতের এক অনন্য পুরুষ—শুধু দার্শনিকই তিনি নন। পরবর্তীকালে তিনি হয়েছিলেন ভারতের এক নম্বর ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি। এমন একজন ভারতবরেণ্য ব্যক্তির সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগের পটভূমিকায় বাংলার প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরপর চারদিন তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করে সাক্ষাৎ কোন মামুলি জোক নয়। ভাববার বিশাল অবকাশ রয়েছে।

চতুর্থ তাৎপর্য হচ্ছে—তখন ১০ নং পদ্মপুকুর রোডের বাড়ীতে ফারুকী সাহেবের নামের আড়ালে যাই ঘটে থাকুক না কেন, পরিণতি হিসাবে আমরা যা পাচ্ছি তা এক কথায় বর্ণনার অতীত। কারণ ঐ ঘটনার পটভূমিকাতেই দেখা যাচ্ছে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব ফজলুল হকের মত এক অনন্য সাধারণ তথা জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থানরত ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রীত্ব খারিজ। ঐ ঘটনা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশকে কতখানি উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল তা পরিমাপযোগ্য নয়। এছাড়াও জনাব ফজলুল হক সাহেবের রাজনৈতিকভাবে আরও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ছিলেন বাংলার হিন্দু-মুসলমানের নিকট সমান আদরণীয় ও গ্রহণযোগ্য। এবং উভয় সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রিয় নেতা। এছাড়া তিনি ছিলেন খ্যাতিমান একজন আদর্শপরায়ণ জাতীয়তাবাদী

ব্যক্তিত্ব। বিশেষ করে তখন যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ছিল সেটাকে বলা যায় এককথায় রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উৎকৃষ্ট সময়। এইসব ঘটনাবলী হচ্ছে বৃটিশের পয়লা নম্বর শত্রু এবং বৃটিশের নজরবন্দীশালা থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর পলায়নের পটভূমিকায়।

এবার এই দুটি ঘটনার গুরুত্বের ব্যাপারে কোন্ চিত্রটি কতখানি ওজনদার সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সত্য ঘটনা কোন্‌টি তা বলার অধিকার আমাদের নেই। এর সত্যাসত্য একমাত্র বলার অধিকারী তিনিই, যে মহানায়ককে নিয়ে এত কাণ্ড। ঐ দুটি চিত্র-কাহিনীতে মহানায়ক নেতাজী সুভাষ বিশ্বব্যাপী অনাগত দিনের অনন্ত কাণ্ডের সূচনা বা উদ্বোধন করলেন মাত্র। এখানে বর্ণিত চিত্রনাট্যের কোন্‌টি যথার্থ তা কোন কালেই হয়ত প্রকাশ হবার নয়। কারণ মহানায়কের শত বছরের ঘটনাবলী থেকে বলা যায় এ সত্য কোনকালেই তিনি প্রকাশ করবেন না। সুভাষচন্দ্রের এই দেশত্যাগের পিছনে যে কত বড় পরিকল্পনা ছিল, তা আগামীদিনের গবেষকরা গবেষণা করেও উদ্ধার করতে পারবেন না। একথা দৃপ্তকণ্ঠে হলফ করেই বলা যায়। কারণ সুভাষচন্দ্র বসুর গৃহত্যাগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বৃটিশ তথা বিশ্বসাম্রাজ্যবাদীদের সম্পূর্ণ পতন এবং বিশ্বমানব মুক্তির মহাকাণ্ড। তাইতো সাম্রাজ্যবাদীদের পয়লা নম্বর শত্রু যদি পৃথিবীতে কেউ থাকেন তবে তাঁর নামই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এই হচ্ছে সুভাষচন্দ্র বসুর দেশত্যাগের আসল পশ্চাৎভূমি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এরূপ দেশত্যাগের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু অপ্রকাশিত ঘটনা না বললে বোধহয় তা সম্পূর্ণ হবে না। এমন দু-একটি ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতেই হচ্ছে।

প্রথম দিন অর্থাৎ ১৬ই জানুয়ারীর ঘটনা ছিল ঘটনাবহুল ব্যাপার। কারণ সেদিনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল অনেক কিছু এমনকি বাংলার প্রধানমন্ত্রীত্বের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার পর্যন্ত। এছাড়া আর একটি ব্যাপার বিশেষভাবে স্মরণীয় যে সুভাষচন্দ্রকে যখন বৃটিশ সরকার তাঁকে গৃহবন্দী করেছিল তারপর সুভাষচন্দ্রের নির্দেশ ছিল তাঁর সঙ্গে কারো কোনভাবেই দেখা-সাক্ষাৎ করা চলবে না। কারণ কিছু তিনি বলেননি, তবে আজ অনুমান করে নিতে কোন অসুবিধার হেতু নেই যে তিনি অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর পরিকল্পনা মোতাবেক প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। তখন তিনি চাপদাড়ি রাখা শুরু করেন। এবং সেই সঙ্গে ধ্যান জপ তপ ইত্যাদি তো ছিলই। অর্থাৎ গোপনীয়তা কঠোরভাবে অবলম্বন করছিলেন। এইভাবে তাঁর শারীরিক প্রস্তুতির কথা স্মরণ করলে ডা: জিয়াউদ্দিন নামের আফগান ভদ্রলোকের বেশভূষার কথাই মনে করিয়ে দেয়। প্রথম দিনকার ঘটনার সঙ্গে তাঁর শারীরিক প্রস্তুতি পর্বের অভূতপূর্ব সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এছাড়া সে সময় যখন কারো প্রবেশই কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ছিল তখন হঠাৎ একজন আফগান ইনসিওরেন্সের ভদ্রলোকের আগমন যে যথেষ্ট প্রহেলিকাময় তা

বলাই বাহুল্য। কাজেই এটা যে একটা পূর্ব পরিকল্পিত ও নির্ধারিত তা বুঝতে অসুবিধার কারণ নেই। এছাড়া যা যা ঘটেছে তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোই পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

এবার প্রশ্ন দ্বিতীয় দিনের ঘটনা তবে কেন? তা যে অতি পরিষ্কার, তা অতীব স্থূল চিন্তাধারাতেও বুঝতে অসুবিধার কথা নয়। মোদ্দা কথা হচ্ছে ব্যাপারটা যদি কোন কারণে সহসা প্রকাশ পেয়ে যায় তবে যেন শুধু বৃটিশ নয় সকলেই বিভ্রান্তির অকূল সায়রে ভাসে। বলাবাহুল্য ঘটেছিলও তাই। এছাড়া ভ্রাতুস্পুত্র শিশির বসুকে চালক হিসাবে সঙ্গে নেবার অনেক সুবিধাও ছিল। তাঁকে পাওয়াটা তো সহজসাধ্য ছিলই এমনকি তাকে সঙ্গে চালক হিসাবে নিলে দেশবাসী যে সহজেই বিশ্বাস করবে তা যথার্থ সত্য। আর বৃটিশ গোয়েন্দাদের অনেকেই ছিলেন বঙ্গসন্তান বা ভারতীয়। তাদের মনে প্রতীতি জন্মানোর একটা দিক ছিল এই নাটকের ব্যাপারে। এছাড়া শিশির বসুকে আফগান ভদ্রলোক সাজালে বৃটিশ গোয়েন্দাদের চোখে ফাঁকি দেওয়াও প্রশ্নাতীত হতো না। এই কারণেই আফগান ভদ্রলোকের বা জিয়াউদ্দীনের প্রয়োজন ছিল। এইসব দিক ছাড়া যে-দিকটা ছিল তা হচ্ছে ভারতবর্ষের কেউই কি জানতেন না তাঁর এই গোপন পরিকল্পনার কথা? অবশ্যই বিপ্লবীজগতকে বাদ দিয়ে। অবশ্য তাঁদেরও মাঝে কেউ জ্ঞাত ছিলেন কি না তা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় না। তবে বি.ভী.'র এ্যাকশন স্কোয়ার্ড প্রধানের জানা ছিল।

কিন্তু ভারতবরেণ্য কেউ তা জানতেন না বললে ভুল হবে। শোনা যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সবই জ্ঞাত ছিলেন। এবং ছিলেন বলেই যতক্ষণ না পর্যন্ত বৃটিশ গোয়েন্দাদের পাতা ফাঁদ অতিক্রমের খবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পেয়েছেন ততক্ষণ তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মতই নাকি ছটফট করেছেন। তারপর সীমান্ত অতিক্রমের খবরে তিনি কিছুটা স্বস্তিবোধ করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের স্বদেশ ত্যাগের প্রাক্‌কালে তিনি মাতা প্রভাবতী দেবীর সম্মুখে ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই ছদ্মবেশে তাঁকে জননী চিনতে পারেননি। তাই এই প্রসঙ্গে জননীকে তিনি তখন বলেছিলেন, না, তুমি যখন আমাকে মা হয়েও চিনতে পারনি তখন আমি নিজে পরিচয় না দিলে পৃথিবীতে কোথায় কখনও কেউ যেকোন অবস্থাতেই চিনতে পারবে না। আজ আমরা দেখছি সুভাষচন্দ্রের ঐ বাণী বেদবাক্যের মত প্রমাণিত হয়েছে। অথচ শত্রু মিত্র সকলের নাকের ডগার উপর দিয়ে পৃথিবীর সর্বত্র নির্দ্বিধায় পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন এবং তাঁর অভীপ্সিত যাবতীয় কাজ করে প্রবল প্রতাপে অবস্থান করছেন। অথচ তাঁকে আমরা একজন রাজনৈতিক নেতার বেশী মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নই। এটাই বিশ্ববাসীর ঐতিহাসিক ভুল। এই ভুল তিনিই একদিন বিশ্ববাসীকে ভেঙ্গে দেবেন—সেদিন খুব দূরে নয়। সেদিন এও প্রমাণিত হবে যে—তিনিই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং শ্রীমদ্ সারদানন্দের এক এবং অভিন্ন সত্তা।

(৩)

যুগে যুগে

ভারত ইতিহাসের বিকৃতির ঠিকাদার কারা এবং কেন?

যুগে যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিভ্রান্ত ও বিকৃত করেছে বা করে চলেছে কে বা কারা? উত্তরে এককথায় বলা চলে ভারত লুণ্ঠনকারী একদল দস্যুরা। এর সূচনাকাল বলা যেতে পারে ইউরোপীয় সভ্যতার ভারতে প্রবেশকাল এবং তার পূর্বে থেকেই। তার পূর্ব পর্যন্ত যে ইতিহাস পাওয়া যায় তখন পর্যন্ত দেখা গেছে ভারতবর্ষের চিরন্তনী মূল্যবোধের অবনময়ন ঘটেনি। এমনকি শত্রুতে শত্রুতেও মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন ঘটেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে হাজার উদাহরণ উপস্থাপনা করা যেতে পারে। সর্বশেষ মূল্যবোধের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যা ইতিহাসে পরিদৃশ্যমান।

সম্রাট আকবর যখন তাঁর সেনাপতি রাজা মানসিংহকে বাংলা জয়ের জন্য বাংলায় পাঠালেন তখন রাজা মানসিংহ বাংলার দ্বারদেশে এসে তাঁর সেনা ছাওনি ফেললেন। সেই সময় বাংলার বার ভূঁইয়াদের ছিল অতুলনীয় প্রভাব ও প্রতাপ। ঐ বার ভূঁইয়া কবজা না করে বাংলা দখল সম্ভব ছিল না। ঐ বার ভূঁইয়াদের মধ্যে ঈশাখাঁ, চাঁদরায়, কেদাররায় প্রতাপাদিত্য এঁরা ছিল সেরা। মোঘল সেনাপতি মানসিংহের আগমনবার্তা পেয়ে ঈশাখাঁ তাঁর দূতকে পাঠালেন মানসিংহের ছাওনিতে। ঈশাখাঁ তাঁর দূতের মাধ্যমে মানসিংহকে বার্তা পাঠালেন যে, বাংলা জয় করতে হলে মোঘল সেনাদের সাথে বাংলার অধিপতিদের যুদ্ধ অনিবার্য এবং তাতে অযথা লোকক্ষয় বা রক্তপাতও অনিবার্য। কাজেই অযথা লোকক্ষয় বা রক্তপাত না ঘটিয়ে আসুন আমরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হই। তাতে সাধারণ লোকের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণসংশয় থাকবে না, অথচ কার্যসিদ্ধি সম্ভব হবে। বলাবাহুল্য রাজা মানসিংহ ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এবং অসিযুদ্ধে তাঁদের জয় পরাজয় স্থিরীকৃত হল। অসিযুদ্ধে এক বীরের অসিযুদ্ধকালীন অবস্থায় ভেঙ্গে গেলে অপর যোদ্ধা শত্রুকে নিরস্ত্রভাবে আঘাত করা যুদ্ধের রীতিবিরুদ্ধ ছিল। তখনও শত্রুর প্রতি শত্রুর ছিল এই ন্যায়নীতি বোধ বা মানবিকতা বোধ। এই ছিল ভারতীয় ন্যায়নীতি এবং প্রত্যক্ষ অনুশীলন স্থল। পরম শত্রুর প্রতি শত্রুর ছিল এমন উচ্চমানের ন্যায়নীতি বোধ। বলতে নেই তার পূর্বেতো এমনটাই ছিল ভারতীয় আচার আচরণের মাপকাঠি। কালক্রমে এই নীতিই জলাঞ্জলি হয়ে এই ন্যায়নীতিই বিপরীত মেরুপথে বিচরণ শুরু হল। আর আজ তার পরিণতি কোন্ পর্যায়ে তাতো সকলেরই জানা।

এমনই একটি ঐতিহ্যপরায়ণ জাতির আজ যে কী পরিণতি তা বোধহয় বিশ্বকোষের ভাষায় ব্যক্ত করাও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এই মহান জাতির যে সুমহান ইতিহাস তা কোন অবস্থাতেই পঙ্কিলতার পূর্তিগন্ধময় আবর্জনায় ভূ-লুণ্ঠিত ছিলনা বা থাকতে পারেনা। যে জাতির আলোকবর্তিকায় একদিন বিশ্বমানব তথা সারাজগত উদ্ভাসিত হতো বা দিশালাভ করত, সে জাতির জাতীয় ভাবধারা বা ইতিহাস তো তেমনি ঐতিহ্য-মণ্ডিত স্বর্গীয় সুষমায়ই উদ্ভাসিত থাকার কথা।

কিন্তু চরম লজ্জার কথা, ক্ষোভের কথা, দুঃখের কথা, পরিতাপের কথা যে ঐ ঐতিহ্যমণ্ডিত আর ভারত ইতিহাস নেই। এমন একটি জাতির জাতীয় ইতিহাসকে আমরাই আজ কতখানি হেয় করা যায়, কলঙ্কিত করা যায়, তার প্রতিযোগিতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রকৃত অর্থে ভারত ইতিহাসের অবমূল্যায়ন ঘটতে শুরু হয় সেই গজনির সুলতান মাহমুদের ভারত লুণ্ঠনের সময় থেকেই। এ সম্পর্কে এদেশের সেকুলারিজমের তথাকথিত প্রবক্তা স্বয়ং জওহরলাল নেহেরু লিখছেন -

"একাদশ শতকে ইসলাম ধর্ম তরবারি হাতে বিজয়ীর ছদ্মবেশে ভারতে এসেছিল, সৃষ্টি করেছিল এক ভীষণ প্রতিক্রিয়া। পুরাণো সহিষ্ণুতা চলে গেল, নিয়ে এল ঘৃণা এবং বিরোধ। তরবারি ধারণ করে অগ্নি সংযোগ এবং হত্যার জন্য যিনি এলেন তিনি হলেন গজনির সুলতান মাহমুদ।.....বছরের পর বছর তিনি ভারত আক্রমণ করেন, লুণ্ঠন করেন, হত্যা করেন এবং ফিরে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যান বিপুল ধন সম্পদ এবং বিরাট সংখ্যক বন্দী নারী পুরুষ।" (বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহেরু)।

নেহেরুর এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি মেলে আমেরিকান চিন্তাবিদ উইল ডুরান্টের 'Story of Civilization' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন—"The Mohamedan conquest of India was probably the bloodiest part of history" দেখা যাচ্ছে হিন্দু মুসলমানের জীবনযাপন গায়ে গা লাগিয়ে হলেও সংঘাতের সৃষ্টি হয়, পায়ে পা লাগিয়ে ধর্মীয় নির্দেশে। পরিচয় হয় আহত, বিশ্বাস হয় নিহত।

(সঙ্কলন ঃ দৈনিক আনন্দবাজার, ১৪ই মার্চ, ২০০১, পত্রকার ঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ)

যুগে যুগে যাঁরা এদেশে আক্রমণকারী রূপে এসেছে তারা তো এদেশের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করবেই, করেছেও। তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু আশ্চর্য আজ আমরাই সেই সেই মীরজাফরীয় প্রতিযোগিতায় কার চেয়ে কে বেশি যোগ্য তার প্রমাণ দিতে পণেবদ্ধ। বলতে নেই এমনটি ঘটে চলেছে আজ প্রায় হাজার বৎসর কাল যাবৎ। আজ গোটা জাতির মধ্যে কারো এ ব্যাপারে কোন চেতনাই নেই। যেন গোটা জাতিটাই অচেতন ঘুমে আচ্ছন্ন। মধ্যযুগের বিদেশী আক্রমণ এবং ইউরোপীয় সভ্যতার এই হচ্ছে পরিণতি। অখণ্ড ভারতবর্ষের যে সত্যকারের মানচিত্র তা তো আমরা কোন্ কালেই হারিয়ে বসে আছি। কিন্তু এখনও যেটুকু বেঁচে-বর্তে আছে তার উপর এবার স্বয়ং আমরাই তাকে আক্রমণ হানার সুচিন্তিত পরিকল্পনায় মেতে উঠেছি। তার নজির কোথায় যদি আপনি প্রশ্ন করেন, তবে তারও উদাহরণ জলজ্যান্ত আমাদের সামনেই রয়েছে। ব্যাপারটা আপনি আমি সকলেই জানি। যদিও আমাদের এ ব্যাপারে হাত-পা বাঁধা। আশা করি ব্যাপারটা স্মরণ করিয়ে দিলে নিশ্চয়ই সকলের মনে পড়বে।

যে জওহরলালের বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গে এমন মূল্যায়ন, সেই পণ্ডিত জওহরলালই স্বাধীনোত্তর ভারত ইতিহাসকে কেমনভাবে বিকৃত করতে চেয়েছিলেন তা দেখা যাক।

তিনি যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে দিয়ে বিকৃত ইতিহাস রচনা করাতে চেয়েছিলেন, আসুন তা একটু পর্যালোচনা করা যাক।

ব্যাপারটা যে সকলেরই জানা তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। আমরা আত্মবিস্মৃত এক জাতি। তাই সব ভুলে যাই। অতি সম্প্রতিকালে পণ্ডিত নেহেরু ভারত ইতিহাসবেত্তা ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের নেতৃত্বে কয়েকজন ঐতিহাসিককে স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার দায়িত্ব অর্পণ করেন, তখন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিপথ ধরে এগোতে চাইলেন। সেইভাবে তিনি কাজও শুরু করলেন। কিন্তু বিধি বাম। তাঁকে ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিপথ ধরে সরকার এগোতে দিলেন না। এর ফলে প্রতিবাদ স্বরূপ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সেই কমিটি থেকে ঘৃণাভরে পদত্যাগ করলেন। বলার অপেক্ষা রাখেনা কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ঐতিহাসিকই এমন কৃত্রিম গাইড লাইন মেনে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেন না। ইতিহাস তো স্বয়ং সৃষ্ট। ঐতিহাসিক কি ইতিহাস সৃষ্টির কর্তা? কিন্তু ভারত সরকার ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারকে দিয়ে তাই করাতে চেয়েছিলেন। তারপর অবশ্যই পদত্যাগ করলেও ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর ঐতিহাসিক বিবেকের নির্দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশাল ইতিহাস সৃষ্টি করে রেখে গেছেন। কিন্তু ভাবুন ভারত সরকারের গাইড লাইন অনুসরণ করে যে-ইতিহাস রচিত হয়েছে এবং জাতীয় আরকাইভে ধূপধুনো দিয়ে পূজিত হচ্ছে, তা কোন্ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস? আর যাঁরা চাটুকার সেজে সেই কাজ করেছেন তারাই বা কেমন ঐতিহাসিক? ঐতিহাসিকের ঐতিহাসিক বিবেকই যদি না থাকে সে কেমন ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে? আজ ঐ বিকৃত ইতিহাসই জাতিকে জন্ম প্রজন্মান্তর গেলানো হচ্ছে। আশা করি এইরূপ নজিরের জন্য এই একটি উদাহরণই যথেষ্ট। বলাবাহুল্য পররাজ্য বিজিতরা এমন কাজ করে থাকে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে স্বাধীন জনগণের সরকার কোন্ পররাজ্য জয় করেছেন যে তারা এমন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। বিকৃতির তো একটা পরিসীমা আছে, এইভাবেই কালে কালে যুগে যুগে ভারত ইতিহাসকে পঙ্কিলতার মহাগর্ভগৃহে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। বলাবাহুল্য রাজরাজারা তা আবহমানকাল যাবৎই করে আসছে এবং করবেও কিন্তু ভারত সরকার এমন ভ্রষ্টাচারীর পথ ধরলেন কী কারণে? তবে কি সহযোদ্ধাদের উজ্জ্বল ইতিহাসকে এবং উজ্জ্বল চরিত্র হেয় করার জন্য ঘৃণ্য চক্রান্তেরই ফল এসব? দেশের যাঁরা কর্ণধার হবার কথা নয় তাঁরাই যদি সেই আসনে আসীন হয়ে যায় ভাগ্যচক্রে, তবে তাঁরা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল প্রতিযোগীদের হেয় প্রতিপন্ন করতে এমন কাজ যদিও বা করার অজুহাত একটা দাঁড় করানো যেতে পারে কিন্তু আমজনতার মধ্যে যারা আছেন অথচ ঐতিহাসিক পুরুষ কখনও হবেনা সেই লোকগুলি কেন কিসের তাগিদে এবং কার স্বার্থে মিথ্যা প্রবঞ্চনার পথ ধরে ঐতিহাসিক উপাদানকে বিকৃত করার প্রয়াস পায়? বলতে নেই ইতিহাসের উপাদান বহুপ্রকার হতে পারে এবং বহুভাবে তা প্রক্ষিপ্ত থাকতে পারে। সমাজ দেহ ও ইতিহাসের

উপাদানের একটি স্থান। এই সমাজ দেহও আজ ইতিহাস বিকৃতিতে সহমর্মীর কাজ করে চলেছে। এরচেয়ে বেদনার কী থাকতে পারে?

কোটি কোটি ভারতবাসী তাই অম্লানে হজম করছে। তবে খুবই আনন্দের কথা আশার কথা যে ডঃ পি. এন. ওক একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বও ঐতিহাসিক। তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় হচ্ছে—

Mr. P. N. Oak was born in 1917. He is a historian researcher of international repute. He holds a Master of Arts degree and a Bachelor of Law degree from the University of Bombay. During World War-II, he was closely associated with Netaji Subhas Chandra Bose in South-East Asia during 1942-45. Mr. P. N. Oak participated in several diplomatic military missions besides serving as a political commentator for years together at the free India Radio in Saigon.

তিনি অর্থাৎ পি. এন. ওক সাহেব সম্প্রতি ভারতের সুবিশাল ইতিহাসকে বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার কল্পে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছেন। এতদ্ সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি অনেক কাজ করেছেন। এবং তিনি এই মহান উদ্দেশ্যে রাজধানী দিল্লীতে 'Some missing chapter of World History'—উদ্ধারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম স্বাভাবিক ভাবেই রাখা হয়েছে—'Institute for Re-writing Indian History'. শ্রীযুক্ত পি. এন. ওকের প্রচেষ্টায় যদি আমাদের সম্বিৎ ফিরে— এইটুকুই আজকের আশা। শ্রীযুক্ত ওকের মাথায় যে ভগবানের আশিস্ বর্ষিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যতদিন যাচ্ছে ততই যেন বিকৃতির ইতিহাস আরও গভীরভাবে বিকৃত করার জন্য তা জগদ্দলের পাথরের মত জাতিকে ও জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেয়ে বসেছে। এই পথ ধরে হাঁটতে গেলে চলমান ভারতে প্রথমেই যা আপনার আমার দৃষ্টি কাড়ে তা হচ্ছে—জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক বীর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সংক্রান্ত অধ্যায়। আসুন এতদ্‌সংক্রান্ত কোনকিছু ভারতের চলমান সমাজে পাই কিনা দেখি।

আজ ২০০১ সালের প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে যদি সমাজদেহের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় তবে দেখতে পাবো সমাজের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও প্রবক্তারা নেতাজী সুভাষকে নিয়ে কী না করছেন! আজকের ভারতবর্ষের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের কিছু নামীদামী আঁতেল বুদ্ধি বিক্রয়কারীও তাদের অনুগামী এবং পৃষ্ঠপোষক পত্রপত্রিকা ও মিডিয়াপতিরা সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে গত অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ যা শুরু করেছে তা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বেঁচে থাকা বা না থাকার ব্যাপারে তাদের আহার নিদ্রার যে কি ব্যাপক ব্যাঘাত ঘটছে তারাই তা ভালো জানেন। নেতাজীর এদেশে জন্মগ্রহণটাই তাদের দৃষ্টিতে যেন বড় অপরাধ। নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যু নয় নয় করেও অন্তত আট দশবার ঘটানো হয়েছে। অথবা বলা যেতে পারে এইসব আঁতেলদের দয়ায়

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু আট দশবার ঘটে গেছে। এইরূপ একবার সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছিল ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তাইহোকু বিমান বন্দরে। এই তথাকথিত মৃত্যুই এখন তাদের গবেষণার জন্য বিশ্বের সেরা বিষয়বস্তু। এই মৃত্যুর প্রমাণের জন্য তাদের গবেষণার অন্ত নেই। এই তথাকথিত মৃত্যুর নেট ওয়ার্কটাও সুভাষচন্দ্রের স্বীয় পরিকল্পনারই প্রসবিত ফল। তার তথ্যগত প্রমাণ কি কিছু আছে? অবশ্যই আছে— ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্ট খুব ভোরে নেতাজী তাঁর মন্ত্রীপরিষদের সদস্য মিঃ থিবিকে একটি গোপন পত্রে জানান—"I am writing all this to you as I am on the eve of taking a long Journey by Air and who knows an accident may not overtake me."

(Evidence of E. Bhaskaran. Confidential Secretary to Netaji)

সুতরাং এই মৃত্যু যে সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পিত প্রহসন মৃত্যু বা মৃত্যুর নামে একটি চমকিত নাট্যায়ন—তার কি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে? বলাবাহুল্য এই তথাকথিত মৃত্যু ছাড়া যতবার মৃত্যু তাঁর ঘটানো হয়েছে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার নায়করা ছিলেন দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোন পক্ষ। তার ফলে প্রত্যেকটাই মিথ্যা প্রতিপন্ন। তিনি নিজেই আচম্বিত ঘোষণা দ্বারা ঐসব পরিকল্পনাকারীদেরই বুরবক্ বানিয়েছেন অনেক সময়। এমন দুই-একটি তথ্য এখানে উল্লেখের দাবী রাখে। ১৯৪২ সালে অনুরূপ একটি মৃত্যু ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষচন্দ্র প্রত্যুত্তরে বার্লিন বেতার থেকে জানালেন— "I am sorry. I could not oblige the British Government by dying, I am still living, I Subhas Chandra Bose is speaking ইত্যাদি।

(—বিপ্লবী শ্রীরাধিকা দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

কিন্তু লক্ষণীয় যে সুভাষচন্দ্রের স্বীয় পরিকল্পিত প্রহসন মৃত্যুর নাট্যায়ন ঘটার পর তিনি ঐরূপ কোন ঘোষণা করেননি অতি স্বাভাবিক কারণেই। কারণ তিনি তখন এশিয়ার মুক্তির কাণ্ডারী হয়েই কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিচ্ছেন। তাই ঐ জাতীয় ঘোষণার আর প্রশ্নই আসেনা। এমন একটি বিশাল কর্মের রূপদান করতে মাঠে নামবেন বলেই তথাকথিত মৃত্যুর একটি বর্ম অঙ্গে স্বেচ্ছায় তুলে নিতে হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে এই মৃত্যুরহস্যও তিনি উন্মোচন করার প্রশ্ন নেই। বিশেষ করে যতদিন না তাঁর উদ্দেশ্য সার্থক হচ্ছে। মৌখিক ঘোষণা দ্বারা এই তথাকথিত মৃত্যু রহস্য তিনি উদ্‌ঘাটন না করলেও তিনি যে বারংবার শতসহস্রভাবে তা উন্মোচিত করেছেন, তার সাক্ষী তো স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল থেকে আরম্ভ করে গান্ধীজী, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, জেনারেল ম্যাকআরথার, লর্ড মাউন্টব্যাটেন এমনকি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত। তাঁরা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে সম্পূর্ণভাবে তা জ্ঞাত। আর মোরারজী দেশাই যিনি ছিলেন ভারতের অ-কংগ্রেসী প্রথম প্রধানমন্ত্রী, তিনিতো দুইজন পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যা ঘোষণাকে বাতিল বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন। এইসব মহামান্য ব্যক্তিবর্গের

স্বীকার উক্তির বিস্তারিত আলোচনা এই পুস্তকে একাধিকবার হয়েছে।

এতসব কিছুর পরও বঙ্গীয় তথা ভারতীয় বুদ্ধি বিক্রয়কারী আঁতেল বাহিনী ভারতবাসীকে তাইহোকুর ছাই গেলাতে ব্যস্ত। তার জন্য তারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা খরচ করে কলিকাতা থেকে ভিয়েনা, জার্মানী, জাপান, টোকি ও কোথাও যেতে কসুর করছে না। কিন্তু বন্ধুবর ওহে আঁতেলের দল আপনারা ভুলে যাবেন না যেদিন আপনারা জয়ী হবেন সেদিন পৃথিবী থেকে সত্য, সৎ, সততা ও বিনাশ হবে, সৃষ্টিও ধ্বংস হয়ে যাবে মহাকালের গর্ভে। অর্থাৎ কিনা আপনাদের আর আঁতলামো বুদ্ধিবিক্রির বাজারই থাকবে না। অতএব যারা এমন যজ্ঞে ব্যস্ত তারা অবশ্যই মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। কারণ পৃথিবীও ধ্বংস হবেনা আর সত্য ও বিনাশ হবেনা। তাই বলতে বাধ্য আপনাদের স্বপ্নও কোনদিন পূর্ণ হবেনা।

বিভিন্ন নামীদামী পত্রপত্রিকায় আমরা নিত্য নতুন দেখতে পাচ্ছি নানা জ্ঞানগর্ভ উপদেশামৃত বর্ষিত হচ্ছে সুভাষ অনুরাগী বা ভক্তদের উদ্দেশ্যে। এ সম্পর্কে দুই-একটি কথা না বললেই নয়, তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, সুভাষভক্তদের যেসব উপদেশামৃত বিলানো হচ্ছে বা ব্যঙ্গ করা হচ্ছে—যারা করছেন তাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, ঐসব বাণী বা ব্যঙ্গবিদ্রূপের আগে অন্তত দুবার ভেবে তা করবেন। কারণ—ভক্তকুল তাঁদের ভক্তির দেবতার ব্যাপারে অন্ধ তো হতেই পারে। তাঁরা যৎপরনাস্তিই অন্ধ হবে, হচ্ছে বা হয়। এটা কোন অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যারা ভক্ত নয় অথচ মুখে শত্রু বলতেও ভয় পাচ্ছে বা শত্রুর দ্বারা প্রতিপালিত নিয়োজিত বলতেও পারছে না; পরন্তু সুভাষচন্দ্রের দেশবাসী হিসাবে সুভাষপ্রেমিক পরোক্ষে দাবী প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে কিন্তু উপায় নেই—তাদের সুভাষভক্তদের ব্যাপারে এমন গাত্রদাহ কেন? ক্ষমতার দম্ভে তো তারা আজ অর্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবৎ গোটা জাতিকেই বিভ্রান্ত করে চলেছে। যাকে বলে ইতিহাস বিকৃতি। এই প্রবন্ধের গোড়াতেই ইতিহাস বিকৃতির কথা বলা হয়েছে। এই বিভ্রান্তিমূলক প্রচার কি ইতিহাস বিকৃতি নয়? ইতিহাস বিকৃতি তবে আর কাকে বলে?

এই বিকৃতির ধারাবাহিকতা যাতে এখানেই পরিসমাপ্তি না ঘটে যায় তার জন্য ঐ গোষ্ঠীর কি নিদারুণ পরিকল্পনা তা ভাবতেও অবাক লাগে। তাদের সুভাষবৈরিতার পরিকল্পনা কোন তাৎক্ষণিক বা স্বল্পকালীন ব্যাপার নয়। বিগত ছাপ্পান্ন বৎসরকাল যাবৎ তো আমরা তা প্রত্যক্ষ করছি। তাছাড়া ইতিপূর্বে আমরা যেসব তথ্য পেয়েছি সেখানে দেখা গেছে সাম্রাজ্যবাদীর সহযোগিতায় আমাদের দেশের সরকার বাহাদুর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের যেকোন সময় আত্মপ্রকাশের দুর্ভাবনায় ও দুঃস্বপ্নে ভীতি বিহ্বল হয়ে তিনি যাতে আবির্ভূত না হতে পারেন তার জন্য যুদ্ধাপরাধী নামক একটি ব্যারিকেটের মেয়াদ হাজার বছর করে রেখেছেন। যদিও সময় সমাগত হলে এটা কোন ব্যাপারই হবেনা সুভাষচন্দ্রের কাছে। তবু কংসের খেলাতো কংস ও তার অনুচররা খেলবেই।

তাদের বিকৃতির খেলাটা যাতে শুধু সমকালীন গণ্ডীতে সীমিত না থাকে তার জন্য

কী ব্যবস্থা, কী সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও দূরদর্শিতা তাদের, তারে প্রশংসা না করে উপায় নেই। তাদের এই চক্রান্তের জাল কিভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে আসুন তা একটু পর্যবেক্ষণ করি। দিনদিন প্রতিদিন যে মানব শিশুটি ভারতের ও বাংলার মাটিতে জন্ম নিচ্ছে তারাও যাতে সুভাষবৈরিতায় সুদক্ষ হয়ে ওঠে তারও সুবন্দোবস্ত তারা নিরবে নিভৃতে করে চলেছে। বাস্তবচিত্র বলছে সুভাষচন্দ্রের কাল থেকে আজ পর্যন্ত দু'বছরের শিশু থেকে শতায়ু সম্পন্ন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত 'সুভাষ'—নাম মন্ত্রের যাদুতে অন্ধ ভক্ত বা অনুরাগী হয়ে ওঠে। এতো চলতে দেওয়া যায়না। তার একটা বিহিত দরকার। এই সুভাষ সংক্রামণের প্রতিবিধানার্থেই সাম্রাজ্যবাদীদের এদেশীয় ছদ্মবেশীরা দেখা যাচ্ছে কিছুদিন পর পরই সুভাষচন্দ্রের নামে নানা প্রোপাগান্ডায় ব্যস্ত। এই বিষবাষ্প ছড়িয়ে যদি ঐ নবাগত প্রজন্মকে কিছুটা হলেও ঐ যাদুমন্ত্র থেকে দূরে রাখা যায় বা দোষিত করা যায় তাই বা ক্ষতি কী? তা যদি মূল উদ্দেশ্য না হয় তবে ৫৫/৫৬ বৎসরের পচা বাসী সংবাদ এবং মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করার যৌক্তিকতা বা সার্থকতা কোথায়? এর যথার্থ উত্তর কী হতে পারে আপনারাই বলুন। এই পচা বাসী খবর পরিবেশন হচ্ছে কিনা তা সমকালীন অপর একটি পত্রকারের লেখা থেকেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আসুন সেই পত্রকার কী পরিবেশন করেছেন তা একটু পর্যালোচনা করি। গত ১লা ফেব্রুয়ারী ২০০১, বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত বর্তমান পত্রিকার চতুর্থ পৃষ্ঠায় বিশিষ্ট সাংবাদিক পবিত্র ঘোষ এক নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে যা প্রতিবাদী ভাষায় পরিবেশন করেছেন তার কিছু কিছু অংশ এখানে সংযোজন করা হল আমার উপরের বক্তব্যের সমর্থনে। (স্মরণীয় এখন ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত তৃতীয় নেতাজী তদন্ত কমিশন চালু আছে।) বর্তমানে লেখা পবিত্রবাবুর ভাষায়—

"নেতাজী তদন্ত কমিশনের কাজ চলার সময় একটি পুরাণো ফাটা রেকর্ড নতুন করে বাজানো হয়েছে। জাপানের বাসীন্দা ডাঃ তানেয়োসি ইয়োশিমির বহুদিন আগের একটি বিবৃতি হঠাৎ ছাড়া হয়েছে বাজারে। বিবৃতিটি বহু আলোচিত ও বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে ইতিপূর্বেই প্রত্যাখ্যাত। তবু সংবাদ সংস্থা পি. টি. আই. দাবি করেছে, ডাঃ ইয়োসিমির ওই বিবৃতি তাদেরই আবিষ্কার। তারা নাকি বিবৃতিটি সংগ্রহ করেছে বৃটিশ পাবলিক রেকর্ড অফিস থেকে।.....পি. টি. আই. বলছে.....নেতাজীর মৃত্যুর চূড়ান্ত প্রমাণ ওই জাপানী ডাক্তারের বিবৃতি।

নেতাজীর জীবন ও মৃত্যু বিষয়ে পি. টি. আই. কোনদিন গবেষণা করেছে বলে শোনা যায়নি। এতকাল পর তারা তদন্তের আসরে নেমে গেল কেন তা বোঝা কঠিন।.....পি. টি. আই. ডাক্তার ইয়োসিমির যে বিবৃতিটি খুঁজে পেতে বের করে ঢাক বাজিয়ে প্রচার করেছে সেটি ডাক্তার সাহেব দিয়েছিলেন হংকং-এ বৃটিশ গোয়েন্দাদের কাছে, যুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের পর।.....ডাঃ ইয়োসিমি মাত্র একবার বিবৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি দফায় দফায় বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁর একটি বিবৃতির সঙ্গে আর

একটি বিবৃতির মিল নেই। তিনি শাহনওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের কাছেও সাক্ষ্য দিয়েছেন। আশিস রায় নামে একব্যক্তি ১৯৯৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর ডাঃ ইয়োসিমির সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন.....। পি. টি. আই.-এর আবিষ্কারটি যেমন ঘটা করে দেশের সংবাদ পত্রগুলিতে প্রচারিত হয়েছে, আশিস রায়ের সঙ্গে ইয়োসিমির সাক্ষাৎকারের বিবরণও তেমনই সাড়ম্বরে প্রচার করা হয়েছিল।

দেখা যাচ্ছে, ডাঃ ইয়োসিমি তাঁর তেত্রিশ বছর বয়স থেকে বর্তমান অষ্টাশি বছর বয়স পর্যন্ত বহুবার মুখ খুলেছেন।.....এবং ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেছেন।.....তাঁর প্রথম বিবৃতিটি দিয়েছিলেন অ্যালায়েড ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের কাছে ১৯৪৬ সালের ১৯শে অক্টোবর। তাইহোকুর সাজানো বিমান দুর্ঘটনার চৌদ্দো মাস পর।.....দ্বিতীয় বিবৃতি দিয়েছিলেন শাহনওয়াজ কমিটির সাক্ষী হিসাবে ১৯৫৬ সালের ২২ ও ২৩শে মে।.....তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার এগারো বছর পর। তিনি তৃতীয় দফায় বিবৃতি দিয়েছেন খোসলা কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে। ৭১ সালের ২৪শে এপ্রিল। বিমান দুর্ঘটনার প্রায় ছাব্বিশ বছর পর।.....চতুর্থ বিবৃতির তারিখ ৯ই ডিসেম্বর ১৯৯৫। আশিস রায় ওই বিবৃতি নিয়েছিলেন দিল্লীতে বসে টেলিফোনে টোকিওয় ডাঃ ইয়োসিমির সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে। নেতাজীর মৃত্যুকাহিনী প্রচারের পঞ্চাশ বছর চার মাস পর। এই বিবৃতিতে এমনভাবে কথা বলেছেন যেন তাঁর স্মৃতি অটুট।.....জাপ-সম্রাটের সামরিক বাহিনীর ডাঃ তানেয়োসি ইয়োসিমির কাছ থেকে এতগুলি বিবৃতি আদায় করার পর সেগুলি বহুভাবে আলোচিত ও প্রচারিত হওয়ার পরও পি. টি. আই. আবার এক পুরানো বিবৃতি নতুন করে প্রচার করতে উদ্যোগী হয়ে উঠল কেন; সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।.....মিত্রশক্তির গোয়েন্দাদের তিনি বলেছিলেন ১৮ই আগস্ট বিকাল ৫টায় আরও ছয় সাতজন লোকের সঙ্গে বসুকে নিয়ে আসা হয়েছিল নানজোন সামরিক হাসপাতালে।.....কিন্তু শাহনওয়াজ কমিটিকে.....বলেছেন দুপুর দুটোয় তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে টেলিফোনে তাকে বিমান দুর্ঘটনার কথা জানানো হয়েছিল। তার মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যেই তেরো চৌদ্দোজন আহত ব্যক্তির সঙ্গে বসুকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। খোসলা কমিশনকে বলেছেন.....সাড়ে বারোটায় সাতজন ব্যক্তি হাসপাতালে এসেছিলেন।.....আশিস রায়ের প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ বলেছেন ট্রাকে করে চন্দ্রবসুকে অন্যান্য আহতদের সঙ্গে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তারপর সৈন্য ও নার্স মিলিয়ে আট দশজন লোক তাঁকে বয়ে নিয়ে একটি ঘরে এনেছিল।

পি. টি. আইয়ের প্রচারিত বিবৃতিতে ইয়োসিমি বলেছেন পাঁচ ছয়জন জাপানীর সঙ্গে দু'জন ভারতীয়কে আনা হলে লেঃ কর্ণেল ইশি একজন ভারতীয়কে দেখিয়ে বলেন উনি বোস, ওঁর চিকিৎসা যেন ভালোভাবে করা হয়। এই ইশির উল্লেখ ইয়োসিমির অন্য কোন বিবৃতিতে নেই। আশিস রায়কে তিনি নোনোমিয়া নামে একজনের কথা বলেছিলেন। তার হাসপাতালের নামটিও তিনি আশিসবাবুকে অন্যরকম বলেছেন। নানমোম হাসপাতাল হয়ে গিয়েছে তাইহোকু সেনা হাসপাতাল দক্ষিণ ফটক। তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে খোসলা কমিশনের কাছে দেওয়া সত্যরঞ্জন বক্সি,

যিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সমকর্মী, বিপ্লবী। তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন:

'‘আই. এন. এ.-র বিচারের সময় আমি দিল্লীতে ভুলাভাই দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। ভুলাভাই ছিলেন আসামী পক্ষের প্রধান অ্যাডভোকেট। তাই বিচারের সময় যেসব জিনিষ দেখানো হয়েছিল সেগুলি তিনি দেখেছিলেন। বিচারের সময় এক মৃত ব্যক্তির ফটো দেখানো হয়েছিল। লোকটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরোপুরি কাপড়ে ঢাকা। ওইটি নাকি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃতদেহ। সবটাই ধাপ্পা। তাইহোকু বিমান বন্দরেরও একটি ফটো দেখানো হয়েছিল। কিন্তু ওটা বিমান বন্দরের ছবিই নয়, তাইহোকু ফরমোসায়। কিন্তু তাইহোকুর ভু-সাদৃশ্যের সঙ্গে ওই ছবির কোনই মিল নাই।''

.....ডাঃ ইয়োসিমিকে জেরা করার সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি সুভাষচন্দ্রের প্রাণবিয়োগের যেসব কথা বলছেন, তা কি জাপানের নিজস্ব নিরাপত্তার প্রয়োজনে? .....জবাবে বলেছিলেন হ্যাঁ।.....

১৯৭০ সালে সুরেশচন্দ্র বসু (সুভাষচন্দ্রের বড় ভাই সেজদাদা) খোসলা কমিশনে সাক্ষ্য দিতে এসে বলেন : ‘‘যুদ্ধ শেষ হওয়ার অনেক আগেই নেতাজী একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। তা হলো যুদ্ধ শেষে রাশিয়ায় চলে যাওয়া। জাপানিদের সঙ্গে কথা বলে স্থির করা হয়েছিল রাশিয়ায় চলে যেতে তাঁরা তাঁকে সাহায্য করবে। বিজয়ী ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি নেতাজীকে যুদ্ধাপরাধীরূপে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার চাপ দেবেই। তখন জাপানীরা বলবে নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন''।.....সুরেশ বসু শাহনওয়াজ কমিটির সদস্য হিসাবে এসব তথ্য তিনি পেয়েছেন। ডঃ রাধাবিনোদ পালও একই কথা বলেছিলেন।.....ডাঃ তানেয়োসি ইয়োসিমির বিবৃতিগুলি খুঁটিয়ে দেখলেই সেগুলির ভিতরকার অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে।.....প্রথম বিবৃতিতে বিকাল পাঁচটায় নেতাজীকে হাসপাতালে আনার কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী বিবৃতিতে সময় হয়ে গিয়েছে দুপুর দু'টো, সাড়ে বারটা ও একটা—দু'টো। প্রথম বিবৃতিতে নেতাজীর সঙ্গে আনা আহতের সংখ্যা ছিল ছয় সাতজন, দ্বিতীয় বিবৃতিতে তেরো চৌদ্দোজন, আবার তৃতীয় বিবৃতিতে সাতজন।.....কিন্তু আশিস রায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কোন ভারতীয়ের উল্লেখ নেই।.....কে তাঁকে অর্থাৎ ডাঃ ইয়োসিমিকে আহত ভারতীয়কে বসু বলে শনাক্ত করে দিয়েছিল। তিনি বলেছেন লোকটি হয়ত 'ইশি'। দ্বিতীয় তৃতীয় বিবৃতিতে ইশির নামও উল্লেখ নেই।.....আবার অন্যত্র বলেছেন হাসপাতালে আনিত অগ্নিদগ্ধ বসুকে শনাক্ত করেছিলেন লেফটেন্যান্ট নোনোমিয়া। নোনোমিয়া নাকি বলেছিলেন, উনি চন্দ্রবসু খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যেকোন মূল্যে ওঁর জীবন রক্ষা করতে হবে। ১৯৪৬, ১৯৫৬ ও ১৯৭১ সালে নোনোমিয়ার কোন অস্তিত্বই ছিলনা।.....১৯৪৬ সালে মিত্রশক্তির গোয়েন্দাদের বলেছিলেন, বসুর গোটা দেহ পুড়ে গিয়েছিল—বিশেষভাবে মাথা, বুক এবং উরুদেশ।.....আইডিন্টিফিকেশনের চিহ্নও ছিলনা।.....এগারো বছর পর শাহনওয়াজ কমিটিতে সাক্ষ্য দিতে এলে তাকে দেখানো হয়েছিল নেতাজীর একটি বহু পরিচিত ফটো। তখন ইয়োসিমি লাফিয়ে ওঠে বলেছিলেন, 'এঁর চিকিৎসাই আমি করেছিলাম'।.....১৯৪৫ সালে ১৮ই আগস্ট যাঁকে চিনতে পারেনি.....১৯৫৬ সালে

তাঁর ফটো দেখেই চিনে ফেললেন!!

.....পি. টি. আই.-এর প্রচারিত বিবৃতিতে ডঃ ইয়োসিমি বলেছেন : "আমি নিজেই তাঁর ক্ষতগুলি পরিষ্কার করে ড্রেস করে দিলাম। প্রথম চারঘণ্টা তিনি আধাঅচৈতন্য ছিলেন এবং অনেক কথা বলেছেন। তিনি এক গ্লাস জল চাইলে আমি প্রথমে জাপানীতে কথা বললাম। বসু বলেছিলেন ইংরেজিতে। তাই একজন দোভাষীর জন্য অনুরোধ জানানো হল। অসামরিক সরকারী দপ্তর থেকে নাকামুরা নামে একজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সে বলল, সে বহুবার বসুর দোভাষীর কাজ করেছে"। অর্থাৎ নেতাজীর মৃত্যুর সময় একজন দোভাষীর দরকার হয়েছিল। আর তাঁর পরিচিত একজন দোভাষী কাছেই মজুদ ছিল।

ডাঃ ইয়োসিমির চারটি বিবৃতি ছাড়াও.....১৯৬৯ সালে 'ইয়োমিউরিসিমবু' পত্রিকার প্রতিবেদককে তিনি বলেছেন, "১৮ই আগস্ট বেলা ৩টায় মারাত্মক দগ্ধ অবস্থায় একজনকে অ্যামবুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হল। (অন্যত্র বলেছেন ট্রাকে করে কয়েকজনকে নিয়ে আসা হয়েছিল।) স্ট্রেচারে করে আটজন লোক তাঁকে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট রুমে নিয়ে গেলাম।.....আমি দেখেই বুঝলাম তিনি বাঁচবেন না। আমি এবং সুরুতা মিলে তাঁর চিকিৎসা করলাম। যখন তিনি হাসপাতালে এলেন তখন তাঁর জ্ঞান পরিষ্কার ছিল। বসু সন্ধ্যা ৭টায় অচৈতন্য হলেন। রাত ১০টায় মারা গেলেন"।

খোসলা কমিশনে এই বিবৃতির কপি দেওয়া হয়েছিল। পি. টি. আই. প্রচারিত বিবৃতির সঙ্গে এই বিবৃতির মিল নেই।.....খোসলা কমিশনে বলেছিলেন হাসপাতালে আনার পরও বসু বারঘণ্টা বেঁচেছিলেন। "হাসপাতালে আনার পর থেকে আমি সবসময় বসুর পাশে ছিলাম"—বলেছিলেন ডাঃ ইয়োসিমি। কিন্তু জেরার মুখে তিনি স্বীকার করেন—তিনি নেতাজীর পাশে ছিলেন না। এমনকি তাঁর বা তাঁর সহকারীর বিনা অনুমতিতে ও বিনা উপস্থিতিতে নেতাজীর শরীরে কেউ রক্ত ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর শাহনওয়াজ কমিটিকে দেওয়া সাক্ষ্যের সঙ্গে খোসলা কমিশনকে কথা বলার মিল নেই। কেন নেই তা জিজ্ঞাসা করলে ডাঃ ইয়োসিমি বলেছিলেন, শাহনওয়াজ কমিটিকে তিনি ভুল কথা বলেছিলেন।

এসব কথাই নথিভুক্ত হয়ে আছে। পি. টি. আই. পঞ্চান্ন বছরের পুরানো বিবৃতিকে তুলে এনে বলছে, নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে এটাই চূড়ান্ত কথা।

—বর্তমান পত্রিকা : ১লা ফেব্রুয়ারী ২০০১ : প্রবন্ধকার পবিত্র ঘোষ

উপরের তথ্যচিত্রকে কি আর ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের এতটুকু প্রয়োজন আছে? তা যে নেই তা বলাই বাহুল্য। শুধু একটা কথাই এখানে সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে, তা হলো ভারতবর্ষের সকল লিডিং সংস্থা, ব্যক্তি বা মিডিয়াপতিরা নেহেরু সাহেবের গাইড লাইনেই বিকৃত ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে। এই বিকৃতির বিরুদ্ধে আসুন আপনি, আমি, এবং আপমর জনগণ সচেতন হতে চেষ্টা করি এবং তা নিয়ে সোচ্চার হই ভারতবর্ষের মূল্যবোধ ও সনাতন ঐতিহ্যকে বাঁচাতে। কারণ ভারতের ইতিহাস বিকৃতি হয়ে চলেছে হিন্দু যুগের সমাপ্তি ও মধ্যযুগের সূচনা থেকে বৃটিশ যুগে এবং এমন কি আজ আধুনিক স্বাধীন ভারতে পর্যন্ত। মধ্যযুগে মুসলিম অনুপ্রবেশের কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে, ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে এবং হয়ে চলেছে, তা যে অবশ্যই বিদেশীদের

সৃষ্টি এমন কি আজও বিদেশী চোখের পর্দায় দেখা ও সেই কৃত্তিম মানসিকতা দ্বারা ইতিহাস রচিত হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে ও আমাদের জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে সেই ইতিহাস নতুন করে ভারতীয় মানসিকতা দ্বারাই সংস্কার করতে হবে। কাজেই আত্মসচেতন না হলে তাঁর হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই। তাই আসুন, এ ব্যাপারে সচেতন হই এবং সোচ্চার হই।

(৪)

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ফৌজের প্রতি শেষ আদেশনামা

SPECIAL ORDER OF THE DAY

by

THE SUPREME COMMANDER,

AZAD HIND FAUJ.

TO OFFICERS & MEN OF THE AZAD HIND FAUJ.

COMRADES,

All sorts of wild rumours are now afloat in Syonan and other places, one of them being that hostilities have ceased. Most of these rumours are either false or highly exaggerated. Till this moment, fighting is going on on all fronts, and I say this, not only on the basis of reports from friendly sources, but also of reports given out by the enemy radio. If there is any change in the war situation, I shall be the first to inform you. Therefore, I want all of you to remain perfectly calm and unperturbed and carry on your duties in a normal way. Above all, do not allow yourselves to be influenced in any manner by wild bazar rumours. We have to face any situation that may arise, like ~~the~~ brave soldiers fighting for the freedom of their Motherland.

JAI HIND

Syonan, 14th August, 1945.
1500 hours

Subhas Chandra Bose

SUPREME COMMANDER,

AZAD HIND FAUJ.

পঞ্চদশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

নেতাজী সংশ্লিষ্ট কত ফাইল ভারত সরকারের দপ্তরে বন্দী আছে? সাম্প্রতিককালের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রামাণ্য চিত্র নীচে প্রদত্ত হল।

কমিশন (নেতাজী অন্তর্ধান)-কে মাত্র ৯৯০ খানি ফাইল জমা দিয়েছে। তার মধ্যেও আবার শোনা যাচ্ছে অনেক ফাইল থেকে জরুরী জরুরী সব documents বেপাত্তা। এবার অবস্থাটা চিন্তা করুণ। ব্যাপারটাকে তারা অর্থাৎ ভারত সরকার কোথায় চালান করেছে। এ যেন সেই অন্ধকূপ হত্যার দ্বিতীয় নজির। অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে নিশ্চয় একটা মস্ত সান্ত্বনা ছিল। সেটা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নষ্টামী। কিন্তু এই উল্লেখিত ব্যাপারে যে ভণ্ডামী আজ ৫৫ বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি সরকার করে চলেছে তার কি সান্ত্বনা? ভারতবাসী হিসাবে আপনার আমার। তার উত্তরে অবশ্যই বলতে হয় বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। যারা এই মহাজোট সরকার বা জাতীয়তাবাদী সরকার বলে প্রত্যাশা করেছিলেন তাদেরও আক্কেল সেলামী পুরস্কার মিলল তো? আপনাদের ধারণা বৃটিশজাত ক্রীড়নক শুধু কংগ্রেস, কমিউনিস্ট আর মুসলিম লীগ! তাহা মিথ্যা। ভারতবর্ষের ছোট বড় সকল রাজনৈতিক পার্টিরাই সুভাষবৈরিতায় এবং বৃটিশ চাটুকারীতায় বিশ্বে অদ্বিতীয়। সরকারের ঘরে এতৎ সংক্রান্ত ফাইলের সংখ্যা সম্পর্কে একটি প্রবাহমান বিখ্যাত সংবাদ পত্রের প্রচারিত সংবাদ নীচে উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

Netaji probe body's plea to PM

<u>STATESMAN NEWS SERVICES</u> (9th May-2000, 4th Page).

CALCUTTA, May 8.—The Netaji Provc and Research Foundation has complained to the Prime Minister that delay in the release of vital documents by departments at the Centre has hampered the work of the Justice Mukherjee Commission probing the mystery into the disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose.

In a letter to Mr. Atal Behari Vajpayee the Foundation said that the commission had given six months time to send the related documents for beginning the work but it has not received them yet. It has requested the Prime Minister's Office to extend all co-operation to enable the commission to function.

Mr. Debabrata Biswas, MP and general secretary, All India Forward

Bloc said that unless the Centre declassify the documents it will be difficult for the commission to ask for relevant papers from countries like Japan, Germany and Vietnam.

Mr. Biswas said that he will soon meet Union Home Minister Mr. L. K. Advani to seek his intervention for expediting the inquiry. There are about 10,000 files on the circumstances that led to the disappearance of Netaji. About 1000 files had been released by the Centre before the commission.

The commission was set up by the Vajpayee government following persistent demands by the Forward Bloc but its work has been affected since it is yet yet to receive a large number of files.

এখানে সবিশেষ উল্লেখনীয়।
নেতাজী সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি বিশেষ ঘটনা।

ষাটের দশকে যখন শৌলমারী কাণ্ড নিয়ে নানা বিভ্রান্তি চলছে তখন সুভাষবাদী জনতার কর্মকর্তারা শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বসুকে আবেদন করেছিলেন তিনি তো সুভাষচন্দ্রের নিকট সহকর্মী ছিলেন, তাই তিনি গিয়ে যদি ঐ সাধুজীকে আইডিন্টিফাই করেন তবে জনগণের আর কোন সংশয় বা বিভ্রান্তি থাকবে না। শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বসু মহাশয় সেই সুভাষবাদী প্রতিনিধিদের বলেছিলেন, 'আমার পক্ষে শৌলমারীর সাধুজীর কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ আমি খণ্ডিত ভারতের সংবিধান মেনে নিয়ে রাজনীতির ময়দানে রাজনীতি করি। যদি শৌলমারীতে যাই তবে আর আমার পার্টি পলেটিক্স করা চলবে না। কারণ সেখানে যাওয়া মানেই আমার অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা বা প্রকাশ করা।' একথার অর্থ সুভাষবাদী প্রতিনিধিদের নিকট ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বসু অতিব সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন বলেই আসল সত্য কথাটি বলতে দ্বিধা করেননি। এই ছিল তৎকালীন লোকেদেরই নয় রাজনীতিবিদদেরও মূল্যবোধ। আর আজ তারাই ডানপাশে ফিরে মাইকে যা বলেন বাঁপাশে মুখ ঘুরালেই তা অস্বীকার করেন। এর যে কোন প্রতিকার বা ফল নেই তা নয়। তবে সবই সময় সাপেক্ষ। সেই ধৈর্যের পরীক্ষায় আমদের উত্তীর্ণ হতেই হবে। তাই বলতেই হয় 'সবুরে মেওয়া' ফলে। অতএব আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক। কারণ ultimate goal সত্যের। এ-কথাই শেষ কথা।

নেতাজী সুভাষের মৃত্যুর খতিয়ান

এখানে কিছু মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে যা অবগত হলে এই ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রই উপকৃত হবেন। এই তথ্য যাঁর নিকট হতে সংগৃহীত তিনি

হচ্ছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় বিশ্বজিৎদা (বিপ্লবী শ্রীবিশ্বজিৎ দত্ত) এবং প্রখ্যাত সুভাষবাদী সংগঠনের একসময়ের সেক্রেটরী জেনারেল যিনি সত্যগুপ্তের একান্ত সহকর্মী ও সহযোগী ও অনুরাগী এবং সুভাষ নিবেদিত প্রাণ।

পৃথিবীতে রহস্য পুরুষদের মৃত্যু অনেকবার ঘটে। তেমনি সুভাষচন্দ্র যে পৃথিবীর সেরা রহস্য পুরুষ তাতে কেউই দ্বিমত পোষণ করবেন না আশা করি। তাই তাঁকে শুধু একবার তাইহোকুতে বিমানে চাপিয়ে মেরে ফেলা নয়। তাঁকে কতবার যে আমরা মেরে ফেলেছি তার কোন ঠিকানা নেই। আসুন তাঁকে আমরা কতবার কত প্রকারে যমরাজের রাজ্যে পাঠিয়েছি একটু চোখ বোলান যাক। কথিত আছে নয় নয় করেও ৯/১০ বার তাঁকে আমরা মেরে নিষ্ক্রান্ত হয়েছি। পারলে আরও মারতে অবশ্যই কসুর করবো না। আসুন আগামীদিনের কথা বাদ দিয়ে বিগত দিনের পুঁজি পাট্টায় কি পাই তাই একটু ওলট পালট করে দেখি, ব্যাপারটা কি? জানিনা হয়ত ইতিমধ্যে আরও বেশ কয়েকবার নেতাজীর মৃত্যু আমরা ঘটিয়েছি।

সম্প্রতি তাইহোকু থেকে ভারত পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বইখানি একটি ঐতিহাসিক দলিল। কাজেই বইখানির চাহিদা অসীম। সেই বই-এর ভূমিকায় আমরা যা পাচ্ছি নেতাজীর মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য, তাই এখানে তুলে ধরলাম হুবহু। তাতে ব্যাপারটা অনুধাবনে সহজসাধ্য হবে সকলের পক্ষেই।

তৃতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

'তাইহোকু থেকে ভারতে' (২য় পর্ব) নবতর সংস্করণের নব মুদ্রণের আসন্ন প্রকাশনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কথা বলা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিষয়বস্তুটি খুব যে জটিল, তা নয়; তবে কালোচিত এবং গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষতঃ এই আকর-গ্রন্থ প্রসঙ্গে। উদ্দিষ্ট পুস্তকটির শুধু যে মূল-প্রতিপাদ্য তাই নয়, একমাত্র প্রতিপাদ্য হল—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সশরীরে জীবিত। শৌলমারীর সাধুবেশী সারদানন্দজীই নেতাজী। প্রতিপক্ষ শক্তি আবার আদা জল খেয়ে কোমর বেঁধে আসরে নেমেছেন—না, নেতাজী মৃত। সম্প্রতি ২২শে জানুয়ারী ১৯৯২-তে নেতাজীকে মরণোত্তর ভারত-রত্ন ঘোষণা দ্বারা বর্তমানে ভারত সরকার নেতাজীকে মৃত প্রতিপন্ন করবার প্রাণপণ প্রয়াস করেছেন। এইটি নেতাজীকে মৃত প্রতিপন্ন করবার অষ্টম প্রয়াস। অষ্টম আশ্চর্য! এইবার নিয়ে আটবার মরলেন। আমরা পাঠকবৃন্দের সম্মুখে ক্রমান্বয়ে তা হাজির করছি।

প্রথম প্রয়াস : নেতাজী জার্মানী থাকাকালীন (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪২ খৃ: অ:) ইংরেজ সরকার কর্তৃক ঘোষণা :—

Mr. S. C. Bose, Swami Satyananda Puri and others died in a plane crash when it was proceeding from Singapore. এটি একটি অসম্পূর্ণ ঘোষণা। প্রত্যুত্তরে নেতাজীর বার্লিন রেডিও থেকে তাৎক্ষণিক ঘোষণা : I am sorry. I could

not oblige the British government by dying. I am still living, I Subhash Chandra Bose is speaking. এ তথ্য সবারই জানা।

দ্বিতীয় প্রয়াস : জাপান গভর্নমেন্টের অনুমোদনে ডোমেই নিউজ এজেন্সির পরিবেশিত ২৪শে আগষ্ট ঘোষণা অনুযায়ী সংবাদ যে ফরমোসাতে তাইহোকু বিমান ঘাটিতে ১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫ খৃ: অ: সুভাষচন্দ্র নিহত হয়েছেন। এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন।

তৃতীয় প্রয়াস : পঞ্চাশের দশকে আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সত্য দেবনাথ দাস কর্তৃক ঘোষণা যে, জাপ সরকার কোন এক স্থানে নেতাজীকে গুলি করে মেরেছে।

চতুর্থ প্রয়াস : একদা যাহারা নেতাজীকে দেশদ্রোহী, ফ্যাসিস্ট ষ্টুজ, কুইসলিং ও তোজোর কুকুর নামে অভিহিত করেছিল সেইসব প্রগতিবাদী বিশ্বপ্রেমিকারা (হঠাৎ নেতাজীর প্রেমমুগ্ধ) জানাল যে, চীন-মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় তাঁকে হত্যা করেছে।

পঞ্চম প্রয়াস : আশীর দশকে দিল্লী রেডিও থেকে ঘোষণা যে সাধুবেশী নেতাজী দেরাদুনে পরলোক গমন করেছেন। হৃষিকেশে তাঁর দাহকার্য সমাধাও হয়েছে। উত্তমচাঁদ মালহোত্রা রেডিও টিভিতে প্রতিবাদ পাঠান, তা অগ্রাহ্য হয় অথবা সরকার চেপে দেয়।

ষষ্ঠ প্রয়াস : আশীর দশকের শেষাংশে (১৯৮৭) কিছু কিছু সংবাদপত্রে সরকারের মাধ্যমে ঘোষণা, ফৈজাবাদে সাধুবেশী নেতাজীর দেহান্ত হয়েছে। নেতাজীর ভ্রাতৃষ্পুত্র ডা: শিশির বসু সরজমিনে তদন্তের জন্য ঐ স্থানে গিয়েছিলেন। ভ্রাতুস্পুত্রী ললিতা বসুও গিয়েছিলেন।

সপ্তম প্রয়াস : স্ট্যালিনের আদেশে নেতাজীকে রাশিয়ায় হত্যা করা হয়েছে। নেতাজীর আর এক ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীঅমিয় নাথ বসু তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ইউরোপে গিয়েছেন। ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে।

অষ্টম প্রয়াস : ২২শে জানুয়ারী ১৯৯২ খৃষ্টাব্দ। ভারত সরকারের ঘোষণা : মরণোত্তর ভারতরত্ন নেতাজী। সন্ধিবিচ্ছেদে দাঁড়ায় :—মরণ + উত্তর = মরণোত্তর। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র মরণ (মৃত্যু) দ্বারা গ্রাসিত। কিন্তু কোথায়? কখন কিভাবে তিনি মরণগ্রস্ত হলেন? আমরা সব দীনজন ও হীনজন স্থান-কাল পাত্র, এই তিনটি বিষয়ের একীভূত হওয়া অবশ্য দরকার। তবে কি সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু অন্যভাবে হবে। তথায় স্থান ও কাল-এর নির্ধারণ হওয়ার প্রয়োজন নেই? তবে কি আমাদের দেশের High ups রা—মহাজনগণ মনে করেন কি নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্থান ও কালের অতীত? একই ব্যক্তি কতবার মরতে পারেন? তবে কি ঐ মৃত্যুগুলি 'Proxy-death" মৃত্যুর প্রক্সি চলেছে? অর্থাৎ নেতাজীর এতবার মৃত্যু প্রক্সিতে ঘটে চলেছে। লজিকের সূত্রানুযায়ী বা তর্কশাস্ত্রের সূত্রানুযায়ী ভিন্নতর সিদ্ধান্ত বা Conclusion-এ আসা যায় না। বহু ব্যক্তির পক্ষেই নেতাজীর মৃত্যুর বড়ো প্রয়োজন।

নবম প্রয়াস : জনৈক গবেষক ড: উষা ভট্টাচার্যের গবেষণার লব্ধ ফল যে, নেতাজীকে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে লালকেল্লায় গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। উড়ন্ত বিমানে শুধুমাত্র সামরিক প্রহরী ও আবিদ হোসেন এবং নেতাজী ছাড়া আর কেউ ছিলেন না—সেখানেই আবিদ হোসেন ও নেতাজীর বাক্যালাপ তিনি ভূমিতে থেকে শুনেছেন। যদিচ আবিদ হোসেনের সঙ্গে তাঁর কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। আবিদ হোসেন কোথাও তা লিখে যাননি কিংবা কাহাকেও একথা বলেছেন বলে জানা যায়নি। ধন্য গবেষণা!

কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে লঙ্কেশ্বর দশানন রাবণের উক্তি : "মরিয়াও না মরে রাম এ কেমন অরি।" এতদ্‌ক্ষেত্রে শ্রীসুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে চলেছে। শতচেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীসুভাষচন্দ্র মরছেন না, তাঁকে মৃত প্রমাণিতও করা যাচ্ছে না। বহুজনের নিকট নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু "বিষম অরি"।

১৯৭৮ খৃ: অব্দে লোকসভায় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ৩রা সেপ্টেম্বর বলেছেন : "Some contemporary records have been available. In the light of doubts and contradictions and those records, the government finds it difficult to accept the earlier conclusions (of the Shas Nawaz Committee and the Khosla Commission) are decisive."

বঙ্গানুবাদ : "সাম্প্রতিক কিছু কিছু দলিল দস্তাবেজ পাওয়া গিয়েছে। ঐ সব নথিপত্র দৃষ্টে যে সন্দেহজনক, বিভ্রান্তিকর অসামঞ্জস্যকর তথ্যাদি দৃষ্ট হয়েছে তাতে করে শাহ নওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের যে অভিমত, বিশ্বাস করা ও গ্রহণ অসাধ্য সরকারের পক্ষে।" তৎপর তিনি বলেছেন : Government has rejected recommendations of both the committees অর্থাৎ সরকার তা বাতিল করে দিয়েছে।

সর্বসাধারণের মতো আমাদের, ন্যায্য প্রশ্ন যে, বর্তমান সরকারকেও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে তাদের এই অলীক ও অদ্ভুত ঘোষণার সত্যিকারের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি? প্রতীক্ষায় থাকলাম।

তিমির রাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণ ছোঁয়ায়ে।

ইতি—
বিনীত

SRI SUBHAS CHANDRA

'Reuter' announces the death of Sri Subhas Chandra on information gathered from Lyons and Vichy radios. We refuse to write an obituary notice. Long live Sri Subhas Chandra!

১৯৪২-এর মার্চ মাসে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ প্রচারের পর
হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদকীয়

মা-জননী তো প্রথম থেকেই খবরটা বিশ্বাস করেননি বলে শুনলাম। তবুও তাঁকে সন্ধ্যায় উডবার্ন পার্কের বাড়িতে নিয়ে এলাম। মা-জননী ও মাকে বসিয়ে রাঙাকাকাবাবুর বেতার বক্তৃতা শোনালাম। কিন্তু দেশের, বিশেষ করে সুভাষপ্রেমী আপামর জনসাধারণকে বোঝাবে কে? তাদের মনের কথা প্রতিধ্বনিত হল আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদকীয়'র কয়েকটি ছত্রে।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কাছে শুনেছি যে ঐ সম্পাদকীয় ছাপাবার পর বাংলাদেশের তদানীন্তন ইংরাজ হোম সেক্রেটারী তাঁকে খুব চোখ রাঙিয়েছিলেন।

সাধক তারা ক্ষ্যাপার হস্তলিপির ফটোচিত্র

সুভাষচন্দ্রের প্রতি সাধক তারা ক্ষ্যাপার একটি নির্দেশিকা—

ওঁ

উমাবলম্
বহরমপুর
(বেঙ্গল)
১৪ই মার্চ

সুভাষ

৫/৬ বছর পূর্ব্বে একদিন "ভিয়েনার" কথা মনে কর। পদ চুম্বন ধর্ম্ম নয়! ইন্দ্রকে "গোত্রভিৎ বলে" আর বলদেবকে যমুনাভিৎ বলে। তুমি কিছু ভেদ করেছ? "অষ্ট বজ্র মিলন কাল এসে গেছে। কোথায় কার উদ্দেশ্যে যাইতেছ?

তোমাদের—
(সাধক তারাক্ষ্যাপা)

সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খানের নেতাজী সুভাষ মূল্যায়ন

শেষ সংগ্রামে সীমান্ত গান্ধীর একটি মূল্যবান বক্তব্য এখানে সংযোজিত হলো যা অবহিত হলে যে কেউ সুভাষচন্দ্রের মূল্যায়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে আরও গভীর সচেতন হতে সাহায্য করবে। আসুন, তিনি কি বলতে চাইছেন তাঁর ভাষায়ই শুনি। যথা, ৬ই এপ্রিল ১৯৭০ টাইমস অব ইণ্ডিয়া থেকে সংগৃহীত।

6th April 1970, KABUL

KABUL, 5th April '90!--Fortunately a reporter concerned with the "Times of India" at New Delhi was invited to visit Afganistan and about the same time he had a short programme to meet Badsha Khan there.

In course of close discussion with Frontier Gandhi almost for an hour, Badsha Khan expressed his views in a brief....."

Badsha Khan said, now the time has come when the people should immediately dethrone all these selfish and motivated leaders and they should help the selfless leaders to go in power. Otherwise, their fate will remain unchangeable and the situation will deteriorate into an almost complete breakdown.

To Mr. K. M. Kulkarni's asking on the point of selfless leader, Gaffar Khan voluntarily said that his heartiest congratulation only would go to the only leader--Netaji Subhas for his sincere act of

love towards the poor. Only Subhas could wipe out the communal plague, in India & Pakistan.

To Mr. Kulkarni's utter surprise and ignorance over the fate of Netaji, Badsha Khan visualised that Subhas might have come earlier in 1947 but the fate and destiny helped him to reach somewhere other than this sub-continent. The only would come when Subhas might appear in the midst of his own countrymen astounding the whole world like mid-day sun. Lastly Badsha Khan said.....firmly that Subhas himself would be the only immense power which might be compared to number of units released but the nuclear fission of Atom. —NAFN

(বিপ্লবী বিশ্বজিৎ দত্ত মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস ছদ্মবেশে ভারতে অবস্থানকালে যে সকল স্থানের উপর দিয়ে গেছেন এবং যে সকল স্থানে এক বা একাধিক দিন বা ততোধিক দিন অবস্থান করেছেন সেসব জায়গার নামের তালিকা :

হিমালয় অঞ্চলে :
মানস সরোবর
জম্মু ও কাশ্মীর :
নাগা পর্বত টোল্টী
কার্গিল
উধমপুর
লাহোর :
রাবী
হিমাচল প্রদেশ :
কুলু
পাঞ্জাব :
হোশিয়ারপুর
পাতিয়ালা
রাজস্থান :
যোধপুর
জয়পুর
আজমীর
আবু
উদয়পুর
কোটা
উত্তর প্রদেশ :
উত্তরকাশী
যমুনোত্রী
চাক্রাতা
বদ্রীনাথ
বারাহোতী
কেদারনাথ
যোশীমঠ
চামেলী
ঋষিকেশ
হরিদ্বার
ল্যান্সডাউন
পিথোরাগড়
আলমোড়া
কোটদ্বার
নৈনীতাল
কাঠগোদাম
টনকপুর
গাজিয়াবাদ
মোরাদাবাদ
বেরিলী
খারী
লখীমপুর
জৌনপুর
কাসগ
সীতাপুর
বলরামপুর
আগ্রা
ইটাওয়া
লক্ষ্ণৌ

নবাবগঞ্জ
বারাবঁকী
গোরখপুর
কানপুর
আকবরপুর
আরই
এলাহবাদ
ফুলপুর
রামনগর
বারাণসী
মীর্জাপুর

মধ্যপ্রদেশ :

ক্ষটনি
মোরেণা
ভিণ্ড
মাধোপুর
গিয়লিয়র
বরোদা
ললিতপুর
টিকমগর
ছতমপুর
ভুপাল
ইন্দোর
জবলপুর
মণ্ডলা
অমরকন্টক
বস্তার
বস্তার
বিলাসপুর

গুজরাট :

গান্ধীনগর
ভাবনগর
খেরা

মহারাষ্ট্র :

নাগপুর

অন্ধ্র :

অনন্তপুরম

তামিলনাড়ু :

মাদ্রাজ
কন্যাকুমারী
কাছিপুরম্
বিলুপ্পুরম্
পণ্ডিচেরী
নিলগিরি
কারাইকুকাল

কেরালা :

মালাপুরম্
পালঘাট

উড়িষ্যা :

ভুবনেশ্বর
কটক
পুরী

বিহার :

যোগবানী
আরা
বাঁকীপুর
বুদ্ধগয়া

নেপাল :

ধবলগিরি
গোরখা
কালী গণ্ডক
গণ্ডক-নদী
কপিলবস্তু
সিলগড়ী
চন্দন চৌকী
কাঠমণ্ডু
জলেশ্বর
বিরাট নগর

আসাম :

আমিন গাঁও
হাফলং
তেজপুর
গোরেশ্বর
গৌহাটি
যমুনামুখ
ডিমাপুর

নাগাল্যাণ্ড :

কোহিমা

মণিপুর :

চুরাচাঁদপুর

অরুণাচল :

ব্রহ্মকুণ্ড
আমিলি
মুরকোংগ সেলোক

মেঘালয় :

মৈরাং

উত্তরবঙ্গ :

শৌলিমার
ফালাকাটা
কুচবিহার
শিলিগুড়ি
পাথরঝোড়া
নিমতি
মোহিতনগর
রাজগঞ্জ

❑ উপরোক্ত নাম ছাড়া আরও অনেক জায়গার নাম আছে যা এই অল্প পরিসরে সংযোজন করা সম্ভব হলো না। উল্লেখ্য উপরের এই পর্যটন ও স্থানীক চিত্রটি সংগৃহীত হয়েছে অভিজিৎ সরকার কৃত তাইহোকু থেকে ভারতে বই-এর দ্বিতীয় খণ্ড থেকে। ছদ্মবেশী গ্রন্থকারের অনুমোদনে।

সুভাষচন্দ্রের গ্রহণ করা কিছু কিছু ছদ্মনাম। অথবা তাঁকে যাঁরা যে নামে ডাকতেন তেমন কিছু নাম তৎসংশ্লিষ্ট মহাজনদের বা ব্যক্তিবর্গের নাম এবং স্থানের নাম।

সুভাষচন্দ্রের ছদ্মনাম

১। সুবি = মেজদা শরৎ বসু এই নামে ডাকতেন।
২। শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু = স্কুল, কলেজে এই নাম ছিল।
৩। সুভাষবাবু/সুভাষ বসু = এই নামে জাতীয় কংগ্রেসে পরিচিতি ছিল।
৪। মোহম্মদ জিয়াউদ্দিন = ভারতবর্ষ থেকে কাবুল পলায়নকালে।
৫। ওর্ল্যাণ্ডো মাজেট্টো = কাবুল থেকে বার্লিন যাবার পথে।
৬। মিস্টার এক্স = অস্ট্রিয়া থেকে জার্মান যাবার পথে।
৭। চন্দর বোস = জার্মানী থেকে সাবমেরিনে দক্ষিণ-পূর্ব দেশে যাবার পথে।
৮। চন্দর বোস = জাপানে অবস্থানকালে।
৯। নেতাজী = বার্মায় যুদ্ধরত অবস্থান।
১০। লিউ-পো-চ্যাং = চীনে অবস্থানকালে।
১১। জেনারেল ডেথ = উত্তর কোরিয়ায় যুদ্ধরত অবস্থায়।
১২। মার্শাল শিব = তিব্বতে অবস্থানকালে।
১৩। আইভানজন অথবা ইভানজন = রাশিয়ায় অবস্থানকালে।
১৪। শ্রীমদ্ সারদানন্দজী = শৌলমারী আশ্রমে অবস্থানকালে।
১৫। লি: হে: হোং = মাঞ্চুরীয়ায় মোঙ্গলীয় নাম।
১৬। ওরাকেল (জ্ঞানী) = তিব্বতে অবস্থানকালে।
১৭। জেনারেল শিব = তিব্বতে অবস্থানকালীন।
১৮। জেনারেল ডেথ = তিব্বতে অবস্থানকালীন।
১৯। মিঃ আজাদ = মালয়েশিয়ায়।
২০। জাপানী সাবমেরিনে = মাৎসুদা।

মায়ের কাছে লেখা কিশোর সুভাষের চিঠি

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

কটক
রবিবার

পরম পূজনীয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী শ্রীচরণ কমলেষু

মা,

ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান—এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্ট ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং

প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতাররূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই—তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা, ভগবানের বড় আদরের দেশ। দেখ মা, ভারতে যা চাও সবই আছে—প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, দারুণ শীত, ভীষণ বৃষ্টি, আবার মনোহর শরৎ ও বসন্তকাল, সবই আছে। দাক্ষিণাত্যে দেখি—স্বচ্ছ-সলিলা, পুন্যতোয়া গোদাবরী দুই কূল ভরিয়া তর তর কল কল শব্দে নিরন্তর সাগরাভিমুখে চলিয়াছে—কি পবিত্র নদী! দেখিবামাত্র বা ভাবিবামাত্র রামায়ণের পঞ্চবটীর কথা মনে পড়ে—তখন মানসনেত্রে দেখি সেই তিনজন—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা, সমস্ত রাজ্য ও সম্পদ ত্যাগ করিয়া, সুখে, মহাসুখে, স্বর্গীয় সুখের সহিত গোদাবরী তীরে কালহরণ করিতেছেন—সাংসারিক দুঃখে বা চিন্তার ছায়া আর তাঁহাদের প্রসন্ন বদন কমলকে মলিন করিতেছে না—প্রকৃতির উপাসনা ও ভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহারা তিনজন মহা আনন্দে কাল কাটাইতেছেন—আর এদিকে আমরা সাংসারিক দুঃখানলে নিরন্তর পুড়িতেছি। কোথায় সে সুখ, কোথায় সে শান্তি! আমরা শান্তির জন্য হাহাকার করিতেছি! ভগবানের চিন্তন ও পূজন ভিন্ন আর শান্তি নাই। যদি মর্তে কোনও সুখ থাকে তাহা হইলে গৃহে গৃহে গোবিন্দের নাম কীর্তন ভিন্ন আর সুখের উপায় নাই। আবার যখন উর্দ্ধে দৃষ্টি তুলি, মা, তখন আরও পবিত্র দৃশ্য দেখি! দেখি—পুণ্যসলিলা জাহ্নবী সলিল-ভার বহন করিয়া চলিয়াছে—আবার রামায়ণের আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে। তখন দেখি বাল্মীকির সেই পবিত্র তপোবন—দিবারাত্রে মহর্ষির পবিত্র কণ্ঠোদ্ভূত পূত বেদমন্ত্রে শব্দায়িত...দেখি বৃদ্ধ মহর্ষি অজিনাসনে বসিয়া আছেন...তাঁহার পদতলে দুইটি শিষ্য...কুশ ও লব...মহর্ষি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। পবিত্র বেদধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রূর সর্পও নিজের বিষ হারাইয়া ফণা তুলিয়া নীরবে মন্ত্রপাঠ শুনিতেছে...গোকুল গুহায় সলিল পান করিবার জন্য আসিয়াছে...তাহারাও একবার মুখ তুলিয়া সেই পবিত্র মন্ত্রধ্বনি শুনিতেছে...শুনিয়া গোকুল কর্ণদ্বয় সার্থক করিতেছে। নিকটে হরিণ শুইয়া আছে...সমস্তক্ষণ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে মহর্ষির মুখপানে চাহিয়া আছে। রামায়ণের সবই পবিত্র...সামান্য তৃণের বর্ণনা পর্যন্তও পবিত্র, কিন্তু হায়! সেই পবিত্রতা আমরা ধর্মত্যাগী বলিয়া আর এখন বুঝিতে পারি না। আর একটি পবিত্র দৃশ্য মনে পড়িতেছে। ত্রিভুবনতারিণী কলুষহারিণী ভাগীরথী চলিয়াছে...তাঁহার তীরে গোপীকুল বসিয়া আছেন...কেহ মন্ত্রোচ্চারণে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিতেছেন কেহ গঙ্গার পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া আপনকে পবিত্র করিতেছেন...কেহ গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে পূজার জন্য বনফুল তুলিতেছেন। সকলই পবিত্র...সকলই নয়ন ও মনের প্রীতিকর। কিন্তু হায়! যখন ভাবি সেই পুণ্যশ্লোক ঋষিকুল কোথায়? তাঁহাদের সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ কোথায়? তাঁহাদের সেই যাগ যজ্ঞ, পূজা হোম প্রভৃতি কোথায়? ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! আমাদের ধর্ম নাই, কিছুই নাই জাতীয় জীবন পর্যন্তও নাই। আমরা এখন দুর্বলশরীর পরদার ব্যবসায়ী নষ্টধর্ম পাপিষ্ঠ জাতি! হায়!

পরমেশ্বর! সেই ভারতের কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত! তুমি কি আর আমাদের উদ্ধার করিবে না? এত তোমারই দেশ...কিন্তু দেখ ভগবান, তোমার দেশের কি অবস্থা! তোমার অবতারগণ যে সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা কোথায়? আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যগণ যে জাতি এবং যে ধর্ম গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা ছারখার হইয়াছে! দয়া কর, রক্ষা কর, ওহে দয়াময় হরি!

মা, আমি যখন চিঠি লিখিতে বসি তখন পাগলের চেয়ে পাগল। কি লিখিব ভাবিয়া লিখিতে বসি এবং কি বা লিখিতে পারি তাহা জানি না। মনে যে ভাবটি আগে আসে তাহাই লিপিবদ্ধ করি...ভাবি না কি লিখিতেছি বা কেন লিখিতেছি। ইচ্ছা হয়...তাই লিখি...মন বলে...লেখ...তাই লিখি। যদি কিছু অসঙ্গত লিখিয়া থাকি তবে আমাকে মার্জনা করিবেন।

ইতি—

আপনার সেবক সুভাষ

(বিপ্লবী শ্রীবিশ্বজিৎ দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

সুভাষচন্দ্রের চিঠি

মায়ের প্রতি সুভাষচন্দ্রের যে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে প্রভাবতী দেবীকে লেখা তাঁর এই চিঠিগুলিতে। মায়ের প্রাণে এইসব চিঠি কী বিশেষ ভাবের সঞ্চার করেছিল কে জানে, মৃত্যুদিন পর্যন্ত এই চিঠিগুলি তিনি হাতছাড়া করেননি, অন্তিমশয্যায় বিভাবতী দেবীর (শরৎচন্দ্রের স্ত্রীর) কাছে গচ্ছিত রেখে যান। অল্প বয়েসেই যে আশ্চর্য পরিণত ও ধর্মপিপাসু মন ছিল সুভাষচন্দ্রের তার অকাট্য প্রমাণ মেলে এই চিঠিগুলিতে। সবসুদ্ধ নয়খানা চিঠি আছে এই সংকলনে, দুঃখের বিষয় প্রত্যেকটাই তারিখবিহীন। তবে হিসেব করে রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন নয়। এই চিঠিগুলি সুভাষচন্দ্র যখন লিখেছিলেন তখন তাঁর বয়েস ছিল পনেরো থেকে ষোলো। কারণ, দ্বিতীয় চিঠিতে দেখবেন মেজদা শরৎচন্দ্রের বিলাত যাওয়ার উল্লেখ আছে। শরৎচন্দ্রের কাছ থেকেই আমরা জানতে পারি তিনি প্রথম বিলাতযাত্রা করেন ১৯১২ সালে। এবং যেহেতু সুভাষচন্দ্রের জন্মকাল ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি, সেহেতু এই চিঠিগুলি সুভাষচন্দ্র পনেরো থেকে ষোলো বছর বয়েসে লিখেছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে।

শ্রীশ্রীদুর্গা
সহায় —

কটক
বৃহস্পতিবার।

পরম পূজনীয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী —
শ্রীচরণকমলেষু —

মা, অনেকদিন হইল আপনাকে কোনও পত্র লিখি নাই তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। দাদা এখন কেমন আছেন লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। তাঁহারদিগের পরীক্ষা দেওয়া হইবে না।

ভগবানের দয়ার অন্ত নাই — দেখিতে গেলে জীবনের প্রতি মুহূর্তে তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আমরা অন্ধ, অবিশ্বাসী, ঘোর নাস্তিক, তাই তাঁহার দয়ার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না। আর বুঝিয়া বা কি করিব? দুঃখে পড়িলে তাঁহাকে ডাকি — অনেকটা প্রাণ খুলিয়া ডাকি — কিন্তু যেই দুঃখ দূর হইল — যেই সুখের আলোক আসিতে লাগিল — অমনি আমাদের ভাব অন্য হইল

কিশোর সুভাষের মা-কে হাতে লেখা চিঠি

ওঁ

৬০-এর দশকে নেতাজীর হস্তলিপি শৌলমারী আশ্রমে

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আচরণের নমুনা! (প্রবাহমান সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে) ঃ

সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠতম বীর মহামনীষী বা সৃষ্টির ব্যতিক্রমী এই মহামানবকে নিয়ে ১৯৩৯ সালের পর থেকেই ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের পর থেকেই যে স্বাধীন ভারতের একটি সরকার বাদে অর্থাৎ ৭৭-এর নির্বাচনের পর মোরারজী দেশাই সরকার বাদে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি সরকারই যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে ফটকাবাজি করে চলেছে সমগ্র ভারতবাসীর সঙ্গে সে তথ্য কে না জানেন? তবু তা মুখের কথায় সীমাবদ্ধ না রেখে তার দু'একটি যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য উপস্থাপন করা গেলে, তা হবে অধিকতর মূল্যবান। আসুন, এতদ্‌সংক্রান্ত দু-একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য যাচাই করে দেখি। যথা, ৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী হেরে যাবার পর রণছোড়জি মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বে আসে জনতা সরকার। সেই সরকারের কাছে যখন জনগণের নেতাজী সংক্রান্ত চিরন্তনী দাবী সোচ্চার হয়ে উঠল, তখন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই তাঁর যে সুচিন্তিত মতামত ঘোষণা করেছিলেন তা আমরা সকলেই জানি। তবু মোরারজী দেশাই সরকারের মূল বক্তব্য এখানে নীচে তুলে ধরা হলো, একনজরে ব্যাপারটা যে কতখানি যথার্থ তা উপলব্ধি করার জন্য। আসুন প্রধানমন্ত্রীর সেই মূল বক্তব্যখানি আমরা দেখি, তাতে তিনি কি বলছেন। ১৯৭৮ সালে লোকসভায় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ৩রা সেপ্টেম্বর পূর্বের দুটি Commission-এর recommendation-ই reject বা বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু তাঁর সরকারের ইতিমধ্যে পতন ঘটায় এব্যাপারে আর তিনি অগ্রসর হতে পারেননি। স্মরণীয় পণ্ডিত জওহরলাল থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়িজী পর্যন্ত মোট ১২টি সরকার আমরা এ-পর্যন্ত পেয়েছি। এই ১২টি সরকারের মধ্যে মোরারজী সরকার বাদে সকল সরকার এবং তাদের প্রধানমন্ত্রীদের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যাপারে সম্পূর্ণ একই খেলা অর্থাৎ বৃটিশের পদলেহন বা চাটুকারীতা। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। এবং বলা চলে যতদিন যাচ্ছে ততই যেন ব্যাপারটা এইসব ভারতীয় বৃটিশ ক্রীড়নকদের কাছে আরও বেশী বেশী করে তামাসার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার যে সর্বশেষ প্রমাণ, তা বলছে সংবাদপত্রের রিপোর্ট। আসুন, এমন এক আধটি রিপোর্ট আমরা নিরীক্ষণ করি। যথা, প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়িজীর এ-ব্যাপারে যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও নির্লজ্জ আচরণ, তা সংবাদপত্রের পাতা খুলেই দেখি। ১৪ই জুন ২০০০ সাল আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্ট এবং বর্তমান পত্রিকার রিপোর্ট। আরও একটি বিষয় এখানে অত্যন্ত গভীরভাবে স্মরণীয় যে কলিকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিমকোর্টের আদেশে বর্তমান ভারত সরকার নেতাজী সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে এই তৃতীয় কমিশন বসিয়েছে। সেই কমিশনের কোয়েরীর বিষয়বস্তু অত্যন্ত পরিষ্কার করে

হাইকোর্ট বলে দিয়েছে। কি কি কোয়েরীতে থাকবে। সেখানে মৃত্যু হয়েছে কোথাও বলা নেই। কলিকাতা হাইকোর্ট নির্দেশিত পাঁচটি লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। এই পাঁচটি পয়েন্টে কোথাও মরে গিয়েছেন একথা বলা নেই। অথচ এই কমিশনের নিকট নেতাজীর "ছাই"-এর এ্যাজেণ্ডাও সরকার অন্তর্ভূক্ত করেছে। এছাড়া শুধু যে কেন্দ্রীয় সরকারই জনগণকে প্রতারণা করছে তা নয়। রাজ্য সরকার বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধান রায়ের আমলেও করেছিল, আর আজ তো কথাই নেই। তার প্রমাণ সংবাদপত্রের report,

কেন্দ্র রাজ্য উদাসীন, কাজ ব্যাহত নেতাজী কমিশনে

স্টাফ রিপোর্টার : কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছ থেকে যথাযথ সাহায্য না পাওয়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান সম্পর্কিত তদন্ত কমিশনের কাজ কার্যত থমকে গিয়েছে। **তদন্তের কাজ ব্যাহত হওয়ায় দুই সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির অফিসারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্ষুব্ধ কমিশন।**

কেন্দ্রের কাছ থেকে কমিশন পাচ্ছে না নেতাজী সম্পর্কে বহু তথ্য ও রিপোর্ট। তথ্য সাহায্য তো দূরে কথা, এ-পর্যন্ত কমিশনের দু'টি শুনানির কোনওটিতেই উপস্থিত হননি কেন্দ্র বা রাজ্যের প্রতিনিধিরা। বারবার নোটিস দিয়েও তাঁদের হাজির করাতে পারেনি কমিশন। এক সদস্য-বিশিষ্ট কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মনোজ মুখোপাধ্যায় মঙ্গলবার বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় থমকে গিয়েছে কমিশনের কাজ। তিনি বলেন, **"এটি বিচার বিভাগীয় কমিশন। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, কমিশনের কোনও নির্দেশই মানছে না কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার। তাই দুই সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের অফিসারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"**

অভিযোগ, নেতাজী সম্পর্কিত বহু ফাইল ও রিপোর্ট রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে গিয়েছে কলকাতার গোয়েন্দা দফতর থেকে। পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, "সরকারি ভাবে আমাকে কিছু না জানালে আমি কোনও মন্তব্য করব না।" কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব পি. ডে. শেনয় বলেন, "এই মুহূর্তে কিছু বলা যাবে না। ফাইল দেখে, আলোচনা করে তবেই কমিশনের অভিযোগের উত্তর দেওয়া সম্ভব।"

মঙ্গলবার ছিল কমিশনের দ্বিতীয় শুনানির দিন। কেন্দ্র ১৯৯৯-এর ১৪ মে কমিশন গঠন করে। কমিশনের প্রথম শুনানি হয় ২০০০ সালের ২৩ মার্চ। কমিশনের কাজে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হবে বলে সর্বসম্মত প্রস্তাব নিয়েছিল বিধানসভা। আগস্টে কমিশনের তৃতীয় শুনানি হবে। স্থানাভাব, অর্থাভাব ও লোকাভাবের কারণে প্রথম ছ'মাস কোনও কাজই করতে পারেনি কমিশন। ১৯৯৯-এর নভেম্বরে আরও ছ'মাস

বাড়ানো হয় কমিশনের মেয়াদ। কমিশনের অবস্থা সম্পর্কিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, কমিশনের সচিব নিয়োগ করতেই সময় লেগেছে আনুমানিক পাঁচ মাস।

নেতাজির অন্তর্ধান সম্পর্কিত বহু পুলিশ রিপোর্টই কলকাতার গোয়েন্দা দফতর থেকে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছে বলে কমিশনের সচিব পি কে সেনগুপ্তকে এ দিনই জানান স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার সুমনবালা সাহু। তিনি বলেন, "আমাদের ধারণা, অনেকেই এই সমস্ত প্রয়োজনীয় ফাইল বাড়ি নিয়ে গিয়েছেন। গত ১৫ দিন ধরে সমস্ত পুরনো ফাইল হাতড়েও নেতাজীর ব্যাপারে কোনও রিপোর্ট খুঁজে পাইনি।" সাহু জানান, ১৯৫৬ সালে কলকাতার একটি সভায় নেতাজীর অন্তর্ধান নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন জওহরলাল নেহরু। এখন সেই রিপোর্টটির খোঁজ চলছে। তদন্ত ত্বরান্বিত করতে কলকাতা ও রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশের কাছে ওই সমস্ত রিপোর্ট চেয়েছিল কমিশন।

মনোজবাবু জানিয়েছেন, নেতাজী এবং আই এন এ-র বিষয়ে মোট ৯৯৯টি ফাইলের একটিও কমিশনকে দেয়নি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছেই ওই সমস্ত ফাইল ছিল। সম্প্রতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ওই সব ফাইল জাতীয় সংগ্রহশালায় পাঠিয়ে দেয়। কমিশনের অভিযোগ, নেতাজী বিষয়ে খোশলা কমিশন এবং শাহনওয়াজ কমিটির রিপোর্টও দেয়নি কেন্দ্র! নেতাজীর অন্তর্ধান নিয়ে ১৯৫৫ সালের শাহনওয়াজ কমিটি এবং ১৯৭৪ সালে খোশলা কমিশনের রিপোর্ট ও কার্যবিবরণী চেয়েছিল কমিশন। নেতাজি সম্পর্কে তথ্য পেতে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের কাছেও সাহায্য চেয়েছিল কমিশন।

এ দিকে, বছর দুয়েক আগেই নেতাজী সম্পর্কিত ২০০টি গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সাধারণের দেখার জন্য খুলে দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। সম্প্রতি ওই ফাইলগুলি ব্রিটিশ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। এ দিন কমিশনের সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে অনেকেই বলেন, "দেশের সরকারের কাছ থেকেই যদি সাহায্য পাওয়া না-যায়, তা হলে বিদেশি সরকারদের কাছ থেকে কী ভাবে ওই সাহায্য আশা করা যেতে পারে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা : ১৪ই জুন ২০০০ সাল
প্রথম পৃষ্ঠায় (স্টাফ রিপোর্টার)

বক্তব্য নিষ্প্রয়োজন হলেও একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই হচ্ছে যে, যতদিন যাচ্ছে ততই ভারতবর্ষীয় সরকারগুলো ভাবছে তিনি অর্থাৎ মহানায়ক সত্যসত্যই পিরামিডের মমি হয়ে নিশ্চয় কোন দেশে কোন যুগে মহাকালগর্ভে নিশ্চিহ্ন। অতএব আমাদের (অর্থাৎ সরকারে যেই আসুক তাদের) যৎপরনাস্তি যা খুশী করতে কোন বাধা নেই, বা আপত্তি কোথায়? উত্তরে বলতে বাধ্য হচ্ছি বন্ধু আপনারা মূর্খের স্বর্গে

বাস করছেন। তাই বলতেই হচ্ছে—“তোমাকে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে”। এই আপ্তবাক্য আর আপ্তবাক্য নয়। এইটিই হবে ভারতবর্ষীয় ও সাম্রাজ্যবাদী সরকারদের প্রতিভূদের জন্য বেদবাক্য। সাম্রাজ্যবাদীদের বক্তব্য ছিল তিনি অর্থাৎ চন্দ্র বসু একটিবার আত্মপ্রকাশ করলে আমরা অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। কিন্তু এখন বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপট বলছে সুভাষচন্দ্র বোস, তাদের ঐ বক্তব্যকেও challange জানাচ্ছে—এই বলে যে এবার দেখ মৃত বা অদৃশ্য লোকটি দৃষ্টিপটের মাঝে না এসে অদৃশ্য থেকেই অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ না করেই তোমাদের হাল কি করতে পারে। ১৫ই জুন ২০০০ সালে খবরে প্রকাশ পায় দুই কোরিয়া মিলনের পথে। ভুলে যাবেন না বন্ধু এসব কোন অটো মেশিনের কাজ বা কৃতিত্ব নয়। এই সবই ঐ অদৃশ্য ঘটকের কাজ। আগামী যুগই তার সাক্ষ্য দেবে। কাজেই বলছিলাম হুঁশিয়ার, সাধু সাবধান।

ভারত ও পাকিস্তান যে আদৌ দুটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র নয়, তার অকাট্য প্রমাণ। ১৯৪৭ সালের Statesman পত্রিকা থেকে :—

ভারত ও পাকিস্তান যে আদৌ দুটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র নয় তার প্রমাণ কোন গবেষকের গবেষণার প্রয়োজন নেই। তৎকালীন বৃটিশ পত্র-পত্রিকায় চোখ বোলালেই তার সাক্ষ্য বা প্রমাণ আমরা পেয়ে যাবো। যথা, ১৯৪৭ সালের বৃটিশ পত্রিকা Statesman হাতে নিলেই পরিষ্কার চিত্র বেরিয়ে আসছে। এছাড়াও অনেক তথ্য আছে। সে সব তথ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য হচ্ছে—

“India is not Sovereign Republic”

—U. K. Court
Amrita Bazar Patrika
Sunday Magazine
15th August 1965

স্মরণীয় U. K. Court যে রায় দিয়েছে 15th August 1965 সালে, তা একটু বিশ্লেষণ করলে আমরা কি পেতে পারি তা দেখা যাক।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দুটি ডোমিনিয়ান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর ভারতীয় ডোমিনিয়ানের বা তথাকথিত স্বাধীন ভারতের গভর্ণর হয়েছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তিনি কৌশলে পাকিস্তানেরও গভর্ণর জেনারেল হতে চেয়েছিলেন একথা আমরা সবাই

Vol. CXIII. No. 23112 REG No. C193 CALCUTTA FRIDAY, AUGUST 15 1947. TWO ANNAS.

TWO DOMINIONS ARE BORN

Political Freedom For One-Fifth Of Human Race

H.E. Sir Frederick Burrows talking to Mr S. C. Roy Chowdhury, Mayor of Calcutta ... —Statesman.

Close Friendship with Britain

Nehru's Reply to Mr. Attlee

NEW DELHI, Aug 15.—"My colleagues in the U.K. Government join with me in sending, on this historic day, greetings and good wishes to the Government and people of India," says a message from Mr Attlee to Pandit Nehru. He adds ...

POWER ASSUMED BY INDIANS

Constituent Assembly Members Take The Oath

WORK FOR COMMON PROSPERITY

From Our Special Representative

NEW DELHI, Aug 15.—Two new Dominions, India and Pakistan, were born at zero hour today, ushering in political freedom to 400 million people, constituting one-fifth of the human race.

At a special session of the Indian Constituent Assembly the House assumed full powers for the administration of the Indian Dominion.

NO DISTURBANCE IN CALCUTTA

No incidents of a communal nature occurred in Calcutta and Howrah yesterday.

AUGUST 15, 1947.

A special Independence Day supplement is published with this issue of The Statesman.

Joyful Scenes In Calcutta

Sir Frederick Burrows, retiring Governor of Bengal, and Mr Rajagopalachari, Governor of West Bengal, photographed at Government House ... —Statesman.

First Governor of W. Bengal

C. R. Sworn In This Morning

By a Staff Reporter

With the birth of the Indian Dominion His Excellency Mr C. Rajagopalachari assumed charge of the office of Governor of West Bengal at one o'clock (IST) this morning. Immediately afterwards Dr P. C. Ghosh, Chief Minister, West Bengal, and the members of his Cabinet were sworn in.

TWO HOLIDAYS

After protracted negotiations two Dominions, India and Pakistan were born on August 15, 1947. While India retained the services of Lord Mountbatten as the first constitutional Governor-General of India, Pakistan chose Mr Jinnah for the post. The Indian Constituent Assembly, at a special session, assumed full powers for the administration of the country.

জানি। কিন্তু মহোম্মদ আলি জিন্নার দূরদর্শিতায় তা আর হয়ে উঠেনি। মাউন্টব্যাটেনের পর যিনি ভারতীয় ডোমিনিয়ানের গভর্ণর হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীয়া। তিনি শপথ নিয়েছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের নিকট। সেই শপথ মন্ত্র নিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডেশ্বরী রানী ও তার ক্রাউনের নামে শপথ বাক্য পাঠ করে। কিন্তু সেটা হওয়া উচিত ছিল ভারতীয় গণপরিষদের নামে। তার স্থানে তিনি শপথ বাক্য কিনা পাঠ করলেন ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর নামে।

এবার সহজাত ভাবেই কি প্রশ্ন আসে না তবে তিনি অর্থাৎ চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারীয়া ছিলেন কার প্রতিভূ? আর লর্ড মাউন্টব্যাটেনই বা প্রথম গভর্ণর হয়েছিলেন কাদের স্বার্থরক্ষার্থে এবং কি শপথ মন্ত্র উচ্চারণ করে? তাতেই কি প্রমাণিত নয় যে U. K. Court-এর রায়ই যথার্থ এবং নির্মম সত্য। এ জন্যই কি তথাকথিত ভারত সরকার গ্রেটবৃটেন সরকারকে সাড়ে সাত কোটি টাকা পেনশন বাবদ দিতে বাধ্য হয়েছিল? Transfer of Power শর্ত অনুসারে? তাই স্বভাবতই একের পর এক কি প্রশ্ন আসে না যে, এই তথাকথিত স্বাধীনতার নামে যে চোরাপথে ভারত স্বাধীনতা হস্তগত করল এবং ভোগ দখলের অধীশ্বর হলো তারা কারা? তারা কি ভারতীয় জনগণের সত্যকার প্রতিনিধি? নাকি বৃটিশ কর্তাদের প্রতিভূ বা দালাল? সেই বিশ্বস্ততার বা নাকখতের প্রমাণ স্বরূপই কি তবে ভারতীয় নেতাদের সুভাষ বিরোধিতা? শুধু কি তাই, সেই ১৯৪৭ সাল থেকে আজ ২০০২ সাল, আজও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। সেই নেহেরু সরকার থেকে আজকের অটলবিহারী সরকার পর্যন্ত একই ধারা একই প্রবাহ। কার স্বার্থে? এবার বলুন গোলামির নাকখত আর কারে বলবেন? তাই বলতেই হয় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল যথার্থই বলেছিলেন,

"নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বাদে অন্যান্য ভারতীয় নেতারা হচ্ছেন প্রতারক, দুরাত্মা, ও যথেচ্ছ লুণ্ঠনকারীর দল, রাজনৈতিক দর্শনের শুধু বাইরের আবরণ স্পর্শ করতে ভারতীয় নেতাদের হাজার বছর সময় লেগে যাবে।"

"It will take thousand years for them to enter the periphery of philosophy of politic." (নেতাজীর অজ্ঞাত অধ্যায়—ড: সুশান্ত মিত্র)

অখণ্ড ভারতের পূজারী সীমান্ত গান্ধীর আক্ষেপ দেশভাগের পর—

- "Khan Abdul Gaffar Khan repeatedly said that the frontier would regard it as an act of treachery if the Congress now threw the Khudai Khidmatgars to the wolves."
- "If Congress wishes to accept partition it will be over my dead body" (31-3-1947 Gandhiji)

কিছু প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য সম্প্রতিকালের ঘটনার প্রেক্ষাপটে

।। ছয় ।।

খোসলা কমিশনে একটি চাঞ্চল্যকরসাক্ষ্য

১৯৭৩ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে আসামের নওগা জেলে বন্দী মাউ আঙ্গামীর (MAW ANGAMI) সাক্ষ্য নেতাজী তদন্ত কমিশনের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যটির মূল বক্তব্য এখানে পরিবেশন করা হোলো। কমিশনের পক্ষ থেকে শ্রী এস, এল, চোপড়া কমিশনের এবং শ্রী টি, আর, ভাসিন আইনজীবির কাজ করেন। আঙ্গামী : আমার নাম মাউ উইশানসু (Mawa Ywizansu) ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি আমার নামকরণ করেছে মাউ আঙ্গামী।...আমি স্কুল কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করি নাই। আমার বাড়ী কোহিমা জেলার খুনী গ্রামে। আমার পূর্বপুরুষরা মণিপুর রাজ্য থেকে এসেছিলেন। বহুদিন পূর্বে পাঠশালার পড়া ছেড়ে নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনে ১৯৫২ সালে যোগ দিই। সে-সময় থেকেই আমি ফিজোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। কমিশন :...নেতাজী সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কিনা, সেটাই আসল কথা।

আঙ্গামী : হ্যাঁ। ১৯৫৮ সালের নেতাজী সম্পর্কে এক রিপোর্টারকে কিছু বলেছিলাম এই শর্তে যে তা' প্রকাশ করা হবে না। কিন্তু রিপোর্টারটি সেই সংবাদ প্রকাশ করে দেন। ....সে সময় আমি কোহিমা জেলে বিচারাধীন ছিলাম। সংবাদটি প্রকাশিত হবার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু একজন গোয়েন্দা অফিসারকে—মনে হয় আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টরকে—শিলং থেকে কোহিমায় আমার কাছে পাঠান। সেই অফিসারটি আমার সূত্রে প্রকাশিত সংবাদটিকে অস্বীকার করতে বলেন। তা না করলে আমার অনেক হয়রানি পোহাতে হবে—এই হুমকিও দেন। আমি উত্তরে বলেছিলাম যে আমি তা করবো না। কারণ আমি সংবাদটি ৫০ : ৫০ হারে বিশ্বাস করি। নেতাজী জীবিত কি মৃত এ সম্বন্ধে আমি শতকরা ৫০ ভাগ বিশ্বাস করি। শতকরা ৫০ ভাগ বিশ্বাস করি না।

প্র: অফিসারটি কী শিলং থেকে এসেছিল, না দিল্লী থেকে? নাম কি মিরচান্দানি?

উ: না, শিলং থেকে। তার নাম জানিনা।

প্র: বরুণ সেনগুপ্ত নামে কোনো রিপোর্টারের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিলো?

উ: শিলচরে সংবাদপত্রের অনেক রিপোর্টারদের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। ওই নামে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিলো কিনা মনে নাই।

প্র: এখন আমাদের নির্ভয়ে বলুন নেতাজী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে আপনি বলেছেন যে নেতাজী জীবিত এবং তাকে ভারত-তিব্বত সীমান্তে দেখা গেছে।

উঃ ...১৯৫৮ সালে আমি জানতে পারি। সে-সময় আমি বর্মায় এবং রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে দেখা হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং জাপানীরা কিভাবে মণিপুরে এবং নাগাল্যাণ্ডে বৃটিশ-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তার বিবরণ শুনি। সে-সময়কার নাগা পরিস্থিতি সম্পর্কেও কিছু সংবাদ তার কাছ থেকে পাই প্যালেল থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আনা হয়েছিলো, ময়রাং-এর কাছেও তারা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করেছিলো। কোন্ জায়গায় জানতে চাইলে, সেটা তারা গোপন রাখে। যেখানে অস্ত্রশস্ত্র মাটির তলায় রাখা হয়েছিলো, সে জায়গাটায় আমাকে নিয়ে যায় এবং ঠিক কোন্ জায়গায় ওগুলি রয়েছে তা ওখানকার ম্যাপের মধ্যে দেখায়। নেতাজীর নাম আলোচনার সময় উঠলো। আমি নাগা নেতা ফিজো এবং সুভাষের কথা তুলতে সেই আলোচনায় তারাও গভীর আগ্রহ দেখালেন। সে আজাদ হিন্দ বাহিনীর এই অফিসারদের একজনের নাম ছিল খান। সে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে আমাদের কোহিমার গ্রামের কাছাকাছি পরিচালনা করে এনেছিলো। সে-সময় ফিজো বর্মায় নেতাজীর পরামর্শদাতার কাজ করছিলেন। সেটা ৪২ সাল জাপানীদের বর্মা দখলের পর।

প্র: ১৯৪৫-এ ১৮ আগষ্টের পর কি ফিজোর সঙ্গে নেতাজীর দেখা হয়েছে?

উ: তা আমি বলতে পারবো না।

প্র: আপনি কি তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদ শুনেছেন?

উ: হ্যাঁ।

প্র: সেটা কোন সময় হবে?

উ: তা আমার মনে নেই। জাপানীরা কোহিমা ত্যাগ করে যাবার পর ফরমোজায় তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ শুনি।...সে সময় নাগারা দুজন ভারতীয় নেতার নাম জানতো—মহাত্মা গান্ধীর ও সুভাষচন্দ্র বসুর।

প্র: আমরা ধরে নিতে পারি আপনার নিজের জানা কোনো খবর নেই।

উ: ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বসু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতাম না, তিনি জীবিত কি মৃত সে-সম্বন্ধেও না। ১৯৫৮ সালে রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ বাহিনীর কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে দেখা হলে তাদের কাছে শুনি যে সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত আছেন। তারা স্থানের নাম উল্লেখ করেন নাই। আমার দুজন অফিসারের সঙ্গে দেখা হয়! তারা বলেন নেতাজী জীবিত।

তার কিছুদিন বাদে মারকোয়াই এবং ট্যাভয় অঞ্চলে যাই। সেখানেও কয়েকজন আজাদ হিন্দ বাহিনীর লোকদের সঙ্গে দেখা হয়। ট্যাভয় থেকে আমরা মালয়েশিয়ার পেনাং-এ যাই। সেখানে তারা আমার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৮-এর এপ্রিলে পেনাং-এ সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে আমার নিজের দেখা হয়।

প্র: তার আগে তো সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানতেন। আপনি কি পূর্বে তাঁকে কখনও দেখেছেন?

উ: তার পূর্বে আমি তাঁকে কখনও দেখি নাই।

প্র: সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে আপনাকে কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল?

উ: সুভাষচন্দ্র বসুর এক গোপন সহকারী আমাকে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সেই ভদ্রলোক মি: গুপ্ত নামে পরিচয় দেয় এবং সুভাষের নাম বলে 'আজাদ'।

সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে আমাকে শপথ নিতে হয়েছিলো যে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো কথাই আমি প্রকাশ করবো না।

প্র: আপনি কি নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন যে যার সঙ্গে আপনার দেখা হল তিনিই সুভাষচন্দ্র বসু?

উ: আমার তাই মনে হয়। আমাকে শপথ নিতে হয়েছিলো। সেই গোপন সহকারীটি আমাকে তার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয়। আমি বিশ্বাস করেছি।

প্র: আপনি কি তাঁর ফটোগ্রাফ দেখেছেন?

উ: আমার কাছে নেতাজীর কয়েকটা ফটো ছিল। ফটোর সঙ্গে তাঁর চোখের ও নাকের গড়নের সাদৃশ্য থেকেই বলি যে নেতাজী সে সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত হই।.....

প্র: ১৯৫৮ সালে নেতাজী সম্পর্কিত এই সংবাদটি কি আপনি নাগাল্যাণ্ডে আপনার কোনো সহকর্মীর নিকট প্রকাশ করেছিলেন?

উ: না, কারণ আমি শপথ নিয়েছিলাম।

প্র: কমিশনের (শ্রীচোপড়া) : সম্বন্ধে আপনি কি উৎপল রায়কে কিছু বলেছিলেন?

উ: না।

প্র: আপনি সাঙ্গাইকাকে জানেন?

উ: না।

প্র: এটা কি ঠিক যে ১৯৫৮ সালে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর রিপোর্টার ঐ সংবাদটি ছাপায়?

উ: হ্যাঁ।

প্র: আপনি কি ১৯৫৭-তে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন?

উ: হ্যাঁ।

প্র: আপনি ১৯৫৮-তে নেতাজী সম্পর্কে জানতে পারেন?

উ: আমি আমার বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারি। সে আমাকে বলে যে এই সংবাদটি আমার আর এক বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া সংবাদের উপর ভিত্তি করে পাওয়া।

প্র: ১৯৫৭-র ২রা সেপ্টেম্বর হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে নিম্নলিখিত যে-সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিলো—এটাই কি আপনার দেওয়া সংবাদ? সংবাদটি এই রূপ :

"নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত আছেন এবং বিদ্রোহী নাগা নেতা ফিজোর সঙ্গে

১৯৫২ সালে ভারত-তিব্বত সীমান্তে তাঁর এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়ে গেছে। এই সংবাদটি দিয়েছেন পাকিস্তান থেকে নাগাল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তনের সময় ডামচেরা চাকমায় সম্প্রতি ধৃত ফিজোর ব্যক্তিগত দূত মাউ (Mawu)।"

উ: আমি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে বলেছি, একথা ঠিক নয়। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ২, ৯, ১৯৫৭ তারিখে পরিবেশিত সংবাদও ঠিক নয়। আমি সংবাদ প্রতিনিধিকে বলেছিলাম আমরা ফিজো ও সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে যোগাযোগের সবরকম ব্যবস্থা করছিলাম কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে পড়ায় তা সম্ভব হয় নাই।

সুভাষচন্দ্র বসু ও ফিজোর মধ্যে ভারত-তিব্বত সীমান্তে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়ে যাওয়ার সংবাদটি ভুল। বৈঠকটির আয়োজন করা হবে এটাই সাংবাদিককে বলেছিলাম।....."

॥ সাত ॥

আবার একটু পিছন পানে তাকাতে চাই—চিকাগো ট্রিবিউন পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা অফিসার মি: আলফ্রেডওয়াগ বলেন :

"১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে কোন চীনা সেনাপতির অতিথি হিসাবে 'সুভাষ' দক্ষিণ চীনে উপস্থিত হন। এখান থেকে তিনি হ্যানয়-এর 'অনামি' সরকারের কয়েকজন বামপন্থীর সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। এই ঘটনাগুলি থেকে একটা বিস্ময়কর ঘটনার সূত্র ধরা পড়ে। জাপানের আত্মসমর্পণের চারদিন আগে 'বসুকে' সায়গনে দেখা যায়। জাভা থেকে ড: সুকর্ণ আর ইন্দোনেশীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্য নায়কেরাও তখন উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বসুর সরকার স্বাধীনতার সংকল্পে উদ্বুদ্ধ ছিল বলে 'অনামি' নিয়ন্ত্রিত অংশে আশ্রয় দেওয়া সহজ ছিল। আমাকে 'বসুর' কাছে নিয়ে যাবার অনুরোধ জানালে তারা অস্বীকার করেন। তবে একজন জাপানি আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি 'বসুর' শেষ নির্দেশনামার নকল আমাকে দেন, তাতে সুভাষ বলেছেন : 'ব্রহ্মদেশে' পরাজয় স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় মাত্র, আরও অনেক পর্যায়ে ভবিষ্যতে চলতে হবে"।

বর্তমানে ঐ 'অনামি সরকারের নাম হো-চি-মিনের উত্তর ভিয়েৎনাম সরকার'।

উপরোক্ত সংবাদ প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা উল্লেখ করছি যে, তাইহোকুর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পরও নেতাজী সম্পর্কে তৎকালীন লোকসভা সদস্য থেবর দিল্লীতে একাধিকবার সাংবাদিক সম্মেলনে দাবী করেছিলেন যে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসুর অনুরোধে তিনি ভারত সরকারের জ্ঞাতসারে একাধিকবার ভারত চীন সীমান্ত পার হয়ে চীনে গিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সাথে মিলিত হয়েছেন।

সেদিন, ভারত সরকার বা জনসাধারণের তরফ থেকে কিন্তু থেবরের এই সুস্পষ্ট ঘোষণার কোন প্রতিবাদ করতে পারেন নি।

॥ আট ॥

১৯৪১-এর ১৭ই জানুয়ারী কলকাতার এলগিন রোডের গৃহ হতে অলৌকিক অন্তর্ধানের পর—সর্বপ্রথম ১৯৪৮-এর জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে মহাসাধক-মহাযোদ্ধা নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে ভারত-তীব্বত সীমান্ত দিয়ে ভারত-পরিক্রমায় অগ্রসর হন। এই ঐতিহাসিক ভারত-পরিক্রমার পথে তিনি নাদন, টনকপুর, কাটগুদাম, কুলুভেলি, জালামুখি, পাঞ্চুয়া, উত্তরকাশী, ঋষিকেশ, আলমোড়া, নৈনীতাল, হরিদ্বার, মতীচুর, লছমনঝোলা, বেরিলি, এটোয়া, ফৈজাবাদ, মোরাদাবাদ, কানপুর, গাজিপুর, বারাণসী, অমরকন্টক, ত্রিকুট, বুদ্ধ গয়া, বাকীপুর, কোহিমা, ফাফলং, মৈরাং, ধবলগিরি পর্বত ও আরো অনেক স্থানে তাঁর অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য অজ্ঞাতবাস কাহিনী ছড়িয়ে আছে। ঐসব স্থানে মহাসাধক-মহাযোদ্ধা ছদ্মবেশী নেতাজীর সান্নিধ্যে যারা এসেছেন তারাই বুঝেছেন মানুষের ও দেশের জন্য তাঁর কি অন্তহীন ভালবাসা।

তথাপি তাঁর শত্রুপক্ষ বা মিত্রপক্ষ আজ পর্যন্তও তাঁর ছদ্মবেশ উন্মোচন করতে পারেন নি। আশা করি আসন্ন পরমাণু যুদ্ধ (তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ) আরম্ভ হলেই তিনি তাঁর অলৌকিক দিব্যশক্তিবলে বিশ্বকে ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে—বিশ্বাবাসীকে প্রকৃত কল্যাণের পথে পরিচালিত করবেন। ইহা সুনিশ্চিত। তখন মেঘমুক্ত ভাস্করের মত স্বেচ্ছায় ছদ্মবেশত্যাগী সমুজ্জ্বল দিব্যদেহী মহাসাধক-মহাযোদ্ধা নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আমরা 'বিশ্বপিতা' রূপে দর্শন করে ধন্য হব।

মনে হয়, বর্তমানে মহাসাধক-মহাযোদ্ধা নেতাজী—কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের অধ্যুষিত পবিত্র গুপ্ত সাধনপীঠকেই তাঁর আশ্রয়স্থল করেছেন। এবং হয়তো সেখান থেকেই প্রয়োজনে তিনি স্থানান্তরে যাতায়াত করে থাকেন!

"সুবিশাল হিমালয়ের যে-প্রান্তে তোমার সাধনপীঠ, সেই দুর্গম তুষারমৌলী আবৃত স্থানে যে 'মহা-বিজ্ঞান-মন্দির' রচনা করেছে তাহা সাধারণ মানুষের তো দূরের কথা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরাও কল্পনা করতে সক্ষম নয়; এই জন্যই তুমি প্রকাশ থেকেও অপ্রকাশিত রয়েছ, কারণ, তোমার সৃষ্টিকাল হতেই তুমি "রহস্যময়"।

॥ সত্যমেব জয়তে ॥

References . i) Netajir Swapna-O-Sadhana

ii) Netajir Sandhana

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রকৃত ঘটনা

১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাস তখন। সকালে কলেজ লাইব্রেরিতে বসে পড়ছি, এমন সময়ে খবর পেলাম জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক আমাদের ক্লাসের একটি ছেলেকে

মারধোর করেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আমাদের ক্লাসের কয়েকটি ছেলে মি: ওটেনের ঘরের সামনের বারান্দায় পায়চারি করছিল, এতে বিরক্ত হয়ে মি: ওটেন তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েকজন ছেলেকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন। ক্লাসের প্রতিনিধি হিসেবে আমি তৎক্ষণাৎ অধ্যক্ষ মি: এইচ. আর. জেমসের কাছে গিয়ে প্রতিবাদ জানালাম, বললাম—যে-ছেলেদের মি: ওটেন অপমান করেছেন তাঁদের কাছে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যক্ষ বললেন, তাঁর পক্ষে মি: ওটেনকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা সম্ভব নয়, কারণ মি: ওটেন ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিস-এর লোক। তাছাড়া, তিনি বললেন, মি: ওটেন তো কাউকেই মারধোর করেননি, শুধু হাত ধরে সরিয়ে দিয়েছেন—এতে অপমানিত বোধ করার কিছু নেই। জবাবদিহি শুনে আমরা মোটেই খুশি হতে পারলাম না। পরের দিন ছাত্রেরা ধর্মঘট করল। অধ্যক্ষ বহু চেষ্টা করেও ধর্মঘট ভাঙতে পারলেন না, এমনকি মৌলবী সাহেবের প্রাণপণ চেষ্টাতেও মুসলমান ছেলেরা ধর্মঘট থেকে বিরত হল না। স্যার পি. সি. রায় এবং ডক্টর ডি. এন্. মল্লিক—এঁদের অনুরোধেও কেউ কর্ণপাত করল না। যেসব ছেলেরা ক্লাসে অনুপস্থিত ছিল অধ্যক্ষ তাদের প্রত্যেককে জরিমানা করলেন।

প্রেসিডেন্সির মতো কলেজে এ রকম জোরালো একটি ধর্মঘটের খবর শহরের চতুর্দিকে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করল। ধর্মঘটের ঢেউ যখন আস্তে আস্তে আরো কয়েক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল কর্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

(বিপ্লবী শ্রীবিশ্বজিৎ দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

তৎকালীন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দকে লিখিত সুভাষচন্দ্র বসুর একটি পত্র

Lloyd Triestino

Piroscafo Conte Verde
০৬/০৩/১৯৩৬

পরমশ্রদ্ধাভাজনেষু—
স্বামীজী!

আপনার ২রা ডিসেম্বর তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম, কিন্তু নানা কারণে সময়মত উত্তর দিতে পারি নাই। আপনি যে-প্রবন্ধের কথা লিখিয়াছিলেন তাহা লিখিতে পারি নাই প্রধানত: দুইটি কারণে। প্রথমত: শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সম্বন্ধে কিছু লিখিতে সাহস হয় না। দ্বিতীয়ত: গত দুই-তিন মাস আমি ক্রমাগত ঘুরিয়াছি এবং স্থির হইয়া এক জায়গায় বসিতে পারি নাই।

তথাপি আপনি যে আমাকে স্মরণ করিয়াছিলেন তাহার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্যপ্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। "নিবেদিতার" মতো আমিও মনে করি যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের (স্বরূপের) দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁহাকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হউক, যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে"র একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব—একথা বলা বাহুল্য।

পরশু দিন আমরা বোম্বাই পৌঁছিব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি

ভবদীয়

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

'উদ্বোধন', ৪৯তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৪, পৃ: ৪৫৯

সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। বর্তমান নিবন্ধটি তিনি স্বামী পূর্ণাত্মানন্দকে গত ৩ মে ১৯৭৮ তারিখ দিয়েছিলেন। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ তখন মুক্তিসংগ্রামীদের ওপর স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে প্রাক্তন মুক্তিসংগ্রামীদের কাছে উপাদান সংগ্রহ করছিলেন। স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে এম. এ. পড়ার সময় 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১৮ সালে (তখন তিনি ষষ্ঠ বর্ষে উঠেছেন) তিনি রাজবন্দিরূপে খুলনা জেলে এবং পরে কিছুদিন কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলের সলিটারি সেল-এ বন্দীজীবন যাপন করেন। তারপর মাস দশেক অন্তরীণ ছিলেন ময়মনসিংহের গোপালপুরে। ঐসময় স্যার রোনাল্ডসে গোপালপুরে এসেছিলেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী এবং 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার একদা-সম্পাদক ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ছিলেন জ্ঞানাত্মানন্দজীর বিপ্লবজীবনের সতীর্থ। জ্ঞানাত্মানন্দজী ১৯২০ সালে ২৪ বছর বয়সে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন। গত ৭ এপ্রিল ১৯৮৩, ৮৮ বছর বয়সে বেলুড় মঠে তাঁর দেহত্যাগ হয়।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

সুভাষচন্দ্র আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট ছিলেন। ১৯১৬ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আমি বি. এ. পাশ করি। ১৯১৬ সালে সুভাষচন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজে

তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হন। তাঁকে তিনবার আমি দেখেছি খুব কাছ থেকে। প্রথমবার খুব সম্ভব ১৯২২ সালে ঢাকা আশ্রমে। তখন আমি ঢাকা আশ্রমের কর্মী। সুভাষচন্দ্র তখন সবে বিলেত থেকে I.C.S. পদ প্রত্যাখ্যান করে দেশে ফিরেছেন এবং কংগ্রেসের কাজে নেমেছেন। দলের কোন কাজেই তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। একদিন বিকালবেলা সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে আশ্রমে এসেছিলেন ড: প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং আরও কয়েকজন কংগ্রেসের যুবনেতা। বেশ কিছুক্ষণ আশ্রমে কাটালেন ওঁরা। আশ্রমটি সবাই ঘুরে ঘুরে দেখলেন এবং আশ্রমের বিভিন্ন কাজকর্ম কেমন চলছে সাগ্রহে তার খোঁজখবর নিলেন। তখন ঢাকা আশ্রমে এখনকার মতোই মঠ ও মিশন উভয় বিভাগেরই কাজ হতো। মঠে ঠাকুরপূজা, শাস্ত্রাদি পাঠ ও মিশনে Outdoor Dispensary, ছোট Indoor Hospital, Public Library ও Public Scripture Class ইত্যাদি হতো। এছাড়া দুঃস্থ রোগীদের বাড়িতে গিয়ে সেবা করা হতো এবং অনাথ কেউ মারা গেলে তাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তার সৎকারের ব্যবস্থা করা হতো। আমি একসময় সুভাষচন্দ্রকে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম : "একটু প্রসাদ দেব কি?" সঙ্কোচের কারণ, সদ্য বিলেতফেরত লোককে প্রসাদের কথা বলা। আর প্রসাদ বলতে তো শুধু একটুখানি বাতাসা ও সামান্য কিছু ফল—কলা বা শশা। আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সুভাষচন্দ্র খুব আগ্রহ এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে বলে উঠলেন : "নিশ্চয় নিশ্চয়, প্রসাদ দেবেন বইকি।" প্রসাদ দিলাম এবং উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তা খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে খেলেন। কিছুক্ষণ পর ওঁরা চলে গেলেন। সেদিন তাঁর কথাবার্তায় মিশনের কাজকর্ম এবং মিশনের সাধুদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখেছিলাম।

দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল বরিশালে। তখন আমি সেখানকার মিশনের কর্মী ও পরিচালক। সময়টা ছিল ১৯৩১ সাল। রোমাঁ রোলাঁর "The Life of Vivekananda" তখন সবেমাত্র বেরিয়েছে। একটি ছোট Students' Home (যাতে ৮-১০টি দরিদ্র মেধাবী কলেজের ছাত্রকে রাখা হতো) এ ছাড়া বরিশাল আশ্রমের কাজকর্মও ঢাকা আশ্রমের মতোই ছিল। বরিশালে শঙ্কর মঠে ওঁরা এসেছিলেন কোন একটা কনফারেন্স উপলক্ষে। আমাদের আশ্রমটি বরিশাল কলেজের কাছে—শঙ্কর মঠের ঠিক উলটো দিকে। একদিন সকালবেলা আমার ঘরে আমি রোমাঁ রোলাঁর বইটি পড়ছি, এমন সময় সুভাষচন্দ্র সেখানে এলেন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন। আমাকে সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন : "কি পড়ছিলেন?" আমি বললাম : "রোমাঁ রোলাঁর লেখা স্বামীজীর জীবনী। আপনি কি দেখেছেন বইটি?" বললেন : "না, দেখিনি।" আমি বললাম : "খুব সুন্দর লেখা! স্বামীজী সম্পর্কে কী গভীর শ্রদ্ধা!" আমি কয়েকটি জায়গা থেকে কিছু কিছু পড়ে তাঁকে শোনালাম, যেখানে স্বামীজী সম্পর্কে রোমাঁ রোলাঁ বলছেন। তাঁর শৌর্যময় চরিত্রের কথা, রাজকীয় ব্যক্তিত্বের কথা, দেশের প্রতি তাঁর বীর্যময় আহ্বান এবং দেশের নেতৃবর্গ ও জাতীয় জাগরণে তাঁর প্রচণ্ড প্রভাবের

কথা। সুভাষচন্দ্র খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনলেন এবং পড়া শেষ হলে বললেন : "হবে না! ঐরকম Dynamic Personality আমাদের দেশে আর কখনো জন্মেছে নাকি!" ভারতকে তো তিনিই জাগিয়েছেন। ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মানচিত্রে তিনিই তো স্থাপন করলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পশ্চিমের শ্রদ্ধা জাগল। তিনি পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে ভারতের গৌরব ও গরিমার কথা প্রমাণ করলেন। তাঁর ঐ কীর্তি ভারতের মানুষকে ভারতকে চেনাল। আর তার ফলেই তো ভারতের জাগরণ শুরু হলো। রোমাঁ রোলাঁ ঠিকই বলেছেন।" বইটি থেকে পড়ার সময় সুভাষচন্দ্রকে বারবার পাশের চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলেও তিনি বসলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্তটা শুনলেন। তারপর আশ্রমের কাজ কেমন চলছে সে-সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে চলে গেলেন।

আমার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের শেষ দেখা হয়েছিল দেওঘর বিদ্যাপীঠে। তখন আমি ওখানকার সচিব। সময়টা হবে ১৯৩৮-৩৯ সাল। ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রস্তুতি চলছে। সুভাষচন্দ্র ঐ উপলক্ষে মধুপুরে এসেছিলেন। একদিন সেখান থেকে দেওঘর বিদ্যাপীঠে এলেন বিকেল চারটে নাগাদ। সবে মধুপুরে বক্তৃতা ও মিটিং করে এসেছেন। খুব ক্লান্ত। আমরা একটু চা ও তার সাথে কিছু খাবারের ব্যবস্থা রেখেছিলাম। কিন্তু তিনি এসেই বললেন : "আমাকে শুধু একটু চা খাওয়ান। সারাদিন এরা আমাকে কেবলই বকিয়েছে, কি খেয়েছি তার খোঁজ করেনি। আবার দুমকায় গিয়ে বক্তৃতা করতে হবে।" বিদ্যাপীঠের তুরীয়ানন্দ-ধামে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। ওঁর চা খাওয়া হলে ছাত্রদের আসতে বললাম। ছাত্ররা এলে তাঁকে তাদের কাছে কিছু বলতে বললাম। তিনি প্রায় ২০-২৫ মিনিট ছেলেদের কাছে বললেন। আমার যতদূর মনে আছে, তিনি তাদের বলেছিলেন : "তোমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, বিদ্যাপীঠে পড়ার সুযোগ পেয়েছ। এটি দেশের একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান। আমাদের দেশের গর্ব। স্বামীজী বলতেন, 'দেশের সমস্ত সম্পদের চেয়ে মানুষ সবচেয়ে বেশি মূল্যবান।' আদর্শবান, চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক, হৃদয়বান, বুদ্ধিমান, কর্মকুশল ও পরিশ্রমী মানুষ হতে তিনি আমাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর জীবনী পাঠ কর, তাঁর রচনা, ভাষণ ও পত্রাবলী পাঠ কর। জীবন গঠনের জন্য, চরিত্র গঠনের জন্য, মানুষ হওয়ার জন্য, দেশপ্রেমিক হওয়ার জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমার আর জানা নেই। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে গড়া হয়েছে। তোমরা এখানকার আদর্শ নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করবে। স্বামীজী দেশকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। দেশে সত্যিকারের মানুষ গড়তে চেয়েছিলেন তিনি। আমি বিশ্বাস করি, বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভ করে তোমরা সবাই সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠবে, দেশকে ভালবাসতে শিখবে। সবসময় মনে রাখবে, তোমরা যে-সুযোগ এখানে পেয়েছ তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার যেন করতে পার।"

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি তাঁর খুব আকর্ষণ ছিল। প্রথম জীবনে একবার সাধু

হওয়ার জন্য বেরিয়েছিলেন, একথা সবাই জানে। শরৎবাবু, অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে মিশনের যোগাযোগ ছিল। একবার স্বামী নির্বেদানন্দ তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যার্থী ভবন (Students' Home)-এর বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁদের কলকাতার এলগিন রোডের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র তখন ঘরের মেঝেতে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন। শরৎবাবু নির্বেদানন্দজীকে বললেন : "ঐ দেখুন না, আমার ভাইটি তো আপনাদের মতোই একজন। মেঝেয় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর I.N.A.-র লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জী একবার বেলুড় মঠে এসেছিলেন। তিনি I.N.A.-তে অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে ভরত মহারাজকে (স্বামী অভয়ানন্দ) বলেছিলেন—আমি নিজে শুনেছি : "নেতাজীকে আমরা তো আগে কলকাতায় কতবার দেখেছি। কিন্তু যে-নেতাজীকে আমরা I N.A.-তে দেখেছি—তিনি একেবারে আলাদা মানুষ। একটা প্রচণ্ড দৈবীশক্তি ওঁর মধ্য দিয়ে যেন তখন কাজ করত। আমরা ওঁকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। মুগ্ধ হয়ে দেখেছি কী তাঁর ব্যক্তিত্ব, কী তাঁর কর্মশক্তি, কী তাঁর সংগঠনী প্রতিভা, মানুষের মন জয় করার কী তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা! I.N.A.-তে যখন খাবার যোগান বন্ধ হয়ে আসছে তখন একদিন এমন হলো যে, খাদ্য-সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নেতাজীকে জানালেন, 'আজ সৈন্যদের খেতে দেওয়ার মতো কিছু নেই।' নেতাজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছুই নেই?' আধিকারিক বললেন, 'আছে, কয়েকটা গরু আর কয়েকটা শুয়োর। কিন্তু গরু তো হিন্দুরা খাবে না, আর শুয়োর মুসলমানেরা খাবে না।' নেতাজী বললেন, 'ঠিক আছে। আপনি দুটো মিশিয়ে রান্না করান। আমি আগে খাব। রান্না হলো। খাওয়ার সময় নেতাজী সকলের সাথে খেতে বসলেন। সবাইকে বললেন সেদিন কি রান্না হয়েছে। কিন্তু সকলে যখন দেখল, নেতাজীও ঐ খাবার খাচ্ছেন, তখন কেউ কোন প্রতিবাদ তো করলই না বরং খুব আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করল। নেতাজীকে তারা সবাই দেবতার মতো দেখত। তাঁর নেতৃত্বে হিন্দু, মুসলমান, পাঞ্জাবী, বাঙালী সবাই এক হয়ে গিয়েছিল। কারণ, তিনি ছিলেন সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিকতার উর্ধ্বে। সুভাষের নেতৃত্বের এই বৈশিষ্ট্যটির প্রতি মহাত্মা গান্ধীও গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মিশনের সিঙ্গাপুর কেন্দ্রের তৎকালীন অধ্যক্ষ বুদ্ধ মহারাজকে (স্বামী ভাস্বরানন্দ) ব্রিটিশ সরকার নেতাজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে কিছুদিনের জন্য বন্দী করেছিলেন। তিনি একবার আমাকে নেতাজীর মধ্যে কী বিরাট শক্তির স্ফুরণ ঘটেছিল সে-প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "একবার হাজার চারেক প্রবাসী ভারতীয় I.N.A. -তে নাম লেখানোর জন্য এসেছে। তারা সবাই প্রাক্তন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর লোক। সিঙ্গাপুরের পতনের পর ব্রিটিশরা তাদের সেখানে ফেলে চলে এসেছিল। সুভাষচন্দ্র

তাদের বললেন, 'দেখ, তোমরা এসেছ I.N.A.-তে যোগ দিতে। কিন্তু তোমরা জান না বোধহয় যে, আমি তোমাদের কিছুই দিতে পারব না। তোমাদের আত্মীয়-স্বজন আছে। তোমাদের অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আমার তো অর্থ নেই। তাছাড়া দেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের বিরাট সংগ্রাম করতে হবে। জীবন তোমাদের বিপন্ন হবে। এসত্ত্বেও যদি তোমরা সব কষ্ট, সব দুঃখ সহ্য করে দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাক তবে চলে এস আমার কাছে।' একথাগুলিতে কী যে মাদকতা ছিল কে জানে, কিন্তু দেখলাম একথাগুলি শোনামাত্র সেই হাজার চারেক লোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো মার্চ করে তাঁর দিকে এগোতে লাগল। নেতাজী তাদের উদ্দেশ্যে হাত তোলার সঙ্গে সঙ্গে তারা যে যেখানে ছিল সকলে attention position-এ দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাই বলল, 'আমরা আপনার নেতৃত্বে যেকোন মূল্যে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করব।' শুনতে গল্পের মতো হলেও বাস্তবে এটা ঘটেছিল। মিটিং-এ তাঁর মালা কেনার জন্য লোকের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। I.N.A.-র কাজে নিঃস্ব লোকেরাও যথাসর্বস্ব তুলে দিয়েছে তাঁর হাতে। বস্তুতঃ, ঐসময়ে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে একটা ঐশীশক্তির মানুষ ছিলেন। খুব ধ্যানপ্রবণতা ছিল তাঁর। প্রায়ই রাত্রিতে সিঙ্গাপুরে সামরিক পোশাক ছেড়ে ধুতি-চাদরে শরীর আচ্ছাদিত করে তিনি আশ্রমের প্রার্থনাগৃহে বসতেন। ধ্যান করতেন অনেকক্ষণ ধরে। তাঁর অন্তরের শক্তির আসল উৎস ছিল তাঁর এই ঈশ্বরবিশ্বাস এবং ঈশ্বরনির্ভরতা। ঠাকুরের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভক্তি। মা-ঠাকুরানীর প্রতিও তাই। আর স্বামীজী তো ছিলেন তাঁর জীবনের আরাধ্য দেবতা। যা কালীরও খুব ভক্ত ছিলেন। রোজ গীতাপাঠ করতেন। নিজের চণ্ডীখানি পুরনো হয়ে যাওয়ায় আমার কাছে একখানি চণ্ডী চেয়েছিলেন। আমরা ছিলাম সমবয়সী, কিন্তু যেহেতু আমি সন্ন্যাসী এবং স্বামীজীর সঙ্ঘের সন্ন্যাসী, তাই আমাকেও খুব শ্রদ্ধা করতেন। এতটাই করতেন যে, আমি সঙ্কুচিত হতাম। অবশ্য বুঝতাম, আমার প্রতি তাঁর ঐ শ্রদ্ধা ছিল আসলে স্বামীজীর প্রতি তাঁর অপরিমেয় শ্রদ্ধার জন্যই। বস্তুত:, নেতাজীকে যখন দেখেছি, তখন তাঁর মধ্যে এক ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ হয়েছিল। তাঁর চেহারার মধ্যে তা সবসময় বিচ্ছুরিত হতো। স্বামীজীর দীপ্তি তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হতো। সত্যিই তিনি ছিলেন স্বামীজীর সন্তান।"

সিঙ্গাপুর থেকে চলে আসার আগে বুদ্ধ মহারাজের কাছে এসে নেতাজী বললেন : "স্বামীজী, আমি আপনাকে কোন politics-এ জড়াতে চাই না। তবে দেখছেন তো, এইসব সৈন্যরা তাদের বাড়িঘর সব ছেড়ে পাগলের মতো আমাকে অনুসরণ করছে। তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের কে দেখবে তার ঠিক নেই। এইসব পরিবারকে যদি আপনি একটা Hospital-এর মতো কিছু খুলে আশ্রয় দিতে পারেন তো আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।" উত্তরে বুদ্ধ মহারাজ বললেন : "কিন্তু আমি অত টাকা কোথায় পাব?" নেতাজী বললেন : "কত টাকা লাগবে বলুন।" বুদ্ধ মহারাজ বললেন : "আনুমানিক ৬০,০০০ টাকা। নেতাজী বললেন : "জানেন তো স্বামীজী, আমার কাছে একপয়সাও

নেই। তবে সভায় আমায় যে মালা দেওয়া হয় তা সভার শেষে নিলামে বিক্রি করা হয়। আজ আমি ঐরকম একটি সভায় যাচ্ছি। মালা বিক্রি হলে যা পাব তা আপনাকে দিয়ে যাব।" সভার পর নেতাজী এসে বললেন : "আজ ১০,০০০ টাকায় মালা বিক্রি হয়েছে, তা-ই আপনাকে দিলাম।" বুদ্ধ মহারাজ ঐ টাকা গ্রহণ করেন এবং পরে নেতজী আরও টাকা দেন। ঐ টাকায় মহারাজ সেইসব পরিবারকে কাছে রেখে যথাসাধ্য সেবা করেন। পরে I.N.A.-র পতনের পর প্রধানত: ঐ 'অপরাধে'ই তাঁকে ও তাঁর সহকর্মী ব্রহ্মচারী কৈলাশমকে কিছুদিন ব্রিটিশ কারাবাস ভোগ করতে হয়।

বর্তমান ২০০১ জানুয়ারীর উদ্বোধন সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজীর অনুমোদনক্রমে উপরের চিঠিও প্রবন্ধ এখানে পরিবেশিত হলো

সম্প্রতিকালের একটি জ্ঞাতব্য বিশেষ ঘটনা

পাঠক বন্ধুদের জানাই ১৯৫০-এর জানুয়ারী O. T. Railway-র অরিহর জংশন থেকে—উত্তর ভারতের একজন বিশিষ্ট নেতাজী অনুরাগী (অতি শীঘ্রই নামটা প্রকাশ করতে পারব বলে আশা রাখি)—ছদ্মবেশী নেতাজীকে First class-এর একখানা টিকিট—(গোরক্ষপুর পর্যন্ত) দিয়ে ট্রেনে তুলে দেন। গোরক্ষপুরে নেমে নেতাজী পায়ে হেঁটে নেপালের বিরাট নগরে যান। ঐ অঞ্চলে ৭/৮ দিন অবস্থানের পর নেতাজী পুনরায় উত্তরপ্রদেশে ফিরে যান। এই ঘটনার পরেই ১৯৫৩-৫৪ সালে নেতাজী নেপালের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছিলেন। প্রসঙ্গত এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার উল্লেখ করছি—নেপালের ত্রিবেণীঘাট বা বিরাটনগরে গণ্ডক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। হঠাৎ দেখা গেল প্রকল্পের অদূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে জরিপের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন এক দিব্যদর্শন সন্ন্যাসী। হাতে তাঁর জরিপের সাজ-সরঞ্জাম। অনতিকাল মধ্যেই মঞ্চে আবির্ভূত হলো ঐ সন্ন্যাসীরই শত শত সন্তান! তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেখতে দেখতে বন কেটে হলো মাঠ—অখ্যাত অজ্ঞাত ত্রিবেণীঘাটের জঙ্গলকীর্ণ মাঠে গড়ে উঠল এক বিরাট নগর। তৈরী হলো বড় বড় অট্টালিকা, স্টাফ কোয়ার্টার। তৈরী হলো স্কুল-কলেজ। তৈরী হলো আরও একটি জিনিস—একটি আধুনিক বিমান অবতরণ ক্ষেত্র।

সন্ন্যাসী বললেন—এই স্থানেই বসে মহাকবি বাল্মীকি রচনা করেছিলেন তাঁর অমর মহাকাব্য—রামায়ণ। অতএব এই স্থানের নাম হোক "বাল্মীকিনগর"।

এই সময় ঐ দিব্য সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে ত্রিবেণীঘাটে তথা বিরাটনগরে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সেদিন সমস্ত জেনে শুনেও জনসাধারণের এই প্রবল চাঞ্চল্যতাকেই সংবাদপত্রগুলি বিকৃতরূপে প্রকাশ করেছিল—নেপালের কিছু অংশ সাম্যবাদী বিদ্রোহীগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়েছে বলে। আর ঘটনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করেই সেদিন

নেপাল-ধীশের নির্দেশক্রমে নেপালের তদানিন্তন সেচমন্ত্রী ডঃ নাগেশ্বর প্রসাদের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল।

ঐ সময় ছদ্মবেশী নেতাজী বিরাট নগরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এই অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন অপর একজন সন্ন্যাসী জীপগাড়ী করে এসে নেতাজীর সঙ্গে কিছু সময় এক গোপন আলোচনার পর বিদায় নেন।

বেঙ্গল ভল্যাণ্টিয়ার্স-এর বিপ্লবী বিশ্বজিৎ দত্তের সৌজন্যে এই তথ্য প্রাপ্ত

বৃন্দাবনে কিশোর সুভাষ

সুব্রত—সপ্ত মাতা কি গুরুদেব?

বেদানন্দ—জন্মদাত্রী মাতা, পালন কর্ত্রী মাতা, পরনারী মাতা, গুরুপত্নী মাতা, গোমাতা মাতা, প্রকৃতি মাতা আর দেশজননী মাতা, আমরা সেই দেশজননীর সন্তান সুব্রত।

(স্বামী বেদানন্দ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন)

আনন্দকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—আনন্দ বাহিরে কার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছ! (আনন্দ উৎকর্ণ হইল, পরে কহিল,—না গুরুদেব।)

বেদানন্দ—আমি শুনতে পেয়েছি আনন্দ। কে যেন কুটিরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। মনে হচ্ছে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ এসেছেন, যুগ যুগ ধরে পীড়িত লাঞ্ছিত মানুষ যাঁর জন্য আকুল হ'য়ে প্রার্থনা করছে, এসো, মুক্তি দাও এ অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও, মুক্তিদাতা।

আনন্দ—সে কে গুরুদেব?

বেদানন্দ—হ্যাঁ বৎস। মনে হচ্ছে স্বামীজীর বাণী মূর্তি ধরে এসেছেন।

(শিষ্যগণ উৎসুক হইয়া দ্বারের দিকে চাহিল। সুব্রত কহিল,—কাউকে'ত দেখতে পাচ্ছি না গুরুদেব!)

(স্বামী বেদানন্দ চিন্তিত হইয়া) কহিলেন—তবে কি আমার মনের ভ্রান্তি! কিন্তু ভ্রান্তি কি করে সম্ভব! স্বামীজী যে বলেছিলেন—

আনন্দ—কি বলেছিলেন তিনি গুরুদেব?

বেদানন্দ—তিনি বলেছিলেন, আমার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে আর একটা বিবেকানন্দ আসবে।

বাহির হইতে সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—ভিতরে আসিতে পারি?

বেদানন্দ—ঐ শোন তার কণ্ঠস্বর! তিনি এসেছেন। স্বাগতম্, কিশোররূপী মহামানব স্বাগতম্। —এই দীনের কুটির ধন্য হ'ক তোমার পদার্পণে।

(সন্ন্যাসীর বেশে সুভাষচন্দ্র প্রবেশ করিলেন। স্বামী বেদানন্দ তাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন) কহিলেন—ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি কে তুমি কিশোর?

সুভাষ—আমি আপনার সেবক।

বেদানন্দ—এ কি বলছ তুমি! তোমার সেবা নেবার অধিকার জগতে কার আছে?

সুভাষ—মানুষের।

বেদানন্দ—সত্য, এ তোমারই উপযুক্ত কথা। তোমার নাম কি?

সুভাষ—নামের মোহ ত্যাগ করেছি। আমি মানুষ এই আমার পরিচয়।

বেদানন্দ—জানতে চাই কোন নামকে ধন্য করবার জন্য তুমি এসেছ জগতে। বল বৎস তোমার নাম কি?

সুভাষ—সুভাষচন্দ্র।

বেদানন্দ—পদবী?

সুভাষ—বসু।

বেদানন্দ—(স্বগতঃ) ক্ষত্রিয়। ন্যায়ের দণ্ড ধারণ করে এবার ক্ষত্রিয় রূপে এসেছ তুমি ধরাতলে।

সুভাষ—(বিস্ময়ে) আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

বেদানন্দ—পারবে বৎস। সময় হলে সব বুঝতে পারবে। তোমার পিতার নাম?

সুভাষ—শ্রীজানকীনাথ বসু।

বেদানন্দ—জানকীনাথের পুত্র তুমি?

সুভাষ—তাঁকে চেনেন আপনি?

বেদানন্দ—চিনি, তিনি আমার বাল্যবন্ধু। সুভাষ, তুমি আমার পুত্রতুল্য। একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?

সুভাষ—বলুন।

বেদানন্দ—গৃহত্যাগ করেছ কেন?

সুভাষ—গুরুর সন্ধানে।

বেদানন্দ—ভুল করেছ বৎস। গুরুর সন্ধান তুমি বাইরে পাবে না তোমার অন্তরেই তোমার গুরু বিরাজ করছেন।

সুভাষ—অন্তর বড় বিক্ষুব্ধ। কই সেখানে তাঁর দেখা পাই না।

বেদানন্দ—পাবে। তিনি নিজেই তোমাকে দেখা দেবেন।

সুভাষ—কবে দেখা দেবেন! আর যে সহ্য হয় না।

(স্বামী বেদানন্দ আপন মনেই কহিলেন—সেই নিষ্ঠা সেই ভক্তি! নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণের আকুলতা)।

সুভাষ—প্রভু সময় যে বয়ে যায়,—

বেদানন্দ—ধৈর্য অবলম্বন কর সুভাষ। অধৈর্য তোমার সাজে না।

সুভাষ—আপনি আমাকে দীক্ষা দিন স্বামীজী।

বেদানন্দ—তোমাকে আমি দীক্ষা দিতে পারি না।

সুভাষ—কেন, আমি কি এতই অপরাধী?

বেদানন্দ—অপরাধী তুমি নও। তোমাকে দীক্ষা দেবার অধিকার আমার নেই।

সুভাষ—ঐ এক কথা সবাই বলেছেন,—আমাকে দীক্ষা দেবার অধিকার তাঁদের নেই। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কেউ নেতিবাচক উত্তর দিলেন, কেউ নিরুত্তর রইলেন। সারা উত্তর-ভারত ভ্রমণ করলাম তবু কেউ দীক্ষা দিলেন না।

বেদানন্দ—চিন্তা ত্যাগ কর সুভাষ। তোমাকে দীক্ষা দান সাধারণ ব্যাপার নয়।

সুভাষ—কেন প্রভু?

বেদানন্দ—সেই শক্তিধর কোথায় যিনি তোমায় শক্তিদান করবেন!

সুভাষ—শক্তিধর! শক্তিদান!

বেদানন্দ—হ্যাঁ। তোমার নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে তাকে তোমাকেই জাগিয়ে তুলতে হবে। তুমি জান না তুমি কে!

সুভাষ—কে আমি?

বেদানন্দ—আজ নিজেকে চিনতে পারবে না। আত্ম উপলব্ধি হলে নিজেকে চিনতে পারবে।

সুভাষ—আপনার আশ্রমে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চিত্তের বিক্ষোভ অনেক প্রশমিত হয়েছে। আপনি আমাকে দীক্ষা দিন স্বামীজী।

বেদানন্দ—সুভাষ, তুমি গৃহে ফিরে যাও।

সুভাষ—ফিরে যাব বলে তো গৃহত্যাগ করিনি।

বেদানন্দ—ফিরে তোমাকে যেতেই হবে। গৃহের সুখ তোমার জন্য নয়, তবু উপস্থিত তোমাকে গৃহেই ফিরে যেতে হবে। রাজটীকা তোমার ললাটে।

সুভাষ—রাজটীকা।

বেদানন্দ—হ্যাঁ। তুমি রাজা, তুমি ঋষি। তুমি শিব, তুমি রুদ্র। তুমি সৃষ্টি, তুমি প্রলয়। তোমার ডমরুর তালে তালে অশিব ধ্বংস হবে, সুন্দরের নবজন্ম হবে। তোমার চলার পথের ধারে জনতার পদধ্বনি উঠবে তুমি জনগণমন অধিনায়ক।

সুভাষ—এ সব আপনি কি বলছেন!

বেদানন্দ—সুভাষ, শুষ্ক সন্ন্যাস তোমার জন্য নয়। তোমার জন্ম কর্মের জন্য, বিরাট কর্মক্ষেত্র তোমার সম্মুখে।

সুভাষ—নিপীড়িত মানুষের মুক্তির কাজে লাগব আমি!

বেদানন্দ—হ্যাঁ। তুমি কর্মযোগী। তোমার ধর্ম, তোমার দেহ-মন-প্রাণ সমস্ত পরের নিমিত্ত। স্বামীজী বলেছেন,—জন্ম হতেই তুমি মায়ের নিকট বলি প্রদত্ত।

সুভাষ—আপনি আমার দেহে এ কিসের শক্তি সঞ্চার করলেন, আমার অবসন্ন মন দ্বিগুণ তেজে বলীয়ান হ'য়ে উঠল। আমার চেতনায় নবজীবনের সাড়া পেলাম স্বামীজী।

বেদানন্দ—এর প্রয়োজন ছিল। এবার নিজেকে চেনবার চেষ্টা কর সুভাষ।

সুভাষ—সেই চেষ্টাই করব।

বেদানন্দ—তুমি অমৃতের পুত্র, গীতায় যিনি বলেছেন,—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

(সুভাষচন্দ্র বেদানন্দকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—এই আমার দীক্ষা গুরুদেব।)

বেদানন্দ—আশীর্বাদ করি তুমি সংগ্রামী হও, যশস্বী হও, মৃত্যুঞ্জয়ী হও।

('নেতাজীর যে কাহিনী ইতিহাসের অন্তরালে'—পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত এই তথ্য।)

তাইহোকুর তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় যাঁরা বিভ্রান্ত, তাঁদের কৌতূহল নিবৃত্তার্থে কিছু সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সংক্রান্ত কিছু চর্চা করতে হলে অবশ্যই তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটা অতি স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায় যা কোনভাবেই এড়ানো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, অন্তত দুই চারটি কথা হলেও বলতেই হয়। বলাবাহুল্য সুভাষবাদীরা এ ব্যাপারটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না। সকলে না হলেও অনেকে তো বটেই। আর যারা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুকেই একমাত্র লক্ষ্যবস্তু করে বসে আছেন এবং তা প্রমাণ করতে জীবনপণে বদ্ধপরিকর তাদের সম্পর্কে দৃপ্তকণ্ঠেই বলা যায় হয় তারা সমস্ত তথ্যই সম্পূর্ণ অবগত আছেন নতুবা কিছুই জানেন না। কিন্তু জানেন না একথা যে আদৌ সত্য নয় তা কিন্তু অনায়াসেই অনুমান করা যায়। কারণ নেতাজীর মৃত্যুর সমর্থনকারীগণ তাইহোকুর ভাঙ্গা রেকর্ড ছাড়া অন্যকিছু উপস্থিত করতে পারছেন না। কিন্তু অপরপক্ষ হাজার নথি বা তথ্য হাজির করতে সক্ষম। যারা এ ব্যাপারে যথার্থ কিছু প্রমাণ দিতে পারছেন না, তারা কিন্তু সুভাষবাদীদের মত সাধারণ পর্যায়ের নয়। তাদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত বিখ্যাত সাংবাদিক, সংবাদপত্রগোষ্ঠীর মালিক বা রাষ্ট্রনায়কদের মত ব্যক্তিবর্গরা। কাজেই বলা যায় যাদের মাধ্যম ছাড়া কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদই পরিবেশিত হয়না তারা আসল তথ্যাদি জানতে পারেনি বা জানেন না তা কিছুতেই যথার্থ নয়। এমন নজীর অবশ্য আছে। কাজেই তারা যে সজ্ঞাতেই হটকারিতা করছেন সকলের সাথে, দেশবাসীর সাথে তাতে কোন সন্দেহই নেই। তারা যে এমন কাজ করছেন তার একমাত্র কারণ আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করা। সাম্রাজ্যবাদীর সহযোগী হয়ে। তার দুই একটি প্রমাণ এখানে উল্লেখ্য—

রুশ গবেষক আলেকজাণ্ডার ভিনোগ্রাদোভ 'ইকো প্ল্যানেটি' নামে রুশ ভাষার একটি

জার্নালে (জার্নাল নং ২২) বলেছেন— "বৃটিশ গুপ্তচরদের ১৯৪৬ সালের ডকুমেন্টগুলির একটিতে যে, ১৯৪৬ সালে নেহেরু একটি চিঠি পেয়েছেন নেতাজীর কাছ থেকে। (এই ডকুমেন্টগুলি ১৯৪৬ সালেরই সংগ্রহ করা)। ভিনোগ্রাদোভ লিখেছেন—

"I.N.A. Defence Committee Secretary Asaf Ali confirmed that Nehru requested him to make 4 copies of the note : 'Bose was to-day, 24th August 1945 at Dairen at 1-35 afternoon and together with General Sidei he discussed about how to proceed to Russian territory.'"

অর্থাৎ আই.এন.এ.-র ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারী আসফ আলি দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন, জওহরলাল নেহেরু তাঁকে একটি নোটের চারটি কপি প্রস্তুত করতে বলেছিলেন। নোটটি ছিল নিম্নরূপ ঃ "বসু আজ ২৪শে আগস্ট ১৯৪৫ (বিমান দুর্ঘটনার ছয়দিন পর) দুপুর ১-৩৫ মিনিটের সময় দাইরেনে ছিলেন। সেখানে সিদেইয়ের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন রাশিয়ান এলাকায় কীভাবে যাওয়া যায় সে বিষয়ে।"

ভিনোগ্রাদোভ আরও জানিয়েছিলেন ১৯৪৬ সালে সোভিয়েত সংবাদপত্র 'পাভদা'য় প্রকাশিত হয়েছিল—বসু সোভিয়েত ইউনিয়নে অবস্থান করছেন। একই সময়ে কাবুলের সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত 'খোষ্ট্র' প্রদেশের গভর্ণরকে জানিয়েছিলেন, বসু জীবিত আছেন। একইভাবে ১৯৪৬ সালে তেহেরানে নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত মুরাদফ খবর পাঠিয়েছেন, "Subhas is alive". উল্লেখ্য ১৯৪৬ সালে বোম্বাই থেকে সোভিয়েত এজেন্ট ভি. জি. সায়াদনিয়াৎস জওহরলাল নেহেরুর একটি জরুরী পত্র নিয়ে মস্কো গিয়েছিলেন।

ভিনোগ্রাদোভ লিখেছেন মস্কোয় নিযুক্ত স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মস্কো থেকে দিল্লী ফিরেই বলেছিলেন তিনি রোমাঞ্চকর কিছু বলবেন। (তিনি এও বলেছিলেন যে, তিনি যে-সংবাদ দেবেন তা ভারতবাসীর কাছে স্বাধীনতার চেয়েও আনন্দের)। (সঙ্কলন ঃ বর্তমান পত্রিকা ঃ প্রথম পৃষ্ঠা ঃ কলাম, ৫, ৬, ৭, ১৯৯৬)

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেও যেহেতু নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সে-সম্মেলন করতে যাচ্ছিলেন তাই নেহেরুর নির্দেশেই তা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। (ঐ ব্যাপারে পূর্বে আলোচনা হয়েছে এই পুস্তকে)।

এই তথ্যই প্রমাণ করছে পণ্ডিত নেহেরু সজ্ঞানেই গোটা ভারতবাসীকে চূড়ান্তভাবে প্রতারণা করেছেন দীর্ঘকাল যাবৎ। এবং একই খেলায় মেতে চলেছে ভারতের প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং তাদের সহযোগী বিখ্যাত কোন কোন সংবাদপত্র গোষ্ঠীর। কাজেই যারা নেতাজীর মৃত্যুর পক্ষে সওয়াল করছেন এবং সেই সওয়ালকে সুনিশ্চিত করার জন্য বিশ্বের সর্বত্র দৌড় ঝাঁপ করছেন ও কিছু কিছু চক্রান্তমূলক মিথ্যা বয়ান পত্রপত্রিকায় উপস্থাপনা করে গোটা ভারতবাসীকে বিভ্রান্ত করেছেন আজ অর্ধ শতাব্দী ধরে তারা কী কিছুই জানেন না। তারা কি স্বর্গের বৈতরণী প্রবাহিত ধোঁয়া তুলসী

পাতা? অতএব পাঠক বন্ধুরা বুঝতেই পারছেন চক্রান্তের জাল শুধু বাংলা বা ভারতের মাটিতে সীমাবদ্ধ নয়, তার বিস্তৃতি সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী। এই সবই সুভাষবাদীদের অবগত বিষয়। তাই তাঁরা ঐ তথাকথিত মৃত্যুর ব্যাপারে আদৌ চিন্তিত তো নয়ই বিন্দুমাত্র উৎসাহী নয়।

এতদ্ সংক্রান্ত যে সপ্তসিন্ধু তুল্য তথ্য আছে তাতে না গিয়ে শুধু সংক্ষেপে আরও এক দুটি নথি পাই কিনা তা একটু দেখার প্রচেষ্টা করি। বিপরীত মার্গীয়দের যখন তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনা নিয়েই একমাত্র মাথাব্যথা তখন আসুন আমরাও তাদের মাথাব্যথার কোন মহৌষধ পাই কিনা তাই একঝলক পত্রপত্রিকা বা কোন গোপন নথি দেখার চেষ্টা করি। তাতে ঐ মাথাব্যথাওয়ালাদের কিছু হোক, না হোক অন্তত বিভ্রান্তপথের পথিকদের নতুন করে ভাববার অবকাশ হবে কিছুটা। তাই নয় কী? বলাবাহুল্য তথাকথিত মৃতু-তত্ত্ব নিয়ে পৃথিবীতে বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। তাই আমরা ঐ পথে বিচরণ করলুম না। তবুও মামুলী জিজ্ঞাসার সুরাহার্থে নিম্নের ঘটনাটা আসুন অনুধাবন করতে যত্নবান হই।

বিমান দুর্ঘটনা কী সত্যই ঘটেছিল? প্রবাহমানচিত্র কি বলে?

নেতাজীর জীবনের প্রতিটি ঘটনাই বিশ্বপ্রবাহের চলমান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত ব্যতিক্রমী। এমন দুই একটি ব্যতিক্রমী হচ্ছে—তাঁর গৃহত্যাগের ১৯৪১ সালের ঘটনা থেকেই সূচনা হয়েছিল। তিনি যে যাত্রা শুরু করেছিলেন তা ছিল. না কি ঘোরতর অমাবস্যায়। এটা শোনা যায় তাঁর জীবনের প্রতিটি মহান শুভকর্মের যাত্রা বা আরম্ভ করেছেন ঐ অমাবস্যা রাত্রিতে বা অমাবস্যা লগ্নে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। অবশ্যই পার্থিবচারীদের বিচারে। আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে তাঁর প্রত্যেকটি পার্শ্বচর বা সঙ্গী নিয়ে। ১৯৪১ সালের ১৬ই জানুয়ারী বা ১৭ই জানুয়ারী যে তারিখই তিনি গৃহত্যাগ করে থাকুন তাতে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের কথাই সর্বসাধারণরা জানেন। কিছু সত্য ঘটনা যে আমাদের অন্যপ্রকার ইঙ্গিত দিচ্ছে, তা এই গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে—'রহস্যের মাঝে রহস্য'।

এই পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে—সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগের সময় দুই মুসলমানের উপস্থিতি। একজন হচ্ছেন রতনপুরের নবাব জনাব জে. পি. ফারুকী, অন্যজন হচ্ছেন ইনসুরিয়েন্সের এ্যাজেন্ট ডাঃ জিয়াউদ্দিন আফগান মুসলমান। এই জিয়াউদ্দিনের নামের আড়ালেই সুভাষচন্দ্রের কাবুলে আগমন। তারপর পরবর্তী পর্যায়ে বার্লিন থেকে সাবমেরিনে যাত্রায়ও সঙ্গী সেক্রেটারী তরুণ ইন্‌জিনিয়ার আবিদ হাসান। এবং সর্বশেষ সঙ্গীও ছিল এক বিশ্বস্ত মুসলমান কর্নেল হবিবুর রহমান। তাছাড়া-I.N.A. সরকার গঠনের পর অনিবার্য কারণে নেতাজীর অনুপস্থিতিতে যিনি সরকারীকার্য দেখার দায়িত্ব পেতেন তিনিও একজন মুসলমান (নামটি হচ্ছে এম. জেড্. কিয়ানি)। কেউই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করেননি। তাই দেখা যাচ্ছে সুভাষচন্দ্রের

জীবনের আগাগোড়া সর্বত্রই এক মহাব্যতিক্রমী ধারাবাহিকতা, যা অন্য কোন ভারতীয় বা বিশ্বনেতার ক্ষেত্রে সহসা পাওয়া যায় না।

যাইহোক, এবার আমরা আসুন তাঁর তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে একটু বিচরণ করি। সেখানে আমাদের জন্য ইতিহাস কি নিয়ে অপেক্ষা করছে দেখা যাক। ১৯৯০ সালের ১লা ডিসেম্বর যুগান্তর পত্রিকায় সাংবাদিক ডঃ সুশান্ত মিত্র এ ব্যাপারে যে অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তাঁর সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন তাতে যা পাওয়া যাচ্ছে তা যে কোন ব্যক্তির নিকটই পরম আশ্চর্য মনে হবে। অথচ তথ্যবহুল এবং অসাধারণ তথা চরম সত্য। আসুন আমরা যুগান্তরের ভাষায়ই ব্যাপারটা অনুসরণ করি। সেই সংবাদে ছিল—

"নেতাজীর বিমান যাত্রার সঙ্গী ছিলেন অতি বিশ্বস্ত কর্নেল হবিবুর রহমান। বৃটিশ গোয়েন্দাদের তিনি বিমান দুর্ঘটনা এবং নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে যা বলেছিলেন আট বছর পর তার সব কিছুই অস্বীকার করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি পাকিস্তান সিভিল এণ্ড মিলিটারি গেজেটে এবং কয়েকটি পাকিস্তানী সংবাদপত্রে (তিনি পাকিস্তানের নাগরিক ছিলেন,এবং আজাদ কাশ্মীরের গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন। পাকিস্তান আজাদী সৈন্য ও সেনাপতিদের যোগ্যমর্যাদা দিয়েছিল তখন কিন্তু ভারতে আজও কোন মর্যাদা দেওয়া হয়নি)। বিশেষ সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছিলেন, নেতাজীকে রক্ষা করার জন্যে তিনি সেদিন সত্যি কথা বলেননি এবং যাকিছু বলেছিলেন তা নেতাজীর নির্দেশেই বলেছিলেন। পাকিস্তানে প্রকাশিত মিলিটারি গেজেটের উদ্ধৃতি দিয়ে পরবর্তীকালে অমৃতবাজার পত্রিকা লিখেছিল—নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনাও হয়নি এবং তিনি মারাও যাননি।

"There had been no air crash and that Netaji was still alive" (4.4.55 p. 6 col. 6). তাঁর এই মন্তব্য থেকে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার খবর, বিমান দুর্ঘটনার ছবি এবং জাপানের রেনকোজি মন্দিরে রাখা নেতাজীর চিতাভস্ম—সবকিছুই মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। এর বলিষ্ঠ সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে সংবাদ সংস্থা এ.পি.র খবরে, ক্ষমতা হস্তান্তর গ্রন্থে এবং বৃটিশ গোয়েন্দাদের গোপন রিপোর্টে। ১৯৪৬ সালের ৪ঠা এপ্রিল এ.পি. সংবাদ প্রচার করেছিল—"সুভাষচন্দ্র বসু সুস্থ অবস্থায় মাঞ্চুরিয়ায় আছেন"।..........১৬ই এপ্রিল ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে বসে বৃটিশ গোয়েন্দারা লিখছেন, "হবিবুর রহমানের রিপোর্ট অসন্তোষজনক"। তিনি প্রথমে টোকিওতে সি.আই.সি.-কে এবং পরে সি.এস.ডি.আই.সি.-কে বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে যে বক্তব্য জানিয়েছিলেন তার মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য দেখা যাচ্ছে। (দ্রষ্টব্য No. C-5. Page-5) After interrogation of Col. Habibur Rahman, the intelligence Bureau. New Delhi, on May 19, 1946. (No. C-5, Page-5), recorded. "Habibur Rahman's report is unsatisfactory. The multitude of discrepencies in account of actual air crash as given first to CIC in TOKYO and later to CSDIC is being taken up.....".

জাপান আত্মসমর্পণ করার পর মিত্রশক্তির হাতে ধরা পড়ার আগেই ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি, যিনি এই পরিকল্পনা রূপায়ণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং তা পালন করেছিলেন তিনি 'হারিকিরি' করে নিজের জীবন বিসর্জন দেন।..........জাপানের আত্মসমর্পণের ঠিক পর মুহূর্তেই নেতাজী তাঁর মন্ত্রীসভা ও পরামর্শদাতাদের সঙ্গে এক গোপন আলোচনায় মিলিত হন। এগারোজন মন্ত্রীপরিষদের সদস্য ও পরামর্শদাতাদের কাছে নেতাজী সরাসরি দুটি প্রশ্ন করেন। (১) সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের আলোকে এবং ভবিষ্যতে যে আরও সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে চলেছে তাতে আপনারা কি ভারতের মুক্তিসংগ্রাম চালিয়ে যেতে প্রস্তুত না সরে যেতে চান? (২) যদি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চান, তাহলে কে কোন অঞ্চল থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করতে ইচ্ছুক তা জানান। তবে সকলের মতামত গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে প্রত্যেকের ইচ্ছা পূর্ণ করা হবে বলে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।..........নেতাজীর অপ্রকাশিত গোপন পরিকল্পনাটি যে কি ছিল তা নাগানেতা ফিজোর নিকট থেকে একাধিক সাক্ষাৎকারে জানা যায়। ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় বৃটিশ নাগরিক নাগানেতা আঙ্গামী জাপুফিজোর সঙ্গে লণ্ডনে সাংবাদিক বাসবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক সাক্ষাৎকারে প্রকাশিত হয়।

আপনি কি বিশ্বাস করেন যে নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

না, না, উনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি। লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তারাপদ বসুকে বলেছিলুম "আপনাদের জনগণকে বলুন যে উনি মারা যাননি"। জাপানিরা নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করবে সে কথা আমি ঘোষণার একসপ্তাহ আগেই জানতুম। মৃত্যুর কথা ঘোষণা করে জাপানিরা মহৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। জাপানিরা তাঁদের বন্ধু নেতাজীর সঙ্গে বেইমানি করেনি। আবার বিজয়ী মিত্রশক্তি আমেরিকা ও বৃটেনকেও অসন্তুষ্ট করেনি। তাঁরা নিজেদের এবং সুভাষবোসের মান বাঁচিয়েছিলেন।..........নেপোলিয়ানের পরে তিনিই সর্বশেষ মানুষ। তাঁর মত মহাপুরুষ ভারতে আর জন্মাবে না। (Netaji did not die in any air crash—Phizo).

এই বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন ছিল হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক অশ্বিনী গুপ্তের সাক্ষ্যে। শাহনওয়াজ কমিটিকে তিনি বলেছিলেন, নাগানেতা ফিজো ১৯৫১ সালের মে মাসে নাগা পার্বত্য অঞ্চলে তাঁকে বলেছিলেন, ১৮ই আগস্ট ১৯৪৫ সালের আগে তিনি (ফিজো) জানতে পারেন নেতাজীকে জড়িয়ে একটি বিমান দুর্ঘটনার খবর প্রচারিত হবে, কিন্তু তিনি তা বিশ্বাস করেননি। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন গোয়েন্দারাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে,

"There are major discrepancies regarding the disposal of the body.....The discrepancy here is great and appears suspicious. In addition if it is a deception plan it is one which has been extremely carefully and ingeniously organised."

এই হচ্ছে তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার মর্মকথা। ওপরের তথ্যই বলছে স্বয়ং নেহেরু সাহেবই আসফ আলিকে দিয়ে যে note লিখিয়েছেন সেখানে পণ্ডিত নেহেরু বলছেন ২৪শে আগস্ট বেলা ১টা ৩৫ মিঃ সময় নেতাজী দাইরেনে বসে জাপানি সেনা সিদেইয়ের সাথে রাশিয়া যাবার ছক কষছেন। অর্থাৎ কিনা দেখা যাচ্ছে নেহেরু সাহেব তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ের নেতাজীর বিস্তারিত কর্মসূচীর দিনতারিখ এমনকি ঘন্টা মুহূর্তেরও সবকিছু অবগত ছিলেন। এসব যদি নেতাজী না জানাতেন তবে কিভাবে তিনি পরম্পরায় জ্ঞাত হলেন? আর সেই নেহেরুই ভারতীয় লোকসভায় দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছেন—Netaji's death is a settled fact. (এ ব্যাপারে সুবিস্তৃত ভাবেই আমরা পূর্বে এই গ্রন্থে আলোচনা করেছি।) কাজেই পাঠকবন্ধুরা বুঝতে পারছেন তাইহোকু হচ্ছে একটি পুরানো কাসুন্দি।

কত যে জানার!

মানব ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

অনন্ত অবিস্মরণীয় বিস্ময় কিছু কি আছে এ জগতে? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের অবশ্যই স্মরণ করতে হয় সৃষ্টিকর্তা ভগবানকেই সর্বপ্রথম। তিনি সর্বজীবে যেমন বিরাজমান তেমনি প্রতিটি অণু-পরমাণুতেও বিদ্যমান অথচ প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা আমাদের মত পার্থিবচারীদের আদৌ নেই। এখানে তাঁকে দেখা বা না পাবার একটা সান্ত্বনা আছে, কারণ তিনি তো স্বয়ংই স্বয়ংভূ বা পরমাত্মা। তাঁকে পাবার কথা নয়, পার্থিবচারীদের। কিন্তু মানবজগতে মানবদেহধারী কারো পক্ষে কি এমনটি হওয়া সম্ভব? সৃষ্টিকর্তার বিচিত্র লীলার মাঝে এমনটিও কিন্তু সম্ভব। আর এই সম্ভাবনাময় সত্তাটি সন্ধান করতে গেলে শুধু এমনটির পাওয়া যেতে পারে দেবমানব সত্তায় যিনি বা যাঁরা সত্তাবান তাঁদের মধ্যে। আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর পূর্বে এমন এক সত্তায় সত্তাময় ব্যক্তিত্ব ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তারপর এই বিশাল ছয় হাজার বছরের বিস্তৃত মানবজগতে আর এমনটি সন্ধান মানুষ পায়নি। বলতে নেই আমরা পরম ভাগ্যবান যে আমরা সাম্প্রতিক কালের পৃথিবীতে তেমন একজনকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি অনন্ত কর্মকাণ্ড করছেন অথচ চূড়ান্ত চেষ্টা করেও তাঁকে পৃথিবীর কেউ ধরাছোঁয়ায় পাচ্ছেন না। বলাবাহুল্য তিনিই হচ্ছেন আজকের জগতের অদ্বিতীয় পরমপুরুষ ও পৌরুষ নেতাজী সুভাষ। তাঁর পৃথিবীময় যে-অবিস্মরণীয় মানব কল্যাণের কর্মকাণ্ড তার যৎসামান্য আমরা এই পুস্তকের দশম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এই প্রবন্ধে তাঁর ঐসব কর্মকাণ্ডের কিছু প্রলম্বিত অংশ পাবার চেষ্টা করছি। ঐ প্রলম্বিত অংশেরই দুই-একটি টুকরো সংবাদ এখানে উদ্ধৃতি দেবার চেষ্টা করা যাক।

॥ এক ॥

হিটলারের নাৎসী সংগঠন একটি পৌর সম্বর্ধনা দিতে চেয়েছিল সুভাষচন্দ্রকে তিনি যখন জার্মানে ছিলেন তখন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সেই সম্বর্ধনা গ্রহণ করতে রাজী হলেন

না। কারণ হিটলার একবার বৃটিশ ভারতের প্রশাসকদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার খুব প্রশংসা করেছিলেন। তাই সুভাষচন্দ্রের ঐ সম্মান গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। পুরুষসিংহ সুভাষচন্দ্র তাদের মুখের ওপর জানিয়ে দিয়েছিলেন—

"Hitler is at liberty to lick British boots". অর্থাৎ 'হিটলার বৃটিশ জুতো চাটতে পারেন'—কিন্তু সুভাষ এক অখণ্ড স্বাধীন সার্বভৌম সত্তা, তাঁর পক্ষে চাটুকারদের সম্বর্ধনা গ্রহণ নৈব নৈব চ। এই হচ্ছেন সুভাষ!

সেই সময়ই অন্য এক দৃশ্যে আমরা দেখছি—সুভাষচন্দ্র দাবী করছেন হিটলারের কাছে যে, জার্মান, জাপান ও ইটালির ত্রিপক্ষীয় এক সমঝোতা চুক্তি ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে যেন ঘোষণা করা হয়। এর উত্তরে হিটলার বলেছিলেন বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে এইরূপ ঘোষণা অসম্ভব।

উত্তরে নেতাজী বলেছিলেন হিটলারের দোভাষীকে—

"Tell His Excellency that I have been in politics all my life and that I don't need advice from anyside."

হিটলার যখন 'হিটলার দি গ্রেট ফুয়েরার'—বিশ্বত্রাসি এক অদ্বিতীয়শক্তি অর্থাৎ তিনি চূড়ান্ত form-এ তখন এসব কথা বিনিময় হচ্ছে এক পরাধীন জাতির এক স্বাধীনতা যোদ্ধার সঙ্গে। পরন্তু সুভাষচন্দ্র তখন হিটলারের সহযোগিতা চাইতে সেখানে এসেছেন। তাঁরই হচ্ছে এমন উক্তি। বলতে গেলে এতো এক অসম্ভব উক্তি—যা মনুষ্য জগতের কারো কল্পনাই করার কথা নয়। কারণ ভাবতে হবে দুই বক্তার তখনকার অবস্থানটা! ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৪২ সালের ২৮শে মে জার্মানের খাসমুল্লুকে বসে। ব্যাখার কি প্রয়োজন আছে?

॥ দুই ॥

জাপানের প্রেক্ষাপটে নেতাজী সুভাষ

নেতাজীকে যারা পাপেট, তোজোর কুকুর, কুইসলিঙ্ ইত্যাদি বলেন তারা অর্থাৎ সেই মহামান্যরা এবং তাদের উত্তরসূরী যারা এখনও হম্বিতম্বি করেন তারা শুনে রাখুন—কি কি কঠোর শর্তে জাপানকে তিনি বাধ্যবাধকতার মধ্যে রেখেছিলেন। অথচ এক পরাধীন জাতির তিনি অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র এক স্বঘোষিত স্বাধীন সরকারের প্রতিনিধি মাত্র।

জাপানের সঙ্গে যেসব শর্তে চুক্তি হয়েছিল ইম্ফল অভিযানের পূর্বে জাপানী সমর নায়কদের সঙ্গে সেই চুক্তিতে ছিল—

1) The two armies would work on a common strategy.
2) Officers and the men of the AZAD HIND FOUJ would be under their own military law (The I.N.A. Act) and not under the Japanese military law and police.

3) Liberated territories were to be handed over to the Azad Hind Fouj.
4) The only flag to fly over the Indian soil would be national tricolour.
5) Any Japanese or Indian soldier found looting or raping any woman was to be shot at once.
6) When ever one I.N.A. soldier or Japanese soldier would meet each other they have to salute each of them at a time.
(অর্থাৎ সমান সমান মর্যাদা থাকবে উভয়ের)

এইসব ছিল পূর্ব এশিয়ার ত্রাস জাপানের সঙ্গে নেতাজীর চুক্তির শর্ত। বিশ্বের মানব ইতিহাসে কোন পরাধীন জাতির এক প্রতিনিধির এমন শৌর্যের কাহিনী কোথায় পাবেন? তবু সুভাষচন্দ্র জাতির কাছে, দেশের কাছে, এমনকি তাঁর স্বদেশী স্বগোত্রীয়দের কাছেও অচ্ছুৎ! এরই নাম ভাগ্য তাই না?

এখানেই শেষ নয়। ১৯৪৬ সালে লালকেল্লায় আজাদী সেনানীদের বিচারের সময় সওয়াল করতে ওঠে তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা ভুলাভাই দেশাই বলেছেন—

"I have to attempted to prove and have established that the I.N.A. though small in numbers was fiting as allies of the Japanese army and there is no ignorance in admitting that or doing that because the objectives at the time of both the armies were undoubtedly to free India from Britain."

অপর এক সওয়ালের জবাবে ভুলাভাই দেশাই বলেছেন—

"According to their Agreement which I submit I have proved, any part of Indian Territory which may be liberated would be immediately handed over to the I.N.A.

Where is the question of being an Instrument?

I.N.A. Trial, BhulaBhai Desai, 1946, RedFort

এবার বলুন ঐসব তথ্যই কী প্রমাণ করছে না যারা সুভাষচন্দ্রকে জাপানের ক্রীড়নক বা অন্যান্য কুৎসিৎ আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন, বস্তুতপক্ষে তারাই কী বৃটিশের ক্রীড়নক নয়? শুধু ক্রীড়নক বললে যথেষ্ট নয়। বলাবাহুল্য তারাই আসলে বৃটিশের পোষা নেটিভ ডগ। তাই তো তারা ছিল His Master's Vioce.

॥ ৩ ॥

সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে গান্ধীজী এবং তৎকালীন Statesman-এর সম্পাদকের একটি মূল্যায়ন

১৯৪৫/৪৬ সালের কোন একসময় গান্ধীজীর সঙ্গে জওহরলাল, সরদার প্যাটেল এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কিছু বাকবিতণ্ডা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়

তখন গান্ধীজী বলেছিলেন—

"To-day my son Subhas is not here. If he were with me I would not have needed any of you."

(৩রা এপ্রিল ১৯৯৬ আঃ বাঃ পত্রিকা)

১৯৪৫ সালে মিঃ স্টিফেন্স কলিকাতার Statesman-এর সম্পাদক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে।

"If Subhas is dropped on the Calcutta maidan to-day the whole British Empire will collapse immediately."

॥ ৪ ॥

নেতাজীর ঐতিহাসিক আহ্বান ও বিবিধ প্রেক্ষাপট

১৯৪৩ সালে ৫ই জুন বিকেল ৫ ঘটিকায় (at 5 P.M.) একটি সামরিক ঘাঁটিতে সিঙ্গাপুরে I.N.A. ফৌজ নেতাজীকে অভ্যর্থনা দেবার সময় ঐ অনুষ্ঠানে ঝান্সিবাহিনী Guard of Honour দেয়। নেতাজী তখন উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

"My brothers and sisters of India
—GIVE ME BLOOD I SHALL GIVE
YOU FREEDOM from this British Emperor"

* * *

নেতাজীর I.N.A. সরকার ছিল একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সরকার। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর I.N.A. সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর পৃথিবীর ৯টি রাষ্ট্র সুভাষচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ঐ ৯টি আন্তর্জাতিক সরকার হচ্ছে যথাক্রমে—

১। জাপান, ২। জার্মান, ৩। ইটালি, ৪। মাঞ্চুরিয়া, ৫। থাইল্যাণ্ড, ৬। ব্রহ্মদেশ, ৭। শ্যামদেশ, ৮। ক্রোশিয়া এবং ৯। নানকিং গভর্ণমেণ্ট এবং আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবীবীর—ডি-ভ্যালেরা নেতাজীকে অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিলেন।

* * *

সাম্প্রতিককালে ভারত পর্যটনের সময় সুভাষচন্দ্র উত্তরপ্রদেশের বেরিলীতে যখন অবস্থান করছেন তখন হনুমানগীর বেশে নেতাজী অবস্থানরত থাকাকালীন তাঁর হৃদয়বিদারক আক্ষেপ—

**"দিল যবসে দিয়া হৈ হসীনোকো
তগদীর হামারি ফুট গয়ি।
জিস্ পেড়কো সীচা শুকগিয়া
জিস্ ডালকো পাকড়া টুটগিয়া।।"**

অর্থাৎ—

**"যাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি
সে আমার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে।**

যে বৃক্ষ রোপন করেছি তা অকালে
শুকিয়ে গিয়েছে—আর যে ডাল
ধরেছি তা ভেঙ্গে গিয়েছে।"

"নূতন প্রোগ্রাম আমারও একটা আছে, কিন্তু সে প্রোগ্রাম দিবার সময় এখনও আসেনি—আসবে সেদিন, যেদিন নূতন মানুষ প্রস্তুত হইবে—যাহারা সেই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তাহা কাজে লাগাইতে পারিবে। নূতন মানুষ তৈরী করিবার চেষ্টায় আমি এখন নিযুক্ত আছি।" —নেতাজী

আমেরিকার CIA-এর একটি গোপন রিপোর্টের D-Classified কপির অংশবিশেষ।

FRIENDS OF INDIA SOCIETY INTERNATIONAL (U.S.A.)

Action Committee for Democratic Rights

Southern California Chapter
4901 Pacific Blvd.
Vernon, CA 90058
Tel (213) 589-5085
Fax (213) 589-7420

Co-ordination Committee:
Sharad Dandekar - (818) 998-4975
Gulshan Bhatia - (714) 855-2286
Ajith Bhargava - (714) 220-1774
Tushar Ravuri - (213) 737-6318
Amish Shah - (818) 957-0948
Naveen Doshi - (310) 641-7348
Pragnya Kanth - (310) 541-0201
Amith Gandhi - (310) 534-0941
Bal Kulkarni - (818) 914-2081
Pratap More - (714) 761-8611
Ram Sastry - (818) 892-2695
Dr. Manohar Shide - (818) 772-6543
Mukund Vijayan - (805) 298-3140
Prashanth Chawia - (213) 891-9016

THE MEMO THEN GOES ON TO SEEK ANY INFORMATION BRITISH HAD REGARDING THE PLANE CRASH IN WHICH BOSE WAS SUPPOSED TO HAVE PERISHED AT TAIHOKU ON AUGUST 18, 1945

" .SAID THAT OBVIOUSLY THERE MUST HAVE BEEN NUMBER OF PEOPLE WHO SAW THE PLANE CRASH AND BURN AT TAIHOKU ON AUGUST 18; THAT BOSE MUST HAVE BEEN TREATED IN A HOSPITAL BY SOME PHYSICIAN. THAT IF HE DIED THERE MUST BE PEOPLE WHO HAD FIRST HAND KNOWLEDGE OF HIS CREMATION AND THE CEREMONIAL DISPOSAL OF HIS ASHES"

"IF THE DEPARTMENT COULD FURNISH ANY INFORMATION ON THIS SUBJECT, IT WOULD BE MOST HELPFUL TO THIS CONSULATE GENERAL. . .POSITIVE PROOF OF SOME KIND THAT BOSE IS DEAD WOULD BE MOST INTERESTING."

DONOVAN (THE END OF THIS MEMO)

OBVIOUSLY THERE ARE NO ANSWERS. BUT THE QUESTION THEY RAISE ARE OF MUCH

Bhoomaiah Alishetti - (818) 403-0621

HISTORICAL INTEREST. IF POSSIBLE RETURN OF BOSE AS LATE AS 1964 WAS A MATTER OF CONCERN TO CIA OBSERVERS OF INDIA, THEN OBVIOUSLY LAST WORD ON HIS DEMISE ALLEGED IN THAT PLANE CRASH, IS YET TO BE SAID.

ANYWAY IT WAS HIGHLY INTERESTING TO FROM THE INFORMATION OSS AND CIA HAD ON BOSE. THE GREAT ORGANISATIONAL ABILITY OF BOSE. HERE WAS A PERSON WHEN HE LEFT INDIA HE HAD NOTHING MORE THAN THE INCOGNI TO DRESS. BUT WHEN HE RETURNED IT WAS WITH A FULL FLEDGED ARMY CONFRONTING THE WOLRD SUPERPOWERS THEN, BRITISH AND AMERICAN. IT MAY BE THAT HE DID NOT PREVAIL. BUT HIS EFFORTS SHOWED HIS CONSUMMATE DIPLOMATIC SKILLS IN HARNESSING AID FROM ENEMY'S ENEMY. HIS ABILITY TO RAISE ARMED RESISTANCE SHOWED THAT AN INDIAN CAN RAISE ARMIES AND FIGHT TYRANNY EVEN UNDER MOST DISMAL CIRCUMSTANCES. IN THIS HE WAS SHIVAJI OF HIS DAY.

SINCERELY.

FOR FRIENDS OF INDIA SOCIETY.
G. V. CHELVAPILLA
PRESIDENT, FRIENDS OF INDIA (S. CALIF)
(P. S. SUBHASH BOSE BIRTH DAY IS COMING IN JANUARY. THE PUBLICATION OF THIS INFORMATION IF POSSIBLE MAY COINCIDE WITH THAT DATE THANKS)

•Central Secretariat : Dr. R. S. Dwivedi, 103 Periwinkle, Greenbelt, M. D. 20770, Tel - (301) 345-6090

বিপ্লবী বিশ্বজিৎ দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত

(নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত Bibliography -এর অংশবিশেষ)

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যে সকল মহামানবগণ এসেছেন তাঁদের মধ্যে নেতাজী সুভাষ যে সর্বাগ্রগণ্যতার দাবী রাখে তাতে সন্দেহ নেই, অন্তত আজকের যে নেতাজীর প্রেক্ষাপট সেই দৃষ্টিকোন থেকে। তাঁর সম্পর্কে যে পৃথিবী ব্যাপী গবেষণামূলক গ্রন্থরাশি প্রকাশিত হচ্ছে তার নজির বোধহয় দ্বিতীয় কোন মহামানবের ক্ষেত্রে ঘটেনি। তাঁর সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে অসংখ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং হতে যাচ্ছে তার পরিসংখ্যান পৃথিবীতে কেউ দিতে পারবেন বলে বিশ্বাস করিনা। এই অসম্ভব কাজ নিয়ে অনেকেই গবেষণারত আছেন। এমন গবেষকদের মধ্যে অন্যতম গবেষক হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত তাপস দাশ মহাশয়, যিনি ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন এবং আগামী দিনে আরও প্রকাশ করার পথে এগিয়ে চলেছেন।

তাঁর প্রকাশিত যে পুস্তকটি আমাদের হাতে সম্প্রতি এসেছে সেই পুস্তকটি হচ্ছে 'Netaji Subhas Chandra Bose—A select Bibilography'. শ্রীযুক্ত তাপস দাশ মহাশয়ের অনুমোদন ক্রমে তাঁর বই থেকে আংশিকভাবে কিছু অংশ 'সুভাষ দর্পণে বিশ্বরূপ' বই-এ সংযোজিত করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ বইটি উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই শুধু বাংলা ভাষায় যত গবেষণামূলক বা ঐতিহাসিক বই সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে রচিত হয়েছে এ পর্যন্ত তার ক্রমিক পরিসংখ্যান ও পুস্তকের নাম তথা লেখকের নাম এখানে সন্নিবেশিত করা হলো। এর সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বই কোন কোন ভাষায় কত রচিত হয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত হিসেব এখানে দেবার চেষ্টা করছি।

১। অসমীয়া ভাষায়— ২টি পুস্তক রচিত হয়েছে এ-পর্যন্ত।
২। বাংলা ভাষায়— ১৯৮টি ” ” ” ”
৩। ইংরেজী ভাষায়— ১৯০ টি ” ” ” ”
৪। হিন্দি ভাষায়— ৩২ টি ” ” ” ”
৫। কানাড়া ভাষায়— ৩ টি ” ” ” ”
৬। মালয়ালম ভাষায়— ৯ টি ” ” ” ”
৭। মারাঠি ভাষায়— ১৯ টি ” ” ” ”
৮। পাঞ্জাবী ভাষায়— ১৩ টি ” ” ” ”
৯। সিন্ধি ভাষায়— ৭টি ” ” ” ”
১০। তামিল ভাষায়— ২৩ টি ” ” ” ”
১১। তেলেগু ভাষায়— ১২ টি ” ” ” ”
১২। উর্দ্ধু ভাষায়— ৮টি ” ” ” ”

এই সব ভারতীয় ভাষা ছাড়াও পৃথিবীর নানা ভাষায় অসংখ্য পুস্তক রচিত হয়েছে যার হদিস করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে—Netaji Institute for Asian Studies এর লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত তাপস দাশ মহাশয়ের নিকট থেকে এ ব্যাপারে তাঁর আন্তরিক ও সহৃদয় সহযোগিতা পাওয়ায় প্রতিবেদক অশেষ কৃতজ্ঞ।

BENGALI

1. Adhikari, Satosh Kumar
Netaji Subhäsa Candra : vyaktitwa o rajnaitika darsan. Calcutta : Sree Bhumi, 1990, 130p.

2. Adhikäri, Santosh Kumar
Subhas Candrer Rajnaitik Cintadhara. Calcutta : Anandadhara , [19].

3. Bagal, Yogesh Chandra
Muktir Sandhane Bharat. 3rd ed. Calcutta : Asok Pustakalaya, 1960. 554p.

4. Bagci, Moni
Desa-nayaka Subhasa Candra. Calcutta : Sikshabharati, 1965. vi, 166p.

5. Bagci, Moni
Netaji Subhasa Candra. Calcutta : Nirmala Books, [199].

6. Bandyopadhyäy, Amritalal
Netajir Jayajatra. Calcutta : New Book Stall, [19]. 52p.

7. Bandyopädhyäy, Monilal and
Bandyopädhyäy, Rajéndralāl
Tomader Subhasa Candra. Calcutta : H. Chatterjee, 1946.

8. Bandyopadhyay, Shyamadas and
Basu Ray, P.
Viplabi Subhasa Candra. [s.l.] : (s.n.], [1353 b.s.]. 336p.

9. Bangladesh Jatiya Samabay Committee.
Netajir Cintadhara : Bamladesh pariprekshit bhumik
Calcutta : the author, 1971, 16p.

10. Basu, Atul Chandra
Prachyadigante Subhasa. Midnapore : Midnapore Cooperative Press, [1370 b.s.] 50p.

11. Basu, Bimala Kumar
Chotoder Subhasa Candra. Tamluk : the author, 1958. iv, 92p. In verse.

12. Basu, Chitta
Subhasa Candra : itihaser sristi o srasta. 4th ed. Calcutta : Lokmat Prakashani, 1978. 42p.

13. Basu, Jyotiprasad
Netaji O Azada Hind Fauz : an account of the Azad Hind Fauz and its leader Subhasa Candra Basu, Netaji. Calcutta : [s.n.], 1948. 165p.

14. Basu, Krishna
Caranrekha tava. Calcutta : Ananda Publishers, 1982. [vi], 262p.

15. Basu, Krishna
Itihaser Sandhane. Calcutta : Ananda Publishers, 1972. viii, 96p.

16. Basu, Krishna
Prasanga Subhasa Candra. Calcutta : Ananda Publishers, 1993. 176p.

17. Basu, Krishna and Cattopadhyay, J.
Vir vandana. Calcutta : Netaji Research Bureau, 1975. 84p.

18. Basu, Nirmal.
Netaji o jatiya samhati. Calcutta : Lokmat Prakashani, 1989. 14p.

19. Basu, Sankariprasad
Subhasa Candra o nyasanyalplanim. Calcutta : Jayashri Prakashani, 1970. xii. 202p.

20. Basu, Satyendranath
Azad Hind Fauzer sange. Calcutta : Ananda Publishers, [1384 b.s.]. 91p.

21. Basu, Shekhar
Netajir sahadharmini. Calcutta : Ananda Publishers, 1982. 98p.

22. Basu, Sisir Kumar
Anirvan jyoti. Calcutta : Dey's Publishing, 1991. 168p.

23. Basu, Sisir Kumar
Basu-bari. Calcutta : Ananda Publishers, 1985.

24. Basu, Sisir Kumar
Mahaniskraman. Calcutta : Ananda Publishers, 1975.

25. Basu, Subhas Chandra.
Banglar ma o bonder prati. Calcutta : P. K. Paul, 1946. iii, 50p.

26. Basu, Subhas Chandra
Bharat Pathik ; translated by Gouranga Vandyopadhyay ; edited by Sisir Kumar Basu. Calcutta : Netaji Research Bureau, 1966. vii. 147p.

27. Basu, Bubhas Chandra
Bharata pathika : an autobiography of the author. 2nd ed. Calcutta : Signet, [1357 b.s.]. 112p.

28. Basu, Subhas Chandra
Bharater biplaber path. Calcutta : Lokmat Prakashani, 1982. 112p.

29. Basu, Subhas Chandra
Bharater mukti samgram : 1920-1942. Calcutta : Netaji Research Bureau, 1968-70. 2 vols.

30. Basu, Subhas Chandra
Cithi (mejabaudike). Calcutta : Nabarun, 1960. iv. 72p.

31. Basu, Subhas Chandra
Dili calo. Calcutta : Bengal Publishers, 1946. 128p.

32. Basu, Subhas Chandra
Dilli calo. Calcutta : Jayasri Prakashani. 1987. 126p.

33. Basu, Subhas Chandra
Forward Bloc o tar jauktikata. Calcutta : Lokmat, 1982. 33p.

34. Basu, Subhas Chandra
Jatiya mukti samgram o bampantha. Calcutta : Lokmat, 1983. 88p.

35. Basu, Subhas Chandra
Kon pathe ; edited by Sisir Kumar Basu. Calcutta : Patraput. 1973. 2 vols.

36. Basu, Subhas Chandra
Kon pathe. Calcutta : Katha o Kathini, 1974.

37. Basu, Subhas Chandra
Mukti-samgrama ; translated into Bengali by Nirendranath Chakraborty. [Calcutta ; Bengal Publishers, 1953]. iv, 108p.

38. Basu, Subhas Chandra
Netajir bani. Calcutta : Lokmat, 1993. 40p.

39. Basu, Subhas Chandra
Netajir bani : Netajir betar bakirita, bibriti. Calcutta : M. C. Sarkar, 1947. 193p.

40. Basu, Subhas Chandra
Nutanera sandhana. 3rd ed. Calcutta : Gopal Lal Sanyal, 1930. iv, 152p.

41. Basu, Subhas Chandra
Patravali : 1912-1932 ; compiled by Sisir Kumar Bose. Calcutta : M. C. Sarkar, 1964. 308p.

42. Basu, Subhas Chandra
Patravali. Calcutta : Meenakshi, 1966. 288p.

43. Basu, Subhas Chandra
Samagra rachanabali. Calcutta : Ananda Publishers, 1980-87. 3 vols.

44. Basu, Subhas Chandra
Smaraniya baraniya. Calcutta : Jayshree Prakashan, 1985. 93p.

45. Basu, Subhas Chandra
Subhas Bose : 1939-1940 ; translated by Nripen Chakraborty. Calcutta : Forward, 1975. 156p.

46. Basu, Subhas Chandra
Subhasa Candrer cithi. Calcutta : Nabarun, 1960. iv, 72p.

47. Basu, Subhas Chandra
Subhasa rachanavali : edited by Sunil Das. Calcutta : Jayashree Prakashan, 1978-84. 6 vols.

48. Basu, Subhas Chandra
Taruner ahban. Calcutta : Jayashree Prakashan, 1984. 144p.

49. Basu, Subhas Chandra
Taruner swapna. 5th ed. Calcutta : Sriguru Library, 1946. 133p.

50. Basu, Subhas Chandra
Taruner swapna. Calcutta : Ananda Publishers, 1967. iv, 176p.

51. Basu, Shyamal
Netaji sadayantra mamla. Calcutta : Reflect Publications, 1975. 208p.

52. Basu, Shyamal
Subhasa ghare phere nai. Calcutta : Reflect Publications, 1973-77. 3 vols.

53. Basu Ray, Prafulla Ranjan and Banerjee, S.
Viplabi Subhasa Candra. [s.l.] : [s.n.] , [1353 b.s.]. 336p.

54. Beduin
Samakalin Bharatbarsha o Subhasa Candra. Calcutta : Nath, 1988. 226p.

55. Bhattacharya, Kalipada
Azad Hind o Netaji. Calcutta : The Indian Economist Press, 1966. vi, 72p. In verse.

56. Bhattacharya, Prakas
Netaji o quisling prasanga. Calcutta : Priti Prakashani, 1975. 296p.

57. Bhattacharya, Rathindranath (ed.)
Smarane manane Subhasa Candra. Calcutta : Vivekananda Pathagar, 1970. 412p.

58. Bhattacharya, Rathindranath (ed.)
Subhasa subhasita. Calcutta : Printer's Forum, [19]. 58p.

59. Bhattacharya, Usha Ranjan
Netajike Lal Kellay hatya. Calcutta : International Books, 1993. 222p.

60. Bhowmik, Binod Mohan
Bapuji—Netaji keno virodh. Calcutta : New wave, 1987. 123p.

61. Bhowmik, Dhiren
Itihaspurush mahanayak Netaji. 2nd. ed. Calcutta : Nirvik, 1978. 112p.

62. Bhowmik, Gopal
Netaji. Calcutta : Shree Publishing, [1946]. [viii], 164p.

63. Bisi, Sailendranath
Subhasa—smriti. Calcutta : Sisir Publishing House, [19]. 128p.

64. Biswas, Biswa
Netaji Subhasa Candra. Calcutta : Biswas Publishing House, 1969. [iv]. 83p.

65. Biswas, Biswa
Subhasa Candra. 3rd. ed. Calcutta : Biswas Publishing House, 1382 [b.s.]. 298p.

66. Chakrabarti, Alok Krishna
Caram muhurte Netaji. Calcutta : S. R. Publications, 1989. 92p.

67. Chakrabarti, Alok Krishna
Shoulmarir Sadhu ki Netaji ? Calcutta : S. R. Publications, 1987. 182p.

68. Chakrabarti, Alok Krishna
Shoulmarir Sadhu ki Netaji ? Calcutta : Dey Book Store, 1988. 184p.

69. Chakrabarti, Alok Krishna
Srutinatye Netaji-jivan rahasya. Calcutta : S. R. Publications, 1995. 98p.

70. Chakrabarti, Amalendu
Netajir cintadhara. Calcutta : the author, 1967. 12p.

71. Chakrabarti, Narendra Narayan
Netaji sanga o prasanga. 2nd ed. Calcutta : Granthaprokash, 1965. x, 387p.

72. Chakrabarti, Ranjit
Sagnik Subhas Candra. Calcutta : Mahabodhi, 1991. 73p.

73. Chakrabarti, Sadananda
Oi mahanayak elo. Calcutta : Lokmat Prakashani, 1989. 14p. In verse.

74. Chakrabarti, Subodh
Netaji : Home front. 2nd ed. Calcutta : Jogmaya Prakashani, 1988. vol. 1.

75. Chakrabarti, Subodh (ed.)
Subhasa Smriti-katha. Calcutta : Aditya Prokashalay, 1979. 128p.

76. Chakrabarti, Sukhamay
Bapuji-Netaji. Calcutta : Kamal Das, [19]. 54p.

77. Chakrabarti, Sukhamay
Dui mahanayak : Subhasa Candra o Mujibar Rahaman. Calcutta : Agragami Sangha, 1972. 16p.

78. Chakrabarti, Tarini Sankar
Azad Hind Fauz. Calcutta : Hindusthan Book Depot, 1945. 2 vols.

79. Charanik
Oi mahamanav ase. Calcutta : Jayashree Prakashan, 1973. viii, 260p.

80. Chattopadhyay, Asit Kumar
Netaji Subhasa Candra. Calcutta : Golap Publishing House, 1946.

81. Chattopadhyay, Bhavani Prasad
Bharater swadhinata samgrame Gandhiji o Netajir bhumika : 1918-48. Nadia : Sadhana Prakashani, 1992. 496p.

82. Chattopadhyay, Bhavani Prasad
Vyakti vanam vyaktiva : Gandhi o Netaji. Calcutta : Prodyut Chatterjee, 1978. viii, 280p.

83. Chattopadhyay, Nripendra Krishna
Subhasa Candra. Calcutta : P. K. Bose, 1952. 242p.

84. Chattopadhyay, Sabitrai Prasanna
Jvalanta talowar : poems. Calcutta : [s.n.], 1951. 10, 118p.

85. Chattopadhyay, Sabitri Prasanna
Subhasa Candra o Netaji Subhasa Candra. Calcutta : Jayashree Prakashan, 1986. 236p.

86. Chattopadhyay, Sabitri Prasanna
Subhasa Candra o Netaji Subhasa Candra. Calcutta : Nalanda Press, 1946. viii, 340p.

87. Chattopadhyay, Sacinandan
Netaji guru Desavandhu. Calcutta : Indian Associated, 1970. vi, 121p.

88. Chattopadhyay, Sacinandan
Netaji Subhasa. 7th ed. Calcutta : Indian Associated, 1966. 120p.

89. Chattopadhyay, Subhasa Candra
Gandhiji o Netaji. Burdwan : the author, 1949. iv, 82p.

90. Chaudhuri, Hena
Netajir galpa sono. Calcutta : Kalikata Pustakalay, 1973. viii, 102p.

91. Chaudhuri, Nirmal Chandra
Netaji Subhasa. Calcutta : the author, 1949. xii, 44p.

92. Damrudhari (pseud)
Rahasyapurus Netaji. Kharagpur : Sadhan Banerjee, 1978. iv, 130p.

93. Das, Adityanath
Netajir vayavaha kahini. Calcutta : Mahajati Sahitya Mandir, 1951.

94. Das, Bisweswar
Rashtrapati Subhasa Candra. Calcutta : Sri Guru Library, [1939]. ii, 182p.

95. Das, Purna Chandra
Netaji Subhasa. Calcutta : General Library, 1950. 52p.

96. Das, Ramen
Azad Hinder shesh larai, Calcutta : Moushumi Sahitya Mandir, 1397 [b.s.]. 200p.

97. Das, Sisir
Mahanayak Netaji Subhasa Candra. Calcutta : the author, 1968. xxviii, 396p.

98. De, Biswanath
Subhasa smriti. Calcutta : Nirmal Book Agency, 1975. 298p.

99. De, Biswanath (ed.)
Subhasa smriti. Calcutta : Sahityam, 1993. viii, 215p.

100. De, Biswanath (ed.)
Subhas smriti. Calcutta : Sahityam, [1377 b.s.]. 304p.

101. De, Mrityunjay
Netaji Subhasa. Calcutta : M. Dey, 1948. ii, 32p.

102. De, Sailes
Ami Subhasa balchi. 4th ed. Calcutta : Rabindra Library, 1969. 3 vols. Akhanda edition (3 vols. in 1) published by Visvavani Prakashani in 1985.

103. De, Sailes
Gandhiji o Netaji. Calcutta : Rabindra Library, 1977. viii, 352p.

104. De, Sailes
Raktakta Imphal. Calcutta : Puna, 1988. 210p.

105. Devi, Amita
Netaji Subhasa Candra. Calcutta : Dev Sahitya Kutir, 1270 [b.s.]. 95p.

106. Devi, Amita
Netaji Subhasa Candra. Calcutta : Kalpana Sahitya Mandir, [19]. 123p.

107. Dhar, Dhirendralal
Subhasa Candra. Calcutta : the author, [19]. 40p.

108. Gangopadhyay, Subodhchandra
Subhasa Candrer chatrajivan. Calcutta : Sasvati Pathagar, 1957. 124p.

109. Ghosal, Chitta Ranjan
Mrtyumjayee Subhasa Candra, Calcutta : Shilalipi, 1979.

110. Ghosal, Krishneswar
Subhasa manan samdhane. Calcutta : Jayashree Prakashan, 1981. 200p.

111. Ghosh, Asok (ed.)
Dwitiya viswajuddha o Netaji : an evaluation. Calcutta : Lokmat Prokashani, 1988. 114p.

112. Ghosh, Monoranjan
He mahapathik : unmesh parba. Calcutta : Firma Labonya Jyoti, 1382 [b.s.]. 123 13p.

113. Ghosh, Monoranjan
Taihoku theke Bharat. 2nd ed. Calcutta : Firma Labonya Jyoti, [19]. 582p.

114. Ghosh Pabitra Kumar
Subhasa Candra. Calcutta : Jayashree Prakashan, 1969-74. 3 vols.

115. Ghosh Prabir Kumar
Subhasa Candra. Calcutta : Jayashree Prakashan, 1974. 330p.

116. Ghosh, Samir (ed.)
Azad Hind Fauzer kahini. Calcutta : Ratnakar Publishing House, 1946. iv, 60p.

117. Ghosh, Sudhansuranjan
Sabar priya subhasa. Calcutta : Tuli-Kalam, 1970. [vi]. 399p.

118. Goppi, Aparajita and Sarkar, J. (eds.)
Subhasam. Calcutta : Lokmat, 1989. 96p.

119. Goswami, Sourendramohan
Netaji rahasya sandhane. Calcutta : the author, 1954. vi, 66p.

120. Guha, Asok
Bastabbadi Netaji. Calcutta : Lokmat Prokashani, [1982]. 7p.

121. Guha, Mahendranath (ed.)
Bangalir prativa o Subhasa Candra. Calcutta : the author 1946. 137p.

122. Guha, Samar
Netajir mata o patha. Calcutta : [s.n.], 1948. 8, 186p.

123. Guha, Samar
Netaji mrta na jivita. Calcutta : Bengal Publishers, 197. [xi], 146p.

124. Guha, Samar
Netajir svapna o sadhana. Calcutta : Calcutta Book House, [1982]. 203p.

125. Guha, Samar
Rabindranather dristite Subhasa Candra. Calcutta : Jayashree Prakashan, 1991. 115p.

126. Guha Dey Sharma, Satis Chandra
Amader Netaji. Calcutta : [s.n.]. 1356 [b.s.] 102p.

127. Gupta, Subrata
Subhasa Candrer arthanaitik cinta. Calcutta : Modern Column, 1986. 135p.

128. Khan, Shah Nawaj
Azad Hind Fauz o Netaji. Calcutta : Chakraborty, Chatterjee, 1980. xii, 530p.

129. Khan, Umapada
Netajir padakshepa. Calcutta : General Printers Publisher, 1952. 65p.

130. Kushbahakant
Bidrohi Subhasa. Varanasi : Bharat Pocket Books, [19]. 184p.

131. Lahiri, Prafullachandra
Subhasa alekhya. 2nd ed. Calcutta : A. Mukherjee, 1951. ii, 46p.

132. Maikap, Satis Chandra
Bahniman Netaji Subhasa. Calcutta : Naya Prokash, 1987. xxii, 373p.

133. Maitra, Haridas
Vir Subhasa. Calcutta : the author, 1948. viii, 71p.

134. Majumdar, Bijayratna
Azad Hinder ankura. Calcutta : New Age, [1945]. [vi], 171p.

135. Majumdar, Mohitlal
Jayatu Netaji. Calcutta : General Printers, 1353 [b.s.]. 175p.

136. Majumdar, Nepal
Rabindranath o Subhasa Candra. Calcutta : Saraswat Library, 1968. [x], 271p.

137. Majumdar, Pranab Chandra
Subhasavader a a ka kha. 2nd ed. Calcutta : Kendriya Subhas Senadal, 1954. iv, 12p.

138. Majumdar, Pranab Chandra
Subhasa Candrer vajravani. Howrah : Subhasade Sahitya Samsad, 1951. 2 vols.

139. Mitra, Kautilya
Swamiji—Netajir bhabnay juba samaj. Calcutta : Sales Alliance, 1984. 80p.

140. Mitra, Sudhir Kumar
Amader Netaji. Calcutta : Sri Guru Library, [19].

141. Mukhopadhyay, Anukul Chandra
Netaji Subhasa. Batanagar : the author, [19]. ii, 52p.

142. Mukhopadhyay, Balai Chand
Satyanisthay ananya Netaji charitra. Calcutta : Netaji Research Bereau, 1968. 30p.

143. Mukhopadhyay, Debabrata
Subhasa Candrer svapna. Calcutta : S. R. Publications, 1991. 92p.

144. Mukhopadhyay, Dinesh
Netaji Subhasa Candra. Calcutta : Kamala Book Depot, 1946. 311p.

145. Mukhopadhyay, Kananvihari
Chotoder Subhasa Candra. Calcutta : the author, [19]. 48p.

146. Mukhopadhyay, Nanda
Germanir chokhe Netaji ; translated from English by Anjali Sengupta. Calcutta : Granthaprokash, 1385 [b.s.]. 183p.

147. Mukhopadhyay, Nanda
Subhasa Candra o Britishraj ; translated from English by H. Sarkar. Calcutta : Modern Column, 1986. 230p.

148. Mukhopadhyay, Nanda
Subhasa Candra o Natsi sarkar. Calcutta : Jayashree Prakashan, 1994. 214p.

149. Mukhopadhyay, Nanda
Vivekanandar aloy Subhasa. Calcutta : Modern Column, 1990. 127p.

150. Mustafi, Ashok
Subhasa Candra p Brahmadesh. Calcutta : Subhasa School of Political Studies, [1978]. 68p.

151. Nag, Hiten
Ananya Netaji. Calcutta : Pioneer, 1989. 93p.

152. Nag, Sujit Kumar
Mahanayak Subhasa Candra. Calcutta : Aditya Prokashalay, 1970. 115p.

153. Nair, A. M.
Japane Bharatiya swadhinata samgrami. Calcutta : Subarnarekha, 1986. 439p.

154. Nandi, Hirendra Nath
Netaji o Bharater asamapta biplab. Tripura : Naba Chandana, 1988. 2 vols.

155. Pradhan, Sudhi
Subhasa Candra, Bharat o akshyasakti. Calcutta : People's Book Society, 1994. 412p.

156. Rakshit, Nirmalendu Bikash
Subhasa Candra : Haripura theka Ramgarh. Calcutta : Ratna, 1980. 132p.

157. Rakshit, Nirmalendu Bikash
Subhasa Candrer antardhan o tar pratikriya. Calcutta : Ratna, 1982.

158. Rakshit, Nirmalendu Bikash
Subhasa Candra o Russia. Calcutta : Ratna, 1984. 127p.

159. Ray, Anil
Netajir jivanvad. 4th ed. Calcutta : Jayashri Prakashan, 1973. [xxvi], 92p.

160. Ray, Anil
Netajir jivanvad. 4th ed. Calcutta : Presidency Library, [19]. 106p.

161. Ray, Dilip Kumar
Amar bandhu Subhasa. Calcutta : Mitralay Gouri Shankar Bhattacharjee, 1966. 2 vols.

162. Ray, Pabitra Mohan
Netajir secret service : edited by Debashis Bandyopadhyay. Calcutta : Prantik, 1980. 03p.

163. Ray, Phani Bhusan and Bagci, Moni
Sarvadhinayak Subhasa Candra. Calcutta : Book stand. 1946 viii, 67p.

164. Saha Ray, Robidas
Amader Netaji. Calcutta : Dev Sahitya Kutir, 1971. 130p.

165. Sakuni
Netaji kothay. Calcutta : Prodyut Kumar Das, [1973]. x, 70p.

166. Sanyal, Diptendra Kumar
Shoulmari asramer rahasya. Calcutta : Vak Sahitya, 1964. 144p.

167. Sanyal, Diptendra Kumar
Subhasa Candra. Calcutta : Monikotha, 1961. 90p.

168. Sanyal, Gopal Lal
Te kather shesh nai. Calcutta : Jayashree Prakashan, 1985. 267p.

169. Sanyal, Narayan
Ami Netajike dekechi : pratyaksyadarsira javanbandi. Calcutta : Anandadhara Prakashan, 1971. [xvi], 510p.

170. Sanyal, Narayan
Netaji rahasya Sandhane. Calcutta : Anandadhara Prakashan, 1970. iv, 304p.

171. Saptavanhi
Gananayak Subhasa Candra. 2nd ed. Calcutta : Radha Pustakalay, 1973, 116p.

172. Sarkar, Abhijit
Taihoku theke Bharate. 2nd ed. Calcutta . Dey's Publishing, 1971. [viii], 450, 84p.

173. Sarkar, Abhijit
Taihoku theke Bharate : Netajir abasthan rahasya. Calcutta : Pharma Labonya Jyoti, 1973. [xxiv], 498, 68p.

174. Sarkar, Hemanta Kumara
Subhasa Candra. Calcutta : D. M. Library, 1991. 99p.

175. Sarkar, Hemanta Kumara
Subhaser sange baro bachar. Calcutta : [s.n.], 1949. viii, 152p.

176. Sarkar, Kalipada
Itihaspurush Netaji. Calcutta : Rupa, 1980. [xvi]. 248, [87]p.

177. Sarkar, Samar
Janagana adhinayak. Calcutta : H. Sarkar, 1947. [vi], 113p.

178. Sarkar, Sudhir
Deshgaurav Subhasa Candra. Calcutta : Sarkar, 1939. 2. 124p.

179. Sarvadhikary, Mrinal Chandra
Netaji Subhasa Candra. Calcutta : Bharat Sahitya Bhaban, 1946.

180. Sen, Amulya Bhusan
Subhasa Netaji. Calcutta : Jatiya Sahitya Prokash, 1984. 310p.

181. Sen, Hemendra Vijay
Netaji Subhasa Candra. Calcutta : Dev Sahitya Kutir, 1363 [b.s.]. 160p.

182. Sen, Monoranjan
Bharater swadhinata sangrame Gandhiji o Netajir bhumika : 1918-48. Krishnanagar : Sadhana, 1992.

183. Sen, Nikunja
Netaji o Marxvad. Calcutta : P. R. Kundu, 1954. ii, 48p.

184. Sengupta, Acinta Kumar
Udyata kharga. Calcutta : Anandadhara Prakashan, 1965. 3 vols (in one).

185. Sengupta, Barun
Netajir antardhan rahasya. Calcutta : Ananda Publishers, 1975. [vi], 87p.

186. Sengupta, Pyarimohon
Joy Subhas. Calcutta : [s.n.], 1352 [b.s.].

187. Sengupta, Sambhu
Netaji Subhasa Basur bhagya. Calcutta : the author, 1946. iii, 11p.

188. Singh, Durlav
Vidrohi Rashtrapati ; translated from English by Anil Bhanja. Calcutta : Lokmat Prokashani, 1990. 110p.

189. Singha, Madan Mohan
Antarjatik rajniti, jatiya sankat o Netaji. Durgapore : [s.n.], 1371 [b.s.].

190. Singha, Madan Mohan
Rajnitir ghurnabarte Netaji Subhas. 2nd ed. Calcutta : Susila Rani Sinha, 1982. [viii], 140p.

191. Singha, Satyanarayan
Netaji rahasya. Calcutta : Granthaprakash, [196]. iv, 116p.

192. Singha, Satyanarayan
Rahasyer antarale. Calcutta : Granthaprokash, [19]. 116p.

193. Sri-Juddhajit (Pseud)
Subhasraj. West Bengal : Book Bank, 1976. 136p.

194. Swami Nirbanananda
Subhasvad—Vivekvad. Nagaland : Satya ghatana ebong rahasya udghatan Committee, 1988. 206p.

195. Talvar, Bhagatram
Ami Netajir antardhane sangi chilam ; translated from English by Murari Mohan Sen. 2nd ed. Calcutta : Nabapatra, 1978. 327p.

196. Talvar, Bhagatram
Subhasa Candrer antardhan. Calcutta : Chalti Duniya Prakasani, 1971. viii, 82p.

197. Toye, Hugh
Vyaghraketan : Subhasa Candra Basur karma o jivan ; translated by Subhas Mukhopadhyay. Calcutta : Allied Publishers, 1960. xx, 300p.

198. Uttamcnad
Subhasa Candrer antardhan kahini. Calcutta : M. C. Sarkar, [1353 b.s.]. 144p.

॥ ডাক ॥

সুভাষবাদী জনতার প্রচারিত 'ডাক' বুলেটিন থেকে একটি—

—সংবাদ সমীক্ষা—

আনন্দবাজার পত্রিকা, শেষ শহর সংস্করণ, ৩রা জুন ১৯৬৪।

শ্রীঅতুল্য ঘোষের ভবনে শাস্ত্রীজী

[বিশেষ সংবাদদাতা]

নয়াদিল্লী ২রা জুন—শাস্ত্রীজী আজ সন্ধ্যার আগে হইতে ঠিকঠাক না করিয়া একজনের ভবনেই যান,—**সেই একজন শ্রীঅতুল্য ঘোষ।**

*　　*　　*　　*

সাংবাদিক বৈঠকে শাস্ত্রীজী

[বিশেষ সংবাদদাতা]

নয়াদিল্লী, ২রা জুন—ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে নির্বাচিত শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন,.....

'আত্মগোপনকারী নেতাদের সহিত আলোচনা।'.....

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

*　　*　　*　　*

যুগান্তর, ১০ই জুন, ১৯৬৪, কলিকাতা সংস্করণ

শাস্ত্রীজীর নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ

[দিল্লী অফিস হইতে]

৯ই জুন—আজ বেলা সাড়ে এগারোটায় রাষ্ট্রপতি ভবনে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর নেতৃত্বে নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রানুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

*　　*　　*　　*

যুগান্তর, কলিকাতা সংস্করণ, ১০ই জুন, ১৯৬৪

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন

[বিশেষ সংবাদদাতা]

৯ই জুন—রাজধানীতে প্রায় দুই সপ্তাহ অবস্থানের পর শ্রীঅতুল্য ঘোষ আজ সকালের বিমানে কলিকাতা যাত্রা করেন।

*　　*　　*　　*

আনন্দবাজার পত্রিকা, শেষ শহর সংস্করণ, ১০ই জুন ১৯৬৪

প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠক বাতিল

নয়াদিল্লী, ৯ই জুন—আজ অপরাহ্ণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর এক সাংবাদিক বৈঠকের কথা ছিল কিন্তু তাহা হয় নাই। বৈঠক বাতিল করার কারণ বলা হয় নাই।

পি. টি. আই

আনন্দবাজার পত্রিকা, শেষ শহর সংস্করণ, ১১ই জুন ১৯৬৪

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর বেতার ভাষণ

নয়াদিল্লী, ১০ই জুন—প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আগামীকাল ১১ই জুন রাত্রি ৮-৩০টায় জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দিবেন।.....

*　　*　　*　　*

আনন্দবাজার পত্রিকা, শেষ শহর সংস্করণ, ১১ই জুন—১৯৬৪

প্রফুল্ল সেন-অতুল্য ঘোষ আলোচনা

প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ব্যস্ততা

(স্টাফ রিপোর্টার)

বুধবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন এবং কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রায় আধ ঘণ্টা একান্ত সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। প্রকাশ উভয়ের মধ্যে দিল্লীর ব্যাপার ছাড়াও এই রাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয়।

শ্রীঘোষ এইদিনই পূর্বাহ্নে দিল্লী হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।.....

—অবশেষে—

আনন্দবাজার পত্রিকা, শেষ শহর সংস্করণ, ১৩ই জুন, ১৯৬৪, নবম পৃষ্ঠা, ৩য় ও ৪র্থ কলম।

ভারতের নূতন প্রধানমন্ত্রী

প্রথম দর্শন

আলিপুরদুয়ার, ১০ই জুন—এক জরুরী টেলিফোনবার্তায় আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল—আসিবেন আলিপুরদুয়ার জংশনে শেষরাত্রির ট্রেন এটেন্ড করি। যথাসময়ে ট্রেন আসিল। কামরা হইতে অবতরণ করিলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। কামরার সামনে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গীদের সাথে কথাবার্তা হইতেছিল এমন সময় আমাদের পাশ দিয়া পাশের কামরা হইতে নামিয়া এক খর্বাকায় ব্যক্তি হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছেন। গায়ে খদ্দরের গলাবদ্ধ কোট, হাতে একটা ব্যাগ; চেহারা ও চলনে সাধাসিধে ভাব। আমার এক সঙ্গীকে দেখাইয়া বলিলাম—ভদ্রলোককে দেখিতে অনেকটা লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মত। সঙ্গীরা বলিলেন—অবিকল তারই মত দেখিতে। শ্রীদাশগুপ্ত বলিলেন—আসুন এনার সঙ্গে আপনাদের আলাপ করাইয়া দিই।

পরিচয় ঘটিল। কোট পরা ভদ্রলোক দুই হস্তে করজোড়ে আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে হ্যান্ডসেক্ করিলেন, পরিচয় জানিলেন, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দুই মিনিটের মধ্যে আমরা এত অন্তরঙ্গ হইয়া গেলাম যেন তাঁহার সঙ্গে আমাদের বহুদিনের পরিচয়। সহজ সরল বেশভুষা অকৃত্রিম সৌজন্য, বিনয়, নিরহঙ্কার ও নিস্পৃহ ভাব। ভদ্রলোক অকৃত্রিমতা ভরা কণ্ঠে বলিলেন—"বড়িয়া বড়িয়া সব আদমী"... । হায়রে বড়িয়া বড়িয়া সব আদমী? এই ভদ্রলোকের মধ্যে আর আমার মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাৎ। ভদ্রলোকের গণসংযোগের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিলাম। মুখে বিরাট এক ব্যক্তিত্বের ছাপ পরিদৃষ্ট। দুই মিনিটের আলাপের পরই মনে হইতেছিল—সারা প্লাটফরমের দুই সহস্র লোকের মধ্যে এই ভদ্রলোকই যেন আমার সর্বাধিক নিকট আত্মীয়।

শ্রীদাশগুপ্ত আমাদের বলিলেন—ইনি যে আমাদের সঙ্গে আসছেন সে খবর তাহলে পাননি : উত্তর দিলাম—না।

এই ভদ্রলোকটিই বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী।

আমাদের কথা

★ ৯ই জুন অপরাহ্নের পূর্বঘোষিত সাংবাদিক সম্মেলন প্রধানমন্ত্রী কেন বাতিল করিলেন? বাতিলের কারণ জানাইলেন না কেন? বাতিল করিয়া কোথায় ছিলেন?

★ ২রা জুন প্রধানমন্ত্রী শুধু শ্রীঅতুল্য ঘোষের ভবনেই কেন গেলেন?

★ দিল্লী হইতে কলিকাতা আসিতে বিমানে কত সময় লাগে? শ্রীঘোষ ৯ই জুন সকালের বিমানে দিল্লী হইতে রওনা হইয়া ১০ই জুন পূর্বাহ্নে কলিকাতা পৌঁছাইলেন কেন? এই দীর্ঘ সময় তিনি কোথায় ছিলেন?

★ ২রা জুন সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী "আত্মগোপনকারী নেতাদের সহিত আলোচনা" বলিতে কী বোঝাইতে চাহিতেছেন?

★ ৯ই জুন বেলা সাড়ে এগারোটায় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শাস্ত্রীজী শপথ গ্রহণের পর ১১ই জুন রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায় বেতার ভাষণ দিয়াছেন, ইহার মধ্যবর্তী সময়ে তাঁহার কী কর্মসূচী ছিল? কোথায় ছিলেন তিনি?

★ ৯ই জুন অধিক রাত্রিতে শাস্ত্রীজী ও শ্রীঅতুল্য ঘোষ আলিপুর দুয়ার জংশনে নামিয়া কোথায় গিয়াছিলেন?

★ আলিপুরদুয়ার হইতে শৌলমারি কতদূর?

Published by Sri Biswajit Dutt, Secy General, All India Subhasbadi Janata from 51/1. College Street. Cal-12 and Printed by him from Printing Centre 21/1, Budna Ostagur Lane. Cal-9

VISWA HINDU VARTA * Post Regd. No WB/RNP-171 * 16ths June. 2000
* Regd. No. 30136/77 * Price : 4.00 only.

ভারত সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের ভবিষ্যদ্বাণী

○ **অধ্যাপক কিরো (ইংল্যাণ্ড) ঃ** অনেক সংগ্রামের পর ভারত আবার উঠে দাঁড়াবে। এক দেব মানব আবির্ভূত হবেন ভারতে এবং তিনি সকল ধর্মানুরাগী ব্যক্তিগণকে সংগঠিত করবেন অধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য।

খ্রীস্টিয় ২০০০ সাল নাগাদ ধর্ম আন্দোলন পাদপ্রদীপের আলোতে উদ্ভাসিত হবে। তারপর থেকে প্রেম, মৈত্রী, দয়া, সততা, নিঃস্বার্থতা এবং সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

○ **জিন ডিক্সন (আমেরিকা) ঃ** প্রখ্যাত নারী ভবিষ্যদ্বাণীকারিকা ভারতে এক মহান আত্মার আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করেছেন, তিনি আসবেন গ্রামীণ পরিবার থেকে, যিনি আধ্যাত্মিক বিপ্লব ঘটাবেন। তাঁর শক্তিশালী নেতৃত্ব একটি শক্তিশালী গভর্ণমেন্টের সমান হবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে আমেরিকার উপর চীনের পারমাণবিক আক্রমণের দ্বারা। আমেরিকা এবং রাশিয়া যুক্তভাবে চীন আক্রমণ করে চীনের শক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে।

○ **অ্যাণ্ডারসন (আইওয়া, আমেরিকা) ঃ** অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভবিষ্য বক্তা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, চীন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করবে এবং আমেরিকা ও রাশিয়া যুক্তভাবে তাকে বাধা দেবে। ভয়ংকর যুদ্ধ এবং রক্তপাত ঘটবে আরব দেশগুলিতে। এই বিশেষ সময়ে ভারতে আবির্ভূত হবেন একটি গ্রামে এক বিরাট ব্যক্তিত্বময় পুরুষ, যিনি শুধু ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে তাঁর ধার্মিক শক্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁর সাংগঠনিক শক্তি শক্তিশালী সরকারগুলির শক্তিকেও অতিক্রম করবে। তিনি বিশ্ব সংবিধান প্রণয়ন করে একটি বিশ্ব সরকার, একটি বিশ্বভাষা, একটি বিশ্ব সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়, এক বিশ্ব পতাকার রূপায়ণ করবেন। তাঁর সর্বোচ্চ শক্তির অধীনে সমগ্র মানব সমাজ অনুশাসিত হবে। নীতিমূলক আইন, নিরপেক্ষ বিচার, সেবা ও দয়ার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। হত্যা, ডাকাতি, অনাচার, চুরি ইত্যাদি অনেক হ্রাস পাবে। এই পরিবর্তনগুলি আসবে ২০০০ সালের পর তারপর হাজার বছর ধরে মানব সমাজ সুখশান্তিতে জীবন যাপন করবেন। ভারতের এই সর্বোচ্চ অবতারের দ্বারা প্রচারিত 'ধর্ম' সারা বিশ্ব গ্রহণ করবে।

○ **জেরাল্ড ক্রোইস (হল্যাণ্ড) ঃ** এই শতাব্দীর ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যবক্তা হল্যাণ্ডের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বেশীর ভাগ ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হয়েছে। তিনি ভবিষ্যবাণী করেছেন যে, ভারতে এক মহাপুরুষের জন্ম

হবে যিনি সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য একটি রূপরেখা করবেন। এই সময় পৃথিবীতে এক ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হবে এবং বহু দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। হাজার হাজার মানুষ সারা দেশে যজ্ঞ করবেন এবং হোমাগ্নি-এর পূত ধূমে আবার আকাশ-পরিবেশ দূষণ লাঘব হবে এবং সমগ্র বিশ্ব তাঁর নির্দেশ পালন করবে। বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে ২০০০ সালের পর।

❍ **আর্থার চার্লস ক্লার্ক (আমেরিকা) ঃ** জগদ্‌বিখ্যাত ভবিষ্যবক্তা আর্থার চার্লস ক্লার্কও তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছেন যে, ভারতে এক ধর্মবিপ্লব আসবে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হবে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি। "ভারতীয় ধর্ম' গৃহীত হবে "বিশ্বধর্ম" বলে। এই সকল বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হবে ২০০০ সালের পর।

❍ **অধ্যাপক হারার (ইজরায়েল) ঃ** নতুন যুগের সূচনা হবে এবং ভারতে জন্ম নেবেন এক দৈবী পুরুষ। তিনি পৃথিবীর মানুষকে দুঃখ, অবিচার, হিংসা এবং অপরাধ থেকে মুক্ত করবেন। সমগ্র মানব সমাজ সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। এই ভারতীয় দৈবী পুরুষ একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব সম্পন্ন করবেন সমগ্র এশিয়ায়, পরে সমগ্র বিশ্বে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। সমগ্র মানব সমাজ তাঁর উদার লোকোত্তর নীতি গ্রহণ করবে। আরব দেশে এক ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হবে, যার ফলে সমগ্র ইসলামিক সভ্যতা বিনষ্ট হবে।

এই বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া ও চীন পরস্পরের প্রতিপক্ষ হবে; চীন জীবাণু যুদ্ধ শুরু করবে; শেষে রাশিয়া চীন দখল করবে; তিব্বত হবে মুক্ত। হিমালয়ের কোলে গোপন ঐশ্বর্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভারত সারা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দান করবে। একটি অল্পজ্ঞাত ভাষা বিশ্বভাষা রূপে গৃহীত হবে। এই সব বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে ২০০০ সাল নাগাদ।

(সৌজন্য—দি হেরিটেজ, মার্চ ২০০০, গৌহাটি)

কিছু অবশ্য জ্ঞাতব্য জরুরী তথ্য ঃ

সুপ্রিম ন্যায়ালয়ের আদেশনামার নকলের অংশ বিশেষ :

এখানে কিছু তথ্যসূত্র সংযোজন করা হল, যার দ্বারা মানুষের কিছু কিছু কৌতূহল দূরীভূত হবে বলে আশা করা যেতে পারে।

(১) ভারতবর্ষের উচ্চতম ন্যায়ালয় ১৯৯৭ সালের ৪ঠা আগস্ট এক আদেশনামায় ঘোষণা করেছিলেন যে 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু'—আর বেঁচে নেই কিম্বা মৃত এ কথা ভারতবর্ষে কেউ বলতে পারবে না। এই ঘোষণা হয়েছিল সুপ্রিমকোর্টের মাননীয় আইন ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বিজন ঘোষের রুজু করা একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে মরণোত্তর ভারতরত্ন প্রদানকল্পে যে ভারত সরকার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিল, তার প্রেক্ষাপটেই বিজন ঘোষের ঐ মামলা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে। সেই মামলার যে ঐতিহাসিক রায় মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয় ঘোষণা করেছিল—সেই রায়েরই অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃতি দেওয়া হল সর্বসাধারণের কৌতুহল নিবৃতার্থে।

বিজন ঘোষ ভারসেস্ গভঃ অব ইণ্ডিয়া মামলার রায়ের অংশবিশেষঃ

"In view of the sentiments expressed by the members of public and the family members of Netaji Subhas Chandra Bose in connection with the press communication the Government of India did not proceed further in the matter. In that affidavit which is filed in these proceedings. They have stated that the matter was treated as closed. The original petitioner have expressed that anguish at the statement made on affidavit by the Government of India have submitted the award press communication should be withdrawn."

—সুপ্রিমকোর্টের প্রকাশিত রায়ের অংশের ট্রু কপি

(২) **সম্পূর্ণ মন্দিরটি যখন ভস্মীভূত হয়ে গেল তখন সেই ভগ্নস্তূপে শুধুমাত্র নেতাজীর 'ভস্ম'ই আবার 'আবিষ্কৃত' হল ডি এন এ পরীক্ষার ধুয়ো তোলবার জন্য? যুক্তিবাদীরা কি বলেন?**

রেনকোজি মন্দির ভস্মীভূত

টোকিও ৪ সেপ্টেম্বর (ডি.পি.এ.)ঃ এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে জাপানের ৩৪৫ বছরের পুরোন ঐতিহাসিক রেনকোজি বৌদ্ধমন্দিরটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। আজ পুলিশ সূত্রে এই খবর জানানো হয়। পুলিশ তরফ থেকে জানানো হয়, এই দুর্ঘটনায় কেউ আহত হন নি। জানা গেছে খুব ভোরের দিকে এই আগুন লাগে। (দৈনিক বর্তমান, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯)

(৩) **চিতাভস্মের ডি. এন. এ. পরীক্ষা কি আদৌ সম্ভব?**

বিজ্ঞানের মুখোশের আড়াল এক অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ভারতবাসীর ওপর চাপিয়ে

দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয় দেশজুড়ে নেতাজী জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে।

নেতাজীর 'প্রেম', 'বিবাহ' ও 'মৃত্যু' কাহিনীর ফেরিদার দু-একজন 'সাংবাদিক' নামধারী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি জনমতকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াসে টোকিওতে রেনকোজি মন্দিরে 'চিতাভস্ম'-এর ডি. এন. এ. পরীক্ষার দাবি তোলে। সন্তর্পণে তাঁরা প্রচার করে ওই চিতাভস্মের ভিতর নেতাজীর একটি সোনা বাঁধান দাঁত অক্ষত অবস্থায় আছে। বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সুকৌশলে বিভ্রান্ত করতে প্রথম দিকে তাঁরা আংশিক সফল হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। জাতীয় নেতাজী জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটিকে নরসিমা সরকার কৌশলে নেতাজীর 'ভস্ম' আনার কমিটিতে রূপান্তরের অপচেষ্টা শেষ মুহূর্তে ভেস্তে যায়। শতবর্ষ উদ্‌যাপনের কর্মসূচী এক বছর পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয় তারা। উল্লেখ্য, নেতাজী শতবর্ষেই দিল্লীর প্রধান মন্ত্রীর আসন তিনবার ফাঁকা হয়। চিতাভস্ম প্রসঙ্গ শেষ করার আগে ডি. এন. এ. টেস্টের দাবি কতটা ভিত্তিহীন তার সমর্থনে বিশেষজ্ঞের মতামত তুলে ধরছি।

তবে এ 'চিতাভস্ম' কার?

EXPERT OPINION

DNA TESTING & NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE

Dr. Madhusudan Pal

Subject : DNA testing of composit specimen of alleged human ash with a piece of gold and one tooth, kept in Renkoji Budhist temple, Tokyo to prove that those are of Netaji Subhas Chandra Bose.

What is DNA : Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) controlls the formation of another nucleic acid, ribonucleic and (RNA) which spreads throughout the cell and controlls the formation of different proteins and thereby all functions of cell. The basic building blocks of DNA include phosphoric acid, a sugar called deoxyribose and four nitrogenous bases (two purines, adenine and guanine and two pyrimidines, thymine and cytosine). It's molecular weight is measured in millions.

Where DNA is present : DNA is mainly present in chromosomes situated inside nucleus and in small amount in mitochondria and ribosomes located in cytoplasm.

How DNA is collected for DNA testing : Nucleated cells are the source of DNA, Blood, Semen, Vaginal epithelium, tooth

pulp, bone marrow, hair roots, muscle, skin, mucous membrane etc. are used for this. At least 1 ml. and preferably 5 ml of blood are taken into an EDTA tube. Autopsy tissue at least 2 gms from parenchymal organ is needed for DNA testing. The fresher the tissue, the better is the result. Newly developed techniques are allowing the use of older specimens for DNA testing. The new technique of PCR (Polymerase Chain reaction) has made smaller amount of tissue DNA recognisable after multiplication.

What is DNA testing : A sample is taken and from it DNA is chemically extracted and purified. It is then cut into fragments at specific sequence by a restriction enzyme (RE) when this process is repeated by several enzymes. Enough information is gathered to construct a detailed genetic finger print of a person. Because every person's DNA sequence is different, the fragments of DNA specimen from one individual differs from those of another individual in number and length.

DNA is much more stable than proteins and enzymes, therefore, more important in medicolegal indentification.

Human ash : Human ash is the end product of cremation of human body in open air or in crematorium (gas or electric furnace). During Second World War gas furnace crematorium was being used. Incineration of an adult human body for purpose of cremation require $1^1/_2$ hour at 1600°C-1800°C and the resultant ashes weigh about 4-6 kg. In this temperature range all parenchymal organs will be completely converted to ashes. Only a few pieces of bones without organic material may be present in the human ashes. Hydrogen (H), Carbon (C), Sulpher (S), Phosphorous (P) all will be oxydized and leave into air in gaseous form as different oxides. All metals Fe (Iron), Co (Cobalt), Aluminium (Al) etc. will be oxydized along with Ca (Calcium), Mg (Magnesium) and Silicon (Si).

Can human ash be subjected to DNA testing? : As no DNA containing material is present in human ash DNA testing of human ash is impossible.

Has human ashes any medicolegal values? : 'Due to complete destructions of body almost all medicolegal evidence is lost'. Composition of ashes of different species have minor differences. Analysis of human ash can never tell from which

human body the ash has originated.

What is the fate of gold in crematorium? : Melting temperature of gold is 1064°C. Temperature of crematorium is much higher, when gold will melt into liquid form. After cooling it will take the form of granules which will remain mixed with human ash.

What is the fate of tooth in crematorium? : Main component of tooth is calcium whose melting temperature is 839°C which is much below the temperature of crematorium. All chemical and Biochemical composition will be converted to human ashes with which DNA test is impossible.

Some new factual contradictions and irregularities related to alleged ashes.

1. After surrender of Japan on 15 August 1945. Saigon-Taihoku air route was closed for Japanese. Then, how a Japanese Bomber can fly in this air route on 18 August without special permission of victorious American forces.

2. Where is the cremation? While CSDIC, CIC (1946) Netaji Enquiry Committee (1956) Netaji Inquiry Commission (1970) tell of cremation at Taihoku, one top secret signal of Hikari Kikan of 20 August, 1945 tells 'T' while on way to the capital as a result of an accident to this air craft at Taihoku at 1400 hours on 18th was seriously injured and died at midnight on the same date. His body has been flown to Tokyo by Formosan Army.

3. Where the ashes will be available? Quoting News agency (DPA) report, some newspapers including Bartaman (a Bengali Daily, 5 Sept '89) reports that one devastating fire has destroyed 345 years old historic Budhist Renkoji temple at Tokyo.

Then, where is the alleged ashes in an urn? Had the Budhist temple caught fire after giving notice to remove the urn of alleged human ashes with a piece of gold and one tooth to a safe place?

CONCLUSIONS

1. DNA test is impossible with human ashes.
2. Infact piece of gold can not stay in human ashes.
3. A tooth can not be a part of human ashes in a natural way, if not manipulated.

Synopsis of speech by Dr. Pal on 21 October 1998 (Azad Hind Day) at Citizens' Convention at Mahajati Sadan, Calcutta

[JAYASREE–Netaji number, January 1999]

(৪) নেহেরুর আমলে 'নেতাজী বর্জন'-এর এই ফতোয়া জারি হল কেন?

স্বাধীন ভারত সরকারের আকাশবাণী সহ অন্যান্য গণমাধ্যমগুলিতে একসময় নেতাজী ও আজাদহিন্দের নাম উল্লেখ নিষিদ্ধ ছিল। আজ পরিস্থিতি অনেকটা পাল্টে গেছে। একসময় অতিগোপন সুপারিশের মাধ্যমে সামরিক ব্যারাকে প্রকাশ্যে কোথাও নেতাজীর ছবি না টাঙানোর হুকুম জারি করা হয়। ওই আদেশ লিখিতভাবে আজও কি প্রত্যাহৃত হয়েছে?

CONFIDENTIAL

M. 155211.1
H. Q. Bombay Sub-area
Colaba, Bombay-6
11th Feb., 1949

Subject–PHOTOS

It is recommended that photos of Netaji Subhas Chandra Bose be not displayed at prominent places in Unit Lines, Canteens, Quarter Guards or Recreation Rooms.

P.N.K.V.L.

Sd/Major General Staff
P.N. KHANDUARI
Tel. 35081 Extn. 41

১৯৪৬ সালে সিঙ্গাপুরে মাউন্টব্যাটেনের প্রশ্ন ছিল পণ্ডিত জহওরলালের প্রতি—

- **সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরলে কে হবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী?**
- **বাংলা না যুক্তপ্রদেশ (বর্তমান ইউ.পি.) ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করবে?**

স্বভাবতই নেহেরুর বিচারে আর সুভাষচন্দ্রের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

(৩৪৪ এবং ৩৪৫ পাতার যাবতীয় তথ্য : 'নেতাজী গেলেন কোথায়?' পুস্তক থেকে লেখক ও সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীর অনুমোদন ক্রমে এই 'সুভাষ দর্পণে বিশ্বরূপ'— পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হল।)

নেহেরুর অন্ত্যেষ্ঠিতে নেতাজী

'৬৪ সালে নেহেরু মারা যান। অন্ত্যেষ্টিতে যোগদান করতে সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কেরা দিল্লিতে উপস্থিত। নিরাপত্তারক্ষীরা সজাগ রাজধানীতে পিঁপড়ে গলতেও দিচ্ছে না। কিন্তু ভারত সরকারের তোলা ডকুমেন্টারি নিউজ রীলে দেখা গেল, ভারতের শেষ বড়লাট ও প্রথম গভর্ণর-জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরেই ঢুকলেন নেতাজী, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশে! সে দিন একমাত্র নেতাজীই আপাদমস্তক লাল গোলাপের মালা দিলেন নেহেরুর মৃতদেহে, সঙ্গে লেখা ছিল তাঁর পরিচয়। সারা বিশ্বে এই নিউজরীল দেখানো হল। ভূত দেখায় ভারতে গুঞ্জন হল সোচ্চার। ভারত সরকার নেতাজীর ছবির অংশটুকু কাঁচি চালালেন, ঐ ফিল্ম নম্বর বি ৮১৬।

সরকার যতই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করুন, কিন্তু জবাব দিতে পারবেন কি? মিলিটারী, পুলিশ ও গোয়েন্দা বেষ্টনী ভেদ করে নেতাজী কি প্রবেশ করতে পারেন যদি না ভারতের সামরিক উচ্চপদস্থেরা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন? মাউনব্যাটেনের পরেই কি করে তিনি শবাধারে মালা দেবার অনুমতি পান? প্রোটোকল কি বলে? মাউনব্যাটেন স্বচক্ষে নেতাজীর ভারতে অবস্থান ও সামরিক সহযোগিতা দেখে গেলেন। এমনকি নেহেরুর চিতার আগুন সংযোগের পর নেতাজী ও স্থল বাহিনীর প্রধান জয়ন্ত চৌধুরী প্রায় শেষ পর্যন্ত শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। নেতাজী মাউন্টব্যাটেনকে দর্শন দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, ভারতবর্ষের স্বীকৃতি পাওয়া প্রকৃত স্বাধীন সরকার—আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান মারা যাননি, স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত! বুঝিয়ে দিলেন, ভারত কমনওয়েলথ বা ব্রিটিশের সাধারণ সম্পত্তি নয়, আজাদহিন্দ ফৌজের স্বীকৃতি পাওয়া বৈধ সম্পত্তি। ইনি আর কে হতে পারেন? কমিশন বলছে ইনি নেতাজী নন। তখন চোখ বন্ধ করে উল্টোটাই বিশ্বাস করা যেতে পারে। বিশেষত সরকার যখন ভয়ে কাঁচি চালিয়েছেন! তাছাড়া কানপুরের সাংসদ এম এম ব্যানার্জীর নেতৃত্বে সংসদে ৮০ জন সাংসদ প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুরকে প্রশ্ন করেন ঃ আমরা মনে করি ইনি নেতাজী, আপনি কি বলেন? প্রধানমন্ত্রী ছবিটি দেখতে চান, কিন্তু ছবিটি দেখার পর নীরব থাকেন।

বিশ্বনেতা নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনে দেশবাসীর নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য

★ '৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকার লিড খবর ছিলো 'ট্যু ডোমিনিয়নস্ আর বর্‌ণ।" ডোমিনিয়ন কথার অর্থ কি?

★ ভারত সরকারের প্রধান রাষ্ট্র-প্রধান ও সেনাধ্যক্ষ কে ছিলেন?

★ ভারত সরকারের প্রধান প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে প্রধানমন্ত্রী রূপে মনোনীত করেছিল কোন ভারতীয়রা?

★ '৪৭-এর ১৫ই আগষ্টের পর প্রত্যেক প্রদেশের গভর্ণরদের নিয়োগ কর্তা কে?

★ '৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট থেকে '৭১ সালের ১৫ই আগষ্ট রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালরা তাঁদের বাড়ীতে ও গাড়ীতে ব্রিটিশের পতাকা উড়াতেন কেন? এটা কোন্ সার্বভৌমত্বের প্রতীক?

★ রাষ্ট্রসংঘের ফ্রিডম্ হাউস তার বার্ষিক রিপোর্টে ভারতকে অর্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে স্বীকৃতি জানালো কেন? যে খবরটি দি পাইওনিয়ার ও স্বতন্ত্র ভারত পত্রিকায় ১৮-১২-৯৩ তারিখে ছাপা হয়েছিল। ঐ খবর সম্পর্কে ভারত সরকারের মন্তব্য কি?

★ রাজ্য সরকারে থেকেও কিছু বামপন্থীদল '৯৭ স্বাধীনতা দিবসে পতাকা উত্তোলন ও সকল সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন করা সত্ত্বেও ভারত সরকার ঐ দলগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করল না কেন?

★ ১৯৬৫-৬৪ শৌলমারী আশ্রমের সাধু শ্রীশ্রী সারদানন্দজী সম্পর্কে ভারত সরকারের যে গোয়েন্দা রিপোর্ট আছে তা প্রকাশের দাবীতে সোচ্চার হউন।

★ ১৯৬৪ সালের ২৭মে, মাউন্টব্যাটেন ও এ্যাটলির পর জওহরলালের শবদেহে যিনি মাল্যদান করেছিলেন তিনি কে? ভারত সরকারের ডকুমেন্টারী ফিল্ম নং ৮১৬বি-তে যাকে দেখা যাচ্ছে তাঁর প্রকৃত পরিচয় কি? 816/B নং ব্যক্তি শোক জ্ঞাপন খাতায় তার কি পরিচয় লিখেছিলেন?

★ ১৯৯১-এর ২০ শে ফেব্রুয়ারী রয়্যালর জর্ডনের একটি বিমান সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটে চীন হতে ৪ জন যাত্রী দমদম বিমান বন্দরে নামেন। বিমানটির নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। খবরে প্রকাশ ৪ জনের মধ্যে ১ জন V.V.I.P. জ্বালানী তেল নিয়ে সন্ধ্যা ৭টায় তেহরানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সমস্ত সংবাদপত্রে খবরটি ছাপা হয়। ঐ ভি ভি আই পি-এর পরিচয় প্রকাশ করার দাবীতে সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হউন।

আজাদহিন্দ স্বেচ্ছাসেবক পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ও আজাদহিন্দ প্রচার দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।

এই গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ :

১। স্বদেশ দর্পণে..কাব্যগ্রন্থ

২। ওই মহামানব আসে ....কাব্যগ্রন্থ

৩। ঊর্মিমালা ....কাব্যগ্রন্থ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও গ্রন্থপঞ্জী

যে সকল মহান সুধীবৃন্দ এই গ্রন্থরচনায় আমাকে অকাতরে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য, সহযোগিতা ও গঠনমূলক পরামর্শ দিয়েছেন বা উপকরণ সরবরাহ্ করেছেন তাঁদের সকলের নিকট আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁদের সকলকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। যাঁদের নাম স্মরণের ত্রুটীর জন্য এখানে দিতে পারিনি তাদের কাছেও সকৃতজ্ঞে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। যাঁদের সহযোগিতা ভালোবাসা ও স্নেহাশিস না পেলে এই অসম্ভব কাজ সম্ভব হতোনা। তাঁরা হচ্ছেন—

পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা কমলা দাসগুপ্তা (প্রাক্তন কলেজ অধ্যক্ষা, শিক্ষাবিদ ও বি. ভি. কর্মী, সুভাষবাদী জনতার নেত্রী), শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ নাগ (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, আজন্ম সুভাষ সাধক), শ্রীযুক্ত বিশ্বজিৎ দত্ত (প্রাক্তন সুভাষবাদী জনতার সেক্রেটারী জেনারেল ও বি. ভি. কর্মী), স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (সম্পাদক : উদ্বোধন), স্বামী আনন্দভারতী মহারাজ, প্রখ্যাত লেখক ও সাহিত্যিক শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা চন্দনা গোস্বামী, শ্রী পলাশ হালদার (নাট্যকার), শ্রী তাপসরঞ্জন ঘোষ (শিল্পী), ড: সুশান্ত মিত্র (সাংবাদিক ও গ্রন্থকার), শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী, (সাংবাদিক ও লেখক), ঁমনোজ চক্রবর্তী (জাতীয় শিল্পী), শ্রী সত্যেন চৌধুরী, শ্রী অনিল দত্ত, শ্রী সমর দাস, শ্রী রুদ্রপ্রকাশ ধর, শ্রী গৌতম ঘোষ, শ্রী মুকুন্দ ঘোষ, শ্রী ভাস্কর নাগ, শ্রী সুশীলচন্দ্র দেব রায়, তাপস বিশ্বাস, শ্রীযুক্তা গৌরী রায়, শ্রী গোপীরাজ পণ্ডিত, শ্রী শুভম চৌধুরী, শ্রী দীনবন্ধু বিশ্বাস, শ্রীযুক্তা কল্পনা ভৌমিক, শ্রী সুনীল কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রী শ্যামল সান্ন্যাল, শ্রী বিমল চৌধুরী, শ্রী হীরেন্দ্রকুমার রায়, ড: পবিত্র গুপ্ত , ডা: চৈতন্য চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত তাপস দাস প্রমুখ।

'সুভাষ দর্পণে বিশ্বরূপ'—এই পুস্তক গ্রন্থণায় যে সকল পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সহায়তা নিতে হয়েছে তা হচ্ছে যথাক্রমে :

India Wins Freedom : Mulana Abul Kalam Azad
An Indian Pilgrim : Subhas Chandra Bose
The Indian Struggle : Subhas Chandra Bose
তাইহোকু থেকে ভারতে : অভিজিৎ সরকার
নেতাজী গেলেন কোথায় : জয়ন্ত চৌধুরী
স্মরণে মননে সুভাষচন্দ্র
নেতাজী ঃ অজ্ঞাত অধ্যায় : ড: সুশান্ত কুমার মিত্র
Brothers Against Raj : Leonard A. Gordon
নেতাজী : দিলদার

ঐ মহামানব আসে : চারণিক
ওরা শুধু ভুল করে : শান্তনু সিংহ
শৌলমারীর সাধু কি নেতাজী : অলককৃষ্ণ চক্রবর্তী
ভারতের জাতীয়তাবাদ : (পুস্তিকা) : বিদ্যার্থীরঞ্জন প্রকাশনী
নেতাজীর বাণী সঙ্কলন : (পুস্তিকা) : বিদ্যার্থীরঞ্জন প্রকাশনী
রক্তে যাদের লেগেছিল সর্বনাশের নেশা : (পুস্তিকা) : বিদ্যার্থীরঞ্জন প্রকাশনী
নেতাজীর যে কাহিনী ইতিহাসের অন্তরালে : (পুস্তিকা) : অমরেন্দ্রনাথ বসু ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়
জয়তু নেতাজী স্মারক গ্রন্থ সমিতি : প্রকাশক : (নেতাজী জন্মশতবর্ষ উৎযাপন শান্তিপুর)
রাখাল বেণু : সাহিত্য পত্রিকা
History of Freedom movement Vol-III : Dr.Ramesh Chandra Mazumder
রহস্য পুরুষ নেতাজী : অরুণ ঘোষ
শুনুন ধর্মাবতার : নাথুরাম গড্‌সে, গোপাল গড্‌সে
The last days of British Raj : Leonard Mosley
The Statesman 1875-2000 : Special issue

Netaji Subhas Chandra Bose A Select Bibliography তাপস দাশ
স্মারকগ্রন্থ নেতাজী জন্মশতবর্ষ উইযাপন কমিটি (শান্তিপুর)

উপরের সকল সুধীবৃন্দসহ সকল পত্র/পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এবং গ্রন্থকারদের নিকট আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করছি বিনম্র চিত্তে। সেই সাথে প্রচ্ছদমুদ্রক এবং রেজ ডট কমের মুদ্রক শ্রীযুক্ত সুমন ও সুমিত রায়কে জানাই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ও কঠোর শ্রমের জন্য।

পত্রিকাসমূহ

দৈনিক বর্তমান, বর্তমান সাময়িক পত্রিকা, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক আনন্দবাজার। Hindustan Standard, Statesman পত্রিকা, দৈনিক বসুমতী পত্রিকা ইত্যাদি। Statesman পত্রিকা শতবর্ষ সংখ্যা (১৮৭৫-১৯৭৫) বিশ্বহিন্দু বার্তা, ইত্যাদি।

মুদ্রণপ্রমাদ

নিম্নলিখিত মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধনী আকারে পড়তে হবে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি
বুঝে	বুজে	৯৬	৮
নুতন	নতুন	৯৮	৪

নীচ থেকে ৪র্থ পংক্তির শেষে একটি 'তা' বসিবে 'তো' এর আগে—পৃষ্ঠা ১০৯।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি
ব্যাতিত	ব্যতীত	১১৯	৭
পক্ষাপত	পক্ষপাত	১৩১	১১

১৪৪ পৃষ্ঠার ২৮ নং লাইনে মহাভরমা-স্থলে মহাভীম পড়তে হবে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি
শ্রুতী	শ্রুত	১৬৪.	১৪
অতিন্দ্রীয়	অতীন্দ্রিয়	১৬৭.	৯
বিবাহিত	বিবাহিতা	১৮০	১০
বহিশত্রু	বহির্শত্রু	১৯২	২৪,২৫
অধিশ্বর	অধীশ্বর	১৯৩	২২
অতিব	অতীব	১৯৯	৩
তিব্বত	তির্ব্বত	২৪৪, ২৪৫	১১, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯,২০
তিব্বত	তির্ব্বত	২৪৬	১৫,২০,২৪
নুতন	নতুন	২৫১	১৫
অধিশ্বরা	অধীশ্বররা	২৬১	১৪

২৬৭ পাতার ৭ম লাইনে—৩১ অক্টোবরের স্থলে হবে—৩১ আগষ্ট।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি
পয়গাম্বর	পয়গম্বর	২৮০	২৮

২৮৬ পাতার ১১ নং পংক্তিতে 'বললে'—স্থলে 'বলতে' ২৮৬ পাতায় ১৩ নং পংক্তিতে 'বলতে'—কথাটি পংক্তি থেকে বিয়োজন হবে।

২৮৮, ২৯০, ২৯১ এবং ৩০০ পৃষ্ঠায়—১৩, ৩১, ১, ২৩ এবং ২৪ নং পংক্তিতে যথাক্রমে অধিশ্বর কথাটি অধীশ্বর বলে পড়তে হবে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি
যোগমার্গীর	যোগমার্গীয়	৯২	২৭
মহাত্ম্যের	মাহাত্ম্যের	১৬৫	১
হিটলালের	হিটলারের	১৭৪	৩
পড়ায়	পরায়	১৮৭	১০
বর্হিশত্রুর	বহির্শত্রুর	২০৫	৭
লেলিন	লেনিন	২৫৬	১৪
ব্যাপীয়া	ব্যাপিয়া	২৬৭	১৬
নুতন	নতুন	২৭৭	৩০
অধিশ্বর	অধীশ্বর	২৮৮	১৩
অধিশ্বর	অধীশ্বর	২৯০	৩১
অধিশ্বর	অধীশ্বর	২৯১	১
অধিশ্বর	অধীশ্বর	৩০০	২৩, ২৪
বিশ্বসত্ত্বাকে	বিশ্বসত্তাকে	২৮৫	১২
অর্ন্তদৃষ্টি	অন্তর্দৃষ্টি	২৯৫	২৭
অধিশ্বর	অধীশ্বর	৩০০	২৩, ২৪